ত্রৈমাসিক পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন,

কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা চতুরঙ্গ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৭

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা চতুরঙ্গ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** মাঘ-চৈত্র ১৩৬৭

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন,

কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

সে যুগে মানুষ তার
লাঙ্গল ও তাঁত,
তার তীর ও
ধনুক এবং
রথের ব্যবহার
করত তার
জীবনের বিকাশের
উদ্দেশ্যে; ঠিক তেমনি
আজকের দিনেও
আধুনিক যন্ত্রপাতিকে
মানুষের কল্যাণের জন্যই
নিয়োজিত করতে হবে।

কবিগুরুর 'নগর ও গ্রাম' ইংরেজী
প্রবন্ধের অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ।
বিশ্বভারতী বুলেটিনের ১৯৪৭ সালের
১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আমাদের হস্তশিল্প—সূচীশিল্প
সূচীশিল্পীর—শিল্পকলা একটু বিলাসিতার ছোঁয়া দিয়ে আমাদের গৃহকে রমনীয় করে তোলে। আমরা সকলেই এইটুকু বিলাসী হতে পারি।
আমাদের দেশের সূচীশিল্পীগণের নিপুণ অঙ্গুলীর যাদুস্পর্শে সামান্য পুঁতির মালা, শঙ্খ, পালক এবং কাঁচ নতুন রূপ নেয় এবং যে কোন জিনিষকে সুন্দরতর করে তোলে।
ভারতীয় সূচীশিল্প দিয়ে আপনার গৃহ সুশোভিত করুন।
নিখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড
ভারত সরকার
DA

কাজের আর অন্ত নেই !
"ডানলপিলোর উপর
আরামে বসে একটু
জিরিয়ে নেওয়া যাক !
কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে
পড়লে মাও তাই করেন।
আমিও হয়রান হয়ে পড়েছি—
অথচ আরো কত কাজ বাকি…"

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য ব্রিটেনের কয়েকটি সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানি সংঘবদ্ধ হ'য়ে **ইস্কন** নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য প্রতিটি কোম্পানি তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যখন সম্পূর্ণ হবে তখন সেটি পৃথিবীর যে কোন দেশের বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক ইস্পাত কারখানার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।

দুর্গাপুরে কারা কি করছেন?

যন্ত্রপাতি নির্মাণ
ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ
সাইমন-কার্ভস্ লিঃ
দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্‌জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ

বনিয়াদ স্থাপন ও গৃহ নির্মাণ
দি সিমেণ্টেসন কোম্পানি লিঃ

বৈদ্যুতিক কাজ
দি ব্রিটিশ টম্‌সন্-হুস্টন কোম্পানি লিঃ
দি ইংলিশ ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানি লিঃ
দি জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানি লিঃ
মেট্রোপলিট্যান-ভাইকার্স ইলেক্‌ট্রিক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ

কাঠামোর জন্য ইস্পাত
স্যার উইলিয়ম এ্যারল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ
ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ
ডরম্যান লঙ্ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং) লিঃ
জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ

(সিমেন্স এডিসন সোয়ান লিঃ এবং পিরেলি জেনারেল কেব্‌ল ওয়ার্কস লিঃ যৌথ প্রতিষ্ঠানের জন্য কেব্‌ল-এর কাজ করছেন।)

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্‌স্ট্রাকশন্ কোম্পানি লিঃ

ISCON-9 BEN

গ

দ্বাবিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ আষাঢ় ১৩৬৭

রবীন্দ্রনাথ

কাজী আব্দুল ওদুদ

মনীষা ভিন্ন আরো নানা ধরনের সম্পদ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলোয় রয়েছে, যেমন, প্রকৃতি-প্রেম, ভগবৎ-প্রেম, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম, মহতের পূজা, কৌতুকহাস্য, শ্লেষ ইত্যাদি। এসবের কিছু কিছু পরিচয় এই সংগ্রহেও পাওয়া যাবে। তবু ধর্ম রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষার মতো গুরু বিষয়ের প্রবন্ধে মনীষাই যে সব চাইতে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ সে-সম্বন্ধে দ্বিমত না হবারই কথা। একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্য হয়ত আর একটু পরিষ্কার হবে। ধর্মজীবনে ভক্তি খুব বড় ব্যাপার; কারো কারো মতে ভক্তি-তন্ময়তাই ধর্মজীবনের সব চাইতে বড় লক্ষণ। ভক্তি ও ভক্তি-সাধন সম্পর্কে অনেক রচনা কবির "ধর্ম", "শান্তিনিকেতন", এসব গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু সেসব থেকে আমরা খুব কম অংশই গ্রহণ করতে পেরেছি। সেই বিভাগ থেকে 'ভাবুকতা ও পবিত্রতা'র মতো লেখা অবশ্য আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছি, তার কারণ, তাতে কবি যেমন সচেতন ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তেমনি তার আনুষঙ্গিক দুর্বলতা সম্বন্ধেও। গদ্য বিচারের ভাষা। অন্যান্য সম্পদে ভূষিত হতে গদ্যের আপত্তি নেই, বরং আগ্রহ আছে; কিন্তু বিচার গদ্যের প্রাণ। সেই গদ্যই মূল্যবান তীক্ষ্ম বিচারবোধ যার স্নায়ু ও মজ্জা-স্বরূপ। তাছাড়া সাহিত্যের লক্ষ্য কোনো বিশেষ পাঠক-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য সাধারণ মানব-সমাজ—কিছু কৌতূহল, কিছু কাণ্ডজ্ঞান আর কিছু শুভবুদ্ধি যাদের নিত্যসম্পদ জ্ঞান করা হয়। মানুষের কোনো একঝোঁকা পরিণতি নয়, তার সমগ্র চেতনাকে ঔদাসীন্য ও অবসাদ থেকে জাগিয়ে তোলা সাহিত্যের চিরদিনের বড় কাজ।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মনীষার মূলে তাঁর ধর্মবোধ, অন্ততঃ, ধর্মবোধের সঙ্গে তাঁর মনীষা অতি নিবিড়ভাবে যুক্ত। তাই তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের প্রথমেই চাইতে হয় তাঁর ধর্মবোধের পানে। তাঁর পিতার ধর্মবোধ ও ধর্ম-সাধনা তাঁর উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, একথা আমরা জানি ও মানি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপারও তুলাস্বীকৃতির দাবি রাখে, সেটি হচ্ছে—বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব সচেতনতা। কবি তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে তাঁর বালককালের যে ছবি এঁকেছেন তাতে দেখা যায় প্রতিদিনের সূর্যোদয় বালক-বয়সে তাঁর জন্য কী অসীম-রহস্য-ভরা ছিল; আর শান্তিনিকেতনের বর্ষীয়ান আশ্রমিকদের

মুখে শোনা যায় সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে উঠে তাঁরা দেখতেন কবি নীরবে পূবের দিকে মুখ করে বসে আছেন সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়। তাঁর প্রায় বিশ বৎসর বয়সে এই সূর্যোদয় একদিন তাঁর সমস্ত চেতনায় কী অমৃতময় অনুভূতির সঞ্চার করেছিল তার পরিচয় রয়েছে এই সংগ্রহের 'মানব-সত্য' প্রবন্ধে। ঋতুপর্যায় মেঘবৃষ্টি বহতা নদী এসব সারাজীবন তাঁর অন্তরে অন্তহীন সুর জাগিয়েছে। আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি যা কিছু প্রতিভাত হচ্ছে সব অমৃত আনন্দরূপ, উপনিষদের এই বাণী তাঁর কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হয়েছে; কিন্তু তাঁর জীবনের দিকে চাইলে বোঝা যায় বিশ্বপ্রকৃতির এই অমৃতময় আনন্দরূপের উপলব্ধি শুধু যে উপনিষদ থেকে তাঁর লাভ হয়েছিল তা নয়—এই চেতনা ছিল তাঁর সহজাত মহাসম্পদ।

এর সঙ্গে আরো স্মরণ করবার আছে তাঁর পরিবেশের প্রভাব—সেই পরিবেশ বলতে বুঝতে হবে যে বিশেষ পরিবারে ও সমাজে আর যে বিশেষ দেশে ও কালে তিনি জন্মেছিলেন সেই সবই। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম-ধর্ম ও সমাজের দ্বিতীয় প্রবর্তক। উপনিষদের চিন্তা তাঁর জীবনে গভীরভাবে সক্রিয় হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই উপনিষদের সব কিছু তিনি গ্রহণ করেননি। আর উপনিষদের ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে তাঁর জীবনে তুল্যভাবে সক্রিয় হয়েছিল তাঁর কালের নবমানবিকতার লোকহিত-সাধনমন্ত্র। এই দুইই হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরও গভীর আত্মিক সম্পদ। এই লোকহিত-সাধনের বিশেষ অর্থ অবশ্য দাঁড়িয়েছিল স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধন। শুধু মহর্ষির ভিতরে নয় তাঁর পরিজনদের মধ্যেও এই স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনা প্রবল ছিল। কিন্তু অচিরে এই চেতনা প্রবলতর রূপ নিয়ে দেখা দেয় বৃহত্তর বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে। সেই প্রবলতর স্বদেশ ও স্বজাতি-চেতনায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ দেখা যায় শুধু তাঁর যৌবনে নয় তাঁর পরিণত যৌবনে আধ্যাত্মিকচেতনা যখন তাঁর ভিতরে প্রবল হ'ল সেই কালেও। এমন কি তাঁর আধ্যাত্মিকচেতনা যেন বিশেষ মহিমা সঞ্চার করে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি-চেতনায়—তার পরিচয় রয়েছে ভারতের বৌদ্ধযুগের ও মধ্যযুগের রাজপুত-শিখ-মারাঠার ত্যাগপূত জীবনসম্বন্ধে তাঁর অতুলনীয় গাথাগুলোয়। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের মহিমা এই কালে তাঁর বহু রচনায় কীর্তিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আফ্রিকার বোয়ার-যুদ্ধে শক্তি ও সভ্যতা-দর্পী ইয়োরোপ যে অবিশ্বাস্য বর্বরতার পরিচয় দেয় তাতে ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবি অনেকখানি সন্দিহান হন, আর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল জ্ঞান করেন প্রাচীন ভারতের সরল নির্লোভ ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবনকেই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঘটে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। কবি সেই আন্দোলনে সর্বান্তকরণে যোগ দেন, কিন্তু তাঁর নব-আদর্শ-নিষ্ঠার ফলে ইংরেজ-বিদ্বেষের কোনো কথাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় না, এক অসাধারণ প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি দেশের লোকদের বলেন ধর্মবর্ণনির্বিশেষে দেশের সবাইকে আপন জেনে ভালবাসতে, আর শাসকদের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সব করণীয় নিজেরা করতে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কবির লেখায় ও কাজে ভগবৎ-প্রেমের ও স্বদেশ-প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় প্রকাশ পায়।

প্রধানত শাসকদের পীড়নের ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন বোমা-বিদ্রোহের রূপ নেয়। যে অসহায়তা-বোধ থেকে তরুণ দেশ-প্রেমিকদের একটি দল সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত হয় কবি তার পরিমাণ সহজেই উপলব্ধি করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন ভারতবর্ষের মতো দেশের বিচিত্র জটিল সমস্যা. ভারতের মহান

ঐতিহ্যের অশেষ অর্থপূর্ণতা আর ভারতবর্ষের মতো দেশে সন্ত্রাসবাদের সমূহ অকার্যকারিতা। তাঁর সেই উপলব্ধি দ্বিধাহীন কণ্ঠে সেই কালে তিনি ব্যক্ত করেন তাঁর 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে।

এর পর থেকে তাঁর ঐকান্তিক প্রচারের বিষয় হয়—উগ্র জাতীয়তা পরিহার আর জ্ঞান শান্তি ও মৈত্রীর পথ অবলম্বন। শুধু ভারতে নয় বৃহত্তর জগতেও এই বাণী তিনি দীর্ঘকাল প্রচার করেন। তাঁর দুটি সুপরিচিত গানে তাঁর পরিণত জীবনের এই চিন্তা পরম-হৃদয়গ্রাহী রূপ পেয়েছে, সেই দুটি গানের প্রথমটির প্রথম পদ হচ্ছে—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে,

আর দ্বিতীয়টির প্রথম পদ হচ্ছে—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।

সেই দিনে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কবির এই চিন্তাকে জ্ঞান করেছিলেন এক শ্রেণীর আদর্শবাদ, অর্থাৎ শুনতে ও ভাবতে ভাল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে স্বল্পমূল্য। কিন্তু দুই মহাযুদ্ধের পরে আর সাম্প্রতিক কালে আণবিক অস্ত্রের সর্বধ্বংসী ক্ষমতার প্রমাণ পেয়ে অনেকেই বুঝতে পারছেন টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো যুদ্ধবিরোধী আর শান্তি ও মৈত্রীকামী একালের মহাপুরুষেরা কত বড় সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন মানব বন্ধু। একালে সভ্যতার এক দারুণ সংকটে তাঁরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন মানুষের বাঁচার পথের। অবশ্য মানুষ বাঁচার পথে চলবে, না, মরার পথেই পা বাড়াবে, কে আর তা বলতে পারে।

বলা যেতে পারে কবির তেত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা প্রথম স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় এতকাল যে শুধু কাব্যচর্চায় তাঁর দিন কেটেছে তাতে তিনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন আর বলছেন, এবার তাঁর কাজ হবে 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা' দেওয়া, 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা' সঞ্চারিত করা। যে আদর্শের নতুন প্রেরণা তাঁর লাভ হয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন—

বল মিথ্যা আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুখ; স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

তিনি আরো উপলব্ধি করছেন, বৃহৎ জগতের কাজে আত্মসমর্পণ করে আর সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা জেনে নির্ভয়ে তার দিকে অগ্রসর হতে হবে—

জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কিন্তু কে সে? তার উত্তরে কবি বলেন—

জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,

নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো।

এখানে দেখা যাচ্ছে কবির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক চেতনার বা ভগবৎ-চেতনার সঞ্চার হয়েছে তার কাজ হচ্ছে মহত্তর জীবনের অভিমুখে এক প্রবল প্রেরণাদান।—এমন প্রেরণার পথে চলে কবির কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয় তার পরিচয় রয়েছে তাঁর নানা কবিতায় নাটকে গানে ও গদ্যরচনায়। শেষে তাঁর এই ধর্মবোধের কিছু ব্যাখ্যা তিনি দিতে চেষ্টা করেন অক্সফোর্ডে তাঁর হিবার্ট-বক্তৃতা-মালায় ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম" বক্তৃতামালায়। "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। সেই বক্তৃতামালার ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

> স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব-প্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।
>
> কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তাহলে এর জন্য সাধনা করতে হয় না।
>
> আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজেই তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন।

দেখা যাচ্ছে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় এক মহত্তর জীবন-চেতনার কথা তিনি যে ব্যক্ত করেছিলেন ধর্মজীবন বলতে সেই মহত্তর জীবন-চেতনাই তিনি উত্তরকালেও বুঝেছেন। সেই মহত্তর জীবন-চেতনা নিয়ত-বিকাশশীল, নব নব সার্থকতার পথে ধাবমান—কবির ভাষায়—

> আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে।

প্রচলিত কথায় যাকে ধর্ম বলা হয় তা অবশ্য অনুষ্ঠানসর্বস্ব—মহত্তর জীবন-চেতনার কোনো লক্ষণই সাধারণত তাতে দেখা যায় না; কিন্তু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এমন সব বাণী আছে যা থেকে বোঝা যায় সেসবে ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকের কথাই ভাবা হয়নি, মহত্তর জীবন-চেতনা বলতে যা বোঝায় তার কথাও ভাবা হয়েছিল।

আর একালে, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের পরে থেকে, ধর্ম বলতে প্রধানত মানুষের মহত্তর জীবন-চেতনার মতো ব্যাপারই বোঝা হচ্ছে। গ্যেটে তাঁর ভিল্‌হেলম্ মাইস্টার-এর শেষের দিকে ধর্ম সম্পর্কে এই মর্মের উক্তি করেছেন : নিজেকে শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অবশ্য এই শ্রদ্ধা অহমিকা ও দুরাকাঙ্ক্ষাবর্জিত। ভারতের নব জীবনারম্ভের মহান পথপ্রদর্শক রামমোহনের একটি অতি প্রিয় বাণী ছিল এই : The true way of serving God is to do good to man. একালের কোনো কোনো খ্যাতনামা চিন্তাশীল অবশ্য ধর্মের উপরে জোর দেননি; তাঁরা ধর্মকে বরং অবিশ্বাস করেছেন, আর জোর দিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চা ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপরে। কিন্তু সমসাময়িক কালের অনেক পাশ্চাত্ত্য মনীষী ধর্মবোধের উপরে নতুন করে জোর দিচ্ছেন, আর সে-ধর্মবোধ মূলত

মহত্তর জীবন-চেতনা। এঁদের নেতৃস্থানীয় Albert Schweitzer-এর একটি উক্তি এই—

> That we have lapsed into pessimism is betrayed by the fact that the demand for the spiritual advance of society and mankind is no longer seriously made among us............
>
> Salvation is not to be found in active measures, but in new ways of thinking.
>
> But new ways of thinking can rise only if a true and valuable conception of life casts its spell upon individuals.
>
> The one serviceable world-view is the optimistic-ethical.
>
> *Civilisation and Ethics.*

আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার তুলনা করলে সহজেই চোখে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম অনুভূতি-মূলক, কোনো তত্ত্বচিন্তা থেকে মুখ্যত তার উৎপত্তি নয়, কোনো তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে যুক্তও নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি কবিতা এই—

এ কথা মানিব আমি এক হতে দুই,
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই।
কেমনে যে কিছু হয়, কেহ হয় কেহ
কিছু থাকে কোনো রূপে, কারে বলে দেহ,
কারে বলে আত্মা মন, বুঝিতে না পেরে
চিরকাল নিরখিব বিশ্ব জগতেরে
নিস্তব্ধ নির্বাক চিত্তে। বাহিরে যাহার
কিছুতে নারিব যেতে আদি অন্ত তার
অর্থ তার তত্ত্ব তার বুঝিব কেমনে
নিমেষের তরে। এই শুধু জানি মনে
সুন্দর সে, মহান সে, মহাভয়ংকর,
বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর।
ইহা জানি, কিছুই না জানিয়া অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে।

তাঁর 'মানবসত্য' প্রবন্ধেও কবি এক জায়গায় বলেছেন—

> সেদিন অক্স্‌ফোর্ডে যা বলেছি তা চিন্তা করে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপরে খাড়া করে বলা।

অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা অন্যান্য প্রাচীন ধর্মচিন্তায় মূল ব্যাপার হচ্ছে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, অর্থাৎ যা জগতরূপে প্রতিভাত হচ্ছে তার অতিরিক্ত কিছু, তা নাম তার যা-ই দেওয়া হোক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যতটা সত্য মানব-জীবন তার চাইতে কম সত্য নয়। এর সমর্থনে তাঁর বহু উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে; তাঁর 'ধর্মের অধিকারে'র একটি উক্তি এই—

> ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে

> খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের (মহাপুরুষদের) কর্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপতপ করিয়াই কাটায় অন্তবদেবাস্য তদ্‌ ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, সকৃপণঃ—
>
> —সে কৃপাপাত্র।
>
> ...বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেম, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে।...মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য।......
>
> যে আপনার সর্বোচ্চকেই সর্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনই উচ্চাসন পাইবে না।

আর শেষের দিকে মানব-জীবনের মহত্তর পরিণতিই তাঁর মনোযোগ যেন বেশী আকৃষ্ট করেছে, যেমন, 'মানুষের ধর্মে' তিনি বলেছেন—

> মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্য-বোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁচেছে।......
>
> জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের পরিপূর্ণতার বিষয় মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহ মন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়......
>
> পরমাত্মা মানবপরমাত্মা ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।

—এর থেকে অনেকখানি নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথ একালের মানুষ, তাঁর ধর্মবোধ একালেরই ধর্মবোধ তা প্রাচীন শব্দ ও রূপ-কল্পনা যতই তিনি ব্যবহার করে থাকুন।— বাউলদের প্রতি বহু জায়গায় তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। বাউলদের সঙ্গে তাঁর দুইক্ষেত্রে বড় মিল রয়েছে—বাউলদের মতো তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত, আর বাউলদের মতনই তিনি অসীম ও অরূপের প্রেমিক। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তাঁর খুব বড় অমিল এই ক্ষেত্রে যে বাউলরা বৈরাগী ও মরমী, কিন্তু তিনি জীবনবাদী ও সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষে আস্থাবান। হয়ত এই গূঢ় কারণেই তিনি প্রাচীন ধর্মপন্থী, ভক্তি-মার্গী, বাউল, কারো মতনই গুরুবাদী নন। এ সম্বন্ধে তাঁর এই বিখ্যাত উক্তিটি উচ্চারিত হয়েছে তাঁর এক নায়কের মুখে—

> আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গেও কিঞ্চিৎ পরিচয় আমাদের হয়েছে। এ স্বাভাবিক কেননা জীবন ও জীবনের প্রচেষ্টা আসলে অবিভাজ্য। তবু নানা ভাগে ভাগ করেই আমরা জীবন ও জীবনের প্রচেষ্টা বুঝতে চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে এইবার একটু খোঁজ নেওয়া যাক। রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের যোগ অঙ্গাঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সঙ্গেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো সমাজ সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তা।

প্রথম যৌবনেই রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সেইগুলি এখন প্রচলিত নেই—"অচলিত সংগ্রহে" স্থান পেয়েছে। সেই সব প্রবন্ধের মধ্যেও উপভোগ্য রচনা কিছু কিছু আছে; দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্লেষোক্তিও দুই একটিতে

চোখে পড়ে। তবে মোটের উপরে সেই সব লেখার জগৎ সংকীর্ণ জগৎ—কবি যেন নিজের সঙ্গে, অথবা একটি সুপরিচিত বন্ধু মহলে, আলাপ করছেন, বৃহত্তর দেশ বা জগৎ যেন তাঁর চিন্তার বিষয় নয়। ব্যাপক মানব-সমাজের সঙ্গে লেখকের যোগের অভাব ঘটলে তাঁর রচনার আবেদনে ত্রুটি ঘটা স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথকে প্রতিভাদীপ্ত প্রাবন্ধিকরূপে প্রথম দেখা যায় 'সাধনা' পত্রিকায়, তাঁর প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে। এর পূর্বেও দু-একটি প্রবন্ধ (যেমন তাঁর ২৭ বৎসর বয়সে লেখা 'হিন্দু বিবাহ'-এ) তাঁর শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু শক্তির প্রকাশ সেখানে আশানুরূপভাবে সুন্দর নয়। 'সাধনা'র যুগে দেখা যায় একই সঙ্গে তিনি দক্ষহস্তে কলম চালিয়েছেন সমাজ রাষ্ট্র ও শিক্ষা বিষয়ে—সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তো বটেই।

কবির ধর্মবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি তাঁর নবযৌবনে তাঁর পরিবেশে স্বদেশ ও স্বজাতি-চেতনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রবল বললে সব কথাটা বলা হয় না—একটি উল্লেখযোগ্য দলের ভিতরে এই চেতনা হয়েছিল উৎকট। তাদের আর্যামির দম্ভ ও আরো নানা উদ্‌ভট চিন্তার প্রতি কবি বহুবার বহু শাণিত বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন। এই সংগ্রহেও তার পরিচয় পাওয়া যাবে। নিজে প্রবলভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনুরাগী হয়েও এমন আঘাত হানা কবি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছিলেন, কেন না, তিনি চাচ্ছিলেন দেশের সত্যকার শ্রীবৃদ্ধি যা সম্ভবপর স্বভাব ও জ্ঞানের পথে, অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক পন্থায় কখনো নয়। বহুকালের নানা আচার ও সংস্কারের ভারে ব্যাহত হয়েছিল আমাদের দেশের জীবন ও চিন্তার গতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে নানা কারণে বর্ধিত জাতীয় অহমিকা সেই ব্যাহত গতিতে আরো বিচিত্র বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। সেই সব অদ্ভুতত্বের সঙ্গে সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় স্বাক্ষর রেখে গেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বভাব ও কাণ্ডজ্ঞান যে নতুন মহিমা লাভ কবলো এজন্য সে-সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ হয়েছে।

কবি তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিজে বলেছেন—

> আমাদের ব্রাহ্ম-পরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়া-কর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল।.. সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ-ভাবে দীক্ষিত করেছে।—সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ প্রকাশ আমাদের অন্তরপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাব-সীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি।

এই চিন্তার দ্বারা চালিত হয়ে ইংরেজি ভাষার সেই সর্বব্যাপী প্রভাবের দিনে তিনি বার বার চেষ্টা করেন প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলার চর্চা প্রবর্তন করতে। ইংরেজের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের লোক শিক্ষাদান, দেশের জলকষ্ট নিবারণ, এ সব গঠনমূলক কাজের ভার নিজেরা নিক, এ প্রস্তাবও বার বার তিনি সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করেন।

ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ভারত-ভাগ্য-বিধাতার কোনো বিশেষ

অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে কিনা কবি এই প্রশ্নেরও সম্মুখীন হন। এ সম্বন্ধে তাঁর খুব উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'।

ভারতবর্ষের নিজস্বতা সম্বন্ধে চেতনা আরো বহুভাবে কবিকে চিন্তা ও কর্ম-তৎপর করে। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ তার ভারতশাসনকে করেছিল বহুল পরিমাণে যন্ত্রধর্মী। তাতে ইংরেজের প্রতাপ ও দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছিল খুব, আর সেই অনুপাতে অভাব ঘটেছিল ভারতের প্রতি তার মমত্ববোধের। কবির আত্মসম্মান-বোধ এতে গভীরভাবে পীড়িত হয়েছিল আর ইংরেজের এই ঔদ্ধত্যের প্রতি আঘাত হানতে তিনি কখনো পশ্চাৎপদ হননি। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নৃশংসতা সম্পর্কে তাঁর প্রতিবাদ সুবিদিত, তার বহু পূর্বে লর্ড কার্জনের ঔদ্ধত্যের প্রতিও তাঁর অকুণ্ঠিত প্রতিবাদ স্মরণীয় হয়ে আছে।—কিন্তু এই সব প্রতিবাদে কবির অপূর্ব একটি বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতি ব্যবহারে ইংরেজ তার সাম্রাজিক স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত; সেজন্য নিষ্ঠুর তার লোভ, বীভৎস তার আচরণ। কিন্তু ইংরেজকে এমন বর্ণে চিত্রিত করেও তার প্রতি শ্রদ্ধা তিনি হারাননি, কেন না একটি বড় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সে বাহন, একালে-অশেষ-অর্থপূর্ণ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতাও সে ভারতবর্ষে বহন করে এনেছে। বিপক্ষ সম্বন্ধে এমন মনোভাবকে অসাধারণ বলতেই হবে। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যায় এই হওয়া উচিত সভ্য ও আলোকপিয়াসী মানুষের মনোভাব, কেন না, বিপক্ষের প্রতি ঘৃণা ও অন্ধতা শুধু বিপক্ষকেই আঘাত করে না, সেই ঘৃণা ও অন্ধতাপোষণকারীকেও গভীরভাবে আহত করে। অবশ্য এ পথ কঠিন। কিন্তু মানুষের সত্যকার কল্যাণের পথ কোনোদিনই সহজ নয়। কবির শেষ বড় লেখা "সভ্যতার সংকটে" দেখা যায় ইংরেজের—অথবা ইয়োরোপীয় সভ্যতার—প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধা নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। তবু তিনি সেই লেখাটিতেই বলেছেন—

> ...মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

জাতীয়তা কী? সব দেশে জাতি গঠন কি একই পদ্ধতিতে হয়েছে? তাদের লক্ষ্য কি একই? এই সব প্রশ্ন এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রবল হয়েছিল। বলাবাহুল্য ভারতবর্ষের নিজস্বতার সন্ধানই ছিল তার মূলে। কবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারতীয় সভ্যতার মূল আশ্রয় সমাজ আর ইয়োরোপীয় সভ্যতার মূল আশ্রয় রাষ্ট্রনীতি। তাঁর মতে—

> সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য তবে আমরা ভুল করিব।

কবির এই ধরনের কথা থেকে ধারণা হতে পারে ভারতবর্ষের পথ আর য়ুরোপের পথ স্বতন্ত্র এই কবির বক্তব্য। এক সময়ে এমন একটা ধারণার দিকে তিনি যে ঝুঁকেছিলেন তা বলা যায়। কিন্তু তাঁর ১৯১৭ সালের বিখ্যাত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' লেখাটিতে দেখা যায় তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে যা শ্রেষ্ঠ, মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সার্থকতা এনে দিতে পারে, তা সব মানুষের জন্য কাম্য, তা পাবার জন্য সবাইকে যত্নবান হতে হবে, যারা তা দিতে পারে তাদের তা দিতেও সচেষ্ট হতে হবে। কবির উক্তি এই—

> যে জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে।...য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জন-সাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার

> মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিধিদত্ত রাজপরোয়ানা।...আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে-কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এক কোণের বাতিটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের সলতে দিয়াই হ'ক আলো জ্বালাই চাই।...ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে-আত্মা অপরিমেয়, যে-আত্মা অপরাজিত, অমৃত-লোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে-আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলায় মুখ লুকাইয়া...যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলি-পুঞ্জে শুষ্ক পত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নব নব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবন-ধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুজয়ী, যে চিরজাগরূক, চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগে যুগে নব নব তোরণ দ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

স্মরণ করবার আছে কবি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'-এর বহু পূর্বে লেখা তাঁর 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শ এমন একটি অর্থপূর্ণ আদর্শ যা শুধু হিন্দুর জন্য ভাল নয় সব মানুষের জন্যই ভাল।

কবি তাঁর কালের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা নিয়েও কম চিন্তা করেননি। এই বিরোধে তিনি খুব দুঃখ পান। মূল সমস্যাটি সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় এই : সামাজিক ব্যবহারে হিন্দুর অনুদারতা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে যেমন একটি বড় বাধা তেমনি বড় বাধা ধর্মচিন্তা সম্পর্কে মুসলমানের অনড় মনোভাব (কবির ভাষায় 'এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের' সংঘর্ষ)। এই দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় সমস্যাটি কত কঠিন। কিন্তু এর সমাধান কোথায়? কবির উত্তর—

> মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্য যুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে।...হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে।

আমাদের দেশে শুধু হিন্দু আর মুসলমানই নেই আছে বিচিত্র-মতাবলম্বী বিচিত্র-আচার-পন্থী নানা প্রদেশে ও অঞ্চলে বিভক্ত নানা ভাষাভাষী প্রায় সংখ্যাহীন দল উপদল। এত বিচিত্র উপাদান নিয়ে কেমন করে গঠিত হবে একটি সুসংহত জাতি ও রাষ্ট্র—এই

দেশের সামনে সমস্যা। স্বাধীনতা লাভের পরে এই সমস্যাটি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও এর গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে এই সমস্যার উপরে তিনি যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য এই : দেশের এত বৈচিত্র্য ও জটিলতা যথাসম্ভব অস্বীকার করে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ সরল মীমাংসার দিকে আমাদের কারো কারো মন যেতে পারে; কিন্তু সে-পথে এই সমস্যার মীমাংসা সহজ হবে না, বরং আরো কঠিন হবে। বৈচিত্র্য যেখানে যথার্থই আছে সেখানে তাকে স্বীকার করতে হবে—স্বীকার করেই তার মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। যেমন হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা। আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত দেশের অগ্রগতির সঙ্গে এর যোগ ঠিক নেই। কিন্তু হিন্দুর বিশেষ জীবনধারা ও চিন্তা-ধারা আর মুসলমানের বিশেষ জীবনধারা ও চিন্তাধারা যখন যথার্থই আছে, তা যখন মায়া নয়, তখন তা যথাসম্ভব ভাল রূপ পাক এই সবার চেষ্টা হওয়া উচিত। ভাল রূপ বলতে কি বোঝায় তার নির্দেশ পাওয়া যায় কবির এই উক্তি থেকে—

> বিশেষত্ব বর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দুদিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

অর্থাৎ বিশেষত্বকে স্বীকার করতে হবে আর এমন আয়োজন করতে হবে যাতে সেই বিশেষত্ব মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হতে পারে, অন্য কথায়, দেশের সাধারণ জীবনধারার বাধা না হয়ে মহৎ সহায় হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমানের চিন্তা-ভাবনার বৈশিষ্ট্য স্থান পাক, সেই সঙ্গে 'বিশ্ব' অর্থাৎ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে যা পরিচিত তাও স্থান পাক। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের তাদেব পুরোনো জায়গায় অনড় হয়ে বসে থাকা আর সম্ভবপর হবে না, বিশ্বের যা শ্রেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা তার স্পর্শ পেয়ে তারাও যোগ্যভাবে বদলাবে।

লক্ষ্য করবার আছে কবি দেশের লোকদের প্রাচীন সংস্কার সরাসরি বদলাতে চাননি, কিন্তু সে সবকে সংস্কৃত ও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন মহত্তব জীবন-চেতনাব দ্বাবা।

হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় দেশে স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থানও সে-সবে হয়েছে। কিন্তু ফল আশানুরূপ হয়েছে কি? কেউ কেউ বলতে পারেন, এই প্রশ্ন করবার সময় এখনো হয়নি। তা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু কবির মূল যে ইংগিত—বিশেষত্বকে মহত্ত্বে উত্তীর্ণ করতে হবে—সেটি যেন দেশেব হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান বাঙালী মান্দ্রাজী মারাঠী পাঞ্জাবী কেউ কখনো না ভোলে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সচেতন ছিলেন ব্যক্তির জীবনের মূল্য সম্বন্ধে তেমনি যৌথ-জীবনের মূল্য সম্বন্ধেও। অল্পদিনে রাশিয়ায় যৌথ জীবনের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে দেখে তিনি গভীর আনন্দ লাভ করেছিলেন; তাঁর বিখ্যাত "রাশিয়ার চিঠি"র এক জায়গায় এই মন্তব্যটি রয়েছে—

> রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো। এখানে এরা যা কান্ড করছে তার ভাল মন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয় কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনেপ্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে তার কতদিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে

পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভয় ভাবনা সংশয় কিছু মনে নেই।

কিন্তু রাশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ব্যক্তির মূল্য যে কম এটি তিনি ভাল বলে মেনে নিতে পারেননি, সে-সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট—

শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না।

অন্যত্র—

সন্দেহ নেই যে, একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর, তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগ-সাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে। তাছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাসে চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে—এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।

তিনি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে গেছেন সমবায়নীতির প্রতি—

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধনউৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক এই আমি কামনা করি।

আমাদের গ্রামগুলোর উন্নতি সম্পর্কে তাঁর এই উক্তিটি খুব অর্থপূর্ণ—

আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনো ইচ্ছে করিনে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেই রকম সংস্কার, বিদ্যা, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত—বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ যে-পরিমাণে ব্যাপক হয়নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে-প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।

মানবপ্রকৃতি কোনোদিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না হোক এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার বিষয় আর এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। অসহযোগ আন্দোলনের দিনে দেশের সবাইকে চরকা কাটতে বলা হয়েছিল; মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি অসাধারণভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়েও তিনি সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, কেননা তাঁর ধারণা হয়েছিল এমন একঘেয়ে কাজে অন্য লাভ যাই হোক মনের উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা নেই।

মানুষের মহত্তর পরিণতিতে তাঁর অশেষ আস্থা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অপূর্ব 'নারী' প্রবন্ধটিতেও।

রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে কবি আর জীবন-জিজ্ঞাসু। কবি রূপে তিনি চিরদিন আনন্দ প্রকাশ করেছেন সৌন্দর্যে—যেমন প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যে, তেমনি মানুষের মনের অন্তহীন সৌন্দর্যে। মানুষের ক্ষুদ্রতা ও ব্যর্থতা দুঃখও দিয়েছে তাঁকে খুব—তারও মূলে সৌন্দর্যবোধ। আর জীবন-জিজ্ঞাসুরূপে তিনি ভেবেছেন জীবনের প্রকৃত সার্থকতার কথা, সম্মুখীন হয়েছেন জীবন সম্বন্ধে এই সব মূল প্রশ্নের : বেঁচে থেকে কি করবো? ধর্ম কি? ঈশ্বর কি? দশের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? বিশ্বের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? আমার আমিত্ব আমি চাই, না বিলুপ্ত করতে চাই? আমার আমিত্ব, অর্থাৎ সবার

আমিত্ব, সমাজের ও রাষ্ট্রের কোন রূপে সার্থক হবে? এই সব মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য-প্রচেষ্টায়। তাই প্রচলিত অর্থে সমাজ-তত্ত্ববিদ্ বা রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ তিনি নন। তিনি সমাজতত্ত্ববিদ্ ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ যেহেতু তিনি ব্যাপক-জীবন-জিজ্ঞাসু—কেমন করে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের যোগ্য লালন-ক্ষেত্র হবে সেই তত্ত্বও তাঁর জিজ্ঞাসার বিষয় হয়েছে। সর্বোপরি তাঁর জিজ্ঞাসার বিষয় হয়েছিল তাঁর কালে তাঁর দেশের জীবন—তাতে রাষ্ট্র, ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়, বৃহত্তর দেশ ও জগৎ, সবের বিভিন্ন ও মিলিত সমস্যা কি, এই সব। এ-সবের এমন উত্তর তিনি খুঁজেছিলেন যাতে শুধু তাঁর কালেরই নয় সর্বকালের মানবমন খুশী হতে পারে। এই থেকেই তাঁর চিন্তার মর্যাদা।

রবীন্দ্রনাথের যে মূল চিন্তা—জীবনের সুমহৎ পরিণতি—শিক্ষা সম্বন্ধে সেইটি যে তাঁর প্রধান চিন্তা হবে এ স্বাভাবিক, কেননা, শিক্ষা সম্বন্ধে এইটি বা এর অনুরূপ চিন্তা দেশদেশান্তরের মনীষীদের প্রধান চিন্তা।

রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাই প্রকাশ পেয়েছে এই মহৎ উদ্দেশ্যযুক্ত শিক্ষার জন্য তিনি যে আয়োজন করেছেন বা করতে চেয়েছেন তাতে। এক্ষেত্রে, অন্ততঃ আমাদের দেশে, তাঁর দান অসাধারণভাবে মৌলিক।

স্কুল কলেজে শিক্ষা তাঁর নিজের খুব কমই হয়েছিল। সেজন্য নিজেকে তিনি বলেছেন স্কুলপালানো ছেলে। কিন্তু পুরোপুরি স্কুলপালানো ছেলে তাঁকে বলা যায় না, কেননা, স্কুল থেকে তিনি পালিয়েছিলেন বটে কিন্তু বই থেকে পালাননি। তাঁর নিজের জীবনে এইযে তিনি স্কুলের বন্ধনকে স্বীকার করেননি অথচ পড়তে কম আগ্রহবোধ করেননি, আর জল স্থল আকাশ সূর্যোদয় এসব যে ছিল তাঁর নিত্যসংগী—অসীম আনন্দ ও উল্লাসভরা সংগী, মুখ্যতঃ তাঁর নিজের জীবনের এইসব অভিজ্ঞতা থেকেই রূপ পেয়েছে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনা।

বলা যেতে পারে শিক্ষা সম্বন্ধে কবির প্রধান চিন্তা হচ্ছে এই সব : মানুষের, বিশেষ করে বালকবালিকাদের, দেহমনের বিকাশের উপরে প্রকৃতির প্রভাব; শিক্ষার যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার অনুপযুক্ততা; শিক্ষার, তথা জীবনের, লক্ষ্য সম্বন্ধে দেশে চেতনার অভাব; শিক্ষার বিকিরণে বিচিত্র বাধা।

শিক্ষা সম্বন্ধে কবি জোর দিয়েছেন প্রধানত পরিবেশ ও শিক্ষকের উপরে। পাঠ্যতালিকা, শিক্ষণ-রীতি এসবও তাঁর মনোযোগ কম আকর্ষণ করেনি; কিন্তু তাঁর বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে শিক্ষার যোগ্য পরিবেশ রচনা, যোগ্য শিক্ষক লাভ, এই দুয়ের দিকেই, এই মনে হয়। শিক্ষার ব্যাপারে এই দুয়ের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে।

মানুষের দেহ হৃদয় ও মনের বিকাশে প্রকৃতির আনুকূল্য কত অর্থপূর্ণ সে সম্বন্ধে কবির একটি বিখ্যাত উক্তি এই—

> খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীর মনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার একথা বোধ হয় কোনো কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। যখন বয়স বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন

হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশ বায়ুর চিরন্তন ধাত্রী-ক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না।.........হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, একথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই; তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষ লীলা-স্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইন্‌স্‌পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্ন পত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

আমাদের দেশ পল্লীপ্রধান। কাজেই আমাদের দেশের লোকেরা এতদিন সহজভাবেই প্রকৃতির কোলে বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের কালে দেশের অবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটলো। শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলো বেড়ে উঠতে লাগলো, সে সবে অনেকে অতি-শ্রীহীনভাবে ভিড় জমালো। আর রাজভাষা ইংরেজি আমাদের মনোযোগ অতিরিক্ত পরিমাণে আকর্ষণ করলো। অথচ ইংরেজিবিদ্যা যা আমাদের লাভ হ'ল অনেকক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত থুঁতো—সভ্য মানুষের জন্য অশোভন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেশের জীবনে যে এতখানি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে-সম্বন্ধে চেতনার পরিচয় পাওয়া গেল না। এই পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ দেশের সামনে তাঁর অতিশয় অর্থপূর্ণ শিক্ষাদর্শন ব্যক্ত করলেন। অতিশয় অর্থপূর্ণ আমরা বলছি এই জন্য যে অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া কি ব্যক্তি কি জাতি সবারই জন্য একটা বড় রকমের মুক্তি। অবশ্য সেই মুক্তি যে আমরা পুরোপুরি পেয়েছি তা বলা যায় না। তবে আমাদের শিক্ষার অবস্থার অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে অনেকখানি চেতনা দেশের শিক্ষিত মহলে দেখা যাচ্ছে এ মিথ্যা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মাতৃভাষা আজ আর অবহেলিত নয়—তার গৌরবের আসন লাভ হয়েছে, অবশ্য যদিও তার যথোচিত বিকাশের এখনো ঢের বাকি। ব্যাপক জনশিক্ষার জন্যেও চেষ্টা হচ্ছে।

শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের পারিবারিক যেসব বড় বাধার কথা কবি বলেছেন, যেমন. পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের উৎকট সাহেবিয়ানা, সে সবও আজ বদলে গেছে বলা যায়। উৎকট সাহেবিয়ানা আজ আর দশজনের সরব বা নীরব বাহবা পায়না যদিও কিছু বেশী বিত্তশালীদের চালচলন আজো আপত্তিকর। তবু আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ও চালচলন যে পরিবারের বালকবালিকাদের সুশিক্ষার অনুকূল হয়েছে এমন কথা বলার দিন আসতে এখনো বহু দেরী। কিন্তু তার কারণটি একটি বড় ব্যাপার, সংক্ষেপে বলা যায় সেটি হচ্ছে—আমাদের জীবনে চিন্তা আশা সংকল্প সবেরই অস্পষ্টতা বা ক্ষীণতা। এ সম্পর্কে কবির উক্তি এই—

আমার কোনো-এক বন্ধু ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যেসব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না, তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহের ও অশুভগ্রহের ফল কী

তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হুহু করিয়া দুইদিনের রাস্তা একদিনে চলিয়া যাইবে, একথা বলিতে সময় লাগে না; কিন্তু কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে, কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না—যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী।.........

কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড় জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড় আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা।.........

.........শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সংগে সঙ্গতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কি হইব, এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড় ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড় ত্যাগে টানিতেছে না।.. ......

রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই।.........

তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সন্‌ভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবাব জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা—এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে একথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

মানুষের দেহমনের সুপরিণতিতে প্রকৃতির সংস্পর্শ গভীরভাবে অর্থপূর্ণ—শিক্ষার ক্ষেত্রে কবির এই চিন্তা যেমন মহামূল্য, তেমনি মহামূল্য তাঁর এই চিন্তা যে আশা লক্ষ্য সংকল্প এসবের অভাব ঘটলে মানুষের জীবন হয় স্রোতের 'পরে কাগজের নৌকার মতো অর্থহীন ক্ষণিকের খেলনা। প্রকৃতির প্রভাবের মহিমা আর আশা লক্ষ্য ও সংকল্পের নীরব মহিমা তিনি মূর্তিমন্ত দেখেছিলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের গুরু ও শিষ্যদের জীবন-যাত্রায়। সেই মহৎ আদর্শের একালের উপযোগী রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে।

তাঁর প্রচেষ্টা কতটা ফলবতী হয়েছে তার চাইতেও বড় প্রশ্ন, তাঁর পরম অর্থপূর্ণ উপলব্ধি ও লক্ষ্য অনুধাবন করতে আমরা কতটা প্রয়াসী হয়েছি।*

---

* সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ধর্ম রাষ্ট্র শিক্ষা খণ্ডের ভূমিকা।
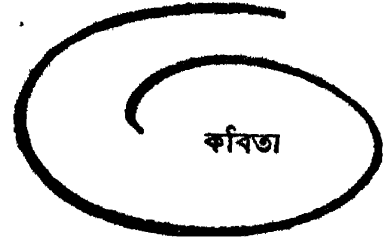
যদি একবার

মণীন্দ্র রায়

তুমি আজ কাছে নেই, তবুও আমার
মনের জানালা খুলে অন্ধকার দূরের হাওয়ায়
পাই স্নিগ্ধ তোমারই সুরভি।
একটি অস্তিত্ব তুমি, তবুও স্মৃতির চোখে চোখে
ঢেউয়ের জ্যোৎস্নার মতো হাজার হীরায়
কতো চেনা রূপে-রূপে ভেসে ওঠো--মৌন চলচ্ছবি।

আমার সমস্ত মনে তোমারই নামের
বৃষ্টি ঝরে। সব ধূলিকণা
মেলে ধরে অভীপ্সার ময়ূরকলাপ।
আর তুমি উদাসীন, এ দিগন্ত ছেড়ে
কোথায় চলেছ? কোন অরণ্যের টানে
বাষ্পনীল তোমার উত্তাপ!

আমাকে চাও না জানি। তবু একবার
যদি দেখে যেতে তুমি, পরিত্যক্ত তোমারই এ ঘরে
কতো ভাঙাচোরা কথা, অশ্রু, হাসি, চোখের চাওয়ায়
কী তীব্র আবেগে বেঁধে, গড়ে তুলি মূর্তি কবিতার।
একবার যদি তাকে বুকে নিতে, হয়তো তখনি
স্নায়ুর বিদ্যুতে, রক্তে, জেনে যেতে—কী তুমি আমার!

সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে

বিষ্ণু দে

বাগান ভরেছে ফুলে, আলোয় আলোয়,
শাদা, লাল, নীল, হলুদ, নানান্ রঙে ফুলে ফুলে ফুলময়।
আর পল্লবেও, হরেক সবুজে, আলোর সরস স্পষ্টতায়।
সমস্ত বাগান ছেয়ে রং আর গন্ধের বাহার,
বাগানে, ঘরেও, বাহিরে অন্দরে, জানলায় বারান্দায়
টবে ছাতে সর্বত্র গন্ধের ইন্দ্রধনুর সম্ভার,
বর্ষায় শান্তির আর সচ্ছল হিমের আসন্ন হাওয়ায়
পাপড়ির বিচিত্র ঢঙে, কেশরের নানাভঙ্গে সাজে।

কে বলে কয়েক বিঘা!
ভিতরে থাকো তো দেখো, মনে হবে
সারাটা পৃথিবী যেন খুঁজে পাওয়া যায়
অক্টোবরে প্রাণের গৌরবে জানলায় বারান্দায়
আর বাগানে উঠানে, যেমনটি পাওয়া যায় গানে গানে
পলি বালি জলে ধোয়া সোনার বাংলায়।
আকাশের নীল তীরে তীরে অসীম উজানে যে বাঁশী বাজায় তাতে
চোখ ভাসে ফুলের হাওয়ায় মুক্ত রঙ্গে দুলে দুলে।
পশ্চিমের পাহাড়ের কঠিন ভঙ্গিমা
সীমা পাবে আঁকাবাঁকা ফুলমতী-পাড়ে,
এমন কি পাঁচিলের পারে লাল পথটাও
রঙের বিন্যাসে মনে হবে উল্লসিত ইতিহাস,
অন্য এক সাহসের সেজানের আঁকা।
বর্ষার অশ্রুতে আর রৌদ্রের ধিক্কারে
মানুষের সংকল্পে ও দৃঢ়শ্রমে
সোরা ক্ষারে সারে হাড়ের ধুলায় ক্রমে ক্রমে
আমাদের বাগানের আশ্চর্য ঐশ্বর্য এই
কয়েকহাজার মৃত্যুঞ্জয় গাছ আর লক্ষ লক্ষ ফুলের মহিমা।

ঘরে ফিরে চোখের বিরাম নেই, ঘ্রাণেরও,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে নেই বুঝিবা বিশ্রাম প্রাণেরও,
যেদিকে তাকাই সবুজ আস্তরে থরে থরে
রঙে গন্ধে কলিজা অবধি প্রাণ ভরে।
এমন কি চোখ যেন গান করে

পাহাড়ে কাঁটিতে, লাল পথে,
আকাশের নীল স্রোতে, শরতের অশরীরী শুভ্র মেঘে,
যেদিকে তাকাই গান, রঙে গন্ধে গান আর গান,
না শুনে থাকাই ভার, থামিয়ে রাখাই ভার।
সারাদিন ধ'রে এই, ভোরাই ভয়রোঁয়,
রাখালী সারঙে কিংবা ঘরেফেরা পূরবী খাম্বাজে।

কয়েক হাজার গাছে নানা সাজে এল অক্টোবরে
আনন্দ, আনন্দই বা প্রত্যাশী প্রসাদ,
শিশু, বৃদ্ধ, মেয়ে বা পুরুষ প্রত্যেকের দেয়
আর প্রত্যেককে দেয়,
বাগানে বাগানে ঘরে ঘরে
যেন সে বিজয়ী বধির আপ্লুত সঙ্গীতের
—বেনেডিক্‌টুস, বেনেডিক্‌টুস্—
সামগ্রিক ঐশ্বর্যের যুক্ত সপ্ত স্বরে
মানবিক উত্তরণে মনের বৈভব।

জানি এর তলে তলে বহু অশ্রুভরা বেদনায়
বহু মৃত্যু আকুলতা, বহু স্মৃতির আমেজ,
দূর ও নিকট বহু দীর্ঘ ইতিহাস, সুদূরের মিতা ওগো মিতা,
মেঘ রৌদ্র, রক্তময় শ্রম, গবেষণা, অনেক দিনের চিতা,
ধুলা, মাটি, কাদা, বহু হাড়ের পাহাড় অন্তরে অন্তরে।
জানি ফুল মাটির জঠরে, পৃথুল তিমিরে চেতনায়
খোঁজে আপন আকাশ।
কাঁকরে, কাদায় শিকড়ের গোপন বিস্তারে
প্রাণ পায়, চলে যায় নিরেট মাটির ফাঁকে
বিকাশের অন্ধকারে, এমন কি পাললিক স্তরে,
এমন কি আগ্নেয় স্মৃতির গ্রানিট্ পাথরে,
হাতে হাতে পায়ে পায়ে শিকড়ে অঙ্কুরে
জোগায় রঙের গন্ধের রসদে রসদে সরস
অবশ্যম্ভাবিতার অবাক্‌শাখায় পরাগের ঊর্ধ্বমূল স্তব।

আমরাও জানি তা, ভাবিও তাই যে,
তাই মনে রং ধরে সুগন্ধে ঘনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে
নন্দিত জীবনে নির্ভীক অজস্র রঙে ফুল ফোটে
সার্থক জন্মের মাগো শিকড় ছড়ায় বাহিরে ও ঘরে
সর্বত্র বাস্তব,
অলৌকিক বাগানে অন্দরে অন্ধকারে পাথরে কাদায় ভিজে
অন্তরে অন্তরে গানে গানে মাটিতে কাঁকরে জীবনের ভিতে॥

চৈত্রসন্ধ্যা

অশোকবিজয় রাহা

দাউ দাউ সূর্যশিখা—ধূ ধূ হাওয়া—চৈত্রসন্ধ্যা জ্বলে,—
পলাশে শিমুলে
বসন্তের রক্তদীপ,
পথের দু ধারে
কৃষ্ণচূড়া আগুন ছড়ায়।

নির্জন মাঠের পারে শালবীথিপথে
চুপি চুপি কে এসে দাঁড়ায়
অবাক স্বপ্নের মতো :
বুকে লাল চেলি
মুখে চুলে সন্ধ্যার আবির।

একটি মুহূর্ত জ্বলে—
তারপর হঠাৎ মিলায়,
চেয়ে দেখি সূর্য ডুবে গেছে,
ধূসর আকাশে
চেয়ে আছে শূন্য শালবীথি।

চারদিক চুপ,
ভেসে আসে ঝাউয়ের মর্মর,
দূর আমবনে
ডাকে এক নিঃসঙ্গ কোকিল,
এ পৃথিবী কবে একদিন
দেখেছিল বসন্তসেনাকে ?

স্বপ্ন কেটে যায়,—
ধূ ধূ হাওয়া ধুয়ে যায় বন,
ডেকে ওঠে অশান্ত পাপিয়া,
চোখ পড়ে দূরে—
চৈত্রপূর্ণিমার চাঁদ লেগে আছে মহুয়ার ডালে।

কনখল

মনীশ ঘটক

আয়েষা বেশ ক'দিন আসেনি। কনখলের মন বলে, ও আর আসবে না। অন্তরঙ্গ খেলার সাথী থেকে যে মেয়ে হঠাৎ বড়ো হয়ে যায়, সে পর হয়ে যায়, এই কথা দৃঢ়বদ্ধ হয় ওর মনে। নিজেই'ত বলে গেছে আমি এখন বড়ো হয়ে গিয়েছি। এক এক সময় হতাশ লাগে কনখলের, কিন্তু হার মানতে চায় না যেন মন। ওকে জব্দ করার সংকল্পও উঁকি-ঝুঁকি দেয় মনে। অমৃত আর ব্যাঙার সাহচর্যে মেতে থাকে, কাঞ্চনকে নিয়েও বেশী সময় কাটায়, কিন্তু স্কুলের বাইরের সময় কি লম্বা, কাটতে চায় না। থেকে থেকে উদাস হয়ে ওঠে।

ছেলের ভাবান্তর নিভাননীর চোখ এড়ায় না। কারণ'ত জানেনই, কিন্তু সে সব কথা আদৌ তোলেন না। কনখলও যেন বড় তাড়াতাড়ি বয়স্ক হয়ে উঠ্ছে। ছেলে হঠাৎ এসে একদিন যখন বলল,—মা, ব্যাঙাকে স্কুলে ভর্তি করার কথার কি হোলো?

—সে কিরে, সামনে পুজোর ছুটি, এখন ভর্তি হয়ে কি লাভ হবে? আর তা ছাড়া, ওরও'ত বাবা মা আছে, তারা যদি এসব পছন্দ না করে। সবাই কি সব করতে পারে?

—কেন পারবে না—ওতে আমাতে তফাৎ কি মা? ও খুব চালাক, দেখো কেমন চটপট সব শিখে উঠবে।

নিভাননী তত্ত্ববিশ্লেষণে তৎপর হন না। ব্যাঙার সাথে নিজের ছেলের সমত্ববোধে বিব্রত হন। যে সমাজে কাউকে বক্তে হলে বলতে হয় 'ব্যাটা ছোট লোক' 'ব্যাটা চাষা'— সেই সমাজে বাস করে একজন দাগী চোরের অশিক্ষিত ছেলের সাথে নিজের ছেলেকে সমান বলে ভাব্তে বিপ্লুত বোধ করেন। এ অস্বস্তির সমাধান কি ভেবে কুল পান না। ধমক গালাগালি দিয়ে থামানো যায় এ অসঙ্গত আবদার, কিন্তু নিজের মনেও কোথায় একটা যথার্থের খোঁচা ফুটতে থাকে। অনুদার হতে চান না, তাই অসহায় বোধ করেন। আপাততঃ কথাটা থামিয়ে দেন, বলেন,—আচ্ছা দেখব। বাবাকে বলতে হবে ত, নইলে আমি একা করব রে।

কনখলের রাজ্য জয় ঐখানেই শেষ হয়। মা যদি বাবাকে বলেন, তিনি কি আর আপত্তি করবেন।

কনখল একটা তেলতেলে ডাল পেয়ারা গাছে গিয়ে ওঠে। পেয়ারাগুলোর বাইরে সবুজ, ভেতরে লাল। বীচি নেই বললেই হয়। সেখান থেকে একটা, দুটো, তিনটে পেয়ারা ছুঁড়ে মারে বাবুর্চিখানার সামনে দাঁড়ানো ব্যাঙাকে তাক ক'রে। ব্যাঙা তাকাতেই বলে,— আয়।

ব্যাঙা এসে কাঠবেড়ালীর মতো গাছে উঠে কনখলের পাশের ডালে বসে। দুইজন সমানে সমানে পেয়ারা ধ্বংস করে। বাড়ীর বারান্দায় বসে নিভাননী দুশ্চিন্তা করতে থাকেন।

একদিনকার ছেলেমানুষী আবদার ছেলের মনে গভীর দাগ কেটেছে। বাগ্চির বদলির কাজ, ঠাঁইনাড়া হলেই হয়ত কনখল সব ভুলে যাবে। নিজে গোঁড়া হিন্দু বাড়ীর মেয়ে, স্বামীর কাজে পাঁচমুলুকের জলখেয়ে আমলমাফিক হিন্দু মুসলমান সাহেব সবায়ের

সমাজেই অকুণ্ঠভাবে মিশে যেতে পেরেছেন। এ যখন সম্ভব হয়েছে, ছেলের দাবীর মধ্যেও সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করতে ব্যগ্র হয় তাঁর মন। ধর্মমত যাই হোক না কেন, জীবনের সকল সুখসুবিধায়ই সাধ্যমত সবায়েরই সমান অধিকার আছে এই ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, রাজা জমীদার আর সাহেব সুবো তাদের কথা আলাদা, একদলের অনেক টাকা, আর একদল দেশের রাজার জাত। স্বদেশী আন্দোলনের খোঁজখবর রাখেন, মনে বিশ্বাস আছে, শেষোক্ত দলের সুখসুবিধার কিছুটা অন্তত একদিন দেশবাসীর হাতে আসবে। মনের বিশ্বাস মনেই রাখতে হয়, স্বামী যে শেষোক্ত দলের বেতনভোগী।

বাগচি ফিরলে আর কিছু বলেন না, বলেন শুধু ব্যাঙাকে স্কুলে দেওয়ার কথা। শুনে তিনি হা হা করে হাসেন, বলেন,—এইবারে পুত্র মারফৎ আমাদের সাথে পাল্লা দেওয়ার লোকের সৃষ্টি হতে থাকবে। ঠাট্টা করেই বলেন। তার পরেই গম্ভীর হয়ে যান। জীবন কী রাজনীতি কিছুই তোলেন না আলোচনায়। শুধু বলেন,—হ্যাঁ, পারতপক্ষে উচ্চশিক্ষায় সকলেরই অধিকার থাকা উচিৎ। আচ্ছা, দেব ব্যাঙাকে স্কুলে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করে। ছেলেটা চালাক চতুর আছে ত? কিন্তু ওর বাবা যে দাগী চোর, কোনো স্কুল নেবে কি? দেখি হরেন কি বলে। ওর মাথায় অনেক রকম খেলে।

চা খেতে বসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান হৃষীকেশ। নিভাননী হৃষীকেশের সামনে রুটির পায়েসের বাটিটা এগিয়ে দিতে দিতে বলেন,—কি হোলো আবার?

—স্বদেশী মামলায় কনা রাজার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে এসেছে।

—কখন? কবে? কোন স্বদেশী মামলায়?

—ঐ প্যারীবাবুর মামলায়। না না, ঠিক সাক্ষী নয়, তবে হ্যাসেট ওকে ডেকে কি যেন জিজ্ঞেস করেছিল। ও যা বলেছে, তাতে সরকারী মামলা ফেঁসে যাবে, স্বদেশীর দল খালাস পাবে, আর প্যারীবাবুর সাজা হবে।

—এত কাণ্ড ঘটল কবে? আমি ত কিছুই জানিনে।

—এখন যে ভোরে উঠে কাঞ্চনকে জিন কসে পোলো ময়দানে যায় মাঝে মাঝে, এটা জানো?

—তা ত জানি। সে ত যায় আয়েষার সন্ধানে। তার সাথে—

—বলতে দাও। হ্যাসেট ওকে ভালোবাসে। ময়দানের মোড়ে ধরে ওকে জিজ্ঞেস করেছে, কাজীর বাজারে আগুন লাগার ব্যাপারে ওর কি মনে আছে। ও বলেছে অনেক অবান্তর কথা, কিন্তু একটি কথায় মামলা ফাঁসবার উপক্রম। বলেছে, আগুন লাগার রাতে প্যারীবাবুর গুদামে এক কণা পাটও ছিল না। খবরদাতা প্যারীবাবুর পত্নী, খবরের মাধ্যম তুমি, এবং তুমি আমাকে যখন বলো, ও যে কোথায় থেকে শুনে নিয়েছে, জানতুম না। হ্যাসেট বলেছে, চিলড্রেন আর গড। মিছে কথা জানে না। যা সত্য তাই বলেছে। আর হয়েছে কি, সেই কথাটা ও নাকি প্রকাশের কাছে বলে ফেলেছিল একদিন।

নিভাননীর মনে পড়ে যায় হাসপাতালে প্রকাশের কাছে খাবার নিয়ে যাবার দিনের কথা। মিছে কথা বলতে শেখেনি এখনো কংখু, সেইদিনই তাঁকে বলেছিল সব কথা খোলসা করে। বলেছিল বেণী দারোগার পেছনে 'বন্দেমাতরম' বলার কথা। তাঁর মন হঠাৎ সমস্ত ইংরেজ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। দৃপ্ত গ্রীবা উঁচু করে বলেন,—যদি বলে থাকে, ঠিক বলেছে। আগুন লাগার পরের ভোরে ঊষা এসে আমায় বলেছিল, প্যারীবাবুর গুদামে এক কণা পাটও ছিল না। হাজিরার টেবুলে আমি তোমায় বলেছিলাম। কনা

চুপ করে শুনেছে। ও যা শুনেছে, শুধু রং না ফলিয়ে সেইটুকুই বলে থাকে, তবে সত্যি কথাই বলেছে। তুমি নিজে সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বলোনি, যে প্যারীবাবু তোমার কোর্টে আসামী হয়ে এলে তাঁর সাজা হয়ে যাবে?

হৃষীকেশ আম্‌তা আম্‌তা করেন। বলেন,—হ্যাঁ, ঐরকম একটা কিছু বলেছিলাম বটে, তখন বুঝিনি ফায়ারমেরিন বীমা কোম্পানীর সাহেব ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট ও কনা যা বলেছে তারই সমর্থন করবে। সেই সাহেবটা বলে গেছে, প্যারীবাবু খালি গুদামে কেরোসীন ছিটিয়ে নিজে আগুন দিয়ে সমস্ত কাজীর বাজার জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার সহকারী ছিল একজন কয়ালী সর্দার। কিন্তু এ যে ভীষণ অপরাধ। ফাঁসী কি যাবজ্জীবন, যে কোনো একটা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু,—

একটু ভাবিত মুখে গোঁফে চাড়া দেন বাগচি।

নিভাননী আজ বহুদিন পরে সকৌতুকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন,—যা ভালো মনে হয় করো। কংখ্ সত্যি কথা বলেছে। এ ব্যাপারে তোমরা রাজাগজারা যা খুশী করবে। আমার ছেলে সত্যি বলেছে, এ গর্ব আমার কোনো দিন মন থেকে মুছবে না। সত্যির আদর যদি শাস্তি হয়, চাকরী ছেড়ে প্রফেসরি নিয়ো। ছেড়ে এসে তো ঢুকেছিলে গোলামখানায় একদিন। আবার না হয় কয়েদমুক্ত হয়ে নিজের বিদ্যার জোরে দাঁড়াও।

হৃষীকেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কি কথা থেকে কি কথা এসে পড়লো। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে রুমালে গোঁফ মুছে উঠে দাঁড়ান। বলেন,—আচ্ছা, হবে হবে। ঐ ত হরেন আর বিদ্যাভূষণ মশায় এসে পড়েছেন। রহমৎ, সব চৌকী তেপাই বাইরে—

—হুজুর বিলকুল তৈয়ার। পণ্ডিতজী তাম্বাকু খাচ্ছেন।

—আমি চললুম। চা এবং টা—মারফৎ ঠাকুর।

হেসে ফেলেন নিভাননী। বলেন,—মনে না করালেও চলবে। তারপর মুখে একটা কঠিন ভাব আপনা থেকে এসে যায়। বলেন,—কংখ্‌কে জেরা করা হবে না। সে সত্যি কথা বলেছে।

হৃষীকেশ চোখ ফেরান। বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা।

বাইরের বারান্দায় সেদিন আর কোনো আলোচনাই হয় না। হরেন চাকী মশাই ভেতরের সব হদিস রাখেন না। বলেন,—ওহে সাহেব, এ যে সাহেবে ইংরেজের মাথা খেলো। জানো তো আজকের খবর? নর্টন ত ফায়ার। রবার্টসনের ওখানে যে বীমা কোম্পানীর সাহেবটা এসেছিলো, সে তো প্যারীবাবুকে চরম আসামী সাব্যস্ত করে গেছে। বীমার ত্রিশ হাজার ত চাঙে উঠ্‌লো, এখন শ্রীঘর হওয়াও আট্‌কানো শক্ত। গীতা সোসাইটির চ্যাংড়াদের বিরুদ্ধে মামলা ত এক জবানবন্দীতেই উড়ে গেছে। সাহেবদের একটা কি গুণ জানো সাহেব, যদি সাহেবে সাফাই সাক্ষী দেয়, তবে তাই বহাল থাকে, কালা দারোগা কিম্বা কসাইয়ের ছেলে পুলিশসাহেব, যতো তোড়জোড়ই করুক না কেন, বে ফয়দা। ঐ বীমা কোম্পানীর সাহেব শুধু প্যারীবাবুর দাবী আদৌ মিথ্যা বলে যায়নি, বলে গেছে তার কোম্পানীর বড়ো সাহেব ফুলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যদি এ কেসে কোম্পানীকে ত্রিশ হাজার খেসারৎ দিতে হয়, তবে বাৎসরিক ত্রিশ হাজার অথবা উনিশ বিশ, বহু খাস ইংরেজকে কালাপানি পার হতে হবে। নর্টন ত চুপ্‌সে গেছে। এখন খালি গজরাচ্ছে বেণী দারোগা আর তার চ্যালাচামুণ্ডার ওপর। অকথ্য গালাগালি করছে।

হৃষীকেশ শুধু তাক মাফিক নজর রাখেন কনার অংশটুকু পরম বন্ধু হরেনের নজরেও

এসেছে কিনা। আসেনি দেখে আশ্বস্ত হন। বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত মানুষ, মামলা মোকদ্দমার খবরও রাখেন না, অব্যাপারে মাথাও গলান না। প্রাকৃতে শুধু বলেন—খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে—

কথা শেষ করতে দেন না হরেন।—থামো হে পণ্ডিত, যদি খাচ্ছিলই, তবে আরো খাবার ইচ্ছে কেন? বুঝলে না, ঐ তৃতীয় পক্ষ, ঐ প্রকাশদের মার মার করে ওঠা, ঐ প্রতিশোধ প্রবৃত্তি, এই গেলো এক তরফ আর একদিকে যতদূর খবর রাখি ঝাঁজরা হয়ে আসছিল তেরজুরি, অর্থাৎ অর্থসামর্থ্য। এ দুটোর সমন্বয় করো, তবে সাহেবপেয়ারি প্যারীবাবুর কীর্তিকলাপের কিঞ্চিৎ হদিস পাবে।

বিদ্যাভূষণ হুঁকোয় টান দেন, ভুড়ুৎ। কথা বলেন না।

হরেন চিরকাল কান্ত কবির ভক্ত। হঠাৎ উত্তেজনা থামিয়ে বলে,

"আঃ যা করো বাবা আস্তে ধীরে—
ঘা কবো কেন খুঁচিয়ে?
পাতলা একটা যবনিকা আছে
কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে?"

—আস্তে ধীরে চালিয়ে গেলে প্যারীবাবুও হয়ত একদিন সাগর পার হতে পারতেন। এটা বুঝলেন না, যে

"সোনার খনি দিয়ে বলো কি হবে বাবা;
থাক্‌লে ধড়ে প্রাণ অনেকখানি পাবা;
কেন এ খোঁচাখুঁচি, পরান বধাবধি?
কেন এ কাটাকুটি, রক্তে নদানদী?"

—একটা বাজারকে বাজার জ্বালিয়ে দিলেন, সেখানে তো অনেক মরলো, অনেক পুড়লো, মায় খাজাওয়ালার ন্যাংড়া মেয়েটা পর্যন্ত। তাতেও শেষ নেই, মহৎপ্রাণ যে কটি ছেলে বাঁচাতে গেলো, পুলিশেব সাথে যোগসাজস করে, তাদেরও ফাঁসাবার মৎলব। আর একি সহজ ফাঁসানো? নিবারণের বিরুদ্ধে যা চার্জ খাড়া করেছিলো, ফাঁসী অবধারিত। এ টাইপের ক্রিমিনালরা সোশ্যাল মিনেস। একেবারে চরমদণ্ডের আসামী।

বিদ্যাভূষণ বলেন, হুঁ। বাগচি গোঁফে চাড়া দেন।

মামলার আলোচনা বেশীদূর আর এগোয় না। বাড়ীর ভেতরে চাপা কান্না আর নিভাননীর অস্ফুট স্বরে সান্ত্বনার আওয়াজ পাওয়া যায়। বারান্দায় তিনজনেই অস্বস্তি বোধ করেন। বিদ্যাভূষণ বলেন,—যাও হে, দেখে এসো পরিস্থিতি। আমরা উঠি।

হরেনবাবু মুখে যতোটা মারমুখী, অন্তরে ততটা নন। কেমন যেন উস্‌খুস্‌ করেন। কথা একটিও না বলে বিদ্যাভূষণের সাথে উঠে পড়েন। বাগচি একা বারান্দায় পায়চারী করেন। একবার উঁকি দিয়ে অন্দরে তাকান। ঊষা উপুড় হয়ে নিভাননীর কোলে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, নিভাননী সান্ত্বনা দিতে গিয়েও যেন পাথর হয়ে গেছেন। শুধু মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।

উত্তেজকের উল্টো পিঠ অবসাদে ভেঙে পড়া, সে উত্তেজনা কৃত্রিম হলে। সহজ সতেজ জীবনই শুধু সুখ দুঃখকে সমভাবে ধরে রাখতে পারে। একবার ইমাম সাহেবের কাছে যেতে হবে, ভাবেন বাগচি। কনখল কোথায়, কি করছে, কেউ খোঁজও রাখে না, দরকারও মনে করে না।

সমস্ত বাড়ীটার ওপর যেন একটা শোকের কফিন ঢাকা চাদর বিস্তৃত হয়।

ওদিকে কনখল বাবুর্চিখানায় গিয়ে রহমতের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। রহমৎ বলে, ঠাণ্ডা হও কনা বাবা, বলো কি হয়েছে। বুঢ়া রহমৎ তোমার দোস্ত্, কিছু ভয় নেই। কি চাও বলো।

কান্নার ধাক্কায় কনখল ফুলে ফুলে ওঠে। আথালি পাথালি করে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। রহমৎ মাথায় গালে হাত বুলোয়। জানে, হালাল করা মুরগীর মতো ওর ছটফটানী থামবেই এক সময়।

থামেও। কনখল উঠে বসে রহমতের বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপায়। বলে,—আমি কি করলুম রহমৎ!

—কি করলে?

—বারান্দার বৈঠকে শুনলাম আমার সাথে কথা বলেই হ্যাসেট নতুন মাসীর বরকে জেলে দিচ্ছে।

—সে আবার কি?

কনখল বলে যায় নতুন মাসীর মাকে বলা কথা প্রকাশদাকে বলে আসা, পুলিশের জেরায় প্রকাশদার সে কথা ফাঁস করে দেওয়া, পরে হ্যাসেটের জেরায় কনখলের স্বীকারোক্তি, যার ফলে আজ প্যারীবাবুর সাজা হবেই। প্যারীবাবুর যা হবার তা হোক্, কিন্তু ও যে নতুন মাসীকে মার পায়ে পড়ে কাঁদতে দেখে এসেছে।

—আমি এ দোষ কেন করলাম রহমৎ।

—তুমি কিছু দোষ করোনি কনা বাবা, কেন থামোথা নিজেকে দোষী মনে করছ?

—নিশ্চয় আমি দোষী। নতুন মাসী—ঐ মুট্কী, ওকে আমি দেখতে পারিনে, তাই বলে—

বোলে ঢোক গেলে কনখল। বলে—ও লোক খারাপ নয়। ও আমাকে ভালোবাসে আমিই ওর সর্বনাশ করলাম। আমি কি করে জানব যে আমার ঐ কথায় এইসব হবে।

রহমৎ এইবার কনখলের মন ঘোরাতে চায়। বলে, রাতের কাট্লিস্ সাজানো আছে। ভাজি দুখানা। উঠে বোসো ত কনা বাবা। ওই মোড়াটায় বোসো।

কাটলেটের কথায় কনখলের শোক কিছুটা কমে। গরম কাটলেট বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খায়, কিন্তু নিজের ব্যবহারে কোথায় যেন অপরাধের কাঁটা গলায় বিঁধে থাকে, স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে না। রহমৎ বলে ঘরে চলো, হুজ্রাইন ব্যস্ত হবেন। সাহেব ইমাম সাহেবের ওখানে গেছেন। হয়ত খবর পেয়ে ডাক্তার সাহেব আর আয়েষা মাই আস্বে। বাড়ী চলো।

কেন যেন আয়েষার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় কনখলের। আসুক না। যদিও আস্বে কিনা জানা নেই। তবুও চলে রহমতের হাত ধরে বাড়ীর দিকে, মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আজ আর কেউ নেই। আস্তাবলের দিকে তাকায়। কাঞ্চন পেছনের পা দুটো ঠুক্ছে। বলে,—রহমৎ, মাকে বলো আমি আস্তাবলে গেছি। আস্ব এখুনি। বলে দৌড়ে যায় আস্তাবলের দিকে।

কাঞ্চন একা। এ ক'দিন কি যেন হচ্ছে, বোঝে না পঞ্চতিলক ঘোড়া, কিন্তু রোজকার সাথীকে পেয়ে একবার চিঁ হি হি শব্দ করে। হারুণ বসে ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ কনখলের মাথায় বুদ্ধি খেলে। সন্ধ্যা? সেত হয়েইছে। বুক অন্ধকার। ঘর অন্ধকার। বুকের

ভেতর, সে যে অপরাধী, এ কথা কে যেন লিখে দিয়ে যাচ্ছে। হারুণকে হুকুম করে, জিন চড়াও।

কাঞ্চন, বাচ্ছা মনিব, মানে মনিব নয় দোস্ত, কাছে পেয়ে আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করে। বাঁদিকে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, চিঁ হি হি। কনখল ওদের কথা বোঝে। জিন কস্‌তেই এক লাফে ঘোড়ায় ওঠে, লাগাম বাঁমুখি টানে। সোজা দরগা। ইমাম সাহেব। আজ কনখল ওস্তাদ সওয়ার নয়, তবুও ঘোড়াই তাকে বাঁচিয়ে ছোটে, শুধু কনখল ঘোড়ার ঘাড়ের কেশরের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে বলে,—চিনবি ত? শাহজলালের দর্গা। বাবা গেছেন বাইসিকেলে। আগে যাবেন জাফর ডাক্তারের টিলায়, তার আগে পেঁছিতে হবে।

কাঞ্চন কনখলের মনের অনুচ্চারিত আদেশগুলো বোঝে। তীরবেগে ঘোড়া ছোটার কথা যারা বইয়ে পড়েছে, তারা বুঝতেও পারবে না তীরতর বেগেও ঘোড়া ছোটে। দর্গার সদরে দীর্ঘদেহ হাজী ওবেদুল্লা সানুচর পায়চারী করেন দেখা যায়। কাঞ্চন ঠিক তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে থামে, কিন্তু কনখল নামে না। যেন জমে গেছে ঘোড়ার পিঠে। ইমাম এগিয়ে এসে বলেন,—এ কে, কনাবাবা? বেহুঁস হয়ে গেছে ঘোড়ার পিঠে? এ ত ঘোড়া নয়, জিব্রাইল। আসাদুল্লা, বাবা কো উতারো।

তার পরের কিছুক্ষণে কিছুই মনে পড়ে না কনখলের। এত লোক কেন, এত আলো কেন, মা বাবা কেন, সবাই এখানে কি করে এল। হাজী ওবেদুল্লা গম্ভীর সুরে হুকুমজারী করেন, যে যার আস্তানায় ফিরে যাও। বাচ্চা আমার কাছে থাকবে রাত্তিরে। নিভাননীকে বলেন, মা বলেছি, কোনো ভয় নেই। বে-ফিকির ফিরে যাও। বাগচিকে বলেন, কুছ্‌ ডব নেহি।

তারপর কনার আর কিছু মনে পড়ে না। আয়েষাও এসেছিল বাপ মায়ের সাথে, আমল দেননি হাজী সাহেব।

দুঃখের রাত, দুঃস্বপ্নের রাত, সব পোহায়—কিন্তু ভোর কি সব সময়েই মঙ্গলোদয়ে দেখা দেয়? সারা রাত ধরে হাজী সাহেবের কাছে, তার মন বেহাত হয়ে গিয়ে দুষমনি করেছে, এই বোঝাতে চেয়েছে কনখল, ঈশ্বরের প্রতীক হাজী সাহেব শুধু সারারাত জেগে ওর মাথা কোলে করে বসে থেকেছেন, আরবী পারসী উর্দু কি যেন ভাষায় আল্লার নাম করে গেছেন, স্বপ্নের ছায়াছবির মতো টুকরো টুকরো মনে পড়ে ওর। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে ও নিজেও জানে না। যখন ঘুম ভাঙে, তখন দেবপ্রতিম ওবেদুল্লার ভোরের আজান দিকে দিগন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে। কনখলের মানসে শান্তির প্রলেপ পড়তে থাকে।

১৭

ভোর হতে ঘটনাপরম্পরা দ্রুত লয়ে চলতে থাকে। বাড়ী পেঁছিয় হাজী সাহেবের সাথে, তারপর নিজের নিজের ঘর, মায়ের কোলে, রহমতের পরিচর্যা। বিছানায় শুয়ে শুনতে পায় বাবার সাথে হাজী সাহেবের কথাবার্তা। ওবেদুল্লা বলেন,—তোমার আর এখানে না থাকাই ভালো। বদলীর সময় হয়েছে কি?

—আপনিই ত বলেছিলেন এক বচ্ছর মেয়াদ। প্রায় হয়ে এসেছে।

—তবে দেখাসাক্ষাৎ করে অন্য জায়গায় চলে যাও, তোমার ছেলেকে আমি দোয়া করি, ভালোবাসি। কিন্তু ও ত তৈরী হয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের মানুষে। এই ত কটা দিন,

ভালোবাসল, অপরাধ বোধ নিয়ে কষ্ট পেল, পরমপুরুষকেও ভালোবাসল। মন যা চায় সব পেয়ে গেছে, এখন সাধারণ মানুষের বাচ্ছার মতো ওকে বাঁচতে দাও। আমি প্রেমধর্মে বিশ্বাসী, কোন আতস দিয়ে কোথায় গিয়ে প্রেমের আলো পড়ল, সে আতসও আমি জানতে চাই না, আলোকোজ্জ্বল, পাত্রও না। আলোটা এলো কোথা থেকে, এইটুকুই সব। এইটুকু যে জেনেছে, সে সব জেনেছে।

—আমি কিন্তু কিছু বুঝছি না হাজী সাহেব। ঘটনাগুলোর মধ্যে কি আছে যে এত কঠিন তত্ত্বে যেতে হবে?

—আলবৎ যেতে হবে। পাক পরওয়ার দেগার যখন শেষ পর্যন্ত শয়তানকে স্ত্রীলোকের নগ্ন সৌন্দর্য দেখিয়েছিলেন, তখন ইব্লিস্ বলেছিল এই নিয়ে আমি বিশ্বজয় করব। সেই ফাঁদ থেকে যদি কেউ বেরিয়ে গিয়ে থাকে তবে তাকে নিযে আর কেন খেলা? সে যদি বুঝে থাকে, যে সে ভালোবাসতে চায়, খালি চারদিকে প্রেমপাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মুহূর্তে সে নিজের মনে ঝাঁপ দিয়ে প্রেমের উৎস খুঁজে পায়, তারপর নির্ভয়। আর কোনো ভয় নেই। পারতাম ত তোমার ছেলেকে আমি নিজের কাছে রাখতাম। কিন্তু তা হয় না। দুনিয়া বেচাল। তবে, দুনিয়ার যত রং বদল হোক্ না কেন, ওর বেলা আমি নির্ভয়। পাঁকে পড়বে, পাঁক ওকে আটকাবে না, ইব্লিসের মায়ায় জড়াবে, কাটিয়ে উঠবে। ও নিজের মনে সত্য প্রেমের উৎসের সন্ধান পেয়ে গেছে। মাকে ডাকো, আমি উঠ্ব।

নিভাননী এসে দাঁড়াতে হাজী সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। আশীর্বাদ করে বললেন, খামশ---তক্রার করবার শক্তি যিনি দিয়েছেন, চুপ করে তাঁর কথা শোনো। মনের কবাট ও তালা যিনি বানিয়েছেন, চাবি তাঁর হাতে। লা ই লাহ্ ইল্লিলাহ।

নিভাননী হাঁটু ধরে প্রণতি জানালেন। হৃষীকেশ মাথা নীচু করে। কনখল ঘুমিয়ে থাকে।

সেদিন রবিবার। হাজী সাহেব চলে যাবার পর হরেনবাবু, বিদ্যাভূষণ এবং সর্বাশ্চর্য, বিপিন কার্লাইল আসেন। নিভাননী ভেতরে চলে যাবার সময় বাগচি বলে দেন চা ইত্যাদি পাঠানোর জন্য। নিভাননীর কোনো উৎসাহ নেই, তবু ভদ্রতার ডাকে সাড়া দিতেই হয়। বিদ্যাভূষণ বর্তমান, রহমতের ওপর ভার দেওয়া চলবে না।

হরেন বলেন,—ওহে সাহেব, জামিন হয়ে গেছে। কলকেতা থেকে ব্যারিষ্টার আসবে। খালাস পেলেও পেতে পারে।

—আমি খুশী হব, বলেন বাগচি।

কার্লাইল হাত কচ্লে বলে, মশাই আমি কি অতো জানি। যা শুনলুম, ওপর ওপর মনে হোলো এ গীতা সোসাইটির পুজোর বাজারের ওপর রাগ ছাড়া আর কিছু নয়, আর পুলিশ সাহেবের ওখানে প্যারীবাবুর সাথে দেখা হলেও উনিও ঐরকমই ঘটনা, তাই জানালেন। এখন শুনতে পাচ্ছি প্রকাশের দল আমার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করছে। অবিশ্যি পুলিশ সাহেব আমার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা করবেন, তবুও হাকিমহুকুমের মহলেও কথাটা জানাজানি হয়ে থাকা ভালো।

হরেন খেপ্তে থাকে, বলে আবার সাক্ষী তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে মশাই। আপনাকে আমরা চিনিই না, আপনি কোনদিনই আমাদের এখানে আসেন নি। আচ্ছা ছ্যাঁচড়া লোক ত আপনি।

—হেঁ হেঁ, আপনাদের উকীলদের মুখের বাঁধন নেই জানি, মনে যা ভাবেন, বলেন অন্য রকম।

—হোপ্‌লেস্‌, বলে হরেন চেয়ারে পিঠ ঢালেন।

বিদ্যাভূষণ তামাক সাজা এবং খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো শক্তি ব্যয় করেন না। কিন্তু আজ বাগচি একেবারে চুপ। হাঁ, না কিছুই বলেন না। চিন্তিত মুখে বসে থাকেন। ভাবেন এরা উঠ্‌বে কখন।

ওদিকে বুড়া রহমৎ কনখলের ঘরে বসে। কনখল, ঘুম নয়, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে রহমতের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, রহমৎ, নতুন মাসীর কাছে যাব।

রহমৎ সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকায়। হুজ্‌রাইন রান্নাঘরে সাহেবরা বারান্দায়। আস্তে গোসলখানার দরজা খুলে বলে, 'এসো'।

প্যারীবাবু জামিনে খালাস হয়ে মহালে গেছেন টাকার তদ্বিরে। অতবড়ো বাড়ী, খাঁ খাঁ করছে। জীবন খেলার মাঠে গেছে, তখনো ফেরেনি। বাড়ীর একমাত্র ঝি সদরে বসে। রহমৎ আর কনখলকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বলে মাকে খবর দেব? রহমৎ বলে, না, খবর দেবার দরকার নেই। কনাবাবা মার কাছে যাবে।

সেই শোবার ঘর, যেখানে একদিন ঊষা কনখলকে বুকের তলায় পিষে ফেলতে চেয়েছিল। আজ উপুড় হয়ে সেই বিছানায় নিজের বুক পিষে ফেলছে। কনখল গিয়ে পিঠে হাত দিয়ে বলে—নতুন মাসী।

তড়িতাহতার মতো বিদ্যুৎবেগে উঠে বসে ঊষা। কিন্তু নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিতা হয়ে যায়। কনখল বলে, মাসী।

ঊষা হঠাৎ উঠে নিজের গায়ের কাপড় সামাল করে। কনখলকে কোলে নিয়ে বসে। বলে, বাবা?

এ কে? মা, আয়েষা, নতুন মাসী, সবাই মা? কনখল কি বলতে এসেছিল ভুলে যায়। শুধু ঊষার সুপুষ্ট স্তনদ্বয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। ঊষা ওর পিঠে হাত বুলোয়। বলে, যা হবার হবে বাবা, তুই কেন ভাব্‌ছিস।

কনখল অনেক কথা বলতে চায় কিন্তু একটিও বলা হয় না। ঊষা শুধু বলে, চুপ করে থাক, তোর কথা আমি শুনতে চাই না, জানিস রে, তোকে আমি—

—ভালোবাসো? জানি বলেই ত বলতে এসেছি তোমার কাছে আমি অপরাধী। তুমি মাকে কি বলেছিলে আগুন লাগার রাতে, সেইকথা আমি কিছু না বুঝে অনেক জায়গায় বলে ফেলেছি। তাইতেই বুঝি সর্বনাশ হচ্ছে। মাসী, আমাকে শাস্তি দাও। আমার একটি কথায় তোমার এত কষ্ট হোলো।

ঊষা বিছানা ছেড়ে মাটিতে দাঁড়ায়। কনখলকে শুইয়ে দেয় বালিশে মাথা দিয়ে। তারপর বলে, দিচ্ছি শাস্তি।

পরের আধঘণ্টার কথা কনখলের মনে থাকে না। স্বর্গে যাওয়া, অন্ধকারে ডুব দেওয়া, আবার সাঁতরে আলোয় ওঠা, এই সব ধরনের কি যেন হয়ে যায়। জ্ঞান ফেরে যখন, তখন ঊষা ওর হাত ধরে টেনে বলে, চল্‌ দিদির কাছে।

ঊষার হাত ধরে মায়ের কাছে যাওয়া। নিভাননী হকচকিয়ে যান। রাত হয়ে গেছে। ঊষা গিয়ে বলে, দিদি,

—কি রে

—কনা মনে করছে ও আমার খুব অনিষ্ট করেছে। সেই গুদামে পাট না থাকার কথাটা সাহেব সুবোকে বলে। ও ঘুমোতে পারে না, সারারাত কাঁদে, ওকে কি করে বুঝোব ও কিছু অন্যায় করেনি? তুমি ওকে বোঝাও, আমার কপালে যা আছে তা হবে, কিন্তু ও মনে মনে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে কষ্ট পাবে, এ আমি কি করে দেখব,—

নিভাননী সসম্ভ্রমে তাকান উষার দিকে। ছলাকলা-লাস্যময়ী যুবতী যেন হঠাৎ জগন্মাতার রূপ নিয়েছে। কি প্রশান্তি দুটি চোখের চাহনীতে।

হাত ধরে বসান উষাকে। কনখলকে একটু কড়া করেই ঘরে যেতে বলেন। মানে ছিল। কনখলের বিছানায় আয়েষা এসে শুয়ে আছে। সেটা আগে বলেন না। কনখল নিজের বিছানায় গিয়ে ঝাঁপ দেয়। তারপর কোন অতলে তলিয়ে যায় টেরও পায় না।

ঘণ্টি বাজিয়ে রহমৎ খানা তৈয়ার জানায়। বাগ্‌চি, জাফর, কুলসম, নিভা, আয়েষা, কংখ্‌ টেবিলে বসে। উষা পাশে একটা চেয়ারে বসে থাকে। মুসলমানের রান্না ও খাবে না, শিলেট গোঁড়া হিন্দুর রাজত্ব। হঠাৎ বাইরে হরেনবাবুর গলা শোনা যায়—বৌদি, আজ আমি জাত খোয়াব। ডিনার টেবিলে আমার একখানা চেয়ার।

সবে সুপ দেয়া হয়েছে। নিভাননী নিজে উঠে গোলকামরা থেকে চেয়ার নিয়ে আসেন। বলেন, বসুন ঠাকুর পো।

রহমৎ ওস্তাদ বান্দা। আর একটি সুপের ডোঙা, মায় কাঁটাচামচ এর মধ্যেই সাজিয়ে ফেলেছে। ডামাস্ক কাপড়ের ন্যাপকিন শুভ্র ফুলের মতো করে বাঁ দিকের কোয়ার্টার প্লেটে। বাগচি হেসে বলেন, জানতাম।

জ্বলে ওঠে হরেন। কি জানতে হে সাহেব? তুমি আমি জীবনটাকে ইন্ধন করে চলেছি। কিন্তু প্রাণের বিকাশের কোনো আমল দিয়েছি? আমাকে গীতা সোসাইটির স্বামীজি ডেকেছিলেন। জিজ্ঞেস করছিলেন কনখলের কথা। ইমাম সাহেবের কথা। যখন সব কথা শেষ হোলো, বললেন বসুন্ধরা চিরকালই বীরভোগ্যা থাকবে, মিথ্যা ঠিক কুয়াসার মতো কেটে যাবেই, আর আচার অনাচার বিভেদ মিটে যাবে। বাড়ীতে গেলাম। আমি তোমার এখানে আসি, যেখানে মুসলমানী আয়েষা বৌদির সাথে রান্নাঘরে বসে, এখানকার খাবার খাই—আমার স্ত্রী পার্শ্ববর্তী অপরা তিন গিন্নীর সাথে তারই ফলাও আলোচনায় লিপ্তা ছিলেন। আমি যেতেই যে সব ভাষা উচ্চারণ করলেন, সেগুলো সাধু তো নয়ই, অসাধু বলেও তার কৌৎসিত্য বোঝাতে পারবো না। অর্থাৎ

—থামো হে, সুপটা খাও।

হরেনবাবু বললেন, খাচ্চি। কিন্তু আদব কায়দা জানিনে। বলে সুপপ্লেট দুহাতে ধরে দুধের বাটির মতো চুমুকে সবটা সুপ খেয়ে নিলেন। সমস্ত ডিনার টেবিল হাসিতে ফেটে পড়লো। রহমৎ যে তৈরী খানসামা, তারও সাদা দাড়ীর ফাঁকে ঈষৎ হাসির রেখা। দৌড়ে এসে প্লেট সরিয়ে হরেনবাবুর বাঁ দিকে চিকেন কাট্‌লেটের ডোঙা স্থাপন করল, হরেনবাবু ভ্রূক্ষেপ না করে খপ্‌ করে ডান হাত দিয়ে চারটে কাট্‌লেট তুলে নিজের প্লেটে রাখলেন এবং আর কারুকে দেবার আগে কচ্‌মচ্‌ করে সেগুলো খেয়ে ফেললেন।

আয়েষা উঠে এসে বলে, কাকাবাবু আপনি আমাদের সাথে এক টেবিলে খাচ্ছেন, একথা জানাজানি হবে,

—তুই থাম তো—রহমৎ আর কি আছে?

নিভাননী হেসে বলেন, ঠাকুর পো, এর পর রোষ্ট আছে,—খাসীর মাংসের। তারপর

ঘি-ভাত আর মুর্গীর কারি, শেষ পুডিং। জানিয়ে রাখছি এইজন্যে যে যেটা যতটা খাবেন কোনো অভাব হবে না। যা ভালো লাগে পেট ভরে খান।

হরেন এবার নিজের গোঁফ্ মুছে বলেন,—তা ত খাবই। তবে, বোধ হয় আপনাদের অংশে কিছু কম-ই পড়ে যাচ্ছে—

—একেবারেই না। আজ জাফরেরা এখানে খাবে, সব জিনিসই প্রচুর পরিমাণে করা হয়েছে। আর দেখুন না, এই হতভাগিনীটাকে, বলে ঊষার দিকে আঙুল দেখান নিভাননী। ও একসঙ্গে বসবে না। কিন্তু দেখুন, ভাতকারী নিয়ে কেমন মেঝেতে বসে গেছে। বেচারা শোকতাপ পাওয়া মানুষ—

কনখল আর আয়েষা হাত টেপাটেপি করছে। হঠাৎ দুজনাই উঠে বলল, আমাদের পেট ভরে গেছে মা রোস্ট খেয়ে। আমরা উঠ্‌ব?

নিভাননী হৃষীকেশের দিকে তাকান সভয়ে—অভব্যতা করছে ছেলে। কিন্তু না। হৃষীকেশ বলেন, ঠিক্ আছে। টেবিল বড়োদের ছেড়ে ছোটোরা উঠে যাক।

নিভাননী বলেন, রহমৎ, দু গ্লাস দুধ দিয়ে এসো কনার ঘরে। যা তোরা। আর দেখিস্, যেন ঝগড়াঝাঁটি করে জ্বালাস নে। হরেনকে বলেন,—ঠাকুর পো, আর একটু ভাত কারী?

হরেন বলেন,—আজ দীক্ষা হোলো। যতো দেবেন খেয়ে যাব। কিন্তু ভাবতেও ভয় হচ্ছে বাড়ীতে সমাদরের বহরটা কি প্রকার হবে।

বাগচি বলেন,—খেয়ে দেয়ে একটু বাইরে বসি চলো। ইতিমধ্যে, বলে নিভাননীর দিকে ইঙ্গিত করেন।

নিভাননী ঊষার হাত ধরে বলেন, বাড়ী যাবি চল্। ঊষা বাড়ীতে ঢুক্‌লে জীবনকে ডাকেন। বলেন,—বাবা, আমায় একটু হরেনবাবু উকীলের বাসা থেকে ঘুরিয়ে আনবি?

জীবন সাত তাড়াতাড়ি তৈয়ারী। চলুন মাসীমা।

রাত হয়ত সাড়ে আটটা ন'টা। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় যে গৌরাঙ্গী বসে আছেন তিনিই হরেনের স্ত্রী বুঝতে দেরী হয় না। একেবারে একা। প্রতিবেশিনীরা কেউ নেই। নিভাননী গিয়ে সামনে বসেন। বলেন, ভাই, ভয় পাবেন না। আমি কনখলের মা। একটু আলাপ করতে এলাম। অবসর আছেন ত?

হরেনবাবুর স্ত্রীর নাম নির্মলা। তিনি উঠে এসে নিভাননীর দুহাত ধরেন। বলেন, আজ আমার কি ভাগ্য। অবসর কেন থাকবে না দিদি। কোলেও কেউ আসেনি, আত্মীয়-স্বজনও নেই। সময়ে অসময়ে এবাড়ী ওবাড়ীর গিন্নীবান্নিরা এসে আসর জাঁকান, কিন্তু এত রাত্রে যে দিদি? সঙ্গে—

ও বাড়ীর জীবন। বাইরে বসে আছে। আমি কিন্তু আপনি ছেড়ে তুমিতে নাম্‌বে। আমাদের কর্তারা তাই করেছেন। শোনো বৌ, তোমার বর আজ আমার ওখানে রাত্রে খাবেন। 'খেয়েছেন' বলে উঠ্‌তে পারেন না নিভাননী। বলেন,—আমার ঠাকুর আছে, আমিও বামুনের মেয়ে। বাইরের ঠাটঠমকে ভুল বুঝো না। জানো না বোধ হয়, বিদ্যাভূষণ ম'শায় রোজ বিকেলে চা জলখাবার খান।

—কিন্তু দিদি, ঐ যে শুনি, পুলিশডাক্তার আর তার মেয়ে ওখানে—

—ও আয়েষা? হ্যাঁ সে আসে, কিন্তু সেত হেঁসেলে ঢোকে না। এর আগে পোলো ময়দানের টিলার বাসার পাশাপাশি ছিলাম। ঐ মেয়ে আমার ছেলের বন্ধু, তাই না এসে

থাকতে পারে না। আর মেয়েও রত্ন। কোনোদিন আমার হিঁদুয়ানীতে চোখ দেয় নি। আমি নাড়ুগোপালের মাথায় জল দি, তুলসী তলায় প্রণাম করি, ও মেনে নিয়েছে এগুলো করতে হয়। জন্ম ওর মুসলমানের ঘরে, কিন্তু মেয়ে লক্ষ্মী।

নির্মলা একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন,—দিদি, মনে বড়ো অশান্তি।

নিভাননী একেবারে বুকে টেনে নেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন,—ঠাকুরপোকে বকাঝকি করবে না, দেখবে শান্তি আসবে। বিধাতার রাজ্যে অশান্তি নেই, মানুষ নিজের মন থেকে সৃষ্টি করে কষ্ট পায়। পারবে?

এমন একটা জায়গায় ঘা দিয়ে নিভাননী কথাগুলো বলেন, নির্মলার দুচোখ ভেসে যায়। নিভাননী আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেন। কিচ্ছু বলেন না।

পুলিশ ফাঁড়ির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজে। বাইরের ঘরে হরেনের গলার শব্দ শোনা যায়।—এ কি জীবন? একা বসে? —কি, কি,—তাই নাকি? আচ্ছা কাণ্ড যা হোক্। বৌদি, কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ—

—উঠ্‌ছি ঠাকুরপো। নিজে ত গিয়ে রোজ বিকেলে আড্ডা জমান। আমার বোনটিকে একদিনও আনতে পেরে ওঠেননি এ পর্যন্ত। তাই এলাম। এখন থেকে রোজ ও যাবে। নিয়ে যাবেন কিন্তু। বলে নিভাননী ওঠেন।—কই বাবা জীবন, চলো, রাত হয়ে গেছে।

হরেন দম্পতীর সে রাত বিনা কলহে কাটে। নিভাননীর দৌত্যে মঙ্গলস্পর্শ ছিল।

ফেরবার পথে ঊষাকে দেখে যান নিভাননী। ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথায় হাত দিয়ে প্রার্থনা করে যান অভাগীকে ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য। বাড়ীতে গিয়ে দেখেন জাফর কুলসম আয়েষা চলে গেছে। হৃষীকেশ চুরোট মুখে একা বারান্দায় বসে। কনখল ঘুমিয়েছে। স্বামীর পায়ের কাছে বসে পড়েন নিভাননী। বাগচি তাঁর মাথার চুলে হাত বুলোন।

১৮

ইমাম সাহেবের উপদেশ মতো বাগচি তদ্বির করে বদলীর চেষ্টা করেছেন। সামনে পুজোর ছুটি। ছুটির পরে ফেণুগঞ্জ বলে এক বন্দরে পরীক্ষামূলক মহকুমার হাকিম হয়ে যেতে হবে। পুজোয় দেশে যাবেন, তোড়জোড় চলছে। লেফ্‌টেনাণ্ট আব্বাস বলে ছোকরা ডাক্তার মিলিটারিতে এসেছে, আয়েষার বিয়ের সম্বন্ধ তার সাথে পাকাপাকি। বিয়ের কথা ওঠার পর থেকে আয়েষা ঘরকুনো হয়ে গেছে, আদৌ বাড়ীর বাহির হয় না। কনখল আব্বাসকে দেখেছে। যেমন শিকারে, তেমনি পোলোতে। আর একেবারে সাহেবদের মতো দেখতে, টক টক করছে গায়ের রং। কনখলের পরিচয় পেয়েছে আয়েষার বাবার কাছে। আয়েষাকে বিয়ে করবে বলেই বোধহয় আয়েষার খেলার সাথীকে একটু ভালোও বেসেছে।

বাড়ীর পাহারা হারুণকে রেখে, দিন দেখে, বাগচি নিভাননী কনখল রহমৎ দেশমুখী রওনা হন। আবার সুরমা, করিমগঞ্জ, চাঁদপুর। চাঁদপুর থেকে বিরাট বড়ো চাটগাঁ মেল জাহাজে ওঠেন সবাই। জিনিসপত্র গোছগাছ করে কুলী মিটিয়ে ডেকে গিয়ে বসেন হৃষীকেশ। কেবিনের সাথে বাথরুম, কনখলকে মুখ হাত ধুইয়ে ঠিকঠাক করে রহমতের জিম্মা করে দেন নিভাননী। নিজে গিয়ে ডেকে বসেন। রহমতের হাত ধরে লাফাতে লাফাতে কনখল বলে,—চলো শিগ্‌গির, ইঞ্জীন দেখব।

দুটো বিরাট ডাণ্ডা ওঠাপড়া করছে। কতকগুলো চাকা ঘুরছে। বাষ্পাচ্ছন্ন এঞ্জিনের ভেতর। হঠাৎ ঘ্রীং ঘ্রীং করে ঘণ্টি বেজে উঠ্‌লো। আর সঙ্গে সঙ্গে কী গম্ভীর সুরে ভোঁ আওয়াজ। কনখলের বুক যেন ভরে উঠ্‌লো। মেল জাহাজ হৃৎস্পন্দন তুলে তীর থেকে সরে যায়, তারপর মোড় ঘোরে, মেঘনার কালো জল কেটে পদ্মার গেরুয়া তরঙ্গমুখী রওনা দেয়। কনখলের বুক উল্লাসে ভরে ওঠে। একটা অসীম শক্তির পরিচয় পায় ঐ জাহাজের গতি বেগে।

জাহাজের পেছনের ডেকে ঘুরে বেড়ায়। বিছানা পেতে মাথার কাছে তোরঙ্গ রেখে কতো মানুষ সংসার সাজিয়ে বসেছে। আবার একটা চায়ের দোকান, চা বিস্কুট বিক্রী হচ্ছে। চোখ বুলিয়ে যায় কনখল। নীচের তলায় কি পরিমাণ মালপত্র, তারও আনাচ কানাচে লোক। একটা পাশের কামরা থেকে অতিপরিচিত সুগন্ধ আসে, কনখল রহমতের হাত টেপে, রহমত হেসে বলে,—বাবুর্চিখানা।

জাহাজের অন্ধিসন্ধি সরেজমিন করে হাঁপ ছাড়ে কনখল। ওপরকার সামনের ডেকে বেতের চেয়ারে বাবা মা বসে, ও গিয়ে পাশে বসে। জল কেটে জাহাজ চলেছে। এঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দ, আর পেছনে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ। দুটো একটা নৌকো বেকায়দায় সেই ঢেউয়ে পড়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। কিন্তু সাবাস মাঝি। কি কায়দায় দোলানি খেয়েও নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছে। গাং চীলগুলো নদীর দুপারে চক্রাকারে উড়ছে, আর মাঝে মাঝে মরশুমী হাঁসের ঝাঁক সাঁ সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে। কনখল পিট পিট করে তাকায়, আর কেবিনের বন্দুক দুটোর কথা ভাবে। কি মনে হয় ওই জানে, হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেলে। বিশ্বস্ত রহমৎ হাঁটু মুড়ে এক পাশে বসে। আস্তে উঠে এসে রহমতের পাশে বসে কানে কানে কথা কয়। রহমৎ ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে বলে,—জাহাজে ফায়ার করা বারণ, কোম্পানীর আইন। তবে যদি কোন বন্দরে জাহাজ দাঁড়ায় তখন হতে পারে। চুপ করে থাকো, আমি সাহেবকে বলব।

দুসার কেবিনের মাঝখানে বসবার আর খাবার ঘর। কি সুন্দর করে সাজানো। জাহাজের খানসামা এসে বলে,—হাজিরা তৈয়ার। বাবা মা ওঠেন। মা খানসামাকে বলেন, রহমৎ আমার বাবুর্চি। ওর জন্যেও নাস্তা,—

—সে সব ঠিক আছে মেমসাব।

কী অপূর্ব রান্না। দুটো ডিম চট করে খেয়ে নেয়। তারপর, ডোঙার ঢাকনা খুলতে সুঘ্রাণে ঘর ভরে যায়। মাছ সেদ্ধ। ইলিশ মাছ। ওর পাতে পড়তেই খেয়ে দেখে একটিও কাঁটা নেই। কি কায়দায় কাঁটা ছাড়ালো ওরা, ভাবে। আর ঠিক সেদ্ধ'ত নয়, একটু পোড়াটে গন্ধ, তাতেই যেন বেশী ভালো লাগে। কিন্তু কি জ্বালাতন! খাবার জিনিস খেলেই পেট যে কেন ভরে যায়। জল খেয়ে চুপচাপ বসে, কিন্তু জানে, মা এখনি চিঁড়ে ভেজা, না কি দিয়ে এক মগ দুধ খেতে বসবেন। পরিজ না ছাই। অখাদ্য। কিন্তু আইন অমান্য করা শেখেনি বলে তাও খেতে হয়। মুখ মুছে উঠে যায় রহমতের সন্ধানে জাহাজের বাবুর্চিখানায়। পেতলের ঝকঝকে রেলিং ধরে নীচে নামে। নামতেই যে দৃশ্য ওর চোখে পড়ে তাতে আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। জাহাজ মাঝ গাং ছেড়ে দিয়ে তীর ঘেসে চলেছে। আর দোতলা সমান নদীর পাড় ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে নদীর জলে। খুব সোরগোল উঠ্‌ছে ডাঙ্গা থেকে। লোকে ঘরবাড়ী জিনিসপত্র সরাচ্ছে। তাকিয়ে দেখে নদীর জল গেরুয়া। স্রোত খরধার। রহমৎ কখন এসে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ্য করেনি। রহমৎ বলে,—পদ্মা।

পদ্মা? কনখলের দুইচোখ বিস্ফারিত হয় অবাক বিস্ময়ে। এই পদ্মা? ভয়াল, মনোহর, প্রাণঘাতিনী, কলকলনিনাদিনী, তটবিপ্লাবিনী, সংহারিনী, একি ভীষণা মূর্তি এই নদীর। ও পড়েছে কি যেন বইয়ে, কীর্তিনাশা বলা হয় এই নদীকে, বহু প্রতিষ্ঠাবান লোকের কীর্তিনাশ করেছে। কেউ কেউ কর্মনাশাও লেখে। ছুটে আসে মায়ের কাছে। বলে,—মাগো, এই নদী—

—হ্যাঁ—এই নদী পদ্মা। বোস্ ত আমার কোলে। হ্যাঁরে কনা, বেড়ে উঠ্‌লি ত এগারো বারো হয়ে, জীবনে নিজেদের আত্মীয়স্বজন কাউকে দেখিস্‌নি। গ্রামে যাচ্ছিস্, সেখানে সবাই গরীব, সবাই নবাব। কিন্তু সাহেব নেই। কি করে সেখানে থাকবি?

—বাবা আর তুমি যে ভাবে থাক্‌বে। স্থিরকণ্ঠে বলে কনখল।

—ঐ দ্যাখ্, পদ্মার ভাঙনে গ্রাম গেছে, দেশ গেছে, একটা গাছ, কোনোরকমে মাথা তুলে আছে। তাতে কতলোক, মুরগী ছাগল সাপ সব উঠে বসে আছে। কেউ কারো কোনো অনিষ্ট করছে না। কি করে হয়?

কনখল ধ্যানমগ্ন হয়ে এক মিনিট ভাবে। বলে, হবে না কেন? সবায়ের শত্রু ঐ নদী—নদী থেকে ওরা নিজেকে বাঁচাচ্ছে। আর কেন নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করবে!

নিভাননী উৎফুল্লে উপ্‌ছে পড়তে পারতেন, কিন্তু সামলান নিজেকে। গম্ভীর সুরে বলেন,

—গোয়ালন্দ এসে গেল। এইবার বাড়ীর লাইন। ষ্টীমার বদল করতে হবে।

গোয়ালন্দ ভারী ষ্টেশন। ঢাকা মেল, চাটগাঁ মেল আরো কতো গাড়ীর আড়ৎ। চাটগাঁর ডাক জাহাজ থামতে সেকি কোলাহল। কাঠের সিঁড়ি পেতে লোহার চেন দিয়ে বেঁধে দেবার সাথে সাথে হাজারো কুলীর আক্রমণ। রহমৎ—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও বলে একে ওকে খেদিয়ে, তিনকুলীর মাল নিয়ে নীচে নামল। নিভাননী হৃষীকেশের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললেন,—এইবার?

—চলো। দেখাচ্ছি।

কালীগঞ্জ সার্ভিস ষ্টীমারের আরোহী হয়ে কনখল যোলোবোরের বন্দুকটা হস্তগত করেছে। বাবার হাফ্‌গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে কার্তুজ ছিল, চারটে চার নম্বর নিয়েছে। রহমৎকে গা টিপে জানিয়ে দিয়েছে অপরাধের কথা। জাহাজ ছাড়তে দু ঘণ্টা দেরী।

নতুন জাহাজে হৃষীকেশ নিভাননী খোলস বদলাচ্ছেন। হৃষীকেশ ইজের কোর্তা ছেড়ে খালি গায়ে ধুতি পরেছেন। খালি পা নিভাননী লাল কস্তাপেড়ে পরে গৃহলক্ষ্মী সেজে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু রহমৎ ও কনখল যে সাতটা ঘুঘু কবুতর আর সারস মেরে এসেছে, সেটা লক্ষ্য করেননি। রহমৎ বুড়ো ওস্তাদ। বলে,—বাবা, গাঁও এসে গেছে, জাহাজ ছাড়লেই পোঁছব। শিকার কটা,

—বুঝেছি। গাঁয়ে বুঝি আমরা অন্যরকম হয়ে যাব? তাহলে,

—আমি বলিকি বাবুর্চিখানায় দিয়ে আসি। সন্ধে নাগাদ গাঁয়ে পোঁছব। তার আগে দুপুরের খানায় যদি ওরা করে দেয়,

—বেশ ত, দাও না। কিন্তু মাকে আমি বলবই। রহমৎ বিব্রত বোধ করে। কনখল গিয়ে নিভাননীর কোলে মুখ গুঁজে সব বলে। নিভাননী ছেলের দুঃসাহসে উতলা হন কিন্তু খুশীও হন। বলেন,—ঠিক আছে। সামলে নিচ্ছি।

ঐ একটি কথা। সামলে নিচ্ছি। না বলে নিভাননী যদি সেদিন শাস্তি দিতেন, হয়তো

কনখলের ভবিষ্যৎ রূপান্তর গ্রহণ করতো।

খাবার টেবিলে বিচিত্র পক্ষীমাংসের সমাবেশে হৃষীকেশ পুলকিত হন। বলেন,—আমাদের কালীগঞ্জ সার্ভিস লাইন রীতিমতো উন্নত। কেউ কিছু ভাঙেনা, তবে কনখল উসখুস করে। মিথ্যে সহ্য করতে পারে না তাই। ছাগলছানার মতো মায়ের বুকে ঢু মারে। নিভাননী হেসে ফেলে বলেন,—এসব ইষ্টীমারের নয়, তোমার ছেলের শিকার। বোকো না, কথা দিয়েছি।

হৃষীকেশ কয়েক মিনিট গুম্ হয়ে থাকেন। বাঁ হাতের কাঁটা দিয়ে সারসের রোষ্টএর ঠ্যাং চেপে ডান হাতে ছুরী চালান। মুখে মাংসের পিণ্ড ঠেলে দিয়ে বলেন,

—কার্তুজ পেল কোথায়?

—কেন, খোলা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে।

—হুঁ। আচ্ছা হাতের তাক ত! সতেরোটা পাখী মারল চার কার্তুজে। কিন্তু এইবার গোলাবারুদ সামাল করো নিভ্। বন্দুকেও শিক্লি পরাও। আজ সাত বছর পরে গাঁয়ে ফিরছি। মা আছেন, দুই বৌদি আছেন, প্রচুর আত্মীয় বন্ধু আছেন, তাদের সাথে এক হয়ে একমাস থাকব—এতে যেন বাধা না হয়।

—কোনো বাধা হবে না। কনাকে আমি আগলে রাখবো।

কালীগঞ্জের ষ্টীমার ছাড়বার ভোঁ দিলো। সিঁড়ির পাটাতন সরে গেলো। তর তর করে জাহাজ পদ্মা ছেড়ে যমুনার দিকে মোড় নিলো। সিরাজগঞ্জ লাইন। পথে পড়বে, আরিচা, নগরবাড়ী, নতুন ভারেঙ্গা বিনানই। শেষোক্ত ষ্টেশন বাগ্‌চিপরিবারের গন্তব্য স্থান। ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার, তবুও হৃষীকেশ গ্রাম্য হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। জুতো মোজা কোট পাৎলুন ট্রাঙ্কে উঠে গেছে। একটি ছাতা, খালি পা, ধুতি, গেঞ্জি, দাঁড়িয়ে আছেন ডেকে। নিভাননী ঘোমটা টেনে কলাবতী হয়ে বসেছেন। কনখল দেখছে, আর অবাক হচ্ছে।

আরিচা গেল, নগরবাড়ী গেল। এইবার। বাগচি অসম্ভব অধীর হয়ে উঠেছেন, ষ্টেশন দেখা দিতেই স্ত্রী ছেলের হাত ধরে সামনের ডেকে টেনে নিয়ে বলেন—এই আমাদের দেশ। ভালো করে দেখো।

দেশের মাটিতে ষ্টীমার ভিড়ল। কি বিরাট নদী, আর কি ঘূর্ণী জায়গায় জায়গায়। কে একজন যেন একদলা কাগজের মোড়ক ছুঁড়ে দিল ঘূর্ণীর বুকে, অতলে তলিয়ে গেল মুহূর্তে।

শুধু মা বাবার চেহারাতেও রূপান্তর নয়, রহমৎও উর্দী ছেড়ে কখন ধুতি সার্ট পরেছে দেখে কনখল। ভাবে নিজেও তবে তাই করবে নাকি। নিভাননী ধুতি পিরান বার করেই রেখেছেন। ওর 'ত অভ্যাস আছেই। কাপড় ছাড়তে দেরী হয় না।

সিঁড়ি পাততেই যে ভদ্রলোক এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর পরনে ধুতি, কিন্তু গায়ে সার্টের ওপর খাকী কোট। কনখল দেখে অবাক হয়, সার্ট কোট বাবা যেমন পরেন তেমনি। কলকাতার সাহেব বাড়ীর। বাবা বলেন, শিবুদা। ওরে প্রণাম কর। নিভাননী হাঁটু গেড়ে বসে ঝাড়া দু মিনিট প্রণাম করেন। কনখল ঝট্ করে দুপায়ের পাতা ছুঁয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক বলেন, চলো, নামি। আয়রে কনখল, আমার হাত ধর। ভালো লাগে কনখলের, কেমন যেন উদার খোলা মাঠের স্পর্শ তাঁর হাতে।

সবাই নামেন, ছোট্ট ডিঙ্গীতে চড়ে বসেন, ডাকাতে চেহারার গহর মাঝি নৌকা চালাবে, আগে মালপত্র শিজিল করে নিচ্ছে। একটা ছোট্ট ছেলে, পাঁচেকে, বছর ছয়েকের হবে, বসে

হালের কাণ মোচড়াচ্ছে। মাঝি বলে, ছারান দে, ভাঙ্যা যাবে। ছেলেটা হঠাৎ ভয় পেয়ে যায় যেন। হাতের কসরৎ থেমে যায়। গহর বলে, রায়বাহাদুর, ছারব? সেই ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। কিন্তু জিজ্ঞেস করেন,—জোলায় সোঁত আছে ত? গহর বলে, সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত টানা জল। কোনো ফিকির নেই।

কনখল শুনতে পায়, বাবা ঐ শিবুবাবুর কানে কানে বলছেন,—দাদা, এটা গহর ডাকাত না? উনি হেসে মাথা নাড়েন। মার যে কি হয়েছে, বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে লজ্জাবতী হয়ে বসে আছেন। ডিঙি তরতর করে চলেছে যাকে বলছে জোলা, সেই নালা দিয়ে। সরু, যেন হাত বাড়ালেই দুপার ধরা যায়। কত ঝিয়ারীরা চানে নেমেছে, কত বউ কলস ভরে, সর্বাঙ্গে তরঙ্গ উথ্‌লে ঘরকে চলেছে। কত কলির কানাই আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি মারছে। ডিঙি চলেছে।

বাবা হঠাৎ গহরের হাত ধরে প্রায় বুকে টেনে বলেন, গহর দা, চিনতে পারো?

পারবো না ক্যান—রিসি—গাব চুরী কর‍্যা খাওয়ার ওস্তাদ। শুন্‌ল্যাম নাকি হাকিম হৈছস্‌, তাই ভয়ে কথা কই নাই।

—ওডা কে? ওই ছ্যাঁরাটা?

—আর কও ক্যান। কি বিপদেই পরল্যাম ডাকাতি করব্যার গিয়া। মরিয়ম, ঐ যে সাজাদ দারোগার বহেন,—লুট্যা ত আনল্যাম। নিকাও হোলো। ফল ঐ চ্যাংড়া। মরিয়ম মর‍্যা গিছে। গহরের দুচোখ টস্‌টসে জলে ভরে এলো।

ঐ যে রায়বাহাদুর শিবুদা, তিনি বললেন, থাম্‌ তুই গহর। শোনো রিসু, ওর বউ ত মরলো, ঐ একটি ছেলে রেখে। ডাকাতি ছাড়ল। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুক নিয়ে আমাকে গিয়ে বলল, আমাক শাস্তি দ্যাও রায়বাহাদুর। আমি মাইন্‌ষের ভালোই করব, আর ডাকাতি করব না। ফলে ওর বিরুদ্ধে যা কিছু চার্জ ছিল, নাকচ করে দিয়ে ওকে গাঁইয়া করে নিয়েছি। ভালো করিনি? কি বলিস্‌ রিসু?

বাবা বল্‌ছেন, দাদা, আপনি কোন দিন কোন কাজ খারাপ করেছেন, একথা কেউ বলবে না। তবে গহরকে একলা পেলে আমি জেল দিতাম।

গহর দাঁড় ছেড়ে রুখে দাঁড়ায়। কি বিশাল বুক, এক মুখ দাড়ি। দুটো হাত যেন চাটগাঁ মেলের দুটো ইস্পাতের রানার। ছাপ্পান্নো ইঞ্চি বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে। গহর বলে, আস্যা গ্যালাম রায়বাহাদুর। রিসুকে কয়্যা দিবেন, গহর কোনোদিন মন্দ কাজ করে নাই।

মন্দ কাজ? কাকে মন্দ কাজ বলা হয়, কনা জানে না। মন্দ? সে কেমন কাজ? যা ভালো লাগে, তাই যদি মন্দ কেউ বলে, তবে, যারা বলে, তারাই মন্দ। নিভাননী কেন যে ভূতের মতো ঘোমটা ঢেকে বসে আছেন। কনখলের বিস্মিত সত্তা উত্তর চায়, উত্তর চায়।

[ক্রমশঃ]

নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লবযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

১০। ইয়োরোপ : পিটার আলেকজাণ্ডার ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯২১)

১৮৮৯ সালে ক্রপটকিন যখন লণ্ডনে জনসভায় ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন জনৈক সাংবাদিক তাঁকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন : 'যদিও তাঁর বয়স বাড়ছে তথাপি তাঁর বপু ও বচন থেকে ঝরে পড়ছে অনির্বাণ যৌবন। তাঁর ভাবনা ছুটে চলেছে জোর কদমে—উৎসাহের আতিশয্যে মাঝে মাঝে হোঁচট খাওয়া ঘোড়ার মত। চশমার পিছনে ধূসর চোখজোড়া অপরাজেয় মমতায় চকচক করছে। কারলাইলের বীরপুরুষের মত তিনি যেন চাইছেন দুনিয়ার লোককে বুকে জড়িয়ে উত্তপ্ত করে রাখতে।'

নেচাএভের মত এ ব্যক্তিটিও রুশ নিহিলিজম্-এর সন্তান। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বিপ্লবী, করুণায় কোমল ও প্রতিভায় উজ্জ্বল দৃষ্টি, চওড়া কপাল, মাথায় টাক ও গালভরা শাদা দাড়ি—সব মিলিয়ে এমন একটা ব্যক্তিত্ব যে সামনে দাঁড়ালে মাথা আপনি নত হয়। অথচ তাঁর এতটুকু দম্ভ নেই, নেই নিজেকে জাহির করবার তিলমাত্র চেষ্টা। কখন বক্তৃতা দিচ্ছেন বিজ্ঞানীর আসরে, কখন বিপ্লবীদের বৈঠকে, কখন অভিজাতদের সভায়, কখন বা মজুরদের মজলিসে,—সর্বত্র তিনি সমান আত্মবিস্মৃত নিজের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় নির্বিকার, উদাসীন এবং আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় আত্মহারা। গভীর মনীষা ও অটল নীতিবোধ ছাড়া আপনার বলতে তাঁর কিছুই নেই। তাই সবাই হল তাঁর আপনজন, স্বভাবগুণে পেলেন তিনি নেতৃত্বের দায়।

১৮৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মস্কোতে রুশের ভূতপূর্ব রাজবংশ রুরিকদের পরিবারে পিটার আলেকজাণ্ডার ক্রপটকিনের জন্ম হয়। শিশুকালে মাকে হারিয়ে বাড়ির দাসদাসীর যত্নে তিনি মানুষ হন। পনের বছর বয়স পর্যন্ত পিতার জমিদারীতে বসে তিনি দেখলেন হতভাগ্য ভূমিদাসদের দুর্দশা এবং পতনোন্মুখ অভিজাতশ্রেণীর দম্ভ—শিশুমনে কায়েম হয়ে রইল এই বৈষম্যের ছাপ। ১৮৫৭ সালে তিনি জারের সুনজরে পড়েন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে এসে সম্রাটের দেহরক্ষীদের সামরিক শিক্ষালয়ে ভর্তি হলেন। শিক্ষা সমাপনের পর তিনি স্বেচ্ছায় সাইবেরিয়ার প্রান্তরে আমুর কসাক বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে এলেন। পাঁচ বছর ধরে এ অঞ্চলের ও তার অপরাধী সমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল।

১৮৬১ সালের আইনে রুশের ভূমিদাসদের দাসত্ব মোচন হল। কিন্তু মোটা খেসারতের দায়ে তারা জমিদারদের কবল থেকে গিয়ে পড়ল সুদখোরদের খপ্পরে। এদিকে পোল্যাণ্ডে রুশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। যে অভিজাতশ্রেণী স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে, নিজ দেশের চাষীদের স্বাধীনতা দিতে তারা নারাজ। ১৮৬৩ সালে চাষীরা ক্ষেপে গিয়ে প্রভুদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা বানচাল করে দিল। এরপর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জনকয়েক পোল বিদ্রোহী বইকাল রোডে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে গিয়ে বিফল হল। বিচারে তাদের পাঁচজন নেতার প্রাণদণ্ড হল। এসব দেখেশুনে ক্রপটকিন চাকরি ছেড়ে দিলেন।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটীতে এসে তিনি গণিত ও ভূগোল নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ১৮৭১ সালে সাইবেরিয়ার পূর্ব দক্ষিণের অজানা অঞ্চলে অভিযান করে তিনি

অনেক ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করলেন। এশিয়ার মানচিত্রের এক শূন্যস্থান পূর্ণ হল। রুশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী এই নবীন বৈজ্ঞানিককে সম্পাদকের পদে বরণ করবার প্রস্তাব নিল। তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কারণ গবেষণার সুখ ও যশের গৌরবে তাঁর অধিকার নেই 'যখন চারদিকে শুধু দুঃখ ও দারিদ্র্য এবং একটুকরা শুকনো রুটির জন্যে মানুষের লড়াই চলেছে।'[১] বৈদগ্ধ্যকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করবার কোন অবসর এই শ্রেণীদুষ্ট সমাজে নেই। পরে "তরুণদের প্রতি আবেদন" পুস্তিকায় তিনি তরুণ মনীষীদের ডেকে দেখিয়েছেন তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও বৃত্তির অসারতা—চিকিৎসা, ব্যবহার, যন্ত্রশিল্প, অধ্যাপনা, সাহিত্য সমস্ত ধনীর পরিচর্যায় নিয়োজিত। সুতরাং বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে যার ন্যায়বোধ আছে তার একমাত্র রাস্তা সমাজবিপ্লব। বিজ্ঞান ও শিল্প জনকল্যাণে সার্থক হতে পারে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে।

এই নবীন সমাজের রূপরেখা ক্রপটকিনের চোখে ফুটে উঠছিল। সরকারী চাকরির মত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেও তিনি জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ করলেন, পালিয়ে এলেন ইয়োরোপে।

সে কালের তরুণ বিপ্লবীদের ওপর শ্রমিক আন্তর্জাতিকের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আন্তর্জাতিকের নৈরাজ্যবাদী দলের ঘাটি ছিল জেনেভা। এখানকার জুরা শ্রমিক ফেডারেশন ছিল বাকুনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত। ক্রপটকিন এসে এদের সঙ্গে ভিড়লেন। এখান থেকে একতাড়া বিপ্লবী প্রচারপত্র সংগ্রহ করে তিনি গোপনে রুশে ফিরলেন—এসে যোগ দিলেন চাইকভস্কির গুপ্ত সমিতিতে। এই সমিতির প্রধান কাজ ছিল আত্মানুশীলন, কারণ সমিতি বিশ্বাস করত যে 'প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ হওয়া উচিত নীতিবান ব্যক্তিত্ব, তা সে প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক রূপই গ্রহণ করুক না কেন কিংবা ভবিষ্যতে ঘটনার চাপে যে কর্মপদ্ধতিই অবলম্বন করুক না কেন।'[২] সমিতির কাজ ছিল মস্কো ও সেণ্ট পিটার্সবার্গের আশেপাশে ছাত্রদের জড় করা এবং তাদের মারফত চাষী মজুরদের সঙ্গে সংযোগ করা। স্টেপনিয়াকও এই সমিতিরই সভ্য ছিলেন। তিনি "আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশ্যা"য় লিখছেন যে ক্রপটকিন যখন বরডিন ছদ্মনামে আলেকজাণ্ডার-নেভ্স্কি জেলায় শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিকের প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন তখন পুলিসের ঘুষ খেয়ে একজন শ্রমিক তাঁকে ধরিয়ে দেয় (৯৬ পৃঃ)।

সকল রাজদ্রোহীর গন্তব্যস্থল পিটার এণ্ড পল দুর্গে ক্রপটকিন আবদ্ধ হলেন। দাদা আলেকজাণ্ডার ছিলেন তাঁর পিঠাপিঠি সোদর ও দোসর। তিনি ভাইকে জেলে দেখতে আসতেন। সন্দেহবশে সাইবেরিয়ায় তাঁর নির্বাসন হল। সেখানে বার বৎসর একাকী অসহায়-ভাবে কাটিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। বোন, ভাই, ভ্রাতৃবধূ যাঁরা ছিলেন আপন জন কেউ পুলিসের নির্যাতন থেকে রেহাই পেলেন না। একটিমাত্র মিথ্যা কথার বিনিময়ে মুক্তিলাভ ও স্বজনের নিষ্কৃতি অর্জনের সুযোগ পুলিস তাঁকে দিয়েছিল। কিন্তু সত্যকে বিকিয়ে স্বাধীনতা পাবার প্রবৃত্তি ক্রপটকিনের চরিত্রে ছিল না।

দু' বছরের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য এমনি ভেঙে পড়ল যে তাঁকে সেণ্ট পিটার্সবার্গের উপকণ্ঠে এক সামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসতে হল। এখানে তিনি একটু নড়াচড়া করবার সুযোগ পেতেন। এই সুযোগ নিয়ে তিনি বাইরের সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন

---

[১] ক্রপটকিন : মেমরর্স অব এ রিভলুশেনিস্ট, লণ্ডন, ১৮৯৯, খণ্ড ২, ২০ পৃষ্ঠা।
[২] মেমরর্স, খণ্ড ২, ৯৪ পৃষ্ঠা।

এবং হাসপাতাল থেকে পালালেন। রুশ ছেড়ে তিনি পালিয়ে এলেন ইংল্যাণ্ডে, সেখান থেকে সুইৎজারল্যাণ্ডে এসে আবার জুরা ফেডারেশনকে কর্মক্ষেত্র করে বসলেন। এখানে ১৮৭৮ সালে তাঁর বিয়ে হল সোফী এনানিয়েভের সঙ্গে। তেত্রিশ বৎসর নানা দুঃখ দুর্যোগের মধ্যে এই মহিলা স্বামীকে সেবা সাহচর্য ও যত্ন দিয়ে আচ্ছাদন করে রেখেছেন। দিনরাত পড়া, লেখা আর লণ্ডন, পারি, জুরিক ও জেনেভার মধ্যে দৌড়দৌড়ি ও বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান—এই হল ক্রপটকিনের কাজ। জুরা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তিনি "ল্য রেভল্তে" বা বিদ্রোহী নামে এক পত্রিকা বের করলেন। সুইস সরকার পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবার পর এর নাম বদলে রাখা হল 'লা রেভল্ত' বা বিদ্রোহ। ১৮৮১ সালে রুশ সরকারের তাগিদে সুইস সরকার তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করলেন। ক্রপটকিন এলেন লণ্ডনে, সেখান থেকে ফ্রান্সে। ফরাসী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। শ্রমিক আন্তর্জাতিকের সভ্য হবার অপরাধে তাঁর পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হল। মিয়াদ ফুরবার কিছু আগে তিনি জন-আন্দোলনের চাপে ছাড়া পেলেন (১৮৮৬)। তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে হ্যারোতে ঘর বাঁধলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় নৈরাজ্যবাদী প্রবন্ধ লিখে কষ্টেসৃষ্টে জীবিকার সংস্থান হত। ১৮৯৯ সালে তিনি নিজের সম্পাদনায় "ফ্রীডম" নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল—সেই আগুনে ক্রপটকিনের রাষ্ট্রনীতির সংস্কার হল। এতদিন তিনি প্রচার করে এসেছেন যে বৈদেশিক সমরে জনসাধারণের কোন স্বার্থ নেই—সকল অবস্থায় জাতীয় সরকারের বিরোধিতাই তার কর্তব্য। সুতরাং রাষ্ট্র যখন আন্তর্জাতিক সংগ্রামে বিপন্ন তখনই তাকে আঘাত করার প্রশস্ত সময়—ক্রপটকিন তথা নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীর এইটেই ছিল কূট কৌশল। ক্রপটকিন এই কৌশল বর্জন করে জনতাকে আহ্বান করলেন মিত্রশক্তিকে যুদ্ধে সাহায্য করবার ও জার্মান সামরিক শক্তিকে রুখবার জন্যে। সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদী মহলে ছি-ছি পড়ে গেল। লেনিন তাঁকে 'সুবিধাবাদী ও মেরুদণ্ডহীন যুদ্ধবাজ' বলে গালি দিলেন, স্টালিন বললেন 'বোকা বুড়োটার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।' আর নৈরাজ্যবাদীর দল ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল। ক্রপটকিন, জ্যাঁ গ্রেভ, পল রবু প্রমুখ ষোলজন আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক ইস্তাহার প্রচার করলেন। এর পাল্টা বিবৃতি দিলেন মালাটেস্টা, শ্যাপিরো, এম্মা গোল্ডম্যান প্রভৃতি। দ্বিতীয় পক্ষ হল দলে ভারি। ক্রপটকিনের আবেদন অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হল।

যুদ্ধের অবসানে মাতৃভূমিতে আবির্ভাব হল আরাধ্য বিপ্লব দেবতার। ক্রপটকিন ভাবলেন বুঝি মুক্ত জীবনের আশীর্বাদ নিয়ে নবীন রুশের জন্ম হল। এই জন্মোৎসবে শরিক হবার জন্যে তিনি দেশে ফিরে এলেন। যখন দেখলেন যে জনতার উদ্যোগের পেছনে রয়েছে বলশেভিক দলের বজ্রমুষ্টি তখন তাঁর চৈতন্য হল—তিনি কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। রুশ সঙ্কটের চাপে পড়ে নৈরাজ্যবাদীদলের ফাটল বন্ধ হল।

প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও মতগুলিকে সমূলে বিনাশ করলেও বলশেভিকরা ক্রপটকিনকে ঘাটাতে সাহস করেনি। জারের সরকার যেমন জনমতের ভয়ে টলস্টয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করেনি, বলশেভিক সরকারের ক্রপটকিন সম্বন্ধে তেমনি ভীতি ছিল। মস্কোর চল্লিশ মাইল উত্তরে দ্মিত্রভ্ নামক গ্রামে বসে ক্রপটকিন রুশ সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন—সরকার বাধা দিলেন না কারণ তাঁর লেখা ছাপবার মত ছাপাখানা ও প্রকাশক সোভিয়েত রাশিয়ায় ছিল না।

তখন তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে। হৃদযন্ত্রের কাজ বিকল, পক্ষাঘাতে দেহ অবশ হয়ে আসছে। অবশেষে ১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি রোগযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি

পেলেন—মৃত্যুশয্যার পাশে বসে অশ্রুবর্ষণ করলেন স্ত্রী সোফী, কন্যা সাশা, জামাতা বরিস লেবেডেভ এবং জনকয়েক বন্ধু।

পৃথিবীতে এমন আর কোন বিপ্লবী এবং দার্শনিক বোধ হয় জন্মান নি যিনি বিশ্বের বিদগ্ধ আসরে এবং শ্রমিক ও ভূমিদাসের সমাজে সমান মর্যাদায় বিচরণ করেছেন, যিনি রাজবংশের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে গৃহহীন পলাতক জীবন বরণ করেছেন। অনিশ্চিত জীবনযাত্রায় একটি বস্তু ছিল স্থির নিশ্চিত—আদর্শ এবং জীবনের নৈতিক মান। ১৮৮৫ সালে, যখন তিনি ফরাসী কারাগার ক্লেরভোতে বন্দী তখন সহকর্মী বিখ্যাত ভৌগোলিক এলিসে রক্লু তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি "পারোল দ্যᐢ রেভল্তে" বা একজন বিদ্রোহীর কথা নাম দিয়ে সংকলন করেন। ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'এই লোকটির প্রতি আপামর জনসাধারণ শ্রদ্ধাশীল, তবুও তাঁহার উপর জেলের বন্ধ দরজা নড়িবার নাম করে না। ইহা দেখিয়া কেহ অবাক হয় না। কারণ ইহা ত' স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয় যে শ্রেষ্ঠতার মূল্য গুরু এবং নিষ্ঠার নিত্যসঙ্গী দুঃখবেদনা। ক্রপটকিন জেলে আবদ্ধ আছেন এ কথা ভাবিলে নিজেকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারা যায় না 'আমি মুক্ত কেন? মুক্ত থাকার চেয়ে বেশী যোগ্যতা আমার নাই বলিয়া কি?"

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন আমি দুটি লোক দেখেছি যারা সত্যিই সুখী এবং তাদের একজন ক্রপটকিন। রম্যাঁ রল্যাঁ বলেছিলেন টলস্টয় যা প্রচার করেছেন ক্রপটকিন তাই হয়েছেন,—অর্থাৎ তিনি খাঁটি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নৈরাজ্যবাদী। ফরাসী শ্রমিকরা তাঁকে ভালবেসে বলত 'নত্র্ পিয়ের'—'আমাদের পিটার।' এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি পেয়েছিলেন চরিত্রগুণে। তাঁর আদর্শে ও আচরণে কোন ফাঁক ছিল না। চরম দারিদ্র্যদশায় পড়েও তিনি কারো কাছে হাত পাতেন নি, কারও দান গ্রহণ করেন নি। বরং যখন যে এসেছে তিনি তার সঙ্গে অভাবের অন্ন ভাগ করে নিয়েছেন। একটি মাত্র বিষয়ে তাঁর সংযম ও মিতাচার ছিল না—সে হল কাজ।

নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও এই বিপ্লবীর বুকে ছিল রসের ফোয়ারা। তিনি হাসতে জানতেন, হাসাতে পারতেন—পাথর নিংড়ে মধু বার করবার কারুকলা তাঁর জানা ছিল। নিরাশ্রয় ভবঘুরে জীবনে যখন একটু স্থিত হয়েছেন—তখন হয়ত হাল্কা মনে পিয়ানোর পর্দা টিপে গান ধরেছেন, পাশের বাড়ির দাসীদের ডেকে তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন, কিংবা তাদের মেয়েদের নিয়ে নাচের আসর জমিয়ে বসেছেন। ক্রপটকিন শুধু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন না—তিনি ছিলেন জীবনশিল্পীও।

ক্রপটকিনের লেখায় একটা অনবদ্য প্রাঞ্জলতা আছে যা প্রুদোঁ-র রচনায় নেই, যুক্তি ও তথ্যের গাঁথুনি আছে, বাকুনিনে যার অভাব। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রসঙ্গও তিনি সাধারণের বোধগম্য করে পরিবেশন করেছেন। তিনি ছিলেন বাকুনিনের ভক্ত, যদিও তাঁকে কোনদিন দেখেননি। কিন্তু বাকুনিনের মত তিনি লোককে গরম কথায় তাতিয়ে তুলবার রাস্তা নেননি। তাঁর আবেদন ছিল মানুষের বুদ্ধি ও নৈতিক চেতনায়।

ক্রপটকিনের বহুল রচনার মধ্যে প্রধান ও মৌলিক গ্রন্থ, "ফীল্ডস্, ফ্যাক্টরীস এণ্ড ওয়ার্কশপস্" (১৮৯৮), "মেময়র্স অব এ রেভল্যুশনিস্ট" (১৮৯৯), "মিউচুয়েল এড, এ ফ্যাক্টর অব ইভল্যুশন" (১৯০২), "লা কংকেৎ দ্যু প্যাঁ" (১৯০৯) বা রুটির জয় এবং "এথিক্স" (১৯২১)। "ল্য রেভল্তে"-তে লেখা তরুণদের প্রতি আবেদন (১৮৮০), আইন ও শাসন কর্তৃত্ব (১৮৮০), বিপ্লবী সরকার (১৮৮২) প্রভৃতি প্রবন্ধ ১৮৮৫ সালে "পারোল দ্যᐢ রেভল্তে" নামে সংকলিত হয়। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ও পুস্তিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

"লানার্কি দাঁ লেভল্যুশিয়ঁ সোস্যালিসৎ" (১৮৮৬); "ইন রাশ্যান এণ্ড ফ্রেঞ্চ প্রিসন্‌স্‌" (১৮৮৭)°; "লা মোরাল এনার্কিসৎ" (১৮৯০); "স্টেট : ইট্‌স্‌ হিস্টরিক্যাল রোল" (১৮৯৬); "এনার্কিস্ট কম্যুনিজম্‌—ইট্‌স্‌ বেসিস এণ্ড প্রিন্সিপল্‌স্‌" (১৮৯৬); লানার্কি—সা ফিলসফি, স' ইডেয়াল (১৮৯৬); লা সিয়াঁস্‌ মদার্ন এ লানার্কি (১৯০১); দি গ্রেট ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশন এণ্ড ইট্‌স্‌ লেসন্‌স্‌ (১৯১৪); এনার্কিজম্‌ (এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় লিখিত প্রবন্ধ)।

এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধে ক্রপটকিন লিখছেন যে নৈরাজ্যবাদী দর্শনে তাঁর প্রধান অবদান একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস। নিরাজ সমাজ কল্পনার মেঘলোক থেকে নেমে আসবে না, সর্বসাধারণের বুদ্ধির বিকাশের জন্যেও বসে থাকবে না—সে আসবে বাস্তবের তাগিদে সমাজবিকাশের অব্যর্থ নিয়মে। সমাজের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করে, অসংখ্য তথ্য চয়ন করে তিনি দেখিয়েছেন যে তার গতি শাসনহীন যূথকেন্দ্রিক সমাজের দিকে। মানুষের সমাজও প্রকৃতির মত নিয়মানুবর্তী। প্রকৃতির রহস্য উদ্ধার করতে যে বৈজ্ঞানিক শৈলী অবলম্বন করতে হয় মানুষের ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করবার জন্যেও সেই পদ্ধতিই গ্রহণীয়।

নক্ষত্রলোক থেকে ব্যক্তিমানস পর্যন্ত সর্বত্র এক ধারা এক রীতি চলে এসেছে। সর্বত্রই উদ্দাম বহুধা গতিশক্তির একটা সামঞ্জস্য বিধানই যেন প্রকৃতির নিয়ম। নভোমণ্ডলে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র আপন খেয়ালে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে—কিন্তু পরস্পরে সংঘর্ষ হয় কদাচিৎ। তার কারণ তাদের পরস্পর বিমুখী গতি একটা মীমাংসায় উপনীত হয়েছে—যার ফলে যার যার অক্ষপথে তাদের পরিক্রমা—লক্ষ লক্ষ বছরেও তারা পথভ্রষ্ট হয় না এবং তাদের সংঘর্ষ ঘটে না।

জীবলোকেও একই রেওয়াজ। এক একটি জীবে বহুল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসংখ্য জীবাণুর সমষ্টি, জীবাণুতে যে আবার কত পরমাণু আছে তার ইয়ত্তা নেই। এরা নিজেদের মধ্যে আপস করে নিয়েছে বলেই দেহ সুস্থভাবে চলাফেরা করতে পারে।

মানুষের মনই বা কি? মনোবিজ্ঞান বলছে যে সেখানে অজস্র বৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার সংঘাত, অজস্র খেয়ালখুশির সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। কাম, ক্রোধ, লোভ আবার দয়া মায়া ভালবাসা—একের বিরুদ্ধে অপরের ক্রিয়া সংযত হয়েছে—সকলের সন্ধিক্ষেত্র হল মন।

আবার এ সন্ধি ও মীমাংসা কোথাও চিরস্থায়ী নয়। এ একটা সাময়িক সমাধান। শক্তির ক্রিয়া চিরকাল একভাবে হয় না, গতি চিরকাল একমুখী নয়। এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সমাধানকে খাপ খাওয়াতে হয়। কোন শক্তিকে জোর করে দাবিয়ে রাখলে সামঞ্জস্য ভেঙে যায়। এই প্রকারে নভোলোকে নক্ষত্রপতন ঘটে, জীবনে রোগ ও বিকার দেখা দেয়, মনের ভেতর ঝড় ওঠে। সমাজে বিপ্লব হয় একই কারণে।

চিরচঞ্চল বহুবিধ বিক্ষিপ্ত শক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান প্রকৃতির ধর্ম। সমাজ এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সেখানে কারও স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যকে অবহেলা করা চলে না। সকলের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য সাধনই সমাজের কাজ—স্বার্থ ও কামনা যখন বদলায়, সামঞ্জস্যেরও তখন সংস্কার করতে হয়। এই সজীব সহজ সামঞ্জস্যের জায়গায় যখন রাষ্ট্র

° এ বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ পুলিস গোটা সংস্করণ কিনে নষ্ট করে ফেলে এবং ক্রপটকিন বিজ্ঞাপন দিয়েও একখণ্ড সংগ্রহ করতে পারেননি।

আইনের অচলায়তন স্থাপন করবার চেষ্টা করে তখন বিপ্লব হয় অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক নৈরাজ্যবাদ এই বাস্তব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

> এখন ইহা আর বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নহে; ইহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়।[৪]

"ল এণ্ড অথারিটি" এবং "স্টেট : ইট্‌স্ হিস্টরিক রোল" দুটি পুস্তিকায় ক্রপটকিন রাষ্ট্র ও আইনের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। আদিম সমাজে আইন ছিল না, ছিল অভ্যাস ও প্রথা। শান্তি ও সামঞ্জস্য তাতেই বজায় থাকত। কারও কোন বিত্ত ছিল না তাই বিত্ত নিয়ে বিবাদ ও বিত্তরক্ষার আইনও ছিল না। যাযাবর জাতি কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে ভূমিবশ হল—একাধিক জাতির মিলনে মিশ্রণে গঠিত হল গ্রাম সমাজ। আদিম যৌথ জীবন তখনো নষ্ট হয়নি। জমি জমার মালিক সারা গ্রাম। সমাজবিধির রক্ষক পঞ্চায়েত। সেখানে পৌত্রিক প্রথা বলবৎ, আইনের বিচার নেই।

কিন্তু ছিল কুসংস্কার, অন্ধ গতানুগত্য, ভীরুতা, চিন্তার আলস্য। সেই সুযোগে ধূর্ত স্বার্থসন্ধীরা এসে আধিপত্য বিস্তার করল,—গ্রামগোষ্ঠীর বিত্ত ও ক্ষমতা করায়ত্ত করে তারা প্রভু হয়ে বসল। পঞ্চায়েতের জায়গায় এল কাজির বিচার, রাজদণ্ড—তার ইজ্জত রক্ষা করবার জন্যে পাইক বরকন্দাজ। তার সঙ্গে হাত মিলাল ধর্মধ্বজ পুরোহিত—লোকের ভাগ্য নিয়ে যার জাদুবিদ্যার ব্যবসায়।

এর বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদ হয়নি তা নয়। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে গড়ে উঠছিল জনপদ, জাতি উপজাতি মিলে এক স্বাতন্ত্র্যশীল মহাজাতি। মধ্যযুগে দেখা যায় ক্ষমতার কেন্দ্রায়নে এরা বাধা দিয়েছে স্যাক্সন, কেল্ট, জার্মান, শ্লাভ সবাই আপন আপন কেন্দ্রাতিগ যূথ-সমাজের রক্ষণে যত্নবান। গ্রামের চাষী-সমবায়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা গড়ে তুলেছে কারিগর-সংঘ তাদের মিলনে তৈরী হয়েছে পৌরসভা, জুরির আদালত ও নাগরিক বাহিনী। নগর নগরের সঙ্গে মিলে বৃহত্তর আদান-প্রদানের আসর রচনা করেছে। ডোভার উপকূলের পঞ্চবন্দর ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে ফরাসী ও ওলন্দাজ বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, স্ক্যানডিনেভিয়ান ও জার্মান নগরগুলি সংগঠিত হয়েছে হ্যানসিয়াটিক লীগে, তার সামিল হয়েছে রুশের নভগরড। এদের মধ্যে যে সব সন্ধি ও চুক্তি হত তার সর্তগুলি পরবর্তী আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের উপকরণ হয়ে দাঁড়াল। নগরে মুক্ত জীবনের পরিবেশে উচ্ছ্বসিত হয়েছে এক অভিনব সৃষ্টিপ্রেরণা যার নিদর্শন গথিক ও রোমানেস্ক স্থাপত্য, র‍্যাফেলের চিত্র, দান্তের কাব্য ও বেকনের বিজ্ঞান।

কালক্রমে নগরযূথের স্বায়ত্তশাসন বিকৃত হল, ক্ষমতা আবদ্ধ হল কয়েকটি বনেদি বংশের গণ্ডিতে। নগরসভায় তারা সর্বেসর্বা। সেখানে নবাগতরা প্রবেশাধিকার পেল না। এক একটি নগরযূথও হয়ে দাঁড়াল সামন্ত প্রভু। চারপাশের কৃষকরা তাদের ভূমিদাস, এদের শ্রমফল ভোগ করে নাগরিকরা ধনী হল। যে নগর একদিন ছিল স্বাধীনতা ও সমন্বয়ের পীঠস্থান সে নগর হল শাসন ও শোষণের কেন্দ্র, অর্থাৎ নগররাষ্ট্র। শক্তিমান রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রকে গ্রাস করল—তৈরী হল বৃহত্তর জাতীয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের চাপে গ্রামীণ যৌথ উদ্যোগ ও ভূমি ব্যবস্থা ভেঙে গেল—গ্রামের জমি চাষীর হাত থেকে চলে গেল জমিদারের হাতে।

মিশর, এশিয়া, ভূমধ্য সাগরের উপকূল ও মধ্য ইয়োরোপ সর্বত্র একই ঘটনাচক্রের

---

[৪] এনার্কিস্ট কমিউনিজ্‌ম্—ইট্‌স্ বেসিস এণ্ড প্রিন্সিপ্‌ল্‌স, ফ্রীডম পাবলিকেশনস, লণ্ডন ১৯০৫, ২ পৃষ্ঠা।

পুনরাবৃত্তি হয়েছে। প্রথমে আদিম জাতি, তারপর আত্মনির্ভর গ্রামযূথ, তারপর মুক্ত নগর, শেষে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র—এই পারম্পর্য দেখা গেছে মিশরে, এসীরিয়া পারস্য ও প্যালেস্টাইনে, গ্রীসে ও রোমে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কেল্ট, জার্মান, শলাভ ও স্ক্যানডিনেভিয়ানরা ইয়োরোপে নূতন প্রাণশক্তি নিয়ে এল তার অধিষ্ঠান হল গ্রামের মুক্তজীবনে, তারও অবসান হল রাষ্ট্রের শাসন পীড়নে।

রাষ্ট্র শাসন চালায় আইনের মাধ্যমে। স্বৈরাচারের যুগে আইনের মাহাত্ম্য ছিল না, রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন, রাষ্ট্রের নীতি। স্বৈরাচারের উচ্ছেদ করল মধ্যবিত্ত শ্রেণী—ফরাসী বিপ্লবের কাল থেকে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল এবং আইনশাস্ত্র রচনা করে তার বলে শাসনের গদিতে কায়েম হয়ে বসল। বর্বররা যেমন এককালে পাথরের রাক্ষস দেবতাকে নরবলি দিয়ে পূজো করত, তাকে স্পর্শ করতে সাহস পেত না, সে দেবতাকে তুষ্ট করবার মন্ত্র জানা ছিল কেবল জাদুকর পুরোহিতের, আজকাল সেই রাক্ষস দেবতার মহিমা পেয়েছে আইন। তার পূজারী এক শ্রেণীর আইনকর্তা

> যাহারা কি বিষয়ে আইন হইবে তাহা না জানিয়া আইন করিতে পারে; যাহারা আজ স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে কোন ধারণা না রাখিয়া পৌরস্বাস্থ্যের আইন পাশ করিতেছে, কাল সেনাবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে যদিও কোন দিন একটা বন্দুককে নাড়িয়া দেখে নাই; শিক্ষা বিষয়ে বিধান দিতেছে যদিও কোনদিন কোথাও একটি পাঠও দেয় নাই কিংবা নিজ সন্তানদেরও সুশিক্ষা দেয় নাই; যাহারা যে দিকে নজর যায় সেদিকে আইন করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু অপরাধীদের জন্য জেল ও শাস্তি বিধান করিতে ভোলে না যাহাদের দুর্নীতির কলঙ্ক এই আইন কর্তাদের এক হাজার ভাগের এক ভাগও নয়।[৫]

আর বে-আক্কেল জনতা, নিজের ভালমন্দ বুঝবার বুদ্ধি যাদের আদৌ নেই, 'প্রভুদের নির্বাচন করিবার বেলায় তাহারা হয় জ্ঞানের অবতার।'[৬]

এদিকে যন্ত্রশিল্প ও ধনতন্ত্র নিয়ে এসেছে নিদারুণ ধনবৈষম্য, শ্রেণীভেদ। শ্রমিক বিত্ত উৎপাদন করে কিন্তু উৎপাদনের যন্ত্র ধনিকের করায়ত্ত, শাসকবর্গও তারই তাঁবেদার। মজুর চাইছে সমাজের বিত্তে তার নিজের হিস্সা বুঝে নিতে, উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। তাদের অন্তরের আশা মন্থন করে উঠেছে সমাজবাদের মন্ত্র, শিল্প ও বিত্তের ওপর সমাজ-কর্তৃত্বের দাবি।

একদল সমাজবাদী বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে এই অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের ধারণা শ্রেণীরাষ্ট্রকে জনরাষ্ট্রে পরিণত করে জন-কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব। শিলারের উপন্যাসে মাকুইস অব পোসা স্বপ্ন দেখেছিল তার একায়ত্ত ক্ষমতার বলে সে লোকরাজ আনবে, জোলার রোমে পাদরি পিটার স্বপ্ন দেখেছিল যে চার্চের শুভ চেষ্টায় সমাজতন্ত্র আসবে। রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রীরাও এমনি আকাশকুসুমের কল্পনায় মশগুল। তারা রাষ্ট্রের হাতে দেবে অপরিমিত ক্ষমতা—উৎপাদন ও বণ্টনের, শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব। তারা দেখছে না যে রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রায়ণের পরিণাম হবে শান্তি ও স্বাধীনতার অবসান।

---

[৫] ল এন্ড অথরিটি : রজার এন. বলডুইন সঙ্কলিত ক্রপটকিনের বিপ্লবী পত্রাবলী, নিউ ইয়র্ক, ১৯২৭, ২০১ পৃষ্ঠা।

[৬] এনার্কিজ্‌ম্ : ইট্‌স্ ফিলজফি এন্ড আইডিয়েল, বলডুইনের সঞ্চয়ন, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

ইতোমধ্যে রাষ্ট্র যে সকল কাজ হাতে লইয়াছে তাহার উপর যদি অর্থনৈতিক জীবনের মূল উপাদানগুলি তাহাকে সমর্পণ করা হয়, যথা জমি, খনি, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি, উপরন্তু সে যদি যন্ত্রশিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখার তত্ত্বাবধান শুরু করে তাহা হইলে নূতন করিয়া এক স্বৈরাচারের বাহন সৃষ্টি হইবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ধনতন্ত্র আমলাতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়াইবে বৈ আর কিছু নয়।[৭]

এরা আর্থিক সম্পর্কগুলি কতটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একবার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবার পর তাদের ভুল ত্রুটি শোধরাবার মত বিনয় থাকবে না। পূর্বতন স্বৈরাচারীদের মত তারাও হবে দাম্ভিক, নিজেদের মনে করবে নির্ভুল সবজান্তা। ফলে এক কালের সাথীরা হবে শত্রু, রাষ্ট্রের ভেতর দেখা দেবে অন্তর্বিরোধ, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব।

তুমি যাহা করিবে তাহাই ঠিক, এরূপ এক অবিসংবাদী কর্তৃত্ব চাপাইয়া সমাজের সংস্কার করিবার চেষ্টা করিও না। পোপ ও সম্রাটদের মত তুমিও বিফল হইবে। এমনভাবে সমাজের সংস্কার কর যাহাতে সহকর্মীরা অবস্থার চাপে পড়িয়া তোমার শত্রু হইয়া না দাঁড়ায়। ঐ ব্যবস্থাগুলিকে বদলাও যাহা কয়েকজনকে অপরের শ্রমফল একচেটিয়া করিবার অধিকার দেয়।[৮]

মজদুরকে ভোটাধিকার দিলে আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার তৈরি করলেই রাষ্ট্র লোকায়ত্ত হয় না। সমাজে যতরকমের বিচিত্র ও বিপরীত স্বার্থ বিদ্যমান তাদের সকলের প্রতিফলন নির্বাচনের মাধ্যমে হতে পারে না, তাদের সন্তুষ্টি সাধন ও সমন্বয় কোন আইনসভা করতে পারে না। নির্বাচন কোনদিন এমন একদল লোক খুঁজে বার করতে পারে নি যারা গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখে, যারা দলীয় মনোবৃত্তির ওপরে উঠে সারা দেশের কল্যাণে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রূপান্তর হয়। ভূমিদাস প্রথার আমলে ছিল দরবারি শাসন। ধনতন্ত্রের যুগে এল প্রতিনিধিমূলক শাসন। উভয়ত ক্ষমতা রইল শ্রেণীবিশেষের হাতে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের কোন দাম নেই, কারণ উৎপাদনশালার চাবিকাঠি যাদের হাতে নির্বাচনের যন্ত্র তাদের স্বার্থের অনুকূল। সুতরাং প্রতিনিধিমূলক সরকারের দ্বারা শ্রমিকের মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, ঠিক যেমন চার্চ, দৈবাধিকার, সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রভৃতির মারফত তা সম্ভব নয়।

শ্রমিক যখন ধনিকের অন্নদাস থাকবে না তখন তার শোষণযন্ত্র রাষ্ট্র হবে অবান্তর।

মুক্ত শ্রমিকদের প্রয়োজন হইবে স্বাধীন সংগঠনের—যাহার বনিয়াদ স্বেচ্ছাধীন চুক্তি ও সহযোগিতা, যেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে ঢাকিয়া যায় না।[৯]

এই নিরাজতন্ত্র ভাবীকালের সমাজবিধান যেখানে মানুষ শ্রেণীশোষণ ও রাষ্ট্রশাসনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। আজকের দিনেও দুনিয়ার অধিকতর ক্ষেত্রে স্বাধীন চুক্তি ও সহযোগিতায় কাজ চলছে। দেশবিদেশের ডাকবিভাগ মিলে আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন

---

৭ এনার্কিজ্‌ম্‌ : এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা।
৮ অ্যানার্কি অ্যা লেভলুশিয়ারি সোস্যালিস্ট।
৯ এনার্কিস্ট কমিউনিজ্‌ম্‌—ইট্‌স্‌ বেসিস এণ্ড প্রিন্সিপল্‌স্‌, ৬ পৃষ্ঠা।

আছে, দেশবিদেশের রেলপথে আছে বোঝাপড়া যাতে যাতায়াত আদান-প্রদানে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। তার জন্যে ডাক পার্লামেণ্ট অথবা রেল পার্লামেণ্ট গড়বার দরকার হয় নি। বৈজ্ঞানিকদের সমিতিগুলিও তাদের গবেষণা ও অভিযানের জন্যে পার্লামেণ্ট নির্বাচন করে না। তারা সম্মেলন করে, সেখানে প্রতিনিধি পাঠায়, প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রতিনিধিরা ফিরে আসে আইন নিয়ে নয়, প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাবে সায় দিলে সমিতি যোগ দেয়, অন্যথায় কোন বাধ্যবাধকতা নেই। লোককার্য পরিচালনা করার এটাই যুক্তিসংগত পদ্ধতি। নৈরাজ্যবাদ সকল ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বহাল করতে চায়।

অনেকের ধারণা ভোটের অধিকার পেলেই মুক্তিলাভ হল। নারীমুক্তির নেত্রীরা এই অধিকারের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

> আমিও চাই মেয়েরা তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত ভোটের অধিকার পাক। ইহার অসারতা বুঝিতে তাহাদের পঞ্চাশ বছর কি তারও বেশী সময় লাগিবে আর ইতোমধ্যে তাহাদের নেত্রীরা কায়েমী স্বার্থের রক্ষণে সাহায্য করিবে। ভোটাধিকার পাইয়া শ্রমিকরাও তাহাই করিয়াছিল। ইহারা যে অধিক বুদ্ধিমতী হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই।[১০]

মুক্ত মহিলা তার ঘরের কাজ অন্য মেয়ের ঘাড়ে চাপাবে—একের মুক্তি বাড়াবে অপরের দাসত্বের বোঝা। নারীকে মুক্তি দিতে হলে প্রথমে দিতে হবে গৃহকর্মের হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে মুক্তি, দিতে হবে যথেষ্ট অবসর, শিক্ষালাভের ও সমাজজীবনে পুরুষের সঙ্গিণী হবার সুযোগ।

প্যারি কমিউনের পতনের পর থেকে শ্রমিক আন্তর্জাতিক সংঘে জার্মান সোস্যাল ডেমক্র্যাট ও ল্যাটিন শ্রমিক সংঘদের মধ্যে বিবাদ ঘনিয়ে উঠল। মার্ক্স্-এর নেতৃত্বে প্রথম দল চাইল সারা ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলন এক সংগঠনের আওতায় এক কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে আনতে। বাকুনিনের নেতৃত্বে ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের শ্রমিক সংঘগুলি আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সচেষ্ট হল। জার্মানদের আদর্শ কমিউনিজম, ল্যাটিনদের আদর্শ কলেক্টিভিজম—যাতে উৎপাদনের উদ্যোগ যৌথ হলেও ভোগ ও বণ্টনের ব্যবস্থা যার যার ইচ্ছাধীন।[১১] একই লক্ষ্যে পৌঁছবার যে আলাদা আলাদা রাস্তা থাকতে পারে এ কথাটা জার্মান সোস্যাল ডেমক্র্যাটরা কিছুতেই বুঝতে চায় নি। সারা মহাদেশ জুড়ে নিজেদের পছন্দমত একটা শ্রমিক আন্দোলন চালাবার ব্যর্থ চেষ্টায় তারা পঁচিশটা বছর নষ্ট করেছে।

১৮৮০ সালে সুইৎজারল্যাণ্ডের জুরা ফেডারেশন তাদের কংগ্রেসে মুক্ত সমাজবাদ বা এনার্কিস্ট কমিউনিস্ট নীতি ঘোষণা করল। তদবধি জুরা হল ইয়োরোপের স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র। প্রুদোঁ ও বাকুনিন যে নিরাজ সহযোগী সমাজের ছবি এঁকেছিলেন জুরার ঘড়িওলাদের সামনে ছিল সেই ছবি। শুধু যে এই আদর্শ তুলে ধরবার জন্যেই ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের শ্রমিকদের ওপর তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয়, তাদের সংগঠনও ছিল এই আদর্শের অনুগামী। তারা কারখানায় কাজ করত না। যার যার ঘরে ঘরে স্বাধীন-ভাবে তারা ঘড়ি তৈরির কাজ করত—কাজে স্বাধীনতা ছিল, মৌলিকতার অবকাশ ছিল।

---

[১০] ফ্রীডম প্রেসের পরিচালকের প্রতি মন্তব্য : জর্জ উডকক ও আইভেন এভাকুমোভিক : দি এনার্কিস্ট প্রিন্স, লণ্ডন, ১৯৫০। ৩০১ পৃষ্ঠা।

[১১] আন্তর্জাতিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে শুধু আদর্শ নিয়ে ছিল না সে প্রসঙ্গ আগে আলোচিত হয়েছে। চতুরঙ্গ, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৬।

তাদের সংঘে নেতা ও জনতার ফারাক ছিল না—ইউনিয়নের বৈঠকে কোনরকম মতবাদের দোহাই না দিয়ে সমস্যাগুলি আলোচনা করা হত।

> যে সমাজ কাঠাম আমরা কামনা করিতাম তাহা এখানে আদর্শে ও বাস্তবে তলদেশ হইতে গড়িয়া উঠিতেছিল। নৈরাজ্যবাদের আদর্শ বিস্তার করিবার কাজে জুরা ফেডারেশনের ছিল এক বিশিষ্ট ভূমিকা।[১২]

এদের সঙ্গে এক সপ্তাহ থেকে ক্রপটকিন এনার্কিজম-এ দীক্ষা নিলেন। এর আগে তিনি পাঁচ বছর সাইবেরিয়ায় অপরাধীদের মধ্যে কাটিয়ে এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন শাসন ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে যা মানুষকে দিয়ে করান যায় না, তার শুভবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিলে সে কাজ কত সহজে হাসিল হয়। এই সব নির্বাসিত চোর ডাকাতের সঙ্গে একলা বস্তা বস্তা নোট ও টাকা নিয়ে তিনি দিনের পর দিন শত শত মাইল আমুর নদী পথে অতিক্রম করেছেন। সঙ্গে অস্ত্র ছিল না, তাকে গলাটিপে মেরে ফেললেও কেউ টের পেত না। টাকায় হাত দেওয়া দূরে থাকুক এরা দুর্গম দেশে আপদে বিপদে তাঁকে রক্ষা করেছে। আইনের সাজায় যে চরিত্র ঢাকা পড়েছিল বিশ্বাস ও ভালবাসা তা মেলে ধরেছে।

> সামন্ত প্রভুর পরিবারে মানুষ হইয়া যখন আমি কর্মজীবনে প্রবেশ করিলাম তখন সে কালের তরুণদের মত আমারও খুব আস্থা ছিল যে ধমক হুকুম ও শাস্তি ছাড়া কাহাকে দিয়া কোন কাজ করান যায় না। কিন্তু প্রথম জীবনেই যখন আমাকে মানুষ লইয়া কারবার করিতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইল তখনই আমি বুঝিতে লাগিলাম যে হুকুম ও শাসনের নীতি এবং আপসে বোঝাপড়ার নীতি এ দুয়ে কত তফাত। প্রথমটি সামরিক কুচকাওয়াজে বেশ কার্যকরী। কিন্তু যেখানে বাস্তব জীবন লইয়া কারবার, যেখানে কার্যসিদ্ধির জন্য বহুর ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছা ও কঠোর উদ্যমের প্রয়োজন সেখানে হুকুম ও শাসন দিয়া কোন কাজ হয় না।[১৩]

শাস্তি দিতে সরকার খুব পটু। জনসাধারণের নির্মাণমূলক উদ্যোগে সরকার কত মনোযোগী ক্রপটকিন তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। বইকাল হ্রদের দক্ষিণে চিতা নামে একটি শহর উঠেছে। সেখানকার লোকেরা প্রহরার জন্যে একটি মিনার তুলবার পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে হিসেব পাঠাল। দু বছর পরে যখন পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়ে এল ততদিনে মালমসলার দাম ও শ্রমিকের মজুরি অনেক বেড়ে গেছে। নতুন করে হিসেব পাঠান হল—আবার সরকারের চিঠি এল দু বছর বাদে, এবং এবারও শহরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দামও চড়ে গেছে বিস্তর। অগত্যা শহরবাসীরা ডবল করে দাম ধরে হিসেব পাঠাল, হিসেব মঞ্জুর হয়ে এল এবং মিনারের প্ল্যান লালফিতার বাঁধন থেকে মুক্তি পেল।

সাইবেরিয়া ছেড়ে আসবার সময়ে ক্রপটকিন রাষ্ট্রশাসন ও নিয়মানুগত্যের প্রতি সবটুকু শ্রদ্ধা বিসর্জন দিয়ে এলেন।

রাষ্ট্রের এখতিয়ারের বাইরে স্বাধীন উদ্যোগ ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শিল্প-বাণিজ্যের যোগাযোগ, রেডক্রশ সোসাইটীর কাজ, বৈজ্ঞানিকদের আন্তর্জাতিক সভা সমিতি, আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ান—এরা লাল ফিতার ধার ধারে না, কোন কর্তার হুকুমের অপেক্ষা রাখে না। ম্যাড্রিড থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত রেলপথ গেছে দেশ বিদেশের বেড়া ডিঙিয়ে। বিশটা কোম্পানী চুক্তি করে গাড়ি চালাচ্ছে, ভাড়ার আয় অনুপাত মত ভাগ

[১২] মেময়র্স, খণ্ড ২, ২১১ পৃষ্ঠা।
[১৩] মেময়র্স, খণ্ড ১, ২৫০-৫১ পৃষ্ঠা।

করে নিচ্ছে।[১৪] একজন নেপোলিয়ন কিংবা চেঙ্গিজ খাঁ এসে ইয়োরোপকে দলে মুচড়ে তবে এই লাইন পাতবে—সে অপেক্ষায় লোকেদের বসে থাকতে হয় নি।

> সর্বত্র রাষ্ট্রকে তাহার পবিত্র দায়িত্ব বেসরকারী লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। সর্বত্র স্বাধীন সংগঠন ইহার রাজ্যে অনাধিকার প্রবেশ করিতেছে। অথচ যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে আভাস পাওয়া যায় মাত্র ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের অবর্তমানে স্বাধীন চুক্তির সম্ভাবনা কত সুদূরপ্রসারী।[১৫]

সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে সমাজ চাইছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রণ। এর উপর নির্ভর করছে সমাজের প্রগতি, বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য। সরকারের একমাত্র কর্তব্য তার কর্ম স্বাধীন আঞ্চলিকগোষ্ঠী ও উৎপাদনসংঘের হাতে ছেড়ে দেওয়া।

১৮৮৯ সালে লণ্ডনের ডক মজদুররা এক বিরাট ধর্মঘট করে। বন্দর থেকে এই ধর্মঘট সারা লণ্ডনে ছড়িয়ে পড়ে শিল্পবাণিজ্য ও নাগরিক জীবন অচল করে তুলেছিল। ইউনিয়ান পাঁচ লক্ষ মজুরকে খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ করেছিল যে তারা শুধু লড়াই করতে জানে না, দেশকে রাখতেও তারা পারে। এই ধর্মঘটে ক্রপটকিন এক নতুন সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। সমাজ বিপ্লবে শ্রমিক-সংঘের ভূমিকা তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। ১৯০৭ সালে "ফ্রীডম" পত্রিকার স্তম্ভে তিনি শ্রমিকদের অভিনন্দন জানালেন, তাদের সাবধান করেও দিলেন রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করবার মোহে তারা যেন না পড়ে।

তখন এনার্কিস্টরা সর্বত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে—তাদের মধ্যে আশাহত কয়েকজন গোপন ষড়যন্ত্র ও হত্যার পথে নেমেছে, আর কিছু যোগ দিয়েছে সিণ্ডিক্যালিস্টদের সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে শেষের দল ক্রপটকিনের আশীর্বাদ লাভ করল। সিণ্ডিক্যালিস্টদের শ্রমিক সংগঠন ও সাধারণ ধর্মঘটের কর্মপদ্ধতিকে তিনি সমর্থন জানালেন।[১৬] ১৯১১ সালে তিনি পাতাউদ ও পুজের "সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ এণ্ড কো-অপারেটিভ কমনওয়েল্‌থ্‌"-এর ভূমিকা লিখলেন। কিন্তু সিণ্ডিক্যালিস্ট সমাধানে তিনি নিঃসংশয় হতে পারেন নি। মজুরদের সিণ্ডিকেট মুক্ত সমাজের কাঠাম তৈরি করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার পাশাপাশি সমান অধিকারসম্পন্ন গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীও থাকতে হবে—এ বিশ্বাস তাঁর অটুট ছিল।

১৯০৭ সালে ক্রপটকিন "রাশ্যান রিভলিউশন এণ্ড এনার্কিজম" নামে একটি পুস্তিকা লিখলেন। দুটি দাবি তুললেন তিনি—চাষীর হাতে জমি চাই, জনে জনে আলাদা করে নয়, যৌথ সত্ত্বে। মজুরদের ইউনিয়ানের হাতে চাই কারখানা, খনি, রেলপথ ইত্যাদি। জুন মাসে রুশে দ্বিতীয় ডুমা ভেঙে যাওয়ার পর তিনি আবার "তাঁ নুভো" বা নতুন কাল পত্রিকার স্তম্ভে এই বাণী প্রচার করলেন। ১৯১৭ সালে নির্বাসন থেকে পালিয়ে এসে লেনিন এই মন্ত্র গ্রহণ করে এর সঙ্গে আর এক দফা দাবি জুড়ে দিলেন,—সকল ক্ষমতা দাও পঞ্চায়েতের হাতে। কথাটা ক্রপটকিনের খুব মনঃপূত হল। কিন্তু বিপ্লবের পরে যখন দেখলেন যে সোভিয়েতগুলি জনতার মুখপাত্র না হয়ে দলীয় যন্ত্রের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠল। সোভিয়েত রুশে তাঁর সমালোচনা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। ১৯১৯ সালে তিনি দিনেমার সাংবাদিক জর্জ ব্র্যাণ্ডেস-এর মারফত 'পশ্চিম ইয়োরোপের শ্রমিকদের প্রতি পত্র' নামে একটি বিবৃতি পাঠান। এতে রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েত সরকারের ভালমন্দ

[১৪] এসব দেশে রেলপথ তখনো রাষ্ট্রায়ত্ত হয়নি।
[১৫] লা ক'কেৎ দু পাঁ, ইংরাজি অনুবাদ, লণ্ডন, ১৯১৩। ১৮৮ পৃষ্ঠা।
[১৬] সিণ্ডিক্যালিজম সম্বন্ধে আলোচনা আগামী সংখ্যায় হবে।

দুই দিক তিনি বিচার করেছেন। সতের শতকে ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং উনিশ শতকে ফ্রান্সে গণতন্ত্র স্থাপনের জন্যে যে বিপ্লব ঘটেছিল রুশ বিপ্লব তারই উপসংহার। যে আর্থিক সমতা পূর্বের দুই বিপ্লব আনতে পারে নি রুশ বিপ্লব তা আনতে চেয়েছে। এর আর এক কীর্তি চাষী মজুরের পঞ্চায়েতের মারফত রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক জীবন পরিচালনা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই লোক সংস্থাগুলি কঠোর দলীয় শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অদূর ভবিষ্যতে পঞ্চায়েতগুলি নিজ নিজ সত্তা হারিয়ে কলের পুতুলে পরিণত হবে। তখন বিপ্লব ব্যর্থ হবে। সমাজ-বিপ্লব সাধন করতে যে বিপুল সাংগঠনিক উদ্যোগের প্রয়োজন তা জাগিয়ে তোলা কোন কেন্দ্রীয় সরকারেব পক্ষে সম্ভব নয়।

> স্থানে স্থানে কত প্রকারের বিচিত্র আথিক সমস্যা ঘনাইয়া উঠিতেছে, যাহার সমাধান করিতে হইলে যাহারা ঐ বিষয়ে ওয়াকিফহাল, যাহারা উহার সহিত জড়িত এমন অসংখ্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার দরকার। এই সহযোগিতাকে বাতিল করিয়া দলীয় একনায়কদের হাতে সর্বস্ব অর্পণ করিবার পরিণাম শ্রমিক ইউনিয়ান, আঞ্চলিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি সমাজের প্রাণকেন্দ্রগুলিকে দলের আমলাতান্ত্রিক বিভাগে পর্যবসিত করিয়া বিনাশ করা। আর আজ এখানে তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[১৭]

তা বলে বলশেভিক সরকারকে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা ধৃষ্টতার কাজ হবে। ফরাসী বিপ্লব দমন করবার জন্যে ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া যা করেছিল কোন দেশ যেন সেই হীন দৃষ্টান্ত নকল না করে। বিদেশী আক্রমণ একতান্ত্রিক শাসনকে আরও মজবুত করবে এবং আভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রচেষ্টাকে আঘাত করবে। প্রতি-বিপ্লবের চেষ্টাও নিরর্থক। এ উত্তাল বিপ্লব তরঙ্গকে রুখবার সাধ্য কারও নেই। একদিন এই উচ্ছ্বাস আপনি শান্ত হবে তখন পড়বে অবসাদের ভাটা—ঠিক যেমন সমুদ্রের বুকে ঢেউ নেমে আসবার পর একটা শূন্য গহ্বরের উদ্ভব হয়। তখন আসবে নূতন সংগঠনের সুযোগ। নৈরাজ্যবাদীকে ধৈর্য ধরে সেই দিনটির জন্যে বসে থাকতে হবে।

ক্রপটকিন অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ছক দিয়েছেন দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থে—একটি "ফীল্ড্স, ফ্যাক্টরীস এণ্ড ওয়ার্কশপ্স" অপরটি "লা কঁকেৎ দ্যু প্যাঁ"। প্রথমটির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতের মিল লক্ষণীয়। ইয়োরোপের দেশগুলির কৃষি ও শিল্প, আমদানি ও রপ্তানি ইত্যাদির ওপর অজস্র তথ্য সমাবেশ করে তিনি কয়েকটি সূত্রের অবতারণা করেছেন। প্রথমত কারখানার শিল্পকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে, দ্বিতীয়ত কৃষি ও শিল্পে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, তৃতীয়ত মাথার কাজ ও হাতের কাজে মিলন ঘটাতে হবে, চতুর্থত শিক্ষা ও হাতের কাজ একসঙ্গে চলবে।

আজকের যন্ত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য চুলচেরা শ্রমবিভাগ ও অণু পরিমাণ কর্মে অতিদক্ষতা। একজন হয়ত সারাজীবন ধরে শুধু আলপিনের মাথা গোল করছে কিংবা কলমের নিব শান দিচ্ছে। এতে মজুর তার সৃষ্টি প্রেরণা হারিয়ে যন্ত্রের সামিল হয়ে দাঁড়ায়, উৎপাদন প্রণালী একটা ছাঁচের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞতার গুণে এক এক দেশ এক এক শিল্পে

---

[১৭] বলডুইনের সঞ্চয়ন, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

একচেটিয়া অধিকার নিয়ে বসে। কোন দেশ হয় শিল্পপ্রধান, কোন দেশ কৃষিনির্ভর—প্রথমরা শোষণ করে দ্বিতীয়দের। ইদানীং শিল্পোন্নত দেশগুলির একাধিকার বিপন্ন হয়ে উঠেছে। কৃষিনির্ভর দেশগুলি, যারা এতকাল ফসল ও কাঁচামাল বিদেশে পাঠাত এখন তারা নিজেদের কলকারখানা গড়ে শিল্পপণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা করছে। যেমন জাপান। ইয়োরোপ থেকে মাল আমদানি করা দূরে থাকুক, সে নিজেই তার শিল্পপণ্য নিয়ে ইয়োরোপের বাজার আক্রমণ করেছে।

নতুন বাজার আবিষ্কার করে এই সমস্যার সুরাহা হবে না। দেশের বাজার বাড়াতে হবে, যারা পয়দা করে পণ্য তাদের ভোগে লাগাতে হবে। বিদেশে শিল্পপণ্য পাঠিয়ে তার বদলে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠছে দেখে আজকাল শিল্পপ্রধান দেশগুলি নিজেরা শস্য ফলাতে বাধ্য হচ্ছে। শস্য ফলাবে দেশের চাষী আর পণ্য কিনবে দেশের ক্রেতা ক্রমশ এই ব্যবস্থা তাদের মেনে নিতে হবে। এ কিছু অবাস্তব কথা নয়। বহুল সংখ্যাতথ্য হাজির করে ক্রপটকিন দেখিয়েছেন পতিত জমি উদ্ধার, কৃষি সংস্কার, বৈজ্ঞানিক আবাদ প্রণালী ও উৎপাদন সংগঠন এই সকল উপায় অবলম্বন করলে ইংল্যাণ্ডের মত দেশও খাদ্যে স্বাবলম্বী হতে পারে, কিছুদিন আগেও যার দুই তৃতীয়াংশ লোকের অন্ন আসত বিদেশ থেকে। মাটি অন্নদা। যে কোন আবহাওয়ায় যে কোন জমিতে আমরা যা চাই তা ফলাতে পারি কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে কৃষির সঙ্গে শিল্পের সংযোগ ঘটানোর অপেক্ষা।

চাষবাড়ির আশপাশে উঠবে ছোট ছোট কারখানা। বড় বড় কারখানার যন্ত্রপাতি সহজে বদলান যায় না, ক্রেতার পছন্দ মাফিক মালের চেহারা বদলান তাদের পক্ষে সহজ নয়। এতে কারিগরের সৃজনশক্তি প্রকাশের সুযোগ পায় না, তারা রক্তমাংসের যন্ত্রে পরিণত হয়। ছোট কারখানায় যন্ত্রপাতি পালটাবার অসুবিধা নেই. সেখানে কারিগরের ওস্তাদি দেখাবার অবকাশ আছে, সে ক্রেতার সাধ মেটাবার চেষ্টা করতে পারে। বড় কারখানার প্রতিযোগিতায় ছোট কারখানা উৎসন্ন হবে মার্ক্‌স্‌-এর এই 'অর্থনৈতিক সূত্র' ভিত্তিহীন। তা যদি হোত তাহলে সুইৎজারল্যাণ্ডের কুটিরশিল্প বড় বড় কারখানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকত না। শস্তা বিদ্যুৎশক্তি, সহযোগিতা ও উৎপাদনের কৌশল-এর জোরে আজকের যন্ত্রশিল্পের বাজারেও কুটিরশিল্প জায়গা করে নিতে পারে।

কারখানাকে যেতে হবে মাঠে, নির্ভর করতে হবে কারিগরের সহযোগিতা ও উৎপাদনী শক্তির ওপর, পণ্য দিয়ে মেটাতে হবে চাষীর চাহিদা। অবশ্য সব শিল্পকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া যায় না—যেমন লোহা শিল্প। কিন্তু বেশীর ভাগ কারখানা শহরে ভিড় করেছে প্রাকৃতিক কারণে নয়, মুনাফাখোরদের প্রয়োজনে। শিল্পোদ্যোগ যে ধনিকদের হাতে কেন্দ্রায়িত হয়ে চলেছে তার কারণ উৎপাদনের খরচ কমানো নয়, বাজারের ওপর একছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করা।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ ও উৎপাদনের কেন্দ্রায়নে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নেই, আছে উৎপাদনের বিকেন্দ্রণ ও কর্মক্ষেত্রের সামঞ্জস্যে।

> এমন সমাজ আনিতে হইবে যেখানে প্রত্যেকে হাতের কাজ ও মাথার কাজ দুই-ই করে; যেখানে প্রত্যেক সুস্থ সমর্থ ব্যক্তি শ্রমিক; যেখানে শ্রমিক ক্ষেতেও খাটে কারখানায়ও খাটে এবং যেখানে শ্রমিকসংঘ নিজের উৎপন্ন শস্য ও পণ্যের অধিকাংশ নিজেরাই ভোগ করে।[১৮]

[১৮] ফীল্‌ড্‌স্‌ ফ্যাক্‌টরীস এণ্ড ওয়ার্কশপ্‌স্‌, লণ্ডন, ১৯১২, ২৩ পৃষ্ঠা। অথচ যন্ত্রশিল্পে ক্রপটকিনের বিরাগ ছিল না। তিনি স্মৃতিকথায় লিখছেন—"সুদৃঢ় সুগঠিত যন্ত্র আমার বেশ লাগিত…

এ ব্যবস্থা সেখানেই সম্ভব যেখানে প্রত্যেকটি নরনারী একাধিক প্রকার হাতের কাজ ও মাথার কাজ জানে। সে শিল্প কোথায়? শিক্ষা ও শ্রমে অহিনকুল সম্পর্ক। এমন কি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গেও বাস্তব পরীক্ষার সম্পর্ক কম। ওয়াট, স্টিফেনসন, ফুলটন প্রভৃতি সেকালের মনীষীরা স্কুলে তেমন কিছু শিক্ষা পান নি—তাঁরা হাতে হাতে পরীক্ষা করে যুগান্তকারী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। একালের বৈজ্ঞানিক যাঁরা হাতের কাজ ছেড়েছেন তাঁদের চিন্তা বন্ধ্যা হয়ে আসছে।

> ঐতিহাসিক ও সমাজবেত্তা যদি মানুষকে দুটি একটি ব্যক্তির অথবা বে-ভাবের মারফত বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও কর্মশালার মাধ্যমে সমগ্রভাবে জানিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে সে জ্ঞান কত খাঁটি হয়! তরুণ চিকিৎসকের যদি রুগ্নের সেবায় হাতে খড়ি হয় এবং সেবিকারা যদি রোগ উপশমের শিক্ষা পায় তাহা হইলে চিকিৎসাবিজ্ঞান ঔষধের অপেক্ষা স্বাস্থ্য বিদ্যার প্রতি কত বেশী নির্ভর করিবে। কবি যদি মাঠে চাষীদের সঙ্গে লাঙ্গল ধরিয়া উদীয়মান সূর্যের সাক্ষাৎ পায়, যদি জাহাজে নাবিকদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ঝড়ের সহিত লড়াই করে, শ্রম ও বিশ্রাম, দুঃখ ও আনন্দ, যুদ্ধ ও জয় এ সকলের কাব্য যদি তাহার জানা থাকে তাহা হইলে প্রকৃতির কত মধুর রসই না তাহার আয়ত্ত হইবে, মানুষের অন্তরের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইবে কতই না নিবিড়।[১১]

"লা কঁকেৎ দ্যু প্যাঁ" বা "রুটির জয়" গ্রন্থে গ্রন্থকার আরও মৌলিক তত্ত্বে প্রবেশ করেছেন এবং নিরাজ সমাজের অর্থনৈতিক নক্সা এঁকেছেন। ধনবিজ্ঞানের কারবার আর্থিক প্রয়োজন নিয়ে যার তাগিদে চলে উৎপাদনের কাজ। সুতরাং উৎপাদনের সংগঠন হবে ভোগের প্রয়োজন মাফিক। প্রথমে খুঁজতে হবে সমাজে লোকের চাহিদা কি, তারপর আবিষ্কার করতে হবে ন্যূনতম শক্তিব্যয়ে চাহিদা মিটাবার উপায়। প্রাথমিক চাহিদা অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়। এই তিনটি মৌলিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে যদি প্রত্যেকে দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে সময় দেয় তাহলে বছরে একশ পঞ্চাশ দিনে সকলের মত অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থান হতে পারে। এর পর যথেষ্ট অবসর থাকবে শিল্প বিজ্ঞান চারুকলা আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি দ্বারা মনের খোরাক যোগাবার। এই স্বাভাবিক সুস্থ ব্যবস্থা চালু হয় না সংগঠনের দোষে। চাষী যদি বেশী শস্য ফলায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে জমির ভাড়া, সরকারের খাজনা, মহাজনের সুদ। যন্ত্র ও সারের দামও বাড়বে তারপর যদি বা কিছু চাষীর হাতে থাকে তাতে মোটা ভাগ বসাবে শস্যের ব্যবসায়ীরা। যেখানে উৎপাদন সংগঠনে এমন অব্যবস্থা সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথা ও যন্ত্রের সাহায্য পেলেও কৃষির উন্নতি হতে পারে না।

চলতি ধনবিজ্ঞানের ধারা উলটো। আগে প্রয়োজন তার পরে উৎপাদন নয়, অর্থশাস্ত্রীরা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থাকে মোক্ষম বলে ধরে নিয়েছেন তারপর এ থেকে কেমন

যন্ত্রের কাব্য আমি বুঝিতাম। আজকালকার কারখানায় যন্ত্রের কাজে শ্রমিক ক্ষয় হইয়া যায়, ইহার কারণ সারাজীবন ধরিয়া সে একটি যন্ত্রের দাসত্ব ছাড়া আর কিছু করে না। ইহা হয় অব্যবস্থার জন্য, ইহার সঙ্গে যন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। হয়রানি ও একঘেঁয়ে কাজ সকল ক্ষেত্রেই খারাপ—তা যন্ত্রের কাজই হউক আর মামুলি হাতিয়ারে হাতের কাজই হউক। একথা ছাড়িয়া দিলে আমি বেশ বুঝিতে পারি যন্ত্রের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যন্ত্রের বুদ্ধিসঙ্গত ও নিখুঁত কাজ দেখিয়া মানুষ কত না আনন্দ পাইতে পারে। আমার মনে হয় উইলিয়ম মরিস যে যন্ত্রকে ঘৃণা করিতেন তাহার কারণ তাঁহার কাব্য প্রতিভায় যন্ত্রের শক্তি ও শ্রী ধরা পড়ে নাই (খণ্ড ২, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

[১১] ফীল্ড্স, ৪০৬-০৭ পৃষ্ঠা।

করে চাহিদা মেটান যায় তার অঙ্ক কষেছেন। এই ধনবিজ্ঞান হল 'প্রভুভৃত্য সম্পর্কের দৌলতে মানবশক্তির অপচয়ের বিজ্ঞান।' 'বেতন নিয়ে কাজ করা অন্নদাসত্ব—এর পক্ষে যথাসাধ্য উৎপাদন সম্ভব নয় উচিতও নয়।' অর্থশাস্ত্রীদের মতে বর্তমান দুঃখ দুর্দশার কারণ প্রয়োজনীয় রসদের অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। ঘটনা ঠিক তার বিপরীত। বিজ্ঞানের বলে উৎপাদন শক্তি জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুততর বেগে বেড়ে চলেছে। দোষ সংগঠনে, সমাজ-ব্যবস্থায়। পুঁজিপতিদের লক্ষ্য কেমন করে অল্প মজুর দিয়ে অধিক পণ্য উৎপাদন করবে এবং দরকার হলে দাম চড়াবার জন্যে উৎপাদন কমাবে। যথেষ্ট মুনাফা হয় না বলে মালিকরা হাজার হাজার খনিমজুরকে বেকার বসিয়ে রাখবে অথচ গরীবদের ঘরে কয়লা জুটছে না, হাজার হাজার তাঁতি ছাঁটাই হয়ে যায় এদিকে গরীবদের কাপড় জোটে না, হাজার হাজার চাষী জমি আবাদ করে গরীবদের মুখে অন্ন দিতে পারে না। অথচ ধনীর বিলাসপণ্য যোগাতে যে কত মজুর খাটছে তার লেখাজোখা নেই।

> একজন বড়লোক যখন তাহার ঘোড়াশালের জন্য এক হাজার পাউণ্ড খরচ করে তখন সে একজনের পাঁচ ছয় হাজার দিনের কাজ নষ্ট করে। এখন যাহারা বিবরে মাথা গুঁজিয়া আছে এই পরিশ্রমে তাহাদের জন্য আরামপ্রদ ঘর উঠিতে পারিত। যখন কোন মহিলা তাহার পোশাকের জন্য একশ পাউণ্ড খরচ করে তখন স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে সে অন্তত দু বছরের ব্যক্তিশ্রম অপব্যয় করিতেছে যাহার সদ্ব্যয় হইলে একশ মেয়েছেলেকে ভদ্র পোশাক পরান যাইত এবং উৎপাদন যন্ত্রের উন্নয়নে প্রয়োগ করিলে আরও বেশী ফল পাওয়া যাইত।[২০]

সুতরাং অতিপ্রজননের ফলে ধনাভাব দেখা দেয় ম্যালথাস ও হার্বার্ট স্পেন্সারের এ সূত্র অসিদ্ধ। এই দলের অর্থশাস্ত্রীরাই আবার বলেন কখন কখন নাকি বাড়তি উৎপাদন হয়, মাল বিকোয় না—তাতেও অভাব দেখা দেয়। অভাব অতি-উৎপাদন জনিত নয়, নিজেদের তৈরী জিনিস উৎপাদকদের কিনবার সাধ্য নেই বলে।

আমাদের যা কিছু ধন ও উৎপাদনের উপকরণ তা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। তার পিছনে আছে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ, এতে কার কতখানি দান তার হিসেব সম্ভব নয়।

> বিজ্ঞান ও শিল্প, জ্ঞান ও প্রয়োগ, আবিষ্কার ও কার্যকরণ যাহাতে নূতন আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হইতেছে, বুদ্ধির কসরত ও হাতের কৌশল, মনের ও বাহুর মেহনত,—সব একযোগে কাজ করিতেছে। প্রত্যেকটি আবিষ্কার, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, তিল তিল সঞ্চিত বিত্ত, তার পিছনে আছে অতীত ও বর্তমান কালের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম।[২১]

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা জন্মলাভ করে শিল্পপ্রগতি থেকে। হাজার হাজার অখ্যাত আবিষ্কার থেকে উদ্ভাবন হয় নতুন যন্ত্রের। সাহিত্যিকের জন্য ভাষা ও ভাব প্রস্তুত হয়ে আছে, সাহিত্যের আদি থেকে তার ভাণ্ডার জমে উঠছে, পূর্বসূরীদের রচনায় পাঠকের মন রসায়িত হয়েছে, সে জন্যেই আজকের সাহিত্যিকের জয়জয়কার। কাল কালান্ত ধরে চলেছে সৃষ্টির মহাযজ্ঞ, দুনিয়ার মেহনতী জনতা—চাষী মজুর, শিল্পী সাহিত্যিক, দার্শনিক

[২০] এনার্কিস্ট কমিউনিজম, ১২ পৃষ্ঠা।
[২১] লা কংকেৎ, ৯ পৃষ্ঠা।

বৈজ্ঞানিক—সকলের সমিধ গ্রহণ করে সেই যজ্ঞাগ্নি যে প্রসাদ বিতরণ করছে তাতে কার কতখানি ভাগ, কার কত পাওনা গণ্ডা সে হিসেব করবে কে? হিসেব হোক চাই না হোক, এই যজ্ঞের পায়স আগলে বসেছে জনকয়েক লোভাতুর লোক, যারা এই যজ্ঞকুণ্ডে কিছুই সমর্পণ করেনি। ল্যাংকাশায়ারের লেস বোনার যন্ত্র তিন পুরুষের তাঁতিদের ঘামে তৈলাক্ত হয়েছে, তাদের আজ সেই কাপড়ের কলে কাজও জোটে না। মানুষ ও মাল চলাচল না করলে যে রেলপথ লোহালক্কড়ের ঢিপি হয়ে পড়ে থাকত তার ওপর মৌরুসী পাট্টা জমিয়েছে জনকয়েক অংশীদার যারা রেলপথের ঠিকানাও জানে না।

সুতরাং সুস্থ ও সমদর্শী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিসম্পত্তির জায়গা নেই। সেখানে সব সকলের সম্পত্তি। উৎপাদনকারীরা সমিতি গড়বে, সমিতি হবে কাঁচামাল ও উপকরণের মালিক। সমিতিরা পরস্পর চুক্তি করবে, সম্বন্ধ পাতাবে আদান-প্রদানের জন্যে। প্রত্যেকে কাজ করবে এবং যখন যা দরকার যৌথ ভাণ্ডার থেকে পাবে। টাকা পয়সার রেওয়াজ, মজুর খাটানো মূলধন জমানো—সব উঠে যাবে।

কেহ কেহ টাকার নোটের বদলে যার যার পরিশ্রম অনুসারে হুণ্ডি দেবার প্রস্তাব করেছেন।[২২] তাতে শ্রমিকের দাসত্ব ঘোচে না। মুদ্রা কিংবা হুণ্ডি কোনটা দিয়েই পরিশ্রমের দাম মাপা যায় না। সম্পত্তি প্রথার সঙ্গে সঙ্গে আজকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্কও তুলে দিতে হবে। সবাইকে দিতে হবে প্রয়োজন মত, পরিশ্রম মত নয়। বৃদ্ধ যুবকের চেয়ে পরিশ্রম করে কম কিন্তু তার প্রয়োজন বেশী। শিশুবতী মায়ের প্রয়োজন অন্য নারীর চেয়ে বেশী এবং খাটবার শক্তি কম। এদের পাওনা পরিশ্রম দিয়ে মাপা হয় না।

আজকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজেও চারদিকে সবাইকে দরকার মত ভোগ করতে দেবার চলন বাড়ছে। রাস্তা ও সেতুর ওপর হাঁটবার জন্যে কাউকে দাম দিতে হয় না। জাদুঘর, গ্রন্থাগার, ছোটদের ইস্কুল, রাস্তার আলো, কলের জল, বেড়াবার বাগান সব বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়। যখন উৎপাদনের যন্ত্র সাধারণের হাতে আসবে, কেহ অপরের অন্নদাস থাকবে না, তখন উৎপাদন যে অনেক বাড়বে এবং সকলের চাহিদা মেটাতে পারবে তাতে আর সন্দেহ কি?

অবশ্য অনেকের সন্দেহ আছে এ ব্যবস্থায় কেউ কাজ করবে না—বিনা কাজে যখন সব পাওয়া যায় তখন কে বা খেটে মরবে? আশঙ্কাটা ঠিক নয়। মানুষ স্বভাবত অলস নয়। বেকার বসে থাকতে কারও ভাল লাগে না। অসম ধন-ব্যবস্থার জন্যে শ্রমিক কর্মবিমুখ হয়। অধিকন্তু যন্ত্র তাকে যন্ত্র বানিয়ে কাজের আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অভাব অনটন, মালিকের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ, সব মিলে তাকে অলস করেছে। মজুর স্বাধীন হলে এবং মনের মত কাজ পেলে সাধ করে খাটবে—তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কৌশল যুক্ত হলে কোন অভাব থাকবে না।

কতক কতক কাজ আছে যা নোংরা কিংবা অপ্রীতিকর—যা জোর করে কিংবা টাকার লোভ দেখিয়ে করান হয়, স্বেচ্ছায় কেউ করতে চায় না। টলস্টয় উদাহরণ দিয়েছেন যেমন ময়লা পরিষ্কারের কাজ, জাহাজের বয়লারে কয়লা ঢালার কাজ ইত্যাদি। ক্রপটকিন বলছেন মুক্ত সমাজে নোংরা ও হয়রানির কাজ থাকবে না। তখন কাজকে পরিচ্ছন্ন ও অনায়াসসাধ্য করবার জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হবে।

[২২] যেমন প্রুদঁ।

কারখানা ছাপর ও খনিকে আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা সুন্দর পরীক্ষাগারের মত স্বাস্থ্যকর ও জমকালো করিয়া তোলা খুবই সম্ভব।[২৩]

হাতের কাজের ওপর মাথার কাজের কৌলীন্য দূর হবে। কালো হাত আর শাদা হাতের তফাত করলেই শাদা কালোর ওপর শোষণ চালাবে। পাঠশালার শিক্ষা হবে প্রকৃতির পরিবেশে হাতের কাজের মারফত। তাতে হাতের কাজ সম্মান পাবে এবং শিক্ষায় আসবে আনন্দ। লেখকরা ছাপাখানার কাজ জানবে, নিজেদের বই নিজেরা ছাপবে।[২৪] প্রত্যেককে একটা না একটা কাজ বেছে নিতে হবে এবং সেই বৃত্তি নিয়ে গড়া সমিতিতে ঢুকতে হবে। পরস্পর চুক্তি হবে, যে কোন সমিতি ও চুক্তিতে আসতে চাইবে না তার পক্ষে টেকাই হবে দায়।

> আমরা তোমাকে আমাদের ঘরবাড়ি, পণ্যভাণ্ডার, রাস্তাঘাট, যানবাহন, স্কুল, মিউজিয়াম ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দিতে রাজী আছি এই সর্তে যে বিশ বছর বয়স হইতে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত তুমি জীবনের আবশ্যক কোন কাজে দিনে চার পাঁচ ঘণ্টা করিয়া সময় দিবে। কোন উৎপাদন সমিতিতে তুমি যোগ দিবে তাহা নিজেই বাছিয়া লও অথবা নিজেই একটি সমিতি গড়িয়া তোল। শুধু দেখিতে হইবে সমিতি কোন প্রয়োজনীয় কাজ করে। উদ্বৃত্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তুমি যাহার সঙ্গে খুশি মিশিতে পার মিলিয়া যেমন তোমার রুচি আমোদ স্ফূর্তি কর, শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চা কর।
>
> কিন্তু যদি আমাদের ফেডারেশনের হাজার হাজার সমিতির মধ্যে একটিও তোমাকে লইতে না চায়, যদি তুমি কোন প্রকার দরকারী জিনিস উৎপাদন করিতে একেবারেই অক্ষম কিংবা অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে একাকী কিংবা পঙ্গুর মত বসিয়া থাক...তোমাকে আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি প্রেতাত্মা বলিয়া ধরিয়া লইব...।[২৫]

কোন কোন সমাজবাদী যৌথকরণের ব্যাপারে উৎপাদনের উপকরণ ও ভোগের বস্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করে, এবং ভোগের বস্তুকে ব্যক্তির হাতে রাখতে চায়। কলকারখানা জমি কাঁচামাল ইত্যাদি হবে সকলের, ভাত কাপড় ঘর থাকবে যার যার। এই সূক্ষ্ম তারতম্যের কোন মানে নেই। গৃহ বিশ্রামের জায়গা যাতে মজুরের দেহযন্ত্র মেরামত হয়। ইঞ্জিন চলতে যে কয়লা পোড়ে তা যেমন উৎপাদনের মসলা মজুরের খাদ্যও তেমন উৎপাদনের মসলা। কামারের পোশাক হাতুড়ি ও নেহাইর মতই উৎপাদনের অপরিহার্য অঙ্গ।

সুতরাং ভোগ্য বস্তুও সার্বজনীন মালিকানায় আসবে। দেশের শস্য এজমালি গোলায় মজুত হবে, বড় বড় প্রাসাদগুলি বাজেয়াপ্ত করে সেখানে বস্তিবাসীদের থাকতে দেওয়া হবে। কাপড়ের আড়ত থেকে সকলে কাপড় পাবে এবং খুশি মত দর্জিকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নেবে। সবাই খাটবে সবাই পাবে কিন্তু কেউ কিছু আগলে বসে থাকতে পারবে না।

নতুন সমাজে সকলে সমান হবে, কাউকে কোন মালিকের কাছে শ্রম অথবা বুদ্ধি বিকিয়ে খেতে হবে না। সকলে যার যার সমিতির মারফত উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করবে। সমিতিতে কোন জোর জুলুম নেই, সভ্যদের কাজ গুছিয়ে মিলিয়ে

---

[২৩] লা কঁকেৎ, ১৫৮ পৃষ্ঠা।
[২৪] যেমন অনেক লেখক পাণ্ডুলিপি নিজে টাইপ করেন।
[২৫] লা কঁকেৎ, ২০৬-০৭ পৃষ্ঠা।

নিয়ন্ত্রণ করা তার উদ্দেশ্য যাতে কাজের ফল পুরোমাত্রায় পাওয়া যায়। ব্যক্তির কর্তৃত্ব কোথাও নেই বটে কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির উদ্যম ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সর্বত্র। উৎপাদন ও ভোগের জন্যে সমস্বার্থে সমিতিগুলি পরস্পর সংযুক্ত হবে, সকল বৃত্তি, সকল স্বার্থ, সকল অঞ্চলকে নিয়ে যুক্তকরণের বুনোনি দেশ ছেয়ে ফেলবে, অবশেষে দেশের ও জাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে। কোন সম্বন্ধ ও চুক্তি অকাট্য বলে ধরা হবে না। সমাজ যন্ত্র নয়, একটা সজীব দেহ, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ যেমন চিরপরিবর্তনশীল সমিতির কার্যকলাপ ও তাদের চুক্তিও তেমন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন সাপেক্ষ। সরকারের জায়গা নেবে স্বাধীন চুক্তি ও যুক্তকরণ। কোন বিবাদ বিসংবাদ উঠলে সালিশি দ্বারা তার নিষ্পত্তি হবে। কাকেও জোর করে খাটান হবে না। সম্পত্তি প্রথা ও শোষণ সম্পর্ক উঠে যাবার ফলে সকলের স্বাভাবিক কর্মস্পৃহা জেগে উঠবে। আলস্য দূর হবে, অভাবও রইবে না।

ক্রপটকিন নৈরাজ্যবাদের অর্থনৈতিক রূপায়ণে সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য এনেছেন। তাঁর হাতে শুধু যে প্রুদঁ ও বাকুনিনের যুক্তকরণের নীতি বিস্তারিত হয়েছে তা নয়, এ নীতির সঙ্গে গোটা সমাজদর্শনের ঐক্যসাধন হয়েছে। গডউইন ছিলেন ব্যক্তিপ্রবণ, কোন প্রকার সহযোগিতার কল্পনাকে তিনি আমল দেননি। প্রুদঁ ব্যক্তিপ্রবণ হলেও পারস্পরিক চুক্তি ও যুক্তকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। বাকুনিন ছিলেন যৌথবাদী, ফেডারেশনের পিরামিডে তিনি পেয়েছেন একতা ও স্বাধীনতার সমন্বয়। ক্রপটকিন এই নক্সার ফাঁক পূরণ করলেন প্রয়োজন অনুসারে অবাধ বিতরণের বিধি এনে এবং শ্রমকে শ্রমিকের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে। এই হল এনার্কিস্ট কমিউনিজম্ বা নিরাজ সাম্যবাদের ছবি যাকে কল্পনা থেকে নামিয়ে এনে বৈজ্ঞানিক আকার দিয়েছেন ক্রপটকিন।

কেমন করে আসবে এই পরিবর্তন? এত বড় একটা ওলটপালট বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়। সমাজে যখন ধীর ক্রমবিকাশের গতি বাধা পায় তখন বাধা সরিয়ে আবার তাকে সচল করবার জন্যে বিপ্লব আবশ্যক হয়ে পড়ে। ইতিহাসের ধারা মোড় ফেরে, গতানুগতিক জীবনে ছন্দপতন হয়, নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়। বিপ্লবের ঢল শান্তভাবে নামে না। তাতে পার ভাঙে, তীর ডোবে। সুতরাং কেমন করে বিপ্লব এড়ান যায় সে প্রশ্ন আসে না, প্রশ্ন আসে কেমন করে ন্যূনতম গৃহযুদ্ধ প্রাণহানি ও রেষারেষি ঘটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। তার জন্যে সকলের আগে চাই দলিত জনগণের মনে উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ আগ্রহ।

এটা হলে দেখা যাবে সুবিধাভোগী শ্রেণীরও অনেকে এদিকে ঝুঁকছে। এদের টানবার খুব প্রয়োজন আছে। যাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে বিপ্লব বিপ্লবের আদর্শ তাদের মধ্যে সংক্রামিত হলে তবে ফল প্রসব করে। মালিকদের বিবেক ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে না উঠলে রুশে ১৮৬১ সালে এ প্রথা রদ হত না। আজ তেমনি বুর্জোয়াদের মনে শ্রমিকদের মুক্তির প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তাদের ভেতর থেকে অনেকে সমাজবিপ্লবের পথে এগিয়ে আসছে।

বিপ্লবের মহড়া হবে পথে ঘাটে পল্লীতে বস্তিতে, সর্বত্র। যেখানে আছে কর্মশালা—মাঠে বা কারখানায় যেখানে দলবেঁধে মানুষ খাটতে নেমেছে সেখানে তাদের মধ্যে জাগিয়ে

তুলতে হবে সংঘ চেতনা, যৌথ অভ্যাস, নূতন সমাজের কল্পনা ও তা গড়বার আকাঙ্ক্ষা। এই মেহনতী জনতা হবে বিপ্লবের কারিগর। বুর্জোয়া বিপ্লবীদের যত রোখ সরকারের ওপর, বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করে নিজেরা গদিতে বসলেই তাদের বিপ্লব সার্থক হল। তাদের বড় আশা যে শোষণ ও দাসত্বের অবসান করবে তাদের 'বিপ্লবী সরকার'। এ আশা বাতুলতা। সরকার মানে আইনানুগত্য, বন্ধ নিয়ন্ত্রিত জীবন, রক্ষণশীলতা আর বিপ্লব মানে স্বাধীন উদ্যোগ, মুক্ত জীবন, ভাঙন ও সৃষ্টি। বিপ্লবী সরকার হল সোনার পাথরবাটি।

'বিপ্লবী সরকার' গণতান্ত্রিক হতে পারে, একতান্ত্রিকও হতে পারে। বিপ্লবের মুখে যখন জনসাধারণের উৎসাহ চরমে উঠেছে, যখন তারা পুরান বিধানের ইমারত ভেঙে গুঁড়ো করছে তখন সেই জোয়ারে বাঁধ দিয়ে নেতারা ভোটপত্র নিয়ে হাজির হয় এবং অনুরোধ করে সমস্ত উদ্যোগ নির্বাচিত সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে। ১৮৭১ সালের বিপ্লবে পারিতে ঠিক এই ঘটেছিল। সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হয়ে বড় বড় বিপ্লবীরা কমিউন গঠন করল। জনতার হাত থেকে তাদের হাতে গেল বিপ্লবের দায়িত্ব। শুরু হল পৌরসভার তর্কবিতর্ক, দপ্তরে লাল ফিতার কাজ, নরমপন্থীদের সঙ্গে আপস রক্ষা। শেষ অবধি নগররক্ষার কাজেও তারা এঁটে উঠতে পারল না।

বুর্জোয়া পার্লামেন্টের যত কিছু গলদ সব নির্বাচিত 'বিপ্লবী সরকারে' এসে দেখা দেয়। বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক এতে তারা বাধাই দেয়। অবশেষে জনতা উত্যক্ত হয়ে রুখে দাঁড়ায় কিন্তু তখন গদির মোহ শাসকদের পেয়ে বসেছে। তারা জন-আন্দোলন দমন করতে অগ্রসর হয়। অসন্তোষ বাড়ে, আর এক দফা বিপ্লবের ঝাপটায় 'বিপ্লবী সরকার' নিপাত হয়।

এই অভিজ্ঞতার পর কোন কোন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারের বদলে একতান্ত্রিক সরকারের জন্যে তদ্বির করছেন। যে দল সরকারের পতন ঘটাবে তারাই রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবে। তারা জোর করে সমালোচনার কণ্ঠরোধ করবে, বিরুদ্ধাচারীদের ফাঁসি দেবে। এই শাসকদের ফাঁসিকাঠে ঝুলবার যোগ্যতা অর্জন করতে বেশী দেরী হয় না। কারণ একনায়কত্ব চিরকাল বিপ্লববিরোধী। নায়কপূজা রাষ্ট্রপূজারই নামান্তর।

দল বিপ্লব করে না, বিপ্লব ঘটায় জনতা। তাদের অভ্যুত্থানে যখন জয়লাভ আসন্ন হয় তখন নানাপ্রকারের স্বার্থসন্ধীরা এসে ভিড় করে। তারা দলের সামিল হয় এবং তার সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা দখল করে।

> বিপ্লবের সাংগঠনিক দায়িত্ব এত বিরাট যে কোন সরকার তা নিয়ে সামলাতে পারে না। সমাজ বিপ্লব হইতে যে অর্থনৈতিক বিবর্তন আসিবে তাহা এত ব্যাপক ও এত গভীর, আজকার সম্পত্তি ও বিনিময় প্রথায় আশ্রিত লোকসম্বন্ধগুলিকে এমন করিয়া ঢালিতে সাজিতে হইবে যে একজন বা অনেকজন ব্যক্তির পক্ষে তাহার বিভিন্ন দিককার কাজ সামলানো সম্ভব নয়। ইহা সম্ভব শুধুমাত্র সংঘবদ্ধ সার্বজনীন প্রচেষ্টায়। ব্যক্তিসম্পত্তির অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে যে বহুমুখী দাবি-দাওয়া ও বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহার সমাধানের জন্য সমস্ত জনসাধারণের সক্রিয় তৎপরতার প্রয়োজন। বাইরের কর্তৃত্ব শুধু বাধা সৃষ্টি করিবে এবং বিবাদ ও বিদ্বেষের পাত্র হইবে।[২৬]

[২৬] রিভলিউশনারী গভর্ণমেণ্ট, ফ্রীডম প্রেস, লণ্ডন, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৪৫, ১১-১২ পৃষ্ঠা।

জনসাধারণ ভুল করে তখন যখন তারা জনকয়েক সবজান্তাকে ভোট দিয়ে তাদের হাতে নিজেদের দায়িত্ব তুলে দেয়। যখন তারা নিজেদের জানা কাজ নিজেদের ভালমন্দ নিজ হাতে নিয়ে বসে তখন ঐ তর্কবাগীশদের চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে সে কাজ সম্পন্ন হয়। এর দৃষ্টান্ত লণ্ডনের ডক স্ট্রাইক। যে কোন গ্রাম্য কমিউনে এর নজির মিলবে। অবশ্য গোড়ার দিকে কিছু কিছু বিশৃংখলা ও অনাচার দেখা দিতে পারে। তার প্রতিকার স্বাধীনতা, দাসত্ব নয়। অবাধ স্বাধীনতা যে সাময়িক বিকার আনবে স্বাধীনতাই হবে তার প্রতিষেধক। স্বাধীন সমালোচনার চাপে ক্রমে ক্রমে বাড়াবাড়িগুলো সংযত হবে, ভুলত্রুটিগুলো সংশোধিত হবে।

বিপ্লবের সময়ে সবচেয়ে বড় হয়ে আসে রুটির প্রশ্ন। প্রতিবিপ্লবী শক্তির মোক্ষম অস্ত্র অন্নাভাব। এর চাপে ফ্রান্সের তিন তিনটি বিপ্লব পণ্ড হয়ে গেছে।[২৭] সুতরাং প্রথম থেকেই এমন একটা কৃষিনীতি নিতে হবে যাতে দীর্ঘকাল ধরে অবরোধকারী শত্রুপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায়। বিপ্লবের সূচনায় ঘোষণা করতে হবে যে প্রত্যেকের রুটির সুরাহা হবে সর্বপ্রথম। সংবিধান গঠনে সময় নষ্ট না করে সমস্ত শস্য গোলাজাত করতে হবে এবং সবাইকে রেশন মাফিক বিলি করা হবে। যথাসম্ভব নতুন জমি আবাদে আনতে হবে। চাষীদের কাছ থেকে তাদের দরকারী শিল্পপণ্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য নিতে হবে।

রুশ বিপ্লবে দেখা গেল রুটির সমস্যার সমাধান এত সহজে হয় না। ১৯১৯ সালে "পারোল দ্যʼ রেভোল্তে"র রুশ সংস্করণে ক্রপটকিন একটু পুনশ্চ দিয়ে লিখলেন যে প্রতিবেশী দেশগুলোর শত্রুতার ফলে বিপ্লবের সামনে নিদারুণ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। যে এক-তৃতীয়াংশ লোকের এখন অন্ন জোটে না তাদের মুখে অন্ন দিতে হবে। আমদানি নেই, উৎপাদন কমেছে আর ভোগের দাবি বাড়ছে। এ অবস্থায় দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। এর প্রকোপ কিছুটা শান্ত হতে পারে যদি জনতা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে নিজ হাতে উৎপাদনের দায়িত্ব নেয়।

বিপ্লবকে প্রথম দিন থেকে দেখাতে হবে যে সে নিপীড়িত জনতার জন্যে ন্যায়ের বিধান নিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে প্রতিকার করবার প্রতিশ্রুতি নয়, আজ এই মুহূর্তে প্রতিকার আনতে হবে।

> সকল কাজের বন্দোবস্ত এমনভাবে করিতে হইবে যে বিপ্লবের প্রথম দিন হইতে শ্রমিক বুঝিতে পারিবে যে তাহার সম্মুখে এক নূতন যুগ আসিতেছে, এখন হইতে কাহাকেও রাজপ্রাসাদ নিকটে থাকিতে পুলের নীচে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইবে না, কাহাকেও প্রাচুর্যের মধ্যে বসিয়া উপবাস করিতে হইবে না, পশমের দোকানের পাশে পড়িয়া কাহাকেও শীতে মরিতে হইবে না, সকল বস্তু সকলের জন্য—কেবল কথায় নয় কাজেও; বুঝিতে পারিবে যে ইতিহাসে এই প্রথম একটি বিপ্লব ঘটিয়াছে যাহাতে লোককে তাহাদের কর্তব্য শিখাইবার আগে তাহাদের কি প্রয়োজন তাহার বিবেচনা হইতেছে।[২৮]

এ কাজটা হয়না বলেই বিপ্লব বারবার পরাস্ত হয়। নেতারা সমর কৌশল ও সংবিধান নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে আসল কাজ ভুলে যান। ১৮৬৩ সালের পোল অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিল সামন্তরা। রুশ প্রভু ভূমিদাসদের মুক্তি দিল (১৮৬১) কিন্তু সামন্ত প্রভুরা তাদের মুক্তি দিতে রাজী হল না। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ফতোয়ার চেয়ে উদার মুক্তিসর্ত দিলে সামন্তরা দাসদের বিপ্লবের পক্ষে পেত। তা তারা করল না। জারের দয়ায় জমি পেয়ে

[২৭] ১৭৮৯, ১৮৩০ ও ১৮৪৮।
[২৮] লা ক'কেৎ, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা।

পোল চাষীরা প্রভুদের বিদ্রোহ গুঁড়িয়ে ঠাণ্ডা করে দিল।

১৭৯৩ সালে ফরাসী বিপ্লবের নায়করা এক প্রবল চাষীবিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল। জেকোবিনরা কৃষি উন্নয়নে মন দেয়নি, চাষীর স্বার্থ দেখেনি। পারির অন্নাভাব মেটাবার জন্যে যখন বিপ্লবীরা চাষীর শস্যে হাত দিতে গেল তখন চাষীরা রুখে দাঁড়াল। শস্যের বদলে জেকোবিনরা দিতে চেয়েছিল কাগজের নোট যা বাজারে পড়ন্ত। যদি শস্যের বিনিময়ে তারা চাষীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করে সরবরাহ করতে পারত তা হলে এ সংকট দেখা দিত না।

১৮৭১ সালের পারি কমিউনও এই রকম অদূরদর্শিতার জন্যে ব্যর্থ হয়েছিল। পৌরসভা গঠিত হল শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবীদের নিয়ে। কিন্তু সভায় বসবার পর থেকে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ রইল না। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে তারা বসল মালিকদের সঙ্গে আপসের আলোচনায়। দু মাস অবরোধের পর যখন কমিউন আত্মসমর্পণ করল তখন বুর্জোয়ারা শ্রমিক প্রতিনিধিদের নরম নীতির জবাবে কঠোর প্রতিহিংসা নিতে ছাড়েনি।

ক্রপটকিনের বড় আশা ছিল যে এত শিক্ষার পর জনতা এবার বিপ্লবের পরিচালনা পরিত্রাতাদের হাতে ছেড়ে দেবে না—নিজেদের হাতে রাখবে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন শতাব্দী পেরুবার আগেই ইয়োরোপময় নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবের ঝড় উঠবে, তাতে সকল দেশের রাষ্ট্র-কাঠাম ভেঙে পড়বে।[২৯] শতাব্দী পেরুবার আগে স্বপ্ন ভেঙে গেল, রাষ্ট্রকাঠাম ভাঙলো না। ক্রপটকিন দেখতে পেলেন রাষ্ট্র যে বিরাট যান্ত্রিক শক্তির অধিকারী হয়েছে তাতে সে সহজে ঘায়েল হবে না। অন্যদিকে জনসাধারণ স্বাধীনতার চেয়ে সচ্ছলতাকে মূল্য দিচ্ছে বেশী। জনকল্যাণ সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্র তাদের মনে কায়েম হয়ে বসেছে। এই মোহ থেকে আগে তাদের মুক্তি না দিলে, স্বাধীনতার মূল্যবোধ না জাগালে সমাজবিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই। এখন ধৈর্যশীল প্রস্তুতির সময়।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব আসবে এ দুরাশা ক্রপটকিনের ছিল না। তিনি হিংসাত্মক উপায়ে বিশ্বাস করতেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে যখন চারদিকে বিপ্লবের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন ফ্রান্স ও ইটালীতে কিছু কিছু লোক গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিল। সরকার-মহল এর মধ্যে ক্রপটকিনকে জড়াতে চেষ্টা করল। এই নির্বোধ হত্যাকাণ্ডগুলির প্রতিবাদ করলেও তিনি হত্যাকারীদের নিন্দা করলেন না। প্রতিহিংসা দিয়ে অত্যাচার রোধ হয় না ঠিক, তাই প্রতিহিংসা কোন কার্যক্রম হতে পারে না। কিন্তু এ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা আসবে। অসন্তোষ নিয়ে যখন বিপ্লবের কারবার তখন প্রতি-শোধজনিত হত্যা তার কর্মকাণ্ডে অবশ্যই দেখা দেবে। ঐ অত্যাচারের জ্বালা যারা অনুভব করেনি তাদের হত্যাকারীদের বিচার করতে বসবার অধিকার নেই।

> তুমি কি তাহাদের সঙ্গে তাহাদের সমান দুঃখভোগ করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক তাহা হইলে লজ্জায় লাল হইয়া চুপ করিয়া থাক।[৩০]

যখন দাবি আদায়ের কোন বৈধ উপায় থাকে না তখন সকল দলই হিংসার আশ্রয় নেয়। আর যে সরকার হিংসার নিন্দায় পঞ্চমুখ তিলমাত্র অবাধ্যতা দেখলে সে সঙিন উঁচিয়ে ধরতে কসুর করে না। রাষ্ট্র যে বড় বড় বুলির আড়ালে পাইকারি হারে নরহত্যা করে তাতে কোন

---

[২৯] লানার্কি দাঁ লেভল্যুশিয়ঁ সোস্যালিস্‌ৎ।

[৩০] লে প্রিজ্‌, ১৮৯০, ৫৭ পৃষ্ঠা।

দোষ নেই। যতদিন যুদ্ধ ও প্রাণদণ্ড থাকবে ততদিন ব্যক্তির কাছে উন্নততর নৈতিক মান আশা করা বৃথা।

ক্রপটকিন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিতে সকল রকম অপরাধকে দেখেছেন,—এর জন্যে দায়ী করেছেন রাষ্ট্রকে। রুশ ও ফরাসী জেলখানায় থেকে এসে তিনি বলেছেন 'এগুলি রাষ্ট্রপোষিত অপরাধ-শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়।' জেলখানার আবহাওয়ায় চরিত্র সংশোধন দূরস্থান, যতদূর সম্ভব নৈতিক অধঃপতন হয়। কয়েদীর স্বাধীনতা হরণ করে, তাকে জানোয়ারের মত খাটিয়ে, আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অদ্ভুত পোশাক পরিয়ে এবং যন্ত্রের মত চালিয়ে জেলখানা তার স্বভাবকে বিগড়ে দেয়। খালাস পাওয়ার পর ভদ্রসমাজে তার স্থান হয় না, আসামী সমাজ তাকে আদর করে ডেকে নেয়। তখন অপরাধের পুনরাবৃত্তি করতে সে বাধ্য হয়। প্রথমবার সে হঠাৎ ভুল করে অপরাধ করে ফেলেছিল। এখন সে জিদ করে অপরাধে নামল। তার শাস্তিদাতারা তার চেয়ে পাকা চোর, এই বিশ্বাস নিয়ে সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল।

> বড় বড় নগরের নৈতিক ও বাস্তব আবর্জনার মধ্যে অনশনক্লিষ্ট ভ্রষ্ট মানবসমাজে বছরের পর বছর ধরিয়া হাজার হাজার বালক বালিকা বড় হইতেছে। ইহাদের সত্যিকার কোন ঘরবাড়ি জানা নাই। আজ তাহারা আছে একটা জীর্ণ চালার নীচে, কাল রাত্রিবাস রাস্তার উপরে। তাহাদের তারুণ্যশক্তি সুস্থভাবে নিষ্ক্রমণের পথ পায় না। যখন দেখি মহানগরীর বুকে এই পরিবেশের মধ্যে বালক বালিকারা মানুষ হইতেছে তখন দেখিয়া অবাক হইতে হয় যে তাহাদের মধ্যে এত অল্প কয়েকজন দস্যু ও নরহন্তা হইয়া দাঁড়ায়। আমার দেখিয়া বিস্ময় লাগে মানুষের সামাজিক অনুভূতি কত গভীর, সবচেয়ে বদ প্রতিবেশীরও কতখানি বন্ধুভাব আছে। তা না থাকিলে আরো কত লোক সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত। এই বন্ধুভাব, হিংসায় অভক্তি না থাকিলে নগরের রাজপ্রাসাদগুলির একখানি ইটও অবশিষ্ট থাকিত না।[৩১]

আইন দিয়ে অপরাধ দমন করা যায় না। তা হলে অপরাধ বন্ধ করবার উপায় কি? একুশ শ বছর আগে চুয়াংৎসে উপায় বাতলেছিলেন। ক্রপটকিনের উপায়ও কতকটা সেই রকম, তাঁর কথায়ও সেই ঝাঁঝ।

> গিলোটিনগুলি পুড়াইয়া দাও; জেলখানাগুলি গুঁড়াইয়া ফেল; বিচারক, পুলিস এবং পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা যে শ্রেণীর লোক সেই গোয়ান্দাগুলিকে তাড়াও; যে ঝোঁকের মাথায় অপরের অনিষ্ট করিয়াছে তাহার সহিত ভাইয়ের মত আচরণ কর; আর সর্বোপরি অলস বুর্জোয়ারা অসৎ উপায়ে যাহা অর্জন করিয়াছে সেই পাপের পসরা লোভনীয় করিয়া দেখাইবার সুযোগ তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লও। দেখিবে সমাজবিরোধী অপরাধ কত কমিয়া যাইবে।[৩২]

নৈরাজ্যবাদী দর্শনে ক্রপটকিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি মিউচুয়েল এণ্ড : এ ফ্যাকটর অব ইভল্যুশন। তখন ডারউইনের শিষ্যরা প্রচার করছেন যে জীবন সংগ্রামসঙ্কুল,

---

[৩১] লে প্রিজ, বলডুইনের সঞ্চয়ন, ২৩১ পৃষ্ঠা।
[৩২] ল এণ্ড অথরিটি, বলডুইনের সঞ্চয়ন, ২১৭ পৃষ্ঠা।

যার জয় হয় সে লক্ষ্মীমন্ত, সে ভাগ্য নিয়ে বেঁচে থাকে, যার হার হয় তার কপালে দুঃখ ও মৃত্যু। এই নিষ্ঠুর সংগ্রাম নিয়েই জীবন, এর দ্বারাই নিয়মিত হয় মানবপ্রগতি। ১৮৮৮ সালে 'জীবন সংগ্রাম এবং মানুষের উপর ইহার ইঙ্গিত' নামে হাক্স্লীর একটি প্রবন্ধ বেরুল—তাতে তিনি দেখালেন যে জীবজগত একটি গ্লাডিয়েটরের মল্লভূমি এবং আদিম মানুষের জীবন অবাধ অবিরাম সংগ্রামে কণ্টকিত। এর পাল্টা জবাবে ক্রপটকিন "নাইনটীন্থ্ সেঞ্চুরী" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন। মিউচুয়েল এড এই প্রবন্ধগুলির সংকলন।

ক্রপটকিন তাঁর প্রতিবাদের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন রুশ পশুতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কেস্লারের কাছ থেকে। ১৮৮৩ সালে তিনি মস্কোতে ল অব মিউচুয়েল এড শীর্ষক বক্তৃতামালায় পশুজগতে বলবানের স্থায়িত্বের সূত্র খণ্ডন করেন। ক্রপটকিন তাঁর কথাগুলি নিজের সাইবেরিয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন, কোথাও অবাধ সংগ্রাম ও শক্তির জয়ের সমর্থন পেলেন না।

আসলে ডারউইন এ কথা বলেন নি। তিনি যখন বলেছিলেন যে যোগ্যতম সেই বাঁচবে, তখন যোগ্য বলতে তিনি শুধু শক্ত ও ধূর্তকে বোঝেন নি, তিনি বুঝেছেন তাদেরও যাদের জীবনে পরস্পর সহানুভূতি আছে। ক্রপটকিন জীবতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণা থেকে প্রচুর মালমসলা সংগ্রহ করে দেখালেন যে সংগ্রামের মত সমাজবন্ধনও প্রকৃতির নিয়ম।

পিঁপড়ে, মৌমাছি ও উইপোকা থেকে শুরু করে বন্য পশু পর্যন্ত কীট ও পশুজীবনে যৌথচেতনার কতখানি গুরুত্ব তার নজির দেখিয়ে ক্রপটকিন বর্বর জাতির আলোচনায় এসেছেন। নিউগিনির পাপুয়া ও কেপ হর্নের (দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর) ফুয়েজিয়ানদের ভেতর এখনও কোন সর্দার নেই, অপরাধ ও বিবাদ নেই। তারা একসঙ্গে কাজ করে, স্ফূর্তি করে, সন্তান পালন করে। রেড ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমোদের ভেতরও এই আদিম সমতা বিদ্যমান। প্রাগৈতিহাসিক কালে সেমাইট, গ্রীক ও রোমানদের ছিল এই প্রকার যূথসমাজ। টাসিটাস হানাদার জার্মান উপজাতিদের সম্বন্ধে একই চিত্র এঁকেছেন। প্রাচীন কেল্ট ও শ্লাভ জাতিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এস্কিমোদের সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তি এসেছে কিন্তু তারা একটা সীমার বেশি একে বাড়তে দেয় না। কেউ বেশী ধনী হয়ে উঠলে সে সভা ডেকে উৎসব করে উদ্বৃত্ত ধন বিলিয়ে দেয়। এদের জ্ঞাতি এলিউট উপজাতির সঙ্গে দশ বছর কাটিয়ে রুশ মিশনারী ভেনিয়ামিনভ ১৮৪০ সালে লিখছেন যে গত একশ বছরে ষাট হাজার লোকের মধ্যে খুন হয়েছে এবং চল্লিশ বছরে আঠার শ লোকের মধ্যে আইনবিরোধী অপরাধ হয়েছে মাত্র একটি করে।

আজকের আন্তর-রাষ্ট্রিক আইনের মত এই সকল উপজাতিরও আইন ছিল। তাদের শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন সম্বন্ধ আন্তর্জাতিক চুক্তি দিয়ে নিয়মিত হত।

আদিম যূথসমাজ ভেঙে যাওয়ার পর এল গ্রাম সমাজ। গ্রামীণ যৌথ উদ্যোগে বিকাশ হল কৃষি ও কুটির শিল্পের। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, পঞ্চায়েতী বিচার, চারুকলা গ্রামের সর্বসাধারণের জন্যে সৃষ্টি হল। তারপর এল শিল্পীসংঘ ও নগর। মধ্যযুগে ইয়োরোপের নগর যে কেবল রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার দুর্গ ছিল তা নয়। এ ছিল গ্রাম সমাজের বিস্তৃত সংস্করণ, সহযোগিতা ও সাহচর্যের ভিত্তিভূমি, যেখানে সকলে আপন আপন রুচি ও দক্ষতা অনুযায়ী বৃত্তি অনুসরণ করত আর সম্মিলিতভাবে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলত। নগরে ও নগরের বাইরে ছিল শিল্পীসংঘ বা ভ্রাতৃসংঘ। জীবিকার জন্যে সকলকে কোন না কোন বৃত্তির অনুসরণ করতে হত এবং সমব্যবসায়ীরা মিলে সংঘ গঠন করত। প্রত্যেককে কোন না

কোন সংঘে স্থান করে নিতে হত। একক জীবন ছিল অসম্ভব।

তারপর এল রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ। ব্যক্তির আনুগত্য হল সংঘের প্রতি নয়, সমাজের প্রতি নয়, মুষ্টিমেয় লোকের করতলগত রাষ্ট্রের প্রতি। পরস্পরের প্রতি কোন বাধকতা ও কর্তব্য রইল না। মধ্যযুগে শিল্পীসংঘের কারও রোগ হলে অন্যেরা পালা করে তার সেবা করত। এখন রোগীর দায় হাসপাতালের, প্রতিবেশী খবরও রাখে না। বর্বর জাতির সমাজে প্রথা ছিল দু জন লোক যদি মারামারি করে আর একজন খুন হয় তাহলে যারা দাঁড়িয়ে দেখবে আর থামাতে চেষ্টা করবে না তারাও খুনের দায়ে পড়বে। রাষ্ট্রের আমলে মারামারি থামাতে যাওয়া নাগরিকের কর্তব্য নয়, এ দায় পুলিসের। হটেনটটরা খেতে বসবার আগে তিনবার হাঁক দিত যদি কেউ অভুক্ত থাকে তা হলে তার সংগে খাবার ভাগ করে খাবে বলে। আজকালকার সম্ভ্রান্ত নাগরিক দুঃস্থদের ভরণপোষণের জন্যে নির্ধারিত খাজনা দিয়েই খালাস—কে উপোস করে মরল সে ভাবনা তার নয়।

তবুও মানব চরিত্র থেকে রাষ্ট্রের চাপে সমবেদনা ও সহানুভূতির উৎসগুলি একেবারে শুকিয়ে যায় নি। যখন মহাযুদ্ধের হাড়িকাঠে হাজার হাজার লোক বলি হয় সেই উন্মত্ত পরিবেশের মধ্যেও মানুষের হৃদয়ের সুধা ঝরে পড়তে দেখা যায়।

> কিয়েভের রাস্তা দিয়া যখন অবসন্ন জার্মান ও অস্ট্রিয় যুদ্ধবন্দীরা পা টানিয়া টানিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে তখন চাষী রমণীরা আসিয়া তাহাদের হাতে রুটি আপেল বা দু এক খণ্ড তাম্র মুদ্রা গুঁজিয়া দিয়াছে। শত্রুমিত্র, নায়ক সৈনিক বিচার না করিয়া হাজার হাজার নরনারী আহতদের সেবা করিয়াছে। গ্রামের সমর্থ চাষীরা যুদ্ধে গেলে পর ফ্রান্স ও রুশে বৃদ্ধরা ও নারীরা গ্রামসভায় বসিয়া স্থির করিয়াছে যে তাহারা জমিগুলি আবাদ করিবে। সারা ফ্রান্স জুড়িয়া লংগরখানা ও অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। এই সকল ও অনুরূপ অনেক ঘটনার মধ্যে লুকাইয়া আছে নূতন জীবনের বীজ। এই বীজ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানে অংকুরিত হইবে, ঠিক যেমন পুরাকালীন সহভাব হইতে একসময়ে সভ্য সমাজের উন্নততম প্রতিষ্ঠানগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল।[৩৩]

মিউচুয়েল এড-এর নৈতিক দিকটার বিশদ আলোচনা করলেন ক্রপটকিন তাঁর শেষ ও অসমাপ্ত গ্রন্থ "এথিক্স্"-এ। এর আগে ১৮৯০ সালে এই প্রসংগে "লা মোরাল আনার্কিস্ৎ" নামে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এর পিছনে একটু ইতিহাস আছে। প্যারিতে একজন এনার্কিস্ট বন্ধুর একটি মুদিখানা ছিল। সাথীরা এ দোকান থেকে জিনিস নিয়ে দাম দিত না—'প্রত্যেকে তার প্রয়োজন মত পাবে' এই নৈরাজ্যবাদী নীতির দোহাই দিয়ে। দোকানী ক্রপটকিনের দুয়ারে ধর্না দিল। ক্রপটকিন এই পুস্তিকাটিতে নীতিশাস্ত্রের অতি পুরাতন সূত্রটির উল্লেখ করলেন—'অন্যের কাছে যে ব্যবহার তুমি আশা কর অন্যের প্রতি তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিও।' দোকানের পৃষ্ঠপোষকদের নৈরাজ্যবাদী যুক্তির খণ্ডন হল।

আসলে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি এই সূত্রের চেয়ে ব্যাপক। নীতিধর্ম দেনা-পাওনার কারবার নয়। ব্যবসাদারী সততার চেয়ে এর দাবি বেশী। যে পাওয়ার ও চাওয়ার অতিরিক্ত দিতে পারে, যে দেয় ভালবাসা থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই বেহিসাবী দাতা খাঁটি নীতিবান পুরুষ। পরবর্তী গ্রন্থ "এথিক্স্"-এ ক্রপটকিন নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করে তার মর্মার্থ

[৩৩] মিউচুয়েল এড, লণ্ডন ১৯১৯, ভূমিকা।

ব্যাখ্যা করলেন। প্রুদ'র মত তিনি একে ধর্মীয় শাসন ও অলৌকিক অধ্যাত্মবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। নীতিবোধের মূল তিনি খুঁজে পেলেন প্রকৃতির ভেতর। প্রকৃতি নীতিহীন নয়। সমাজবিকাশের স্বাভাবিক ধারায় নীতিবোধ এসেছে, শুধু মানুষে নয়, ইতর জীবেও। প্রকৃতি 'মানুষের প্রথম নৈতিক শিক্ষক'। জীবে ও মানুষে আছে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকবার প্রবৃত্তি, পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবৃত্তি। এইখান থেকে জন্ম ভালবাসার, নীতিবোধের।

> পিঁপড়েরা বাসাটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাখি হরিণ কিংবা বানর দলের নিরাপত্তার জন্য আত্মত্যাগ করিতেছে ইহা জীববিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সত্য; প্রকৃতির রাজ্যে হামেশা ঘটিতেছে এরূপ ঘটনা। শত শত জীবজাতির মধ্যে যে এই ধারা চলিয়া আসিয়াছে তাহার পশ্চাতে আছে স্বজাতির প্রতি স্বভাবজাত সহানুভূতি, আপদ-বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিবার অভ্যাস এবং এক সচেতন জৈবশক্তি। ডারউইন প্রকৃতিকে চিনিতেন। তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন যে ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনা উভয়ের মধ্যে সমাজচেতনা অধিক শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। তিনি যে ঠিক বুঝিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই।[৩৪]

সমাজজীবন নির্ভর করে যূথচেতনার, পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবৃত্তির ওপর। প্রকৃতি জীবকে ঐক্যের প্রেরণা দিয়েছে তা থেকে আসছে নব নব উপায়ে সংহতিকে সুদৃঢ় করবার তাগিদ—ন্যায়বোধ ও নীতিধর্ম।

মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুক সমাজ অবশ্য এইটেই চায়। সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করা নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য। যে কাজে অপরের ক্ষতি হয় দুঃখ হয় তা গর্হিত। যে কাজে অপরে সুখী ও স্বচ্ছন্দ হয় তা ন্যায়সংগত। কিন্তু এটা যুক্তির কথা, তত্ত্বের কথা, হৃদয়ের আবেগের কথা নয়। ক্রপটকিন দেখাতে চেয়েছিলেন নীতিবোধের মূল আরো গভীর, জৈবধর্মে অন্তর থেকে এর রস আহরিত হয়। কিন্তু এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না। এই প্রতিশ্রুতির মাঝপথে এসে তাঁর কলম অবশ হয়ে গেল।

রাষ্ট্রনির্ভর সমাজবাদের বিরুদ্ধে মুক্ত সমাজবাদের গুণগান করেছেন একাধিক আদর্শবান মনীষী, কিন্তু তাঁরা এই আদর্শকে তথ্য ও যুক্তির বলে প্রতিষ্ঠা করেন নি। রাষ্ট্রমুক্ত সমাজে সংহতি ও শৃংখলা কোথা থেকে আসবে, অরাজকতার বিশৃংখলা কেমন করে রুদ্ধ হবে কেহ তার হদিস দেন নি। ক্রপটকিনের মিউচুয়েল এড ও এথিক্‌স্‌ মানব-প্রকৃতির এক নিগূঢ় সত্য উদ্ঘাটন করল যার ওপর মুক্ত সমাজবাদের ভিত্তিস্থাপন হতে পারে।

ক্রপটকিনের নৈরাজ্যবাদ তিনটি স্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান,—আর্থিক সমতা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক নীতিবোধ। এর সংক্ষিপ্তসার—

> ধনতন্ত্রের কবল হইতে উৎপাদনের মুক্তি। যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের যথেচ্ছ ভোগ ব্যবহার।
>
> সরকারী শাসন হইতে মুক্তি; সমিতি ও সংহতির মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ, পরস্পরের সুবিধা ও রুচি অনুযায়ী স্বাধীন সংগঠন—ক্রমশ জটিল,

---

[৩৪] ডারউইনের ডিসেণ্ট অব ম্যান থেকে ক্রপটকিন একটি নজির দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের উটায় ভ্রমণকালে ক্যাপ্‌টেন স্টান্‌স্‌বেরি দেখতে পান একটি অন্ধ পেলিক্যানকে দলের অন্য পাখিরা তিরিশ মাইল দূরে থেকে মাছ এনে খাওয়াচ্ছে। এথিক্‌স্‌—অরিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৪, ৪৩ পৃষ্ঠা।

বিস্তরমান।

ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র হইতে মুক্তি। বাধ্যতাহীন কর্তৃত্বহীন স্বাধীন নীতিবোধ যাহা সমাজজীবন হইতে উত্থিত ও ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত।[৩৫]

নিঃসংশয়ে সমাজের গতি এই দিকে। নিরাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুই অবধারিত পথে প্রকৃতির দেওয়া স্বাধিকারবোধ ও যূথচেতনার প্রেরণায় আমরা এগিয়ে চলেছি। দুই পথের সন্ধিস্থল নিরাজ সমাজতন্ত্র আমাদের গন্তব্য স্থান, সেখানে আমাদের উপস্থিতি আসন্ন ও সুনিশ্চিত।

ওভিডের কল্পনা নয়, জেনোর স্বপ্নবিলাস নয়, এই বাস্তব সম্ভাবনার প্রমাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতির অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয়ে নিঃশাসন যূথজীবনের প্রেরণা অগণিত অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করছে। যা ছিল বায়ুভুক কল্পনা, আশার আকাশপদ্ম বিশ্বাসে নির্ভরমান সে আদর্শ বাস্তবে অবতরণ করে লোকায়ত্ত হল। ক্রপটকিনের হাতে নৈরাজ্যবাদ এক পূর্ণাবয়ব জীবনদর্শনে ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উৎক্রান্ত হল।

ক্রপটকিনের দার্শনিক ভাবনা ছিল স্থির বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে, তাঁর বিচারশক্তি কখনো গোড়ামিতে আবদ্ধ হয়নি, ডগ্মার জড়তায় পঙ্গু হয় নি। দলগত নিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য তাঁকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে নি। ১৯০৭ সালে ইয়োরোপের আকাশে যখন ঈশানের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল তখন নৈরাজ্যবাদীরা এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রস্তাব নিল যে তারা যে কোন উপায়ে সামরিক প্রস্তুতিতে বাধা দেবে, সেনাবিভাগে হরতাল করাবে এবং যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া মাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতরণ করবে। বাকুনিনের প্রবর্তিত এই রাষ্ট্রদ্রোহী বিপ্লবকৌশল ছিল সর্বসম্মত। যুদ্ধ বাধবার পর ক্রপটকিন এই নীতি বর্জন করলেন। জার্মান সামরিক শক্তির আঘাত থেকে পতনোন্মুখ গণতান্ত্রিক ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্যে তিনি ইয়োরোপের জনতাকে ডাক দিলেন। জারতন্ত্রের অবসানের পর তিনি রুশ বিপ্লবীদের জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করতে নিষেধ করলেন। সারা ইয়োরোপের নৈরাজ্য-বাদীরা ক্ষেপে উঠল। লন্ডনে "ফ্রীডম" পত্রিকাকে ঘিরে যে দল গড়ে উঠছিল তা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ১৯১৪ সালের অক্টোবরে এই কাগজে ক্রপটকিন একটি চিঠি ছাপলেন—সহকর্মীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাদের আদর্শের সামনে নূতন সংকট সৃষ্টি করেছে জার্মান জঙ্গীরাজ। এই দুরন্ত শক্তিকে হটিয়ে মুক্তি আন্দোলনকে অপঘাত থেকে বাঁচাতে হবে। একাজ সম্ভব একমাত্র জনশক্তির পক্ষে। জার্মান হানাদার বিতাড়িত হলে পর বিজয়ী জনতা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান করবে।

বিপক্ষকে শান্ত করা দূরে থাক এই পত্র আগুনে ঘি ঢালল। চারদিক থেকে পত্রাঘাতে "ফ্রীডম" পত্রিকা নাজেহাল হয়ে উঠল। সবচেয়ে নিষ্ঠুর আক্রমণ এল ইটালীর নৈরাজ্যবাদী ক্রপটকিনের পরম বন্ধু মালাটেস্টার কাছ থেকে।

শ্রেণীবিরোধ, অর্থনৈতিক মুক্তি, নৈরাজ্যবাদের যত কিছু পাঠ সব যেন ক্রপটকিন ভুলিয়া গেলেন। তিনি বলিতেছেন যুদ্ধ বাধিলে আক্রান্ত দেশের পক্ষ লইয়া সমর-বিরোধীকে অস্ত্র ধরিতে হইবে। কে যে আসল হামলাদার তাহা যথাসময়ে অনুধাবন করিবার সাধ্য সাধারণ শ্রমিকদের নাই। অতএব ক্রপটকিনের 'সমর-বিরোধী'কে তাহার সরকারের হুকুম-ই তামিল করিতে হইবে। ইহার পর 'সমর-

[৩৫] আনার্কি দা লেভলুশিয়ং সোস্যালিস্ৎ।

বিরোধিতা'র তথা নৈরাজ্যবাদের কী বা অবশিষ্ট থাকে?

> আসল কথা ক্রপটকিন সমরবিরোধিতার মন্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন কারণ তিনি মনে করেন সামাজিক প্রশ্নের আগে জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। আর আমরা মনে করি যে শ্রমিকদের দাসত্ব কায়েম রাখিবার জন্য প্রভুদের যত প্রকার উপায় জানা আছে তাহার মধ্যে প্রধান জাতিবৈরিতা ও জাতিবিদ্বেষ। সকল শক্তি দিয়া আমরা ইহাতে বাধা দিব।

যুক্তি ও গোড়ামির লড়াই বরাবর এই রীতিতে চলে আসছে। একদিকে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ, তথ্য ও পরিস্থিতির বিচার, বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে আপ্তবাক্যের দোহাই, ব্যক্তিগত আক্রমণ, আবেগের উচ্ছ্বাস। দ্বিতীয় দল সংখ্যায় ভারি হয় এও চিরকালের রীতি। এখানেও সংখ্যালঘু যুক্তি পরাস্ত হল, ক্রপটকিন সমাজচ্যুত হলেন।

আদর্শ ও উপায়ের মানদণ্ড এক নয়, মহান আদর্শের জন্যে হীন উপায় গ্রহণীয়, তাতে পাপ নেই, বিপ্লবী শাস্ত্রের এই চিরাচরিত নীতি ক্রপটকিন স্বীকার করেন নি। আপাত-সিদ্ধির আশায় তিনি তাঁর সুনির্দিষ্ট নীতিমানকে তিলমাত্র সংকুচিত হতে দেন নি। একটিমাত্র মিথ্যা কথা, একটুমাত্র স্বীকারোক্তির বিনিময়ে কারামুক্তি যেমন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তেমন তিনি এমন সব কূটনৈতিক কৌশলের বিরোধিতা করেছেন যাতে নিরাজ সমাজবাদের আদর্শ মলিন হয়। তাঁর সমাজবাদ মানুষের নৈতিক চেতনার ওপর অধিষ্ঠিত— যে কাজে এই চেতনা ক্ষুণ্ণ হয়, রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে কার্যকরী হলেও অন্তিমে তা ক্ষতিকর। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে রুশ বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ কেহ জাপানের কাছ থেকে সাহায্য নিতে চেয়েছিল, বলশেভিক একনায়কত্বকে উচ্ছেদ করবার জন্যে অনেকে বিদেশী আক্রমণকারীকে ডেকে আনতে চেয়েছিল। প্রস্তাব দুটির একটিও তাঁর কাছে আমল পায় নি। বরং এই নীতিহীন কূটনীতিকে তিনি তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন।

এমন অটল সততা ও সত্যনিষ্ঠা ছিল বলেই শত্রুরাও তাঁকে সমীহ করত। এবং এর জোরেই নিঃসম্বল নির্বান্ধব অবস্থায় শত্রুপুরীতে বাস করেও প্রতিপক্ষের অন্যায়ের নির্ভীক সমালোচনা তিনি করতে পারতেন। ১৯২০ সালে বলশেভিকরা যখন শত্রুপক্ষের লোকদের ধরে জামিন রেখে শত্রুর ওপর চাপ দেবার নীতি অবলম্বন করল তখন ক্রপটকিন লেনিনকে একটা চিঠি লেখেন। পত্রটি ইতিহাসের একখানি অতুলনীয় দলিল।

> আজিকার প্রাভ্দায় মন্ত্রীসভার প্রচারিত একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তি আমি পড়িলাম। দেখিলাম র‍্যাংগেলের সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে জামিন রাখা স্থির হইয়াছে। আমার বিশ্বাস হয় না তোমার কাছাকাছি এমন একজনও নাই যে তোমাকে বলিয়া দিতে পারে এই প্রকার সিদ্ধান্ত তামসিক মধ্যযুগের কথা, জেহাদের যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভ্লাডিমির ইলিচ, যে সকল আদর্শ ধরিয়া আছ বলিয়া তুমি দেখাইতে চাও তোমার বাস্তব কর্ম তাহার ঠিক বিপরীত।
>
> এও কি সম্ভব তুমি জান না এই জামিনের মানে কি? জামিন মানে এক ব্যক্তি যে নিজের দোষে বন্দী হয় নাই, বন্দী হইয়াছে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া তাহার সাথীদের উপর চাপ দেওয়ার সুবিধা শত্রুপক্ষের আছে বলিয়া। এই ব্যক্তির মনের অবস্থা ফাঁসির আসামীর মত যাহাকে অমানুষ ঘাতকেরা প্রতিদিন দুপুরবেলা বলিতেছে যে কাল পর্যন্ত ফাঁসি মুলতবী রহিল। এই উপায় অবলম্বনে যদি

তুমি সায় দাও তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিব একদিন তুমি দৈহিক নির্যাতনেও পশ্চাৎপদ হইবে না—যাহা মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল।

আশা করি তুমি জবাবে বলিবে না যে ক্ষমতা অব্যাহত রাখা রাষ্ট্রনায়কের ধর্ম, তাহার ব্যক্তিগত কর্তব্য, এই ক্ষমতার উপর কোন প্রকার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে কোন গুরু মূল্য দিতে হইবে। এই মত আজকাল রাজা-মহারাজারাও পোষণ করে না। শত্রুপক্ষের লোক জামিন রাখিয়া যে আত্মরক্ষার কৌশল আজ রাশিয়ায় গৃহীত হইল রাজতন্ত্রের অধীশ্বররা তাহা বহুকাল আগে ছাড়িয়া দিয়াছে...বলিতে পার তোমার কমিউনিজম্‌-এর ভবিষ্যত কি...?

বলশেভিক রাশিয়ায় বসে লেনিনকে এইরূপ চিঠি লেখার স্পর্ধা দ্বিতীয় ব্যক্তির ছিল না। চিঠিখানি মনে করিয়ে দেয় বারো বছর আগে টলস্টয়ের একখানি বিবৃতির কথা। জারের পুলিস যখন বিপ্লবীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছিল তখন মর্মান্তিক বেদনায় টলস্টয় লিখেছিলেন 'আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না'। সেদিন টলস্টয়ের কান্না অভিজাতদের নিশ্চল বিবেকে নাড়া দিয়েছিল। ক্রপটকিনের বুকের জ্বালা তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল, বলশেভিজম্‌-এর ইমারতে একটা আঁচড়ও পড়ল না।

ক্রপটকিন বহুলাংশে প্রুদঁ ও বাকুনিনের কাছে ঋণী। তাঁর বৈজ্ঞানিক দর্শন নিখুঁত বা নির্দোষ নয়। তাঁর ভুরি ভুরি রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও অসঙ্গতি, কোথাও কোথাও ভুলত্রুটি চোখে পড়ে। তিনি চেয়েছেন সকলে মাথার কাজ এবং হাতের কাজ ত' করবেই, হাতের কাজের মধ্যেও মাঠের কাজ ও কলের কাজ সকলকে করতে হবে, যাতে কৃষি ও কারিগরির বৈষম্য দূর হয়। আবার যার যার বৃত্তি নিয়ে আলাদা আলাদা সমিতি গড়বার কথাও তিনি বলেছেন যা হবে ভবিষ্যৎ সমাজের বনিয়াদ। দুটো কথায় একটু অসঙ্গতি রয়েছে। যন্ত্রশিল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রমবিভাগের তিনি নিন্দা করেছেন, ছোট শিল্পকে যন্ত্রের ওপরে স্থান দিয়েছেন, আবার মুক্ত কণ্ঠে যন্ত্রের গুণগানও করেছেন। যন্ত্রকে গ্রহণ করলে শ্রমবিভাগ ও বৃত্তিবিভাগকেও মানতে হয়। মিউচুয়েল এড্‌-এ জীব ও মানুষের সহযোগ প্রবৃত্তিকে তিনি কিছু অতিরঞ্জন করেছেন। হাক্‌স্‌লী ও হার্বার্ট স্পেন্‌সারের মত তাঁর দৃষ্টিও কিছু একদেশদর্শী। পোকামাকড়, মাছ, সরীসৃপ এদের মধ্যে হিংসার যে বীভৎস মূর্তি দেখা যায়, বের্গ্‌শ'র "সৃষ্টিপর ক্রমবিকাশে" পাতায় পাতায় যার নজির, জীবনের সেটাও একটা দিক যা উপেক্ষণীয় নয়। আদিম জাতিরা পরস্পর সংগ্রামে কোন সংযম রাখত না, পরাজিত শত্রুর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকত না। প্রথম প্রথম তারা শত্রুদের নিঃশেষে নিপাত করত, একটু সভ্য হবার পর তাদের দাসদাসী বানাত। আদিম জাতির কোন শাসন পীড়ন ছিল না—এও কাব্যকল্পনা। গোত্রশাসন অথবা যূথশাসন রাষ্ট্রশাসনের চেয়ে কঠোরতায় কম ছিল না। মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রামের যৌথ উদ্যোগ ও স্বাধীনতা নাশ করার অপরাধে তিনি রাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছেন। এটা ঠিক নয়। মধ্যযুগের শুরু থেকে গ্রামের চাষী সামন্ততন্ত্রের কবলে পড়ে উৎসন্ন যাচ্ছিল। রাষ্ট্র ছিল দুর্বল, অক্ষম। গ্রামক্ষেত্র গ্রাস করে, চাষীকে ভূমিদাস বানিয়ে, গ্রামোদ্যোগ ভেঙে দিয়ে সমাজের সর্বনাশ করছিল রাষ্ট্র নয়, জমিদার শ্রেণী।

ক্রপটকিনের বৈজ্ঞানিক দর্শন এর চেয়ে একটা গুরুতর দোষে দুষ্ট, সে হল তাঁর পরম আশাবাদ। আশার ছলনায় কোথাও তিনি বাস্তবকে তুচ্ছ করেছেন, কোথাও বা অতিরঞ্জন করেছেন। এ বিভ্রান্তির ফাঁদে সকল বিপ্লবীকেই পড়তে হয়। কারণ শুধু বিজ্ঞান নিয়ে

বিপ্লবী হওয়া যায় না, তার সঙ্গে মেশাতে হয় বেশ কিছু স্বপ্নের খাদ, সত্যকে একটুখানি চোখ ঠারতে হয়, প্রতিকূল বাস্তবকে আশার পর্দা দিয়ে আড়াল করতে হয়। ক্রপটকিন বিজ্ঞানের সত্যনিষ্ঠা ও বিপ্লবের সাধনায় সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন। তা হয় না।

তথাপি ক্রপটকিনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সার্থক। দর্শনের মূল্যায়ন ছিদ্র সন্ধান ও ছিদ্র গণনা করে হয় না। বনস্পতির গায় ছিদ্র থাকে কোটর থাকে, তৃণলতার দেহ সমতল মসৃণ।

তবে কেন তার সাধনা বিফল হল? বিপ্লবী নায়কের সকল গুণে গুণী হয়েও আপামর জনতার শ্রদ্ধাভাজন হয়েও ক্রপটকিন জন আন্দোলন সৃষ্টি করে যেতে পারলেন না। তাঁর বিপ্লবদর্শন বাস্তবে ফলিত হল না, সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল না। রাষ্ট্রশক্তির পরিমাপে, রাষ্ট্রের পরমায়ু গণনায় তাঁর ভুল হয়েছিল। তিনি বিপ্লবোত্তর সমাজের চিত্র দিয়েছেন, মানুষের বৈপ্লবিক প্রবৃত্তির সন্ধান দিয়েছেন কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠনের উপায় দেখান নি, সংগ্রাম কৌশল উদ্ভাবন করেন নি। দেশে দেশে ভেসে বেড়িয়ে কোথাও সংগঠনের শিকড় গাড়বার সুযোগও তাঁর ছিল না।

দল ও গোষ্ঠী তৈয়ার করতে হলে যুক্তি ও বিজ্ঞান, স্বপ্ন ও আশা দিয়ে হয় না, সাহস ভালবাসা বলিদান ইত্যাদি গুণপনাও যথেষ্ট নয়,—চাই কূটবুদ্ধি, শিথিল ন্যায়বোধ। এ কাজে চরিত্রের বিশুদ্ধি মস্ত অন্তরায়। ক্রপটকিনের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যর্থতার জন্যে প্রধানত দায়ী তাঁর নিষ্কলঙ্ক সততা, অনমনীয় বিবেক। রাষ্ট্রসংগ্রামে বীরের ধর্ম পালন করার রেওয়াজ হয়ত বা কোন ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ছিল, কলিযুগে নেই, থাকলেও খৃষ্টান নাইট ও তুর্ক সুলতানদের পর থেকে উঠে গেছে। কীট ও পশুর জীবনমরণ সংগ্রামের মতই করাল ভয়াল রাষ্ট্র ও বিপ্লবের সংগ্রাম, উভয়ই বাস্তব জৈব সত্য, কোনটিতে ন্যায়নীতির সংযম নেই। এ ফুটবল খেলা নয়, ক্রীড়ামঞ্চের মল্লযুদ্ধ নয়। এই সুস্পষ্ট সত্যটা কি ক্রপটকিনের চোখে ধরা পড়েনি? তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি কি নীতিবায়ুতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল?

তা নয়। তাঁর নীতিনিষ্ঠা নিছক সংস্কার কিংবা বিবেকের শাসন ছিল না। এর পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল। তাঁর বিপ্লবকাব্যের আদিকাণ্ডে রাষ্ট্রনিধন, উত্তরকাণ্ডে মুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা। জনরাজকে পরিস্রুত হতে হবে নূতন মূল্যবোধে, বিপ্লবীর কর্তব্য তার পরিচর্যা তার পরিশীলন। যদি রাষ্ট্রনিধনের সঙ্গে সঙ্গে সেই মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায় তা হলে বিপ্লব হবে লক্ষ্যহীন রক্তপাতের লড়াই। যে সংগ্রামী কার্যসিদ্ধির জন্যে মূল্যবোধকে বলি দিতে পারে সে জয়মাল্য পায়, কালের ফলকে তার নাম উৎকীর্ণ হয়। আর যে সযত্নে তার সৃষ্টি-উপাদানকে রক্ষা করে, যশ ও খ্যাতিকে উপেক্ষা করে অনাগত কালের প্রতীক্ষায় দিন গণে সে হয় একলা পথের যাত্রী, যুগের কাছে অবজ্ঞাত, যুগের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। কিন্তু বিফলতাই তাঁর সৃজনমনীষার পরিচয়। যে দর্শন কালোত্তর, কালের নিকষে তার যাচাই হয় না। ক্রপটকিন কালোত্তর ভাবনার ভাবুক তাই যুগের সংগ্রামে তিনি পরাহত, যুগের মানসে তিনি উপেক্ষিত।

বৃষ্টির পরে

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

প্রভাতের বজ্রমুষ্টি আমার দিকে এগিয়ে এল। কুঞ্চিত কপাল। ভুরুর রেখায় স্পন্দন। যেন সে খুব চিন্তা করছে কাজটা করবে কিনা। অগ্র পশ্চাত ভাবছে। ভয়ংকর কিছু করার আগে এ-যুগের সভ্য মানুষকে নানা ভয়াল চিন্তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। প্রভাত দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানতাম ওই পর্যন্ত এসে সে থামবে।

বজ্রমুষ্টি আমার নাক কপাল লক্ষ্য করে ছুটে এল না। বরং আস্তে আস্তে তার শক্ত মুঠিটা খুলে গেল, আঙুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল; জলে ভেজা পেট-মোটা আঙুরের রঙের নরম ফোলা-ফোলা আঙুলগুলি আমার নাকের সামনে টেবিলের ওপর নেমে এল। তারপর আবার সব কটা আঙুল একত্র করে সিগারেটের বাক্সটা মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে প্রভাত আর একটা সিগারেট বার করতে ব্যস্ত হয়। মৃদু হেসে তার দিকে দেশলাইটা ঠেলে দিই।

তার সিগারেট না জ্বলা পর্যন্ত আমি চুপ থাকি। আমার জানলার বাইরে আকাশ ধূসর হয়ে আছে। বর্ষা আসি আসি করছে। মাত্র কাল বিকেলে বাগানে লক্ষ্য করেছি বৈশাখী চাঁপা বকুলের ঔদ্ধত্য কমে গেছে—আমার লন্-এর অত বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথার আগুন এইবেলা একেবারে নিভবে। বসন্ত জ্বালায় গ্রীষ্ম জ্বালায়—বর্ষার কাজ নেভানো। মনে মনে বললাম। কেবল জল ঢালা। ঠাণ্ডা করে দেওয়া।

নিশ্চয় প্রভাতও মনে মনে কিছু বলছে। পাতলা নীলাভ ধোঁয়ার বলয় তার প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল ঘিরে ফেলেছে। চোখ বোঁজা। আমার কেন জানি মনে হল তখন, এইমাত্র, কৃষ্ণচূড়ার রং নিভে যাওয়া আর সীসার রঙের বিবর্ণ আকাশটা অত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম বলে প্রভাত নরম হয়ে এল; তার বুকের তরল আগুন আর টগ্‌বগ্ করছে না, জমতে আরম্ভ করেছে, দেখতে দেখতে জুড়িয়ে যাবে।

'প্রভাত!' নরম গলায় ডাকলাম। আর সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করলাম তার মুখের দাড়ি-গোঁফ অবিশ্বাস্যরকম বেড়ে উঠেছে। বোঁজা চোখের কোলে গাঢ় কালির পোছ। ক'রাত ঘুম নেই? তার চিহ্ন? আবার মনে মনে হাসি। ঘটা করে অনিদ্রা অনিয়মের বিজ্ঞাপন চোখে মুখে ঝুলিয়ে প্রভাত এখানে ছুটে এসেছে।

সঙ্গে একটা ঝড়ো হাওয়া নিয়ে সে এ-ঘরে ঢুকেছিল না! সব উড়িয়ে দেবে তছনছ করে দেবে—ভেঙে দুমড়ে, দরকার হলে এবাড়ির প্রত্যেকটা ইট গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে আর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমায় চাপা দিয়ে রেখে সে বেরিয়ে যাবে। এই? এই মন নিয়ে প্রভাত এত সকালে তার ল্যাণ্ডমাস্টার ছুটিয়ে সুদূর ঢাকুরিয়া থেকে আমার বি. টি. রোডের বাড়ির দরজায় এসে নামল?

যেন জেনে শুনেও আমি বন্ধুকে আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে এনে বসালাম। ওই তো বসে আছে সে। স্থির স্তব্ধ। চোখ বুজে সিগারেট টানছে। আমি জানতাম, আমার লন্-এর কৃষ্ণচূড়ার ম্লান বিষণ্ণ চেহারা, আমার বাগানের বকুল চাঁপার দীর্ঘশ্বাস, আমার ছাদের ওপরকার আকাশের ধূসর রং প্রভাতের মনের ওপর সুন্দর কাজ করবে। তার ঔদ্ধত্য চঞ্চলতা ঈর্ষা বিদ্বেষ থাকবে না। থাকল না তো?

'প্রভাত!' নরম গলায় ডাকলাম।

চোখ খুলল সে। লাল লাল চোখ। প্রভাত যে উগ্র ব্লাড-প্রেসারে ভুগছে আমার অজানা নেই। তার পক্ষে উত্তেজনা বিষ। তুমি হাস। সুন্দর করে হেসে ঠাণ্ডা মাথায় আমার সঙ্গে কথা বল। দেখছ তো আকাশের রং। শুনছ না আমার বাড়ির পিছনের বাগানের জঙ্গলে ব্যাং ডাকছে। ওরা কখন ডাকতে শুরু করে জান? আকাশ বেয়ে কলস্বরে পৃথিবীর বুকে জল নামবে। কাল নামতে পারে। আজ বিকেলে নামতে পারে। আজ দুপুরে কি এখনই বর্ষণ আরম্ভ হওয়া বিচিত্র না। ওই দেখ, জানলার ওপারে গাছগুলি স্থির—একটি পাতা নড়ছে না। ওরাও আসন্ন বৃষ্টির গন্ধ টের পেয়েছে। গাছেরা চুপ করে থাকে। জলের গন্ধ পেয়ে ভেককুল মুখর হয়ে উঠল। আনন্দে ওরা ডাকছে, চিৎকার করছে। 'প্রভাত—'

'আমায় কিছু বলছ?' প্রভাত এই প্রথম ঠোঁট খুলল। কিন্তু ঠোঁট জোড়া কাঁপছিল। চাউনিটাও কটমটে। দমে গেলাম। বাইরের উত্তেজনা কমেছে, কিন্তু ভিতরটা যে এখনো উত্তপ্ত অশান্ত।

নিশ্চিন্ত হলাম চাকরকে দেখে। চা নিয়ে এসেছে। যদি এই মুহূর্তে তৃতীয় ব্যক্তি সামনে এসে না পড়ত হয়তো বিপদ ঘটত। ভয়ে ভয়ে আমি প্রভাতের সেই বন্ধ মুষ্টির দিকে আবার চোখ রাখলাম। এমন শক্ত হয়ে আছে তার ডান মুঠিটা।

'চা খাও।' মৃদু স্বরে বললাম। চা ও জলখাবারের প্লেট-এর ওপর লাল লাল চোখ বুলিয়ে প্রভাত গলার একটা বিশ্রী শব্দ করল। 'সন্দেশ চলবে না। সন্দেশ তুলে নাও—নোন্‌তাটা থাক।'

'তাই থাক।' প্রভাতের গলার স্বর অনুকরণ করতে পারলাম না, এবং সেরকম ইচ্ছাও ছিল না যদিও, কেবল কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে চাকরকে বললাম, 'সন্দেশ তুলে নাও।'

নিঃশব্দে চায়ের পর্ব শেষ হল। আমার বুক দুরদুর করছিল। চাকর শূন্য কাপ প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল। তৃতীয় ব্যক্তির অবর্তমানে প্রভাতের মুঠিটা যে আবার শক্ত হয়ে উঠবে বেশ বুঝতে পারছিলাম, কেন না এতটা সময়ের মধ্যে তো সে একবারও হাসল না, চাউনিটা নরম করল না। লাল চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে আমার ঘরের দেওয়াল দেখতে লাগল। পূব থেকে পশ্চিমে তার দৃষ্টি সরে যায়, তারপর উত্তরের দেওয়ালের গায়ে সে দু-চোখ স্থির করে ধরে রাখে। আমার পিছন দিক। আমি দেওয়াল দেখছি না, প্রভাতের চোখ দেখছি। দক্ষিণ দিকে আমার মুখ। হন্তদন্ত হয়ে প্রভাত যখন ছুটে এল দক্ষিণ দরজার মুখের চেয়ারে তাকে বসতে দিয়েছি হাওয়া পাবে বলে। মোটা মানুষ। ঘামে পিঠের পাঞ্জাবি ভিজে গিয়েছিল। হয়তো হাওয়া লেগে এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। আমি তার পিঠ দেখছি না, মুখ দেখছি। মিস্ত্রী আসছে না বলে আমার ঘরের পাখা বিকল হয়ে আছে। যদি তা না হত, যদি মাথার ওপর পাখাটা ঘুরত তবে বোধ হয় প্রভাতকে ওই চেয়ারে বসতে দিতাম না। উত্তরের দেওয়াল পিঠ করে দক্ষিণ মুখো হয়ে সে বসত। আর তখন সে ওই দেওয়ালের হুকে ঝুলানো র‍্যাকেট দুটো নিশ্চয় দেখতে পেত না। পাশাপাশি ঝুলানো ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট দুটোর ওপর স্থির দৃষ্টি মেলে ধরে প্রভাত কী ভাবছে তার ভুরুর বাঁক, কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফের নীচের পেশীর মৃদু স্পন্দন আমার বলে দিল। যেন আমার ইচ্ছা করছিল একটা পর্দা দিয়ে দেওয়ালটা ঢেকে দিই। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। প্রভাত দেখে ফেলেছে—খেলার সরঞ্জাম দুটো দেখামাত্র অনেক কিছু সে অনুমান করে নিতে পারছে। ঝুনো ব্যারিস্টার। একটা প্রমাণ, এইটুকুন তথ্যের দাগ ধরে ধরে তারা কল্পনার ফিতাকে

হাজার মাইল ছড়িয়ে দিয়ে চমৎকার মামলা দাঁড় করাতে পারে। যা আশঙ্কা করছিলাম! চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। যা আশঙ্কা করছিলাম! ঘর ছেড়ে সে বারান্দায় ছুটে গেল। আর সেখানে দাঁড়িয়ে সে যে নীচের লন, ওধারের ফুলের বাগান, বাগানের পাশে আতা ও ডালিম ঝোপের তলার বেঞ্চিটা দেখবে এতো জানা কথা। ঘরের চেয়ারে বসে ঘামছিলাম। কপালে ঘামের ফোঁটা দাঁড়িয়েছে। হাত তুলে মুছতে পারছি না। অবশ হয়ে গেছে দুটো হাত। যেন কোনোরকমে শিরদাঁড়া খাড়া রেখে আমি স্থির চোখে প্রভাতকে দেখছি। তার পিঠ। আদ্দির জামা আবার কি ভিজতে আরম্ভ করল। গেঞ্জির ফুটোকি-গুলি পরিষ্কার দেখা যায়। আমি আশঙ্কা করছিলাম। লন, ঝোপের পাশের বেঞ্চি ও পিছনের রজনীগন্ধার জঙ্গল দেখা শেষ করেই এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে প্রভাত বিকৃত স্বরে আমাকে নানারকম জেরা করতে লেগে যাবে। উত্তর তৈরী করে রাখিনি; কিন্তু প্রশ্নগুলি কি হবে অনুমান করতে পারছিলাম। তার মতন আমিও সন্তানের পিতা। তফাৎ হচ্ছে এই যে চোখা চোখা প্রশ্নের বাণে বুক বোঝাই করে আমি তার বাড়িতে ছুটে যাইনি, যেমন সে এখানে ছুটে এল। তফাৎ হচ্ছে এই যে যে-চোখ দিয়ে প্রভাত পৃথিবীকে দেখতে অভ্যস্ত আমার সে-চোখ নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি প্রভাত রেলিং-এর ওপর আর একটু বেশি ঝুঁকে গেছে। চিলের চোখ দিয়ে সে ওপর থেকে নীচের ঘাসের ওপর চুণের দাগ বুলানো ব্যাডমিন্টন খেলার চৌকোণ ঘরটা দেখছে; দেখছে চৌকোণ ঘর থেকে ঝোপের পাশের বঞ্চির দূরত্ব কতটা; দেখছে পাশাপাশি যদি দুজন বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে বসে আর সূর্য পশ্চিমে হেলতে থাকে তো আতা ও ডালিমের ছায়া দুজনের গলা ও বুকের কতটা ঢাকতে পারে। বা পেরেছিল। না কি ছায়া লম্বা হবার আগে দুজন সেদিনের মতো খেলা সাঙ্গ করে জাল গুটিয়ে র‍্যাকেট কাঁধে ফেলে টুকটুক করে ওপরে উঠে এসেছিল। তারপর? প্রভাত কী ভাবছে জানি না। তার পরের ভাবনা ভয়ংকর অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেন তার দেরি আছে। যেন এখনও রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে ঘাড় লম্বা করে দিয়ে প্রভাত শকুনের চোখ দিয়ে আমার লন বাগান খেলার জায়গা কাঠের বেঞ্চি ঝোপঝাড় জরীপ করছে।

'প্রভাত!' খুব সাহস করে নরম গলায় ডাকলাম।

প্রভাত সোজা হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ পর এই প্রথম পকেট থেকে রুমাল বার করে সে ঘাড় গলা মুছল। টলতে টলতে আসছে। তার চোখ দেখে চমকে উঠলাম। লাল রং নেই। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যেন ক্লান্তিতে সে ভেঙে পড়ছে। যেন অনেক দূরের শ্মশানে প্রিয়জনকে পুড়িয়ে হেঁটে হেঁটে এই মাত্র ঘরে ফিরল। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। আশ্বস্ত হলাম। একটু আগের আশঙ্কাগুলি কাটিয়ে উঠতে বেগ পেতে হয় না। হাসি।

'দেখলে, কী সুন্দর জায়গাটা, কেমন সবুজ নরম ঘাস—'

মাথা নাড়ল সে। অর্থাৎ কিছুই দেখেনি। রুমাল দিয়ে আবার ঘাড় গলা মোছে। নিরস্ত হই না। নিরস্ত হব না মনের এই জোর আছে বলে না আমি হাসতে পারছি। বললাম, 'বিকেল হতে এমন চমৎকার কিচিরমিচির শুরু করে দেয় পাখিগুলি ওই আতা আর ডালিমের ডালে বসে—'

'তুমি চুপ কর, চুপ কর!' হুঙ্কার ছাড়ল প্রভাত। তারপর শুনলাম চাপা গর্জন। যেন নিজের মনে বলছে সে : 'কাব্য, কবিত্ব করা হচ্ছে।'

তেতো মতন একটা ঢোক গিললাম। আমি যে-চোখ দিয়ে পৃথিবীটা দেখছি সে-চোখ

প্রভাতের নেই। তাকে তুমি ক্ষমা কর। ঈশ্বরকে ডাকলাম। দিনরাত সে মামলা মোকদ্দমার প্যাঁচ কষছে মাথায়। হয়তো আমাকেই আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করাতে মাথায় ফন্দী আঁটছে। বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসে মোড়া এমন সুন্দর মাঠ ফুলের বাগান রাখা আমার অপরাধ হয়েছে। আদালতে তাই প্রমাণ করবে প্রভাত। চাই কি এ-বাড়ির গাছের মাথায় পাখিদের কূজন গুঞ্জনের জন্যও সে আমাকে দায়ী করবে। আমি প্রভাতের চোখ দেখতে লাগলাম। আমার মনে হল লনের কৃষ্ণচূড়া গাছটা যে এই কদিন আগেও আগুন ছড়াচ্ছিল আগুন লাগানোর অভিযোগ এনে সে আমায় দোষী সাব্যস্ত করবে। প্রভাত, ফুল ফোটার ব্যাপারে মানুষের হাত নেই। ইচ্ছা করলেই সে সবুজ ডাঁটার মাথায় রজনীগন্ধার রূপালী বিস্ময় জাগাতে পারে কি। যে জাগাবে সে আকাশ কালো করে আসছে। ঐ দেখ, বৃষ্টি হবে! আর বৃষ্টি পড়লে দেখবে বাগানের ওদিকটায়—

কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রভাতকে কথাটা বোঝাতে পারলাম না। তার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠছিল, চোখ লাল হচ্ছিল। যেন এবার সত্যি দমে গেলাম আমি। কথা বলতে কষ্ট হয়। গলা পরিষ্কার করতে অল্প একটু কেশে নিলাম। তারপর মেকি হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে ক্ষীণ গলায় বললাম, 'আর একটু চা খাও।'

'কেন, কেবল চা কেন!' বিশ্রী একটা ভাঁজ দেখা গেল প্রভাতের চর্বি থলো-থলো থুঁতনিতে। ওটা যে তার হাসি বুঝতে এক সেকেন্ড দেরী হল না আমার। চোখ লাল করে হাতের মুঠি পাকিয়ে মানুষ যখন হাসে তখন তার কী অর্থ দাঁড়ায়? শিকার লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে গিয়ে শিকারী সময় সময় হাসে বৈকি। 'তোমার ঘরের আলমারীর তাকে এখন বোতল সাজানো থাকে না?' মুখ না, চোখ দিয়ে প্রভাত কথা বলল। তার নীরব প্রশ্ন আমার মর্মে বিঁধল। আমার যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা সে খুঁচিয়ে বার করতে চাইছে। অথচ কুড়ি বছরের ওপর আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি। প্রাজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপক অতীতের অসংযমের চিত্র দেখতে চায় না। আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। প্রভাত গলার শব্দ করে হেসে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে।

'কেবল চা খেয়ে নেশা হয় না ব্রাদার।'

এই প্রথম আমার পাকা ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল, হাতের মুঠি শক্ত হল, চোখের রং লাল হল।

আমার চোখের ভাষা প্রভাত বুঝতে পারছে না? নিশ্চয় পারছে।

অতীতের অসংযম মনে পড়ে ঢাকুরিয়ার এক প্রতিষ্ঠাবান বিত্তশালী প্রবীণ ব্যারিস্টার কেমন শিউরে উঠছে লক্ষ্য করে পুলকিত হই। আঘাত পেলে মানুষ প্রত্যাঘাত করে। বন্দুকের ঘোড়া টিপবার আগে নিষ্ঠুর শিকারী যেভাবে হাসে আমার ঠোঁটেও সেরকম একটা হাসি ঝুলছিল।

'তোমার বরানগরের রক্ষিতা কি বুড়িয়ে গেছে—আর নেশা ধরাতে পারছে না? বড় যে আজ অন্য নেশা খুঁজছ প্রভাত?'

'চুপ চুপ।' প্রভাতের চোখ ধমকে উঠল। 'আমারটা আমার মধ্যেই রয়ে গেছে—কিন্তু তোমার নেশা তোমার সন্তানকে পেয়েছে। তোমার মদের রক্ত ওর ভিতরে কাজ করছে, তাই না ও মাতাল হয়ে—'

'চুপ চুপ!' আমার চোখ নীরব রইল না। 'ব্যারিস্টার কিনা, তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে তোমার জুড়ি নেই।' আমার রক্তবর্ণ চোখ ধমকের স্বরে বলল, 'নারী-মাংসের ওপর

তোমার চিরদিন লোভ, আমি তো জানি, তুমি আমার বন্ধু; সেই লোভী রক্ত নিয়ে তোমার সন্তান বড় হয়েছে—তাই না—'

প্রভাতের চোখ আর কিছু বলছে না। আমার চোখ হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করল। যেন এইটুকুন যথেষ্ট। ঠোঁট না খুলে, জিভ না নেড়ে আমরা পরস্পরকে কঠিন আঘাত করলাম। এই বয়সে। প্রভাতের ষাট আমার ঊনষাট। ছোটবেলা দুজনে হাত চালিয়েছি পা চালিয়েছি—দরকার মত দাঁত নখ ব্যবহার করেছি। কিন্তু এখন শুধু একে অন্যের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে, নীরব থেকে, দরকার মত লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলে ঝগড়া করা ছাড়া উপায় কি। অথচ প্রভাত গোড়ায় সেটা বুঝতে পারেনি। ঝড়ো হাওয়া হয়ে সে ঘরে ঢুকেছিল। বজ্রমুষ্টি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। যদিও পরক্ষণেই তা শিথিল হয়ে গেছে। আমরা মনে করি বটে বুকের ভিতর গরম রক্ত টগবগ করে ফুটছে। আসলে তা না। ওটা সংস্কার। ক্রুদ্ধ হলেও কতটা ক্রুদ্ধ হওয়া চলে এই বয়সে? আমরা ঠাণ্ডা হয়ে গেছি; রক্ত জমে এসেছে। বুঝলে প্রভাত। তার মুখের ওপর নিঃশব্দ দৃষ্টি বুলিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি।

কিন্তু সে বোঝে না। শিশুর মত চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে তাকাতে ঘৃণাবোধ করছে। সরাসরি দেয়ালের কাছে সরে যায়। ঝুলানো র‍্যাকেট দুটো হুক থেকে টেনে নেয়। দুহাতে দুটো র‍্যাকেট শক্ত করে ধরে শূন্যে নাড়াচাড়া করে। যেন মনে মনে সে সাট্‌লকক্‌ ছোড়াছুড়ি করে। হাসি। যদি তোমার বয়স কুড়ি থাকত তো দুটোই নিজের কাছে না রেখে একটা আমার হাতে তুলে দিতে, প্রভাত; বলতে, চলো চলো, কী সুন্দর বাইরেটা—চমৎকার ঘাসের জমির ওধারে ফুল ফুটেছে—হাওয়াটা অদ্ভুত। বলতে, চলো—নীচে আমরা খেলা করব আর চাঁপার গন্ধে দুজনের বুক ভরে উঠবে, নেশা লাগবে।

চমকে ওঠলাম। মনে মনে কথা বলা থেমে গেল। কেন না প্রভাত হাতের র‍্যাকেট দুটো এত জোরে ছুঁড়ে মেরেছে যে ওধারে আমার ড্রেসিং-টেবিলের গায়ে ছিটকে পড়ে আয়নাটা ভেঙে দিল। লাভ হল কিছু? প্রভাতের মুখ দেখি। ফাটল ধরা আরসির বুকে তার বাঁকাচোরা মুখটাকে শয়তানের মুখের মতন দেখায়। অথচ এমনি সে সুপুরুষ। ক্রোধ মানুষকে কত নীচে টেনে নেয় ভাঙা আরসির ছবি তার প্রমাণ। প্রভাতকে অনুকম্পা করি। যেন কিছুই হয়নি এমন ভান করে সে পায়চারি করে। একটা গ্লাসের টুকরো তার জুতোর চাপে কুড়মুড় শব্দ করে গুঁড়িয়ে গেল। কিছু একটা চিন্তা করা শেষ করে সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'নীচে খেলাধুলো সেরে ওরা ওপরে উঠে আসত, এখানে?'

'ওঘরে। পাশের ঘরে। এটা আমার বসবার কামরা দেখছ না?'

প্রভাত ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর পা টিপে টিপে এগোয়। যেমন শিকারের সম্ভাবিত আস্তানার দিকে শিকারী এগোয়। উত্তেজনা কৌতূহল ঘৃণা লোভ আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষার ছবি যদি কেউ একসঙ্গে দেখতে চায় তো প্রভাতকে দেখুক। এই মুহূর্তে। সে যেমন স্থূল দেহটা টেনে টেনে পিঠটা একটু কুঁজো করে রেখে গলাটা ঝুলিয়ে দিয়ে মাথাটা ঈষৎ আন্দোলিত করতে করতে পাশের কামরার দিকে চলেছে। আর একটা গ্লাসের টুকরো তার জুতোর চাপে কুড়মুড় শব্দ করে ভাঙে। প্রভাত শুনল না। আমি শুনছি। তার দৃষ্টি তার মন ওঘরে। বাঁ-হাতে পর্দা টানছে ডান হাতে দরজার কবাট ঠেলছে। বেশি জোরে ঠেলতে হয় না। ভেজানো ছিল। আস্তে ধাক্কা দিতে পাল্লা ফাঁক হয়ে যায়। কি

দেখছে সে? চর্বির খাজ পড়া কাঁধ দুটো একত্র জমে গিয়ে একটা উঁই ঢিপির চেহারা ধরেছে। পিঠটাকে ঢোলের মতন মনে হয়। প্রভাতের সামনের দিকে যদিও দু চারটা চুল আছে মাথার পিছনটায় মস্ত বড় টাক। ওঘরের জানলাগুলো বন্ধ। ভিতরটা অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপছে কি সে। বুঝতে পারছে না কোথায় সুইচ বোর্ড। অন্ধকারে চোখ মেলে দিয়ে সে শূন্য ঘরে কি কি তথ্য প্রমাণ মেলে তাই খুঁজতে ব্যস্ত। হয়তো একটা দুটো জানলা খুলে দিলে, কি আলোটা জ্বাললে সব পরিষ্কার দেখা যেত। চিন্তাটা তার মাথারই আসছে না। আসতে পারে না। মাথায় অন্য সব চিন্তা ঠেসে রেখে সে এটা ওটা হাতড়াচ্ছে। ওটা কি? জিনিসটা টেনে এনে প্রভাত দরজার কাছে ছুটে আসে। চুলের রীবন। লাল টুকটুকে রং। আমি দূর থেকে দেখলাম; এখানে চেয়ারে বসে থেকে ওখানে দৃষ্টি পাঠিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে সে কী কাজটা করল! জুতো দিয়ে পিষসে চুলের ফিতাটা। নুয়ে আবার সেটা হাতে তুলে নেয়। নাকের কাছে গিয়ে গন্ধ শোঁকে। তারপর সেটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যেন আর একটা কিছুর জন্য সে অন্ধকারে হাত বাড়িয়েছে। ওটা কি? প্রভাত দরজার কাছে—আলোর কাছে ছুটে এল। মূল্যবান কিছু না। ছোট একটা অ্যাসট্রে। প্রভাতের হাতের নাড়াচাড়ায় কিছু ছাই ঝরে পড়ল—কিছু পোড়া তামাকের গুঁড়া। এবার নিশ্বাস বন্ধ করে আমি তাকিয়ে রইলাম। ওটা আর তার জুতোর তলায় গেল না। যত্ন করে সে পকেটে পুরল। যেন আর কিছু জানবার দরকার নেই দেখবার দরকার নেই ওঘরে। আস্তে বেরিয়ে এল প্রভাত।

'কতক্ষণ থাকত ওরা ওঘরে?'

'অনেকক্ষণ।'

'রোজ?'

'রোজ।'

'কবে থেকে এটা হচ্ছিল?'

'শীতের শুরু থেকে—তখনও গাছে গাছে নতুন পাতা কুঁড়ি ফুল দেখা দিতে আরম্ভ করেনি।'

'আবার কাব্য।' প্রভাত বিড়বিড় করে উঠল। 'তো তুমি কিছু বললে না, তুমি কি দেখতে না?'

কী উত্তর দেব! উত্তর তৈরী করে রাখিনি। অসহায় চোখে তার কুঞ্চিত অপ্রসন্ন ভ্রূযুগল দেখতে দেখতে দুবার ঢোক গিললাম। হ্যাঁ, ছিল উত্তর। আমি বলতে পারতাম প্রভাতকে—যখন ওদিকে চোখ গেল আমার, যখন টের পেলাম তখন আর বলার সময় ছিল না। শীত শেষ হয়ে বসন্ত এসে গেছে। তখন কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভায় আকাশ লাল হয়ে গেছে, মধুলোভী ভোমরাদের আনাগোনার বিরাম ছিল না; ওদিকে আম জাম কাঁঠাল জামরুলের গুটি দেখা দিয়েছে গাছে গাছে। ফলের সম্ভাবনায় ডাল পাতাগুলি কাঁপছিল। সেই উৎসবের দিনে ওদের দুজনকে কিছু বলতে আমি সাহস পাইনি।

আমাকে নীরব দেখে প্রভাত দাঁতে দাঁত ঘষল। তার বুঝি মনে নেই বাঁধানো দাঁত—বেশি জবরদস্তি করতে গেলে ছিটকে মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। যেন বন্ধুকে সাবধান করে দিতে আমি ঠোঁট আলগা করতে যাব, এমন সময়, প্রভাত কপালের ঘাম না রীতিমত আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে রুমাল দিয়ে চোখের কোণা মুছল। কাঁদছে? আর তার কণ্ঠস্বর বিকৃত বীভৎস হয়ে আমার কানের পর্দা আঘাত করল।

'কত টাকা খরচ করেছি আমি ওর জন্য, এই সেপ্টেম্বরে ও বিলেত যেত, কত সম্ভাবনা ছিল—অকৃতজ্ঞ—' প্রভাত থরথর করে কাঁপছিল। টেবিলের ওপর দুহাতের ভিতর মুখ গুঁজল। আমার ইচ্ছা করছিল ঐ অবস্থায় তার চেহারা দেখি চোখ দেখি। ক্রোধের আগুন তাহলে এবার সত্যি নিভতে শুরু করেছে! এখন সে বেদনাহত। এখন হয়তো বোঝাতে গেলে প্রভাত কবিতা বুঝবে কাব্য শুনবে। বাইরে আকাশের দিকে চোখ গেল আমার। শিউরে উঠলাম। বিশাল কালো মেঘ আমার লনের ওপর থমকে দাঁড়িয়েছে। গুরগুর শব্দ হচ্ছে।

'প্রভাত!' ফিসফিস করে ডাকলাম।

এত মৃদু ডাক তার কানে গেল না। বরং তার ক্রন্দনজড়িত মৃদু স্বরটা আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম। আর বিকৃত মনে হচ্ছে না কথাগুলি। যেন হৃদ্‌পিণ্ড গলে গলে চোখের জলে ধুয়ে টেবিলের ওপর ঝরে পড়ছে : 'আমি কোথাও চলে যাব। বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি কিছুই ধরে রাখতে পারবে না আমাকে আর—সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব।'

ইচ্ছা করছিল শব্দ করে হেসে উঠি; ইচ্ছা করছিল দুহাতে প্রভাতকে জড়িয়ে ধরি। তা পারলাম না যদিও। টেবিলের ওপর ঝুঁকে গাঢ় গলায় বললাম, 'ঐ সান্ত্বনা ঐ সন্তোষ নিয়ে আমি বুক বেঁধে আছি, প্রভাত। আমার কেউ নয়, আমি কারওর নই। এটা ভাল। না হলে আমিও কি কম যত্ন করেছি ওর। ডায়োসেশানে এবার থার্ড ইয়ার চলছিল—এদিকে গানের মাস্টার, নাচের জন্য মাস্টার, কিন্তু কিছুই তো ভাল লাগল না তার।'

'কিছুই ভাল লাগল না তার।' আমার কথাগুলি অনুকরণ করল প্রভাত। টেবিল থেকে মুখ তুলল। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। উত্তেজনা নিয়ে পাশের কামরায় ঢোকা, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মাত্র এই ক-মিনিটের মধ্যে ভেঙে চুরে দুমরে একেবারে অন্যরকম হয়ে গল মানুষটা। ওই প্রায়ান্ধকার কামরায় এমন আর কি চোখে পড়ল তার যে আর চোখ লাল করতে পারছে না সে, হাতের মুঠি শক্ত করতে পারছে না।

অল্প শব্দ করে হাসলাম।

'আমার আমার করি বটে আমরা, কিন্তু কিছুই আমাদের নয়—কেউ আমাদের নয়।'

প্রভাত ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। আমাকে সে এখন পুরোপুরি সমর্থন করছে। গাঢ় নিশ্বাস ফেলে সে বাইরেটা দেখল। 'অসহ্য গুমট।' অস্ফুটে বলল সে।

আমি তার সুযোগ গ্রহণ করলাম।

'এখনি বৃষ্টি হবে। হাওয়া বন্ধ হয়ে আছে। চলো বাইরে, নিচে—'

প্রভাত ঘাড় কাত করে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। বন্ধুর হাত ধরি। বোধ করি এই প্রথম আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করতে পেরেছে সে। তার চোখে কৃতজ্ঞতা। অবাক হলাম। রক্তবর্ণ চক্ষু মরা মাছের চোখের ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে কৃতজ্ঞতায় নরম হয়ে এল না কিন্তু; সজল মেঘের রং কিশোরীর চোখের রং ফিরে এসেছে তার চোখে। ষাট বছরের প্রভাতের চোখে। তেমনি ঠাণ্ডা নিষ্কলুষ।

'আমিও তাই ভাবছি। এখন ভাবছি, আর রাগ করব না, দুঃখ করব না। কিছুই যখন সে নিতে চাইলে না, নিলে না; আমার কোনো চাওয়া যখন ওর ভাল লাগল না তখন আর—'

সিঁড়ির পথে সে বলছিল।

'না, আমার কোনো চাওয়া ও চায়নি।' প্রভাতকে অনুকরণ করে আমি মৃদু গলায়

বললাম, 'ওর ভাল লাগার কাছে আমার সব ইচ্ছা সাধ গঁুড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে, কাজেই দুঃখ করব কার জন্য!'

নিচের পোর্টিকো পার হয়ে দু বন্ধু হাত ধরাধরি করে নরম ঘাসের বুকে পা রাখলাম।

'আমি কি জানতাম।' প্রভাতকে নিয়ে আমি তখন বাগানের কাছে চলে গেছি। আস্তে আস্তে যেন অনেকটা নিজের মনে সে বলছিল, 'কলেজ ছুটি হতে সে এখানে ছুটে এসেছে খেলতে। ঐ পর্যন্ত জানা ছিল। কিন্তু ওই খেলা যে—'

তার হাতে মৃদু চাপ দিলাম। যেন হঠাৎ চুপ করতে ইসারা করলাম। দুটো বড় বড় রুপালি ফোঁটা পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ল। 'বৃষ্টি হবে—বৃষ্টি আরম্ভ হল। এখন আমরা আরো শান্তি পাব, প্রভাত।' চোখ তুলে প্রভাত আকাশ দেখল, কদম আর দেবদারুর সবুজ নিবিড় পত্রগুচ্ছ দেখল। আমি পরিষ্কার উপলব্ধি করছিলাম আসন্ন বৃষ্টির মুহূর্তে আমার বাগানের রূপ দেখে প্রভাত মুগ্ধ হয়েছে। যা তখন ওপরের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে তাকে বোঝাতে কষ্ট হচ্ছিল। 'বুঝলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গণ্ডীর ভিতর থাকি, কোথাও আবদ্ধ থাকি ততক্ষণ অশান্তি। যেদিন আমি এটা উপলব্ধি করলাম সেদিন বাইরে চোখ পাঠিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলাম। আজ তুমি সন্ন্যাসী হতে চাইছ বন্ধনমুক্তি চাইছ, আজ তোমার আকাশ মাটি গাছ ফুল ঘাস—ওই ওখানে ঝোপের আড়ালে তারস্বরে ব্যাং ডাকছে তা-ও ভাল লাগবে।' একটু চুপ থেকে পরে আস্তে আস্তে বললাম, 'আর তখন এই ভাল-লাগার মন নিয়ে ভালবাসার হৃদয় নিয়ে তুমি সবাইকে ক্ষমা করতে পার, সব কিছু সহ্য করতে পার।'

প্রভাত আমার কথা বুঝল। বুঝল কেন সেদিন কৃষ্ণচূড়ার আগুনে আমি দু চোখ পুড়িয়েছিলাম। কেন ভোমরার গুনগুনে আর পাখির কিচিরমিচির শুনতে কান পেতে রেখেছিলাম। কি দেখব না, কি শুনব না বলে।

'আমার কিছু না কেউ না—আবার সবাই আমার সব কিছু আমার।' সুন্দর করে হেসে পায়ের কাছের নরম রজনীগন্ধার ডাঁটার ওপর আঙুল রাখলাম। 'দেখ, সবুজের বুকে শাদা কুঁড়ি ঘুমিয়ে ছিল। দু ফোঁটা জল পড়তে চোখ মেলছে। আমার ফুল—আমার বাগানের রজনীগন্ধা। দুদিন পর এসো। তখন ঈর্ষা করবে। ঘনবর্ষা শুরু হবে, আর সতেজ উদ্ধত লাবণ্য নিয়ে সবুজ ডাঁটারা রানীর মতো হেলে দুলে তোমায় জানিয়ে দেবে এ-বাগানের মালিক কে, কে এই সৌভাগ্যবান পুরুষ।'

ড্যাবডাবে চোখে প্রভাত আমাকে দেখল। একটু হাসলও। সে হাসুক, তার মন ঝরঝরে হয়ে যাক এই তো চাইছিলাম। বললাম, 'কিন্তু কদিন প্রভাত, কদিন ওরা আমার থাকবে? কৃষ্ণচূড়ারা কদিন আমার বাড়ির সামনেটা আলো করে ছিল? যেদিন বর্ষণ থামবে, একবার এসে উঁকি দিও। তোমার কান্না পাবে বাগানের চেহারা দেখে। হয়তো সেদিন আমাকে মনে মনে অনুকম্পা করবে। কিন্তু সত্যি কি আমি কাঁদব প্রভাত, যা রইল না মরে গেল তার জন্য? না, সেদিন নতুন করে আমাকে দেখতে ভালবাসতে আর একজন আসছে। হিমের স্পর্শ পেয়ে শিউলিরা চোখ খুলছে।'

'ঋতুর পর ঋতু তাই তো চলছে। একটি আসে আর একটি যায়।' প্রভাত দার্শনিকের মতো গলার স্বর করল। 'ফুল ফল—'

'পশু পক্ষী মানুষ—সব।' গলার স্বর চড়িয়ে দিলাম। জোরে বৃষ্টি নেমেছে। প্রচণ্ড

শব্দ হচ্ছে। জাম গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দুজন। জলের ছাটে ভিজে যাচ্ছি। তবু ভাল লাগছিল। এত বড় একটা লাল পিঁপড়া প্রভাতের জামার হাতায় বেয়ে ওঠে। প্রভাত আঙুলের টোকা দিয়ে অনায়াসে ওটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু ফেলছে না। যেন কষ্ট হচ্ছে তার। কত সহিষ্ণু কত নরম হয়ে গেছে ও এই আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখে ভাল লাগল। আর আমি বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলা বড় করে বললাম, 'ঋতুতে ঋতুতে গাছের রূপ বদলায় প্রকৃতির রং বদলায় মানুষের স্বভাব বদলায়। হুঁ তার ইচ্ছা, তার চাওয়া, তার অভিরুচির রং। কোনটা থাকল বলে আমরা হাসব কোনটা থাকল না বলে আমরা কাঁদব তুমি বলতে পার কি? কেননা তোমার ছেলের কোনোটাই তোমার না, আবার সবটাই তোমার—তেমনি আমার মেয়ের। ঠিক ফুল ফোটার মতন, ফুলের মরে যাওয়ার মতন। তাই তো ওরা মাঠের খেলা ছেড়ে যখন চুপ করে গাছের নীচের ওই বেঞ্চিটায় বসে থাকতে আরম্ভ করল আমি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি; যখন বেঞ্চি ছেড়ে আমার ঘরের পাশের সেই ছোট্ট কামরায় আশ্রয় নিল আমি চুপ করে রইলাম। আমি হাসিও নি কাঁদিও নি।'

প্রভাত নীরব। বৃষ্টির জলে স্নান করে করে গাছের রং-ফেরা দেখছে উল্লাস দেখছে। যেন একটু পর সে আমার কথায় ফিরে এল।

'মানে সারা বসন্তটা ওরা মাঠে খেলাধুলো করল, গ্রীষ্মের শুরু থেকে ওই কামরায় ঢুকল?'

'তাই।'

'আর বর্ষা আসছে এমন সময় তোমার লনেও রইল না ওরা, ছোট্ট ঘরেও রইল না।'

'না।' সংক্ষেপে উত্তর সারলাম। প্রভাতের মুখের দিকে তাকাতে আবার ভয় করে। যেন তার গলার স্বর আবার ভাঙছে টের পাই। 'এসো, ইদিকে—' প্রভাতের হাত ধরে আস্তে টানলাম। 'আমার মাধবীবনের কী চেহারা হয়েছে দেখবে।'

'মাধবী মরবে অপরাজিতা জাগবে।' যেন এই প্রথম একটা কবিতার লাইন বলতে চেষ্টা করল প্রভাত। খুশি হয়ে তার হাত ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলি। বৃষ্টির জোর হঠাৎ কমে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। মাথার ওপর পাখার ঝাপটা শুনলাম। একটা পাখি গায়ের জল ঝাড়ছিল। মাধবীবন দেখা শেষ করে আর একটু এগোই দুজন। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াই। প্রভাত ও আমার দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ওপাশে ঘন কেয়া-ঝোপ। লম্বা ডাঁটার মতো শাদা ফুলটা হাওয়ায় একটু একটু দুলছে। টুপটাপ জল ঝরছে পাপড়ি থেকে। কিন্তু আমরা তা দেখিনি—সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। দেখছিলাম এ পাশটা। জমির একটু অংশ। যেন কাল রাত্রে মাটি খোঁড়া হয়েছিল—রাত্রে বা বিকেলে বা কাল সকালে। নতুন মাটির চিহ্ন। গর্ত খুঁড়ে আবার মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তার ওপর ঘাসের চাপড়া বসানো হয়েছে। বৃষ্টির তোড়ে ঘাস সরে গেছে, মাটি ফেটে গেছে। ভিজা মাটি ফুঁড়ে ফুলের কলি আকাশের মেঘ দেখছে—ভুঁই-চাঁপার কলি; একটা না পাঁচটা, আমরা রুদ্ধশ্বাসে গুণে শেষ করলাম। প্রভাত কাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমিও। যেন শেয়ালের মতো মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে প্রভাত ওটাকে টেনে বার করল। আশ্চর্য, রাগ করল না সে, কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে না। আমার বুক দুরদুর করছিল যদিও আশঙ্কায়। তখন সে ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট দুটো ছুঁড়ে মেরেছে। আমার ঘরের ড্রেসিং-আয়না ভেঙেছে। উন্মত্ত হয়ে চুলের রীবন জুতো দিয়ে পিষেছে। এখন?

প্রভাতের চোখে জল এল।

আমিও চোখ মুছলাম। একটু পর, যেন এই নিয়ে তিনবার নবজাত ঘুমন্ত শিশুর কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে প্রভাত আবার আস্তে কোল থেকে ওটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওপরে মাটি চাপা দেয়। ঘাসের চাপড়াগুলি সুন্দর করে বসিয়ে দেয়। তারপর সে উঠে দাঁড়ায়। আমিও। বৃষ্টিটা একেবারে ধরে গেছে। কেয়াঝোপ পিছনে রেখে মাধবীবন পার হয়ে দুজন আবার সবুজ ঝকঝকে ঘাসের ওপর চলে আসি।

'এটা করার দরকার ছিল কি?' প্রভাত আমার চোখ দেখছিল না। মেঘের ফাঁকে রোদ চিকিয়ে উঠেছে তাই দেখছিল।

'হয়তো ভয়ে—লজ্জায়।' আমি আস্তে বললাম।

'তারপর পালিয়ে গেল দুটিতে।' তেমনি আকাশ মুখ করে সোনাগলা রোদ চোখে নিয়ে প্রভাত বলছিল। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তার মুখ দেখছিলাম। কেবল কি অনুকম্পা? যেন আরো অনেক কিছু দেখলাম প্রভাতের চকচকে চোখ দুটোর মধ্যে। ফুল শুকিয়ে যাওয়ার ব্যথা—ফুলের শুকিয়ে একটু একটু করে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ। আমি তাই আশা করছিলাম।

বিশ্বজনীন ঐক্য

আর্ণল্ড টোয়েনবি

মানুষের ইতিহাসে বর্তমান কালে একটি নূতন আন্দোলন জন্ম নিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ একটি অভিন্ন পরিবারের মতো ঐক্যবন্ধ জীবন রচনার জন্য আজ উদ্যোগী হয়েছে। এই উদ্যোগের পিছনে উচ্চাশার অভিলাষ আছে, কিন্তু তেমনি আছে অনিবার্যতারও তাগিদ। এই উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে নানা দেশ থেকে নানা উপকরণের সম্ভার এনে দিতে হবে। সেই দানসম্ভার পশ্চিম থেকে কি আসতে পারে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তার উল্লেখ করা যায়। ভবিষ্যত বিশ্বজনীন সমাজকে পাশ্চাত্য হয়ত দেবে তার যন্ত্রবিদ্যার সাংগঠনিক সহায়তা, সেই সহায়তা ছাড়া এমন অভূতপূর্ব বিশাল বিশ্বপরিবারকে একত্র সংবন্ধ এবং সংরক্ষণ করা অসম্ভব। পাশ্চাত্য দেশে তিনশত বৎসর পূর্বে যে উদারনৈতিক ভাবধারার আবির্ভাব স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল, সেই ভাবধারা থেকেই বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম গ্রহণ করে। ভবিষ্যত বিশ্বসমাজকে পশ্চিম যে যন্ত্রবিদ্যার সম্ভার দান করবে, সে সম্ভার এই বিজ্ঞানবুদ্ধিরই ফল। তেমনি আমি মনে করি, এই বিশ্বসমাজের জন্য ভারতবর্ষের কাছ থেকে দানস্বরূপ পাওয়া যাবে তার প্রশস্ত হৃদয়বৃদ্ধি এবং উদার মানসিকতা। পশ্চিমের বিশিষ্ট প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বজনীন ঐক্যের অভিমুখে মানবজাতি আজ এক নূতন যুগের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেই নূতন যুগের মানবজাতির জন্য ভারতবর্ষের এই দানও অমূল্য সম্পদরূপেই স্বীকৃত হবে। কাব্যিক ভাষায় বলা যায় যে, পশ্চিমের বিজ্ঞানবুদ্ধি 'ব্যবধান বিলোপ করেছে'। কিন্তু সেইসঙ্গে বিজ্ঞানবুদ্ধি আজ মানুষের হাতে এমন অস্ত্রও তুলে দিয়েছে, যার দ্বারা মানবজাতিকেই বিলুপ্ত করা সম্ভব। মানুষের হাতে এমন বিধ্বংসী অস্ত্রও আর কখনো আসেনি। এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র হাতে নিয়ে আমরা মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশগুলি আজ পরস্পরের মুখোমুখি-নিশানায় এসে দাঁড়িয়েছি। যদিও তারা অভিন্ন বিশ্বমানবতারই অন্তর্ভুক্ত, তবু মানবজাতির এই খণ্ড খণ্ড অংশগুলি আজও পরস্পরের কাছে বহুলাংশে অচেনাই রয়ে গেছে। কিন্তু অচেনার অধ্যায়েই এই ভয়ঙ্কর দুর্বিপাক আজ দেখা দিল। একমাত্র জীবাণু ছাড়া এই গ্রহের বাকি সমস্ত মানবেতর প্রাণীর উপরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা একদা প্যালিওলিথিক যুগের মধ্যভাগে চিরকালের জন্য অপরাজেয় প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি মানুষ কখনো আর এতবড় প্রাণান্তক সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়নি। জীবাণুকেও মানুষ বর্তমান যুগে অনেকটা পরাভূত করে এনেছে। কিন্তু এই যুগেই মানুষ মানুষের সম্মুখে যে বিপদের মূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছে, কোনো মানবেতর প্রাণী কখনো মানুষের সম্মুখে ততখানি ভয়ানকরূপে দেখা দেয়নি—কোনো হিংস্র শ্বাপদ, কোনো জীবাণু, কোনো ভাইরাসও নয়। মানুষ জীবাণুকে পরাভূত করেছে সত্য, কিন্তু এখনো নিজেকে করতে পারেনি। আর, নিজেকে সে আজ এমন অস্ত্রে সজ্জিত করেছে, যার তুলনায় হিংস্র শ্বাপদের কিংবা জীবাণুর ভয়াবহতাও অতি তুচ্ছ। এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে তিতিক্ষার মনোভাব মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস ঐক্যবন্ধ মানবজাতির সংগঠনে ভারতবর্ষের স্বধর্মোচিত দান তিতিক্ষার কথা আমাদের বংশধরগণ পূর্বালোচনার সময় স্বীকার করবেন।

পাশ্চাত্য এবং তার সম্ভাব্য দান সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আমি আলোচনা করেছি। মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে পাশ্চাত্য সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা বলার আছে। আমি পাশ্চাত্যের আধুনিক উদারনীতিবাদের বিষয় উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্য তার এই অবদান সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গতভাবেই গর্ববোধ করতে পারে। কারণ, এই উদারনীতির ফলস্বরূপ আরও কিছু কিছু সুকীর্তি পাশ্চাত্য দেখিয়েছে। যেমন, আমার স্বদেশবাসীরা এরই বশবর্তী হয়ে অবশেষে ভারত শাসনের অধিকার পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষেরই নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের হাতে ভারত সরকারের ক্ষমতা সমর্পণ করে গেছেন। আজ যাদের কাছে এই ক্ষমতা সমর্পণ করা হল, তাঁরা পূর্বতন বৃটিশদের হাতে কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। আমি পাশ্চাত্যের এই উদারনীতিবাদের জন্য গর্ববোধ করি। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এই দুই দেশের তিক্ত সম্পর্কের অধ্যায় যে মধুরভাবে শেষ হয়েছে তার কৃতিত্ব উভয়েরই। বর্তমানের সংকট-গ্রস্থ প্রজন্মে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে ভারতবর্ষের যে ঘৃণাবিমুক্ত ভাবধারা পরিপূর্ণ সফলতায় বিধৃত হয়েছে, তারই সঙ্গে পশ্চিমের উদারনীতিবাদের সম্মিলনের ফলেই এ সম্ভব হল। আমাদের উদারনীতিবাদ ভারতবর্ষের গান্ধীবাদের সঙ্গে সঙ্গীত ধ্বনির মতো মিলিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তার মধ্যেও পশ্চিমের উদারনীতিবাদের প্রতি ভারতবর্ষের অনুরাগ স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিমী প্রথায় সংবিধানের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পরিষদীয় নীতি অনুসারে আত্মশাসনের পদ্ধতি ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে।

এই পরিষদীয় গণতন্ত্রের মধ্যেই পাশ্চাত্য তার উদারনীতিবাদের স্বধর্মকে রাজনৈতিক অভিব্যক্তি দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষকে এই সত্য স্বীকার করে নিতে হবে যে, উদারনীতিবাদ কখনোই কেবলমাত্র পশ্চিমের একক জীবনদর্শন ছিল না। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টদের Wars of Religion-এর ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্য জগতে যে নৃশংস গৃহযুদ্ধের পালা আরম্ভ হয়েছিল, তার জিঘাংসা ও ঘৃণার মনোবৃত্তিরই প্রতিক্রিয়ারূপে সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমের উদারনীতিবাদ জন্মগ্রহণ করে। আর, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধাচরণ এখনো স্তব্ধ হয়নি। পশ্চিমে আমার সমসাময়িক যাঁরা তাঁরা নৃশংস গৃহযুদ্ধের আরও একটি পালার ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন—সেই দুইটি যুদ্ধই ইউরোপে আরম্ভ হয়ে বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশে উদারনীতিবাদের বিরোধীরা এই দুই যুদ্ধেই উদারনীতিবাদকে প্রায় মৃত্যুর কিনারায় নিয়ে এসেছিলেন। কাজেই দেবতা জেনাসের মতোই পাশ্চাত্য দ্বিমুখী, তার অন্তরের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ ভাবধারা এবং মূল্যবোধের যে সংঘাত চলছে, তারই প্রতিফলন এই বিপরীত আননে। এই সত্য উদারনৈতিক পশ্চিমীদের মধ্যে বেদনামিশ্রিত বিস্ময়ের সঞ্চার করে। আমাদের পক্ষে এই সত্য স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু আমি বুঝি যে, পাশ্চাত্য-বহির্ভূত বাদবাকি মানবজাতির কাছে এই সত্য অতি সুস্পষ্ট। পশ্চিমের এই দুই বিপরীত মূর্তির উভয় দিকই ইহুদিদের কাছে বহুদিনের পরিচিত, অধুনা এর পরিচয় এশিয়া এবং আফ্রিকার মানুষেরাও পেয়েছে। ভারতবাসীরা এ যুগে পশ্চিমের ইতিহাসের যে অধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছেন, আমি যে অধ্যায়ের ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলাম, তারই অভিজ্ঞতা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, উদারনীতিবাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন স্বাধীনতার বেলায় তেমনি এর বেলায়ও শাশ্বত প্রহরার দ্বারাই এর মূল্য পরিশোধ করতে হয়। কারণ এরও দুরারাধ্য লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা।

এবার আমার মূল বক্তব্যের অবতারণায় আসা যাক। বিশ্বব্যাপী ঐক্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি প্রথমে আলোচনা করব।

বর্তমান মুহূর্তে এই ঐক্যের আবশ্যকতা যে আমরা এত তীব্রভাবে বোধ করছি, তার কারণ একাধারে যেমন চাঞ্চল্যকর তেমনি আবার বৈশিষ্ট্যহীন। এই কথাটাই স্পষ্টভাবে একটি সূত্রাকারে বর্ণনা করা হয়েছে : হয় বিশ্ব অখণ্ড থাকবে, নতুবা বিশ্বের অস্তিত্বই থাকবে না। আজিকার বিশ্বে প্রত্যেক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নর-নারীর কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান পারমাণবিক যুগে আমরা যদি যুদ্ধকে বিলুপ্ত করতে না পারি, যুদ্ধই আমাদের বিলুপ্ত করে দেবে। এমন একটা বহুকথিত উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে সংকোচবোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যতদিন যুদ্ধ একটি স্বীকৃত প্রথারূপে গণ্য হচ্ছে এবং যতদিন এই প্রথা অবলম্বনে মানুষ ইচ্ছুক থাকছে, ততদিন এবিষয়ে আলোচনা না করেও কোনো উপায় নেই।

যুদ্ধ সম্পর্কিত আমাদের বর্তমান সংকট মানব ইতিহাসে কোনো অপরিচিত ঘটনা নয়। যতদিন কোনো সামাজিক অন্যায় ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায় ততদিন সামাজিক অন্যায়কে মানুষ বরদাস্ত করতেই অভ্যস্ত, কারণ মানুষের জীবন তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। যেমন দাসত্বপ্রথার বেলায় ঘটেছে, মানবজাতি হাজার হাজার বৎসর এই অন্যায় বরদাস্ত করেছিল। কোনো অন্যায় প্রথা যতই কুৎসিৎ হোক, সে যদি ধ্বংসাত্মক না হয় তাহলে মানুষ স্বভাবজনিত অভ্যস্ততার বশেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, অন্যায়টা যখন প্রাচীন তখন নিশ্চয় তা মানুষের জন্মগত পাপ এবং তাই যদি হয় তাহলে এর প্রতিকারও নিশ্চয়ই মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু একথা সুবিদিত যে, মানুষের ইতিবৃত্ত কখনোই নিশ্চল নয়। প্রচলন এবং অভ্যস্ততার দরুণ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চিত্রপটে কতকগুলি প্রথা স্থায়ী বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু আজ হোক কাল হোক, একদিন না একদিন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জাগরণের ন্যায় অন্তস্তল থেকে অভ্যুত্থান দেখা দেয়। যে প্রচেষ্টাকে মানুষ এতকাল নিশ্চিত অসম্ভব বলে বাতিল করে এসেছে, এই ধরনের একটা অভ্যুত্থানের পর সেই প্রচেষ্টাই মানুষ বিলম্বে আরম্ভ করতে বাধ্য হয়। অথচ কাল-বিলম্বের দরুন তখন সেই চেষ্টা সময়ের প্রতিকূল হয়ে পড়ে। যে অন্যায় এতকাল জন্মগত বলে বিশ্বাস করে এসেছি তার মূলোচ্ছেদ করে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে তখন আমরা বাধ্য হই। একে আমরা নিশ্চিহ্ন করব, অথবা এর হাতে আমরা নিশ্চিহ্ন হবো—এই বিকল্প যখন উপস্থিত হয় তখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে, আর একে বিধিলিপি বলে বরদাস্ত করা যায় না। প্রতিকার অসাধ্য এই পূর্বতন বিশ্বাস আবার আমাদের যাতে পঙ্গু করে ফেলতে না পারে সেইজন্য প্রতিকারের চেষ্টায় তখন আমাদের নামতে হয়। যুদ্ধ সম্পর্কে আজ আমরা এই প্রকার অবস্থারই সম্মুখীন হয়েছি।

এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া মানুষের নির্বোধ স্বভাবের ফল। এটা কেবল নির্বুদ্ধিতা নয়, নির্বোধ জেদও। শুধু তাই নয়, এই নির্বুদ্ধিতা মনুষ্য স্বভাবেরও অনুপযুক্ত। মনুষ্যত্বের অর্থই হচ্ছে তার পশ্চাৎদৃষ্টি থাকবে এবং পশ্চাৎ দৃষ্টিকে সে দূরদৃষ্টিতে পরিণত করবে। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে রণ দেবতা তাঁর প্রথম বৃহৎ মারণযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। বর্তমানে যেখানে ইরাক সেখানে আমাদের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন সুমেরিয় এবং আক্কাদীয় সভ্যতা ঐ সহস্রাব্দেই যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয়েছিল। তারপর থেকে এতদিন পর্যন্ত যদিও আমাদের কারিগরীবিদ্যার উন্নতি ক্রমাগত পারমাণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল, তথাপি বিগত এই চার হাজার বৎসর যাবৎ আমরা যুদ্ধের প্রথাকে

অব্যাহত থাকতে দিয়েছি। সতর্ক হওয়ার অবকাশ পেয়েছি আমরা চার হাজার বৎসর যাবৎ, কিন্তু একের পর এক সুযোগ আমরা অবহেলায় নষ্ট করেছি। বর্তমান দুর্দশার জন্য আর কেউ নয়, আমরা নিজেরাই দায়ী।

মানবিক ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করাটা নিরাপদ নয়। কিন্তু তার চেয়েও বিপজ্জনক হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করে থাকা। বাঁচতে হলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনুমান করতে হয়। আমার নিজের অনুমানের মূল্য কতটুকু জানিনে, কিন্তু আমার ধারণা যে, যুদ্ধের এই প্রাচীন প্রথাটির বিলোপসাধনে এবার আমরা সার্থক হতে চলেছি। ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ-সাধন যতটা দুরূহ হয়েছিল, এ চেষ্টা নিশ্চয়ই তার চেয়ে দুরূহতর হবে না। যুদ্ধের মতোই ক্রীতদাস প্রথাও বহু পুরাতন এবং আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। অতীতে একাধিকবার নিজেকে নিজের সৃষ্ট বিপদ থেকে মানুষ শেষ মুহূর্তে রক্ষা করেছে।

যুদ্ধের বিলোপ সাধন করতে হলে যতই খীজাকারে হোক, একটি অখণ্ড বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন করতে হবে। পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রথম প্রয়োজন। বিশ্ব কর্তৃত্বমূলক যে সংস্থা আমরা স্থাপন করব, তার আরম্ভ হতে হবে এইখানে। যদি আমরা এই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হই, তারপরে কি এইখানেই আমাদের প্রচেষ্টা শেষ হয়ে যাবে? অবশ্যই নয়। চলার পথে মানুষের পক্ষে কখনোই বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব নয়। আমরা থামতে পারি না, কারণ একটা সমস্যার সমাধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটার উৎপত্তি হবে। যুদ্ধের বিলুপ্তি ঘটা মানেই আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সম্মুখে এসে দাঁড়াব। অবশ্য এই সমস্যা নূতন নয়। যুদ্ধের সমস্যা কিংবা ক্রীতদাস প্রথার চেয়ে এ সমস্যা আরও অনেক পুরাতন। মানুষের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটিরও জন্ম হয়েছিল। মানুষের সংগঠন ক্ষমতা যতদিন সভ্যতার স্তরে না পৌঁচেছে ততদিন ক্রীতদাস প্রথার আবির্ভাবও সম্ভব ছিল না, যুদ্ধেরও না। অপর পক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা মনুষ্যজাতির মতই সমান পুরাতন। বস্তুতঃ প্রাণের আবির্ভাব যতদিনের পুরাতন ঘটনা, এও ততদিনেরই পুরাতন। শুধু এইটুকুই এর নূতনত্ব যে, অধুনা এ সমস্যা মানুষের নিজের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কাজেই আমরাও এর সম্বন্ধে সচেতন হতে বাধ্য হয়েছি।

মানবিক আদর্শ এবং চিন্তাধারা অনুযায়ী এই পৃথিবীতে জনসংখ্যার আকৃতি যতখানি হওয়া বাঞ্ছনীয় সেই অনুপাতে মনুষ্যজীবনকে নিয়মিত করার ক্ষমতা এতকাল মানুষের করায়ত্ত ছিল না। এই পৃথিবীতে যে-ই ভূমিষ্ঠ হোক, তার প্রত্যেককেই আমরা একটা পরম মূল্য দিয়ে থাকি। আমাদের কাছে সেই পুরুষ বা নারীর একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যে ব্যক্তি সমষ্টি নিয়ে মনুষ্যজাতি গঠিত, স্বতন্ত্রভাবে তার প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ যদি সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ পায়, তবেই আমাদের কাছে মনুষ্যজাতিরও বাঁচার অর্থ কিংবা তাৎপর্য থাকে। মানুষের নিজের তৈরী মূল্যায়নমান অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের প্রাণই অমূল্য। যে সব প্রজাতির নিদর্শন অনায়াসে নষ্ট করা যায়, তার মধ্যে মানুষ পড়ে না। কিন্তু প্রকৃতি তার অজস্র প্রজাতির যে কোনো নিদর্শনই অফুরন্ত নষ্ট করতে প্রস্তুত। আর, খরগোস, হেরিং কিংবা মশার মতো এই গ্রহের আর পাঁচটা প্রাণীর সংখ্যা প্রকৃতি তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় যে ভাবে নিয়মিত করে, এতদিন পর্যন্ত মানুষের সংখ্যাও সেইভাবেই প্রকৃতি নিয়মিত করেছে এবং অক্ষম ক্লীবের ন্যায় মানুষকে তাই স্বীকার করে নিতে হয়েছে। মানুষ যদি বাধা না দেয়, প্রকৃতি যদি নিজেই এই কর্তব্য সাধন করে তাহলে এ ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় প্রক্রিয়া

নেই। আর, এই প্রক্রিয়ার ফল অমানুষিক অপচয় এবং নির্মমতা।

মানুষের প্রজননও যদি খরগোস জাতীয় প্রাণীর মতোই চলতে থাকে, অথচ তৎসত্ত্বেও যদি মনুষ্যজাতির মোট সংখ্যা নিয়মিত রাখতে হয়, তার জন্য প্রকৃতিদেবীর অস্ত্রাগারে তিনটি প্রাণান্তক আয়ুধ রাখতে হয়েছিল : দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি এবং যুদ্ধ। আর, মানুষ নিজেই তার আত্মবিকৃতির দ্বারা প্রকৃতির হস্তে এই তৃতীয় আয়ুধটি তুলে দিয়েছে, যার নাম যুদ্ধ।

প্রকৃতির নিজস্ব প্রক্রিয়াগুলির অন্যতম হচ্ছে, এক শ্রেণীর প্রাণীকে অপর শ্রেণীর শিকারে নিযুক্ত করা। প্যালিওলিথিক যুগে দেখা গেল, বাঘ বা সিংহের শিকারে পরিণত হওয়া থেকে মানুষ আত্মরক্ষার উপায় শিখে নিয়ে প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়েছে। অথচ তারপর মানুষ নিজেই আবার আত্মবিকৃতির রাস্তায় প্রকৃতির হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়ল। কারণ প্রকৃতিকে সে এমন এক অস্ত্র তৈরী করে দিল, যে অস্ত্র প্রকৃতি কখনো তৈরী করেনি এবং মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্য ছাড়া সে অস্ত্র তৈরী করা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভবও ছিল না। মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাঁধানোর এবং ক্রমশঃ সেই যুদ্ধকে নৃশংসতর করার উপায় উদ্ভাবন করে মানুষ নিজেই নিজের উপরে শিকারীর থাবা বিস্তার করল। শিকারী পশু হিসাবে বাঘ কিংবা সিংহের চেয়েও মানুষ আরও দক্ষ। এমনকি জীবাণুর চেয়েও সে আরও দক্ষ। অর্থাৎ আপনার শৌর্যবলে মানুষ প্রকৃতিদেবীর হাত থেকে তাঁর স্বহস্ত নির্মিত যে দুইটি বড় আয়ুধ পর পর খসিয়ে দিয়েছিল, তারই পরিবর্তে সান্ত্বনার পারিতোষিক হিসাবে প্রকৃতি দেবীকে সে নিজেই এই মনুষ্যসৃষ্ট অস্ত্রটি দিয়েছে, যার নাম যুদ্ধ। সিংহ বা বাঘের শিকার হিসাবে প্রকৃতি যেভাবে আমাদের প্রাণনাশের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, প্যালিওলিথিক যুগেই সে ব্যবস্থা আমরা রদ করেছিলাম। জীবাণুর আক্রমণের দ্বারা আমাদের বধ করার যে আয়োজন ছিল, এ যুগে প্রকৃতিকে সে আয়োজন থেকেও আমরা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছি। প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে সংগ্রামে এই দ্বিতীয় বিজয় অধিকতর উল্লেখযোগ্য, কারণ এই জয়লাভ ছিল দুঃসাধ্যতর। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অযাচিত বদান্যতার দ্বারা প্রকৃতির কাজ আমরা নিজেরাই করে যাচ্ছি। তাও এমনভাবে করছি যে, বোধহয় প্রকৃতির একার শক্তিতে এত সার্থকভাবে তা করা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ আমরা যুদ্ধের প্রথাকে এখানেও বাঁচিয়ে রেখেছি।

ধরুন, যদি আমার ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হয়, ব্যাধিজনিত অকাল মৃত্যু রোধ করার সামর্থ্য অর্জনের পর, এখন যুদ্ধজনিত মৃত্যু রোধ করতেও আমরা সক্ষম হলাম। যদি প্রকৃতির উপরে মানুষের এই দ্বিবিধ বিজয় সূচিত হয় তাহলে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যার স্বাভাবিক সাম্য অন্তত মনুষ্যজাতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টে যাবে। একজনের জীবৎকালেই এই পৃথিবীতে যদিও পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং তার মধ্যে দ্বিতীয়টির পরিসমাপ্তি যদিও মাত্র ১৫ বৎসর পূর্বে ঘটেছে তথাপি ব্যাধিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করতে পারার ফলে ইতিমধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ক্রমশঃ বিস্ফোরক অবস্থায় এসে তো পৌঁচচ্ছেই, তা ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিও চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের অভীষ্টকে জয়যুক্ত করার জন্য যে লড়াই চলেছে, এ পর্যন্ত তার মধ্যে দুইটি বৃহত্তম সাফল্য আমরা লাভ করেছি। প্রতিষেধক ঔষধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের অধুনাতন আবিষ্কারগুলি তার একটি। এই সব আবিষ্কার যাতে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে ফলপ্রসূ হতে পারে তার জন্য যে আধুনিক প্রশাসনিক সংগঠন স্থাপিত হচ্ছে, সে হল আর একটি সাফল্য। এই দুইটি ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছি বলেই এখন প্রকৃতির সঙ্গে রণে ভঙ্গ দেওয়া আরও অসম্ভব—কারণ এই আংশিক বিজয়কে সার্থক সমাপ্তির মধ্যে স্থায়িত্ব দিতে হবে। এই গ্রহে মানুষের সংখ্যা নিরূপণের

জন্য যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল তার পরিবর্তে একটি মানবিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সক্ষম হয়েছি বলেই আজ আমাদের সম্মুখে আর একটি প্রশ্ন অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই প্রশ্নের মীমাংসা থেকে আজ আর পালানোর উপায় নেই। যদি আমরা প্রজনন সংখ্যা নিয়মিত করতে সম্মত হই তাহলে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের জয়-যাত্রাও সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ একদিকে যেমন মৃত্যুর সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কমে গেছে, তেমনি অন্যদিকে প্রজনন সংখ্যাও যতখানি প্রয়োজন সেই অনুযায়ী স্বেচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে এবং নিয়ন্ত্রিত করে জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যাকে আমরা পুনরায় সামঞ্জস্যের মধ্যে আনতে পারি। বিকল্প হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণের দায়িত্ব আমরা প্রকৃতির হস্তেও ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের বর্তমান আংশিক সাফল্য অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে মনুষ্য জাতির আয়ুষ্কালও সীমাবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রকৃতির নিজস্ব প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রজনন সংখ্যাকে সর্বোচ্চ গতিতে বর্ধমান রাখা। কারণ, তার হাতে মৃত্যুর সংখ্যাও সর্বোচ্চ গতিতেই বর্ধমান আছে। মানুষের চেষ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা আজ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস করা গেছে, কাজেই যতদিন জন্ম মৃত্যুর আনুপাতিক হার সামঞ্জস্যের মধ্যে না আসছে ততদিন পৃথিবীর জনসংখ্যা স্ফীততর হতে থাকবে। তবে একটা কথা সুনিশ্চিত, যেকোনো উপায়েই হোক একদিন না একদিন এই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হবেই। এই পৃথিবীতে কোনো প্রাণীই তার সংখ্যা যথেচ্ছভাবে বাড়াতে পারেনি, বা পারা সম্ভব নয়। জীবসত্ত্বা গঠিত হওয়ার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন, পৃথিবীতে তার পরিমাণ সীমাবদ্ধ। যখন বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা তাদের সংখ্যা স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টার দ্বারা নিরূপণ করতে চাইবে না; অথবা করতে ব্যর্থ হবে, তখন তাদের প্রজনন সংখ্যা বহিঃশক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। মানবেতর প্রাণীরা নিজেদের জন্মের হার নিজেরা স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাদের সংখ্যা হয় প্রকৃতি, নয় মানুষের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং হতে থাকবেও। মানুষের সংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য, কিন্তু এর জন্য প্রকৃতির উপরে মানুষকে নির্ভর করতে হয় না, স্বহস্তে আত্ম-সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ করার এই অসামান্য ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে।

মানুষের ভবিষ্যৎ শুভ অশুভ যাই হোক, নির্ভর করছে এই সিদ্ধান্তের উপরে। ধরুন, আমরা স্থির করলাম, ব্যাধিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা যে ভাবে হ্রাস করা হয়েছে, ভবিষ্যতেও সেইভাবে আরও হ্রাস করা হবে। ধরুন, আমরা স্থির করলাম, যুদ্ধজনিত মৃত্যুও আমরা অসম্ভব করে দেব। ধরুন, তারপর আমরা জন্মসংখ্যা হ্রাস করার দুরূহতর কর্তব্যও সম্পন্ন করলাম। এ প্রচেষ্টা দুরূহতর এই জন্য যে, শুধু বিভিন্ন সরকারের মধ্যে চুক্তি সাধনের দ্বারা এ কার্য সম্পন্ন করা যাবে না। কোটি কোটি স্বামী-স্ত্রী যদি নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে কোটি কোটি সিদ্ধান্ত করতে পারেন, তবেই এই কার্য সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু মানুষকে তার সন্তান-সন্ততি নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা যায় না। যথেষ্ট সময় দিলে একমাত্র শিক্ষা এবং আলোচনার দ্বারাই তাদেরকে এই কাজে সম্মত করানো যায়। কিন্তু ধরুন এর জন্য যতদিন সময় লাগবে, পৃথিবীর মোট খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বিজ্ঞানের সাহায্যে সর্বোচ্চ সীমায় তুলে এনে আমরা ততদিন পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করলাম। ধরুন, এর মধ্যে পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা আমরা সম্পূর্ণরূপে নিয়মিত করতেও সক্ষম হলাম। যদি সত্যই তা সম্ভব হয় তাহলে আদর্শ মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারাকে কাজে রূপায়িত করারও নূতন সম্ভাবনা দেখা দেবে।

এই পৃথিবীতে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে, সৎজীবন যাপনের প্রশস্ততম সুযোগ সে

যাতে যথাসম্ভব পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে আমরা সক্ষম হব। আর, এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য, সৎ বলতে আমি মানসিক মূল্যবোধের দিক থেকে যা ভাল তা-ই বোঝাতে চাইছি। মানব হিতের প্রয়োজনে পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়মিত করার তাৎপর্য আছে, কারণ এই নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে পৃথিবীর প্রতিটি মনুষ্য সন্তানের মূল্যবোধ স্বীকৃত হবে। এতে করে ভবিষ্যতে মানব সন্তান একটি মূল্যবান প্রজাতির মূল্যহীন নিদর্শনরূপে প্রকৃতির হাতে আর নিগৃহীত হবে না।

এবার আমাদের সম্মুখে আর যে বিকল্প আছে তার আলোচনায় আসা যাক। এখনও অনেক দেশে প্রকৃতিই মানুষের জন্মের হার নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু প্রকৃতিকে সেই অধিকারই যদি আমরা দিই তাহলে বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা কাজে লাগিয়েও আমরা যতটুকু খাদ্যোপাদন বৃদ্ধি করতে পারব, তা দিয়ে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না। এতে হয়তো সর্বনাশের দিন পিছিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু তাও বেশীদিনের জন্য নয়। প্রকৃতি দেবীর কাছ থেকে প্রত্যাঘাত আসবেই। আর সেই আঘাতে তাঁরই জয় হবে। কারণ, তাঁর হাতে এখনও একটি প্রাণান্তক আয়ুধ রয়েছে, যে আয়ুধ মানুষ কেড়ে নিতে পারে নি। দুর্ভিক্ষই সেই আয়ুধ। জন্মের হার যদি আমরা প্রকৃতিকেই নিয়ন্ত্রণ করতে দিই তাহলে এমন একদিন আসবে, যখন প্রকৃতি এই দুর্ভিক্ষের অস্ত্র অবশ্যই নিক্ষেপ করবে। আর, দুর্ভিক্ষ তার সহযাত্রীরূপে যুদ্ধ ও মহামারীকে ডেকে আনবে। এমনকি, প্রাক পারমাণবিক যুগেও যদি এই ঘটনা ঘটত তাহলেও মানবিক আদর্শ এবং লক্ষ্যগুলির দিক থেকে দেখলে মানুষের পক্ষে এ দুঃসহ পরাজয় বলেই গণ্য হত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মানবিক প্রক্রিয়া আধাআধি প্রয়োগ করার পরে আবার প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহলে আমাদের খরগোস কিম্বা হেরিং-এর স্তরে অধঃপতিত হতে হয়। মানবেতর জীবেরা হাজারে হাজারে জন্মাচ্ছেও, মরছেও। নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এর চেয়ে কম নির্মম এবং কম অপচয়মূলক কোন পদ্ধতির ক্ষমতা তারা রাখে না। কিন্তু বর্তমান পারমাণবিক যুগে মানুষের জন্য এই অধঃপাতগ্রস্ত ভবিষ্যতের পথও খোলা নেই। কারণ দুর্ভিক্ষ যে যুদ্ধকে সাথে করে নিয়ে আসবে, সে অতীতের তীর ধনুকের লড়াইও নয়, গোলা বন্দুকের যুদ্ধও নয়। এ সেই প্রলয়ঙ্কর পারমাণবিক যুদ্ধ। কাজেই এই দুই ভবিষ্যতের একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে। মানবিক এবং মনুষ্যোচিত পদ্ধতি অনুসারে জন্ম সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, অথবা দুর্ভিক্ষের পরিণতিরূপে যে পারমাণবিক যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তাতে মনুষ্যজাতির সমূহ আত্মবিলুপ্তি ঘটানো।

দুর্ভিক্ষের অভিশাপ সম্বন্ধে সমসাময়িক যুগের কোনও ইংরেজরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ইংরেজের ইতিহাসে দেখা যাবে যে গত ছয় শত বৎসরের মধ্যে তার দেশে কোন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ইংল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। আমি নিজে গোটা যুদ্ধের সময়টাই ইংল্যাণ্ডে কাজ করেছি এবং যুদ্ধকালীন র‍্যাশন দিয়েই আমাকে চালাতে হয়েছে, কিন্তু একদিনের জন্যেও আমাকে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করতে হয় নি। কিছুকাল পূর্বে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে সাময়িকভাবে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে কিছু লোক যারা মুক্তিলাভ করেছে, তাদের পক্ষে এ চিন্তা মাথায় আনাও সহজ নয়। কিন্তু যেমন ভারতবর্ষ, সেখানে দুর্ভিক্ষ এখনও প্রত্যক্ষ বাস্তব। মানবজাতির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশীর ভাগ লোকের উপরে এখনও দুর্ভিক্ষের ছায়া শকুনের মতো উড়ছে। শেষ এই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বাঙালা দেশের উপরে যখন পড়েছিল সেও তো মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেকার কথা।

তবে, আমার ধারণা, জন্ম সংখ্যা নিরোধের ব্যাপারে ভারত সরকার যতটা উদ্যোগী এবং জনসাধারণ যতখানি সক্রিয়, ততখানি সরকারি উদ্যম বা জনসাধারণের সক্রিয়তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

সুতরাং শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, খাদ্য ও জনসংখ্যার সমস্যা যদি মেটাতে হয় এবং যুদ্ধকে যদি আমরা বিলুপ্ত করে দিতে চাই তাহলে মনুষ্যজাতিকে একটি অখণ্ড বিশ্বজনীন সমাজের মধ্যে ঐক্যবন্ধ করতে হয়। একটি দেশ কিম্বা কোন একটি মহাদেশের জন্মের হার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা গোটা মনুষ্যজাতির জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। পশ্চিমে অনেক দেশে জন্মের হার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর জনসংখ্যা বিপজ্জনক গতিতে এখনও ক্রমবর্ধমান। জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে যদি প্রকৃতই কার্যকরী করতে হয় তাহলে একে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টায় রূপ দিতে হবে। অন্য দিকে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাকে যদি যথার্থ সার্থকতা দিতে হয় তাহলে দুনিয়ার চাষযোগ্য সমস্ত ভূমিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অখণ্ড এবং এককরূপে পরিচালনা করতে হবে। আর, পৃথিবীর যেখানেই যে খাদ্য উৎপন্ন হোক না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তে মানুষ ক্ষুধার্ত সেখানে সেই খাদ্য পেঁছে দিতে হবে। জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হতে যতদিন লাগবে ততদিন আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মরক্ষা করব ভাবছি, কিন্তু এই সাংগঠনিক প্রয়োজনগুলি যদি চরিতার্থ না হয় তাহলে বিজ্ঞানও পঙ্গু হয়ে পড়বে। এই প্রয়োজনগুলি মূলতঃ রাজনৈতিক। খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের কর্তৃত্ব স্থানীয় গভর্ণমেন্ট-গুলির পরিবর্তে যদি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশ্বকর্তৃত্বমূলক সংস্থার হস্তে স্থানান্তরিত করা না হয় তাহলে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে না। এই প্রয়োজনের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে যদি একত্র করা যায় তাহলেই দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দ্বারা মনুষ্যজাতির ঐক্যসাধনের প্রয়োজনীয়তাও উপস্থিত হয়েছে।

অতএব পুরোপুরি যদি নাও হয়, ন্যূনপক্ষে অন্তত কতকগুলি রাজনৈতিক সংস্থার ভিত্তিতে বিশ্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা আমাদের বর্তমান যুগে মনুষ্যজাতির আত্মরক্ষার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই লক্ষ্যটি প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই পরম মূল্যবান। সমগ্রভাবে মনুষ্যজাতি যদি আত্মরক্ষা করতে না পারে তাহলে মানুষের অস্তিত্বও থাকছে না, মানুষকে যোগ্য জীবনের উত্তরাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হচ্ছে। আমাদের সম্মুখে যে নূতন শঙ্কা দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির আত্মঘাতী হওয়ার এই শঙ্কা থেকেই আমাদের মনে বিশ্বব্যাপী দেশাত্মবোধের প্রেরণা সঞ্চারিত হওয়া উচিত। আর, ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জাতীয় সত্তার প্রতি আমাদের যে সনাতন আকর্ষণ রয়েছে, তার ঊর্ধ্বে এই বিশ্বজনীন দেশাত্মবোধ আজ আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় কথা, গোটা অস্তিত্বটাই যদি ধ্বংস হয়, এর কোনো অংশবিশেষ সেই নিধনযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাবে না। সুতরাং মনুষ্যজাতির ঐক্যসাধন অপরিহার্য লক্ষ্য। কিন্তু এই ঐক্যসাধনের লক্ষ্যকে আমি এ পর্যন্ত যেভাবে বর্ণনা করেছি, তাতে মনে হবে, প্রয়োজনের স্বার্থবোধ থেকেই মানুষের উচিত এই উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত হওয়া। অথচ মানুষের একটা মস্ত বড় চরিত্র লক্ষণই এই যে, প্রয়োজনের স্বার্থ যত বড়ই হোক, তার পক্ষে সেই স্বার্থ-বোধের তাগিদ কখনোই যথেষ্ট নয়। দুরূহকে এবং মহৎকে জয় করার জন্য যে প্রবল অনুপ্রেরণা দরকার, সে অনুপ্রেরণা শুধু বৈষয়িক তাগিদ থেকে মানুষ লাভ করতে পারে না।

শুধু তাই নয়, যদি নিছক প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধও করতে পারে তাহলেও তার আত্মার ক্ষুধা অতৃপ্ত থেকে যাবে।

ঐক্যবদ্ধ পরিবাররূপে মানুষ যে একত্র জীবনযাপন করবে, তার ভিত্তিমূলে তাহলে আর কি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রেরণা থাকতে পারে? খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত একটি নাটকের একটি পংক্তিতে আমি এই প্রেরণার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। নাটকটি লিখেছিলেন এশিয়া থেকে আফ্রিকায় আগত ঔপনিবেশেকদের মধ্যে এক কবি, কিন্তু ইনি তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন রোমে এবং তাঁর সাহিত্য রচনা সমস্তই লাতিন ভাষায়। তাঁর উক্তিটি এই : 'আমি মানুষ, মানুষের ধন আমার কাছে কিছুই যাবে না ফেলা।' এই লাতিন কবির মাতৃভাষা ছিল পিউনিক, অথবা ফিনিসীয়, অর্থাৎ হিব্রুর সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত। কাজেই হিব্রু ভাষায় লেখা এক অজ্ঞাতনামা ইজরাইলী কবির একটি উক্তি আমার মনে পড়ল। সেই বিখ্যাত উক্তিটি প্রতিবাদী প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞাসিত হয়েছিল। ঈশ্বর যখন কেইনকে তার ভ্রাতা আবালের হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করেছিলেন, তখন কেইন আত্মপক্ষ সমর্থনে তার প্রতিবাদ আরম্ভ করেছিল এই উক্তির দ্বারা : 'আমি কি আমার ভ্রাতার প্রতিপালক?' *Book of Genesis*-এর কাহিনী অনুসারে প্রশ্নটি স্বমীমাংসিত। ঈশ্বর মনে করেন এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক নয়। সুতরাং কেইনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঈশ্বর সরাসরিই তাঁর রায়ে ঘাতককে দণ্ডাদেশ দিলেন।

এখানে ঐক্যসাধনের জন্য যে মহৎ প্রেরণার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, সে প্রেরণা সাময়িক প্রয়োজনের স্বার্থে সীমাবদ্ধ নয়। যতই জরুরী এবং যতই শোভন হোক, কোনো বৈষয়িক বিবেচনাবুদ্ধির দ্বারা এই প্রেরণা সীমিত নয়। এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এক প্রেরণার সাক্ষাৎ আমরা পাচ্ছি। এই প্রেরণা বাসনা বিমুক্ত, অফলপ্রত্যাশী। বাসনার প্রয়োজনও তার নেই, কারণ তার অপরিহার্যতা অন্তর্নিহিত। মানুষের স্বভাবের মতোই এই প্রেরণাও সমান পুরাতন এবং যতদিন কোনো মানুষ জীবিত থাকবে ততদিন এই প্রেরণাও জীবিত থাকবে। আমরা একে অপরের প্রতিপালক। যদি একটি মাত্র মানুষের স্বার্থও কোনো ব্যাপারে জড়িত থাকে, সে ব্যাপারে মনুষ্য জাতির পক্ষে উদাসীন থাকা কোনো মতেই সম্ভব নয়। এই উপলব্ধিকে আমরা সত্য বলে জানি এবং এই সত্য পালনের আহ্বান শুধু কর্তব্যবোধ সঞ্জাত নয়, ভাবাবেশ সঞ্জাত প্রেরণা। একথা নিঃসন্দেহ যে, যেদিন প্রাক্-মনুষ্যস্তর থেকে আমরা মনুষ্যস্তরে উন্নীত হয়েছি, সেইদিন থেকেই এই সত্যোপলব্ধিকেও প্রত্যেকেই আমরা অল্প-বিস্তর মারাত্মক আঘাতে আহত করেছি। *Book of Genesis*-এর যে অনুচ্ছেদটি আমি উল্লেখ করলাম, তার অজ্ঞাতনামা লেখক বলছেন যে, মানুষ মানুষকে হত্যা করার ঘটনা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল মানুষের দ্বিতীয় প্রজন্মেই। প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শনেও দেখা যাবে যে, দুইটি নৃশংস মারণপর্বের অন্তবর্তীকালেও মানুষ পরস্পরের প্রতি অমানুষিক হৃদয়হীনতার আচরণ দেখিয়েছে। ইতিহাসের জঘন্যতম নৃশংসতার ঘটনাও আমাদের প্রজন্মেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। যতই ক্ষুদ্র হোক, আজকের দুনিয়ার প্রত্যেকটি নরনারীই এই মহা-পাপের কিছু না কিছু অংশভাগী। হয়ত এর জন্য তাঁর নিজের দায়িত্বের অংশ বৃহৎ নয়, কিন্তু পরস্পরের প্রতি আমাদের এই পাপ প্রত্যেকের বিবেকের উপরেই ভার হয়ে রয়েছে। আমরা জানি, উপলব্ধিও করি যে, মানুষ হিসাবে যেহেতু আমরা পরস্পরের ভ্রাতৃতুল্য সেইজন্যই পরস্পরের সঙ্গে একত্রে এক পরিবারের মতো বাস করা আমাদের কর্তব্য। আসলে মানব সৌভ্রাত্রের মূল প্রেরণা এইখানেই।

মানুষ যে-সভ্যতার আওতায়ই গড়ে উঠুক না কেন, এই সৌভ্রাত্রবোধ তার জন্মগত। ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে যাঁরা গড়ে উঠেছেন তাঁদের হৃদয়ের প্রসারতা অনেক বেশী। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ জেনে এসেছে যে, শুধু মানুষে-মানুষে নয়, সমস্ত প্রাণীজগতের প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা সৌভ্রাত্র বন্ধনে আবদ্ধ। আমার বিশ্বাস যে, পশ্চিমের কোনো আগন্তুক ভারতবর্ষে এলে প্রথমেই একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়বে—পশ্চিমের দেশগুলিতে বন্য পক্ষী, এমনকি পশুরাও মানুষকে যতটা ভয় পায়, ভারতবর্ষে তাদের মধ্যে ততটা ভয় দেখা যায় না। তাদের ভাব দেখে মনে হয় যেন মানুষ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে বলে তারা ভাবে না। অভিজ্ঞতা থেকেই বন্য প্রাণীদের মধ্যে নিশ্চয়ই এই ভাব জন্মেছে। বন্য পশু পক্ষীরা এদেশের মানুষের কাছে যে অপেক্ষাকৃত বেশী মমত্ববোধের পরিচয় পেয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে, এ'রা বিশ্বসৌভ্রাত্রকে শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ রাখেননি। সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণবস্তুরই উৎস এক। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে সমস্ত প্রাণীকে যেভাবে আত্মীয়জ্ঞানে স্বীকার করা হয়েছে, তার মধ্যেই এই সত্যের চেতনা হাজার হাজার বৎসর পূর্বে দেখা দিয়েছিল। এও আর একটি আশ্চর্য ঘটনা, যেখানে intuition-এর দ্বারা মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে বহু পূর্বেই অনুমান করেছিল।

আমি নিশ্চিত যে, এই প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তি এবং ভ্রাতৃভাবের ধ্রুপদী অভিব্যক্তি ভারতবর্ষের সমস্ত যুগের সাহিত্যেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। ভারতীয় সাহিত্যে অজ্ঞতার দরুণ আমার পক্ষে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই অজ্ঞতার জন্যই আমার বক্তব্যের সমর্থনে সংস্কৃত, পালি অথবা তামিল সাহিত্যের পরিবর্তে লাতিন ও হিব্রু সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে হল। এই অন্তর্নিহিত সৌভ্রাত্র প্রত্যেকেই আমরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করি, কিন্তু কার্যত অনেকেই অনুসরণ করতে পারি না। এর সমর্থনে ভারতীয় সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে আমি অসমর্থ বটে, কিন্তু এর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি একজন ভারতীয়ের উল্লেখ করতে পারি। অশোক শুধু সম্রাটরূপে বিখ্যাত নন। সম্রাট ভাল মন্দ বহু ছিলেন। সুতরাং শুধু সম্রাট বলেই কেউ মানুষের মধ্যে স্মরণযোগ্য স্থান লাভ করে না। অশোক বিখ্যাত এই জন্য যে, তিনি এই সার্বজনীন সৌভ্রাত্রবোধকে কার্যে রূপায়িত করেছিলেন। তাঁকে যে অসাধারণ নৈতিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাও যথার্থ। কারণ, মানুষকে সমান ভ্রাতৃভাবে মানুষরূপে গণ্য করার এই অসামান্য সুযোগ যেমন রাজশক্তি দিতে পারে, তেমনি রাজশক্তির দ্বারা যে-মানুষ বলীয়ান তাঁর পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও বিবেকের নির্দেশ লঙ্ঘনের লোভ সম্বরণ করা এবং বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী চালিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

অশোককে মানুষ চিরকাল স্মরণ করবে এইজন্য যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের পরিবর্তে তিনি বিবেকবুদ্ধিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই কীর্তি আরও উল্লেখযোগ্য, কারণ রাষ্ট্রনীতি হিসাবে যুদ্ধকে পরিত্যাগ করার জন্য একালের মানুষ যে প্রত্যক্ষ, জরুরী প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করছে, প্রাক-পারমাণবিক যুগের মানুষ অশোকের জন্য সেই তাগিদ ছিল না। তৎকালে সবচেয়ে মারাত্মক যে অস্ত্র মানুষের আয়ত্ত ছিল, যদি তাই নিয়েই অশোক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন তাহলেও সমগ্র মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর প্রজাবৃন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এমন বিপদের কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। তিনি যদি কলিঙ্গ বিজয়ের পর, ভারতীয় উপদ্বীপের শেষ প্রান্ত অথবা সিংহল

পর্যন্ত তাঁর বিজয় অভিযান চালিয়ে যেতেন তাহলেও তো তাঁর এই ধরনের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেক রাষ্ট্র শাসককেই একটা দুরন্ত বাসনায় পেয়ে বসে—তাঁরা তথাকথিত প্রাকৃতিক সীমারেখার দ্বারা সাম্রাজ্যকে সুগঠিত করার জন্য কেবলি আত্মপ্রসারের দিকে অগ্রসর হন। এমন কার্যে অশোকও নিজেকে যুক্তিসংগতভাবেই এই সান্ত্বনা দিতে পারতেন যে, শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যেই তাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের ফলে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে শান্তি তিনি সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে স্থাপন করতে পারতেন।

এই সনাতন যুক্তিচিন্তায় অগ্রসর না হয়ে অশোক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কর্মপ্রণালী গ্রহণ করেছিলেন। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে তিনি যে কলিংগ রাজ্যকে মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রাস করেছিলেন, এই অপরাধের জন্য তাঁর মনে এক নৈতিক বীতস্পৃহা দেখা দিয়েছিল। সারাজীবন এরই দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন। তাঁর আক্রমণাত্মক অভিযান যে নৃশংসতা এবং দুর্গতি ঘটিয়েছিল, সেই দৃশ্য দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। সৌভ্রাত্রবোধের বিরুদ্ধে তিনি যে অপরাধ ঘটিয়েছেন তার জন্য নিজের বিবেকের সম্মুখে তিনি অপরাধী হয়ে দাঁড়ালেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি নিজ রাজবংশের এবং অন্য সমস্ত রাজবংশেরই, যা চিরাচরিত রীতি তার থেকে সরে দাঁড়ালেন। চিরাচরিত রীতি থেকে অশোকের এই ব্যতিরেক আরও লক্ষণীয় এইজন্য যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের অন্যায় পন্থা গ্রহণ করাটা শুধু মৌর্যদেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। যে সব রাজন্যশক্তি এই পন্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন, তাঁদের মধ্যেও এর ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র সার্বজনীনভাবে প্রচলিত। আলেকজাণ্ডারের অপকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্তকে প্ররোচিত করেছিল। সাইরাসের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন আলেকজাণ্ডার স্বয়ং। এইভাবে যেন কর্মের বিপরীত চক্র অনুসরণ করে এই ধারা চলে গেছে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মিশরীয় এবং সুমেরীয় সাম্রাজ্য নির্মাতাদের আমল পর্যন্ত। এই পূর্বসূরীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে সরে এসে অশোক সৌভ্রাত্রবোধের আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করার জন্য জীবনের অবশিষ্টাংশ এবং তাঁর রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করেছিলেন।

অশোক যুদ্ধ বর্জন করার সংগে সংগে মানবজাতির ঐক্যসাধনের সংকল্পকে বিসর্জন দেন নি। সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে অতঃপর তিনি ভিক্ষুবাহিনীর দ্বারা তাঁর এই লক্ষ্য-সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি সিংহলেও আপন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, শুধু সেখানেই নয়, তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের আরও পশ্চিমে যেখানে তৎকালে আলেকজাণ্ডারের অপকৃষ্ট ম্যাসিডনিয়ান গ্রীক উত্তরাধিকারীর রণতাণ্ডব চলছিল, সেখানেও তাঁর প্রভাব পেঁৗছেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের আচার ও বিশ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণের দ্বারা অশোক নিজের প্রভাব তাঁর সাম্রাজ্যসীমার বাইরে পেঁৗছে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় প্রচার কার্যের জন্য তাঁর কাজে কোনো প্রাকৃতিক সীমানার বাঁধন ছিল না, ভূপৃষ্ঠের যেখানেই মানুষের বাস আছে সেখানেই বৌদ্ধধর্মের বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন। সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে আজ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ছড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আধ্যাত্মিক সৌভ্রাত্রবোধ পৃথিবীর ঐক্যসাধনের পক্ষে প্রধান সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করেছে এবং এখনও করছে। তাদের এই সৌভ্রাত্রবোধ বর্তমান কালে বোধ হয় আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে। ভারতভূমিতে প্রধান দুইটি বৌদ্ধ তীর্থস্থান, সারনাথ ও বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করে তিন বৎসর পূর্বে আমার অন্তত এই ধারণাই হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাণময়তা এবং সর্বত্রগামিতার আরও অনেক

কারণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবার আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের হৃদয় পরিবর্তনের ফলে বৌদ্ধধর্মের এই বিস্তার এবং প্রাণময়তা সম্ভব হয়েছিল—তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনজনিত অভিজ্ঞতাকে কার্যে রূপায়নের ফলেই এ সম্ভব হয়েছিল।

অশোকের কার্যাবলী থেকে এ বিষয়ে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে মানবিক সৌভ্রাত্রবোধ শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। আমি যতদূর জানি, অশোক মৃগয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন, তাঁর সভাসদবর্গের জন্য নিরামিষ আহারের প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং তাঁর রাজ্যে বৎসরে ছাপ্পান্ন দিন পশু হত্যা আইনত নিষিদ্ধ ছিল। এই তিনটি অনুশাসনের মধ্যেই জীবপ্রেমের ভারতীয় আদর্শ প্রতিফলিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তির এই ঐতিহ্য আরও একটি অসাধারণ ঘটনায় প্রমাণিত হয়—হুবহু এই তিনটি অনুশাসনই অশোকের ১৮০০ বৎসর পরে আর একজন ভারতসম্রাট বলবৎ করলেন, তিনি সম্রাট আকবর।

আকবর যে-ধর্মপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে এই অনুশাসনগুলি প্রয়োগ করেছিলেন, সে বৌদ্ধধর্ম নয়, জৈনধর্ম (কারণ কমপক্ষে এর চার শত বৎসর পূর্বেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল)। তবু সে প্রেরণাও ভারতীয়ই। বিদেশীরা যদি ভারতের অধ্যাত্মশক্তির প্রভাবে আসেন তাহলে সেই শক্তি তাঁদের কি পরিমাণে বশীভূত করতে পারে, তার একটি হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত স্বয়ং আকবর—কারণ ভারতবর্ষে জীবন অতিবাহিত করার ফলে এই তুর্কী-সন্তানের চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তাকে আমরা 'ভারতীয়করণ' বলে আখ্যা দিতে পারি। তৈমুরের সাময়িক অভিযানের কথা বাদ দিলে আকবরের পূর্ব-পুরুষেরা ভারতবর্ষে কেউ পদার্পণ করেন নি—তাঁর পিতামহ বাবর প্রথম ভারত আক্রমণ করেন। বাবর তাঁর জীবনের যতটা সময় খাইবার গিরিবর্ত্মের পশ্চিমাঞ্চলে যাপন করেছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। বাবরের পৌত্র আকবরকেও মুসলমানরূপেই মানুষ করা হয়েছিল। তাছাড়া, ইহুদি গোষ্ঠীর অন্য দুইটি ধর্মের ন্যায় ইসলামধর্মও একান্তভাবেই আপন চিন্তার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ভারতবর্ষে যেসব ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের জন্ম হয়েছে, তাদের তুলনায় ইসলামের মনের কপাট অনেকটা রুদ্ধ। তৎসত্ত্বেও আকবরের মধ্যে ভারতীয় প্রভাব এমন গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল যে, তিনি নিজের ধর্ম নিজেই রচনা করে নিয়েছিলেন। আকবর প্রবর্তিত দীন ইলাহির মধ্যে প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তির যে উদারতা দেখতে পাওয়া যায়, সে একান্তভাবেই ভারতবর্ষীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

জন্তু জানোয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অশোকের মতো আকবরও বর্জন করেছিলেন, কিন্তু অশোকের মতো মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেও তিনি বর্জন করতে পারেন নি। অবশ্য বাস্তবের দিক থেকে, আকবরের পক্ষে এই সংকল্প গ্রহণ করা অশোকের চেয়ে দুরূহতর হত সন্দেহ নেই। অশোক যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, তার ক্ষমতা পূর্ব থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আকবরের পিতামহের সৃষ্ট সাম্রাজ্য তাঁর পিতা হারিয়েছিলেন, সেই হৃতরাজ্য আকবর পুনরুদ্ধার করেন। আকবর যদি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেও বর্জন করতেন তাহলে সম্ভবত তাঁকে সিংহাসনই হারাতে হত, এমন কি হয়ত নিজের জীবনও। তথাপি এই অনুমান হয়ত মিথ্যা নয় যে, দৈবক্রমে আকবরের স্থানে যদি অশোক জন্ম নিতেন তাহলেও অশোক ঠিক তাই করতেন, যা তিনি নিজের জীবনে করে গিয়েছেন।

আজিকার পারমাণবিক যুগে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সেই মনোভাবের জন্ম হওয়া দরকার যে মনোভাব অশোকের ছিল। আজ ঐক্য ছাড়া আর মানবজাতির কোনো বাঁচবার পথ নেই। কিন্তু গায়ের জোরেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার উপায় নেই। আজকের দিনে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে বল নয়, অন্তরের পরিবর্তনই একমাত্র পথ। পারমাণবিক যুগে বল-প্রয়োগের দ্বারা ঐক্য সম্ভব নয়, আত্মনিধন সম্ভব। অশোক তাঁর কালে কেবল বিবেকের প্রেরণায়ই যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, আজকের দিনে ভয় এবং বিবেক, দুই-ই সেই নীতির দিকে আমাদের নির্দেশ করছে।

বিশ্বজনীন ঐক্য সংস্থাপনের আশু প্রয়োজন সম্বন্ধে এবং সেই প্রয়োজন যদি আমরা সময় মতো পূরণ করতে না পারি তাহলে আত্মনিধন যজ্ঞের দ্বারা যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সে সম্বন্ধেও উপরোক্ত অংশে আমি আলোচনা করলাম। অতঃপর মনুষ্যজাতির ভবিষ্যত সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই। বলা বাহুল্য যে, এই সম্ভাবনাগুলি মোটেই স্পষ্ট নয়। আমি এই আলোচনার নামকরণ করছি : 'বিশ্বজনীন ঐক্য স্থাপনের পথে অগ্রগতি'। কিন্তু এই নামকরণের মধ্যেই কি পুরো একটা বিতর্কের অবকাশ থেকে যাচ্ছে না? আজকের দিনের ঘটনাবলী দেখে একথা কি মনে হয় না যে, ঐক্যের দিকে অগ্রসর না হয়ে পৃথিবী বরং তার থেকে দূরে, ক্রমশ দ্রুততর গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে?

রাজনীতির ক্ষেত্রে আজকের দিনে সবচেয়ে লক্ষণীয় গতি কোন্ দিকে? সে কি সাম্রাজ্যগুলি ভেঙেগ পড়া এবং স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে গতি নয়? ১৯৪৭ সালের পর ভারতীয় উপমহাদেশে যে ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যেও এই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাভিগ গতির নাটকীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। অতীতের মৌর্য, গুপ্ত এবং মুঘল শাসনের ন্যায় বৃটিশ শাসনও ভারতবর্ষের গোটা উপমহাদেশটাকে এক অখণ্ড শাসনপাশে আবদ্ধ করেছিল। এমন কি পূর্বেকার তিনটি শাসনকালে যত না ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, গত শতাব্দীতে বৃটিশ শাসনকালেই তার চেয়ে আরও সুসংহতরূপে এই ঐক্য ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শক্তি যখন প্রত্যাহৃত হল তখন বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের স্থলে একটি নয়, দুইটি রাষ্ট্র দেখা দিল। ১৯১৮ সালে হ্যাপসবার্গ রাজবংশের পতনের পর পূর্ব ইউরোপে যেমন কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিকভাবে নানা রাষ্ট্রের মধ্যে সীমারেখা তৈরী হয়েছিল, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের সীমারেখাও তেমনি কৃত্রিম-ভাবে টানা হয়েছে। কাশ্মীর অঞ্চল এখনও বিতর্কের বিষয়ীভূত, তার সম্বন্ধে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সীমানা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই ঠিকই, কিন্তু এখন আবার এই সীমানার অভ্যন্তরবর্তী অঞ্চলে আর একটা কেন্দ্রাভিগ গতি দেখা দিয়েছে। আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন প্রশাসনিক মানচিত্র নূতনভাবে রচনা করা হচ্ছে।*

অনুবাদ : **অমিতাভ চৌধুরী**　　　　[আগামীবারে সমাপ্য]

* আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা

গীতিকবিতা বললে 'লিরিক'-এর প্রতিশব্দ বুঝিয়ে থাকে। অতি প্রাচীন কালে শুরু হয়ে সাহিত্যের এই ধারা আজও অব্যাহত আছে। ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে কবিতার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অলংকারশাস্ত্রসম্মত যেসব ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ প্রচলিত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি প্রবন্ধের মধ্যে কাব্যের আকার-প্রকারের কথা বলতে গিয়ে সেই শ্রেণীগত বিভিন্নতার সরল সারকথাটুকু এইভাবে বলেছিলেন যে কাব্যের 'রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে'—অর্থাৎ বাইরে থেকে কেবল চেহারা দেখেই কোনো রচনাকে বিশেষ কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধি মনে করা ঠিক নয়। একটি বিভ্রমের উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। তাঁর সেই উদাহরণটি একালেও অচল হয়ে যায়নি। তিনি বলেছিলেন, 'এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে।'

না, চেহারামাত্র দেখে কোনো রচনাকে নাটক বলাও সংগত নয়, 'গীতিকবিতা' বলে মেনে নেওয়াও সুবিবেচনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া সংক্ষিপ্ত শ্রেণীব্যাখ্যাটি এই : 'তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা প্রথম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; দ্বিতীয়, আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপাল বধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।' এবং—'খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে।' অতঃপর গীতিকাব্যের বস্তুপ্রকৃতি এবং ভাবপ্রকৃতির ব্যাখ্যায় উদ্যত হয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে গীতের স্বরচাতুর্য এবং কবিতার শব্দচাতুর্য,—আদর্শ গীতিকবিতার অবলম্বন প্রধানতঃ এই দুই উপাদান। কিন্তু 'দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল। কাজে-কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে।' এই ইতিহাসটুকু বলে নিয়ে তিনি পরিশেষে গীতিকবিতার এই সূত্র দিয়েছিলেন : 'গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়স্পন্দন ব্যতিরেকে গীতিকবিতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত! হৃদয়ে কোনোরকম সুখ-দুঃখের ঢেউ দেখা দিলে মানুষ তার কতকটা ব্যক্ত করে, কিছুটা অব্যক্ত থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির

রুদ্ধ হৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বাসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; বক্তব্য এবং অবক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান ভেদ বলিয়া বোধ হয়।'

অতএব গীতিকবিতার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাতে ভাবুকের হৃদয় ধরা পড়ে। কথাতে সুরেতে এমন এক সম্মিলন ঘটে যায়, যার ফলে কথার অতিশায়ী ব্যঞ্জনা দেখা দেয়। ভাবের প্রগাঢ় ঐক্য এবং সুখ-দুঃখের অপরিসীম নিবিড়তাই গীতিকবিতার প্রকাশ্য লক্ষ্য। সব ভালো জিনিসের মতন ভালো গীতিকবিতাও সত্যিই বিরল!

ফরাসী "গীতাঞ্জলি"র ভূমিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী আঁদ্রে জিদ্ লিখেছিলেন : 'মহাভারতের ২১৪,৭৭৮ শ্লোক, এবং রামায়ণের ৪৮০০০ শ্লোকের পর গীতাঞ্জলি,—আঃ, কি আরাম! হায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে ভারতবর্ষকে অবশেষে স্বল্পতাদোষে দোষী হইতে হইল,—সে জন্য আমি তাঁহার নিকট কত না কৃতজ্ঞ! এই যে দৈর্ঘ্যের বদলে মহার্ঘতা, ভাবের বদলে সার,—এ পরিবর্তনে আমাদের কত না লাভ! কারণ গীতাঞ্জলির ১০৩টি ক্ষুদ্র কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিই যথেষ্ট সারগর্ভ।' শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর অনুবাদ। থেকে এই উক্তিটুকু প্রায়ই মনে আসে। বাংলা বইয়ের আয়তন একালে বাড়তির মুখে। কেবল উপন্যাস বা প্রবন্ধের বইয়েতেই যে এই আধুনিক প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তা নয়। স্মৃতিকথা, আত্মকথা, আত্মজীবনী বা আপন কালের কথা বলতে গিয়ে আজকাল লেখকদের কথা যেন ফুরোতেই চায় না! কিন্তু গদ্য-রচনার ক্ষেত্রে সে-রকম অতিব্যাপ্তি যতোই ঘটুক, এবং বাংলা কবিতার ধারা সাম্প্রতিককালে যতোই পরিস্ফীত দেখাক না কেন, কোনো আধুনিক বাঙালী কবিকেই এখন আর ভূরি পরিমাণে লিখতে দেখা যাচ্ছে না। এ-অবস্থায় উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতার প্রায় আটশ' পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি সংকলন হাতে পেয়ে মনটা প্রথমেই কিঞ্চিৎ দুলে ওঠা অসংগত নয়। ১৮৬০ থেকে ১৯১০ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে উৎপন্ন মোট পাঁচশ' বাংলা গীতিকবিতা একসঙ্গে বেঁধে দিতে হলে গুচ্ছটির কায়িক স্থূলতা নিবারণ করবার উপায় থাকে না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত উনিশ শতকের বাংলা কবিতার এই অতিস্ফীতি তাই প্রথম নজরেই চোখে পড়ে। এই পাঁচ শ' কবিতার লেখক সর্বসমেত প'চাত্তরজন। ছ'টি খণ্ডে কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে। এই ষট্-বিভাগের শিরোনাম যথাক্রমে : প্রেম-কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গার্হস্থ্য জীবনের কবিতা, প্রকৃতি-কবিতা, বিষাদ-কবিতা এবং তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা। সম্পাদকদের বিচারে প্রেম, দেশপ্রেম এবং গার্হস্থ্য জীবনের কবিতাগুলিই সর্বাধিক সার্থক বলে মনে হয়েছে। তাঁরা এ-পর্বে বাংলার কবিসমাজকে প্রকৃতিবর্ণনা বা বিষাদ-ভাবনা বা তত্ত্বচিন্তার কাব্যাবেগ প্রকাশে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ এবং কম ইচ্ছুক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 'প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতা' আলোচ্য সময়ে যে খুবই কম লেখা হয়েছে, সে-কথাও তাঁরা জানাতে দ্বিধা করেননি এবং আলোচ্য ক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ উহ্য রেখেই এ-সব মতামত জানানো হয়েছে। জন্মকালের পারম্পর্য ধরলে ঈশ্বর গুপ্ত (জন্ম ১৮২২) থেকে শুরু করে পঙ্কজিনী বসু (জন্ম ১৮৮৩) পর্যন্ত খ্যাত-অখ্যাত নানা কবির সুদীর্ঘ একটি তালিকা এখানে ভিন্নভাবে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত পর্যায়ে সাজানো হয়েছে বলে বোঝা যায়। তবে কবিদের আরম্ভকালের সন-তারিখে হয়তো কিছু গরমিল আছে। বৃহৎ ব্যাপারে সে-রকম ঘটাও স্বাভাবিক। সেটা এ-রকম সংকলনের প্রধান আলোচনার বিষয় নয়। অতীতের পঞ্চাশ

বছরের বাংলা কবিতার সংকলন থেকে প্রধানতঃ দুটি প্রসঙ্গ জানতে ইচ্ছে হয়—প্রথমতঃ এতে সত্যিকার কাব্যগুণ ছিল কী পরিমাণে,—দ্বিতীয়তঃ এঁদের দৃষ্টি বা আগ্রহ বা মনন-কল্পনার ব্যাপ্তি কী রকম!

সম্পাদকদ্বয় বলেছেন যে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলা গীতিকাব্যের আধুনিক স্তরের সূত্রপাত হয়। বলাবাহুল্য, এ-কথাটা বড়োই চিত্তচমৎকারী! তাঁরা এই যুক্তি দিয়েছেন যে, বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী", "নিসর্গসন্দর্শন", "বন্ধুবিয়োগ" এবং "প্রেমপ্রবাহিনী",—হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর প্রথম খণ্ড, ভাওয়ালের গোবিন্দচন্দ্র দাসের "প্রসূন" কাব্য, বলদেব পালিতের "কাব্যমালা" ও "ললিত কবিতাবলী" এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "কাব্যকলাপ" ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল,—অতএব এঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, আধুনিক কালের গীতিকবিতা বাংলায় সেই বছরেই 'প্রতিষ্ঠিত' হয়েছে! সেইসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, '১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিহারীলালের "সংগীতশতক" কাব্যটি রোমাণ্টিক গীতিকাব্যের নিঃসঙ্গ অগ্রপথিকরূপে স্মরণযোগ্য।' আর, রবীন্দ্রনাথের উল্লেখসূত্রে এঁরা চমকপ্রদ ভঙ্গিতে বলেছেন—'বর্তমান সংকলনে ধৃত কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনাত্মক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গত শতকের গীতিকাব্যের বিভিন্ন ধারার সমন্বয় রবীন্দ্রকাব্যে হইয়াছে, এই সমন্বয় হইতে এক উন্নততর কবিকৃতির উদ্ভব হইয়াছে এবং শতাব্দীর সাধনার পূর্ণ ফল তাঁহাতেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে।' এ-কথা অবিশ্যি 'তুলনাত্মক আলোচনা'র পরিশ্রম ব্যতিরেকেই যে-কেউ বলতে পারতেন! তবে ভূমিকার আর-একটি মন্তব্য দেখে এঁদের তুলনা-প্রয়াসের প্রকৃতি বা অনুসৃত আদর্শ সম্বন্ধে মনে খট্‌কা দেখা দেয়। সে মন্তব্যটি বলে নেওয়া দরকার। কথাটি এই : 'এই সংকলনে পদ্য ও গান আমরা গ্রহণ করি নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র এবং আঁদ্রে জিদের কথা সেই সূত্রেই একসঙ্গে মনে এলো। ১৮৬০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর চেয়ে প্রবীণতর এবং তরুণতর, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবিই সত্যিকার গীতিকবিতা লিখেছিলেন। বাকি সবই পদ্য! সেই ভাবরসনিবিড় সত্যিকার গীতিকবিতার লেখকসংখ্যা পঁচাত্তরের চেয়ে সত্যিই অনেক কম।

কিন্তু পঁচাত্তরেও আপত্তি নেই। পঞ্চাশ বছরের বাংলা গীতিকবিতার ধারাটি পাঠকের ধারণায় সঞ্চার করতে হলে সরবরাহের কাজটি একটু বেশি পরিমাণেই করা হয়তো ভালো। অনেক কবিই সম্পদহীন, অসহায়, বিস্মরণযোগ্য। সম্পাদকের দাক্ষিণ্য ব্যতিরেকে কাব্যানুরাগীর স্মৃতি অধিকার করে ভবিষ্যতে টিঁকে থাকবার সামর্থ্যবর্জিত তাঁরা। অতএব, তাঁদের সংরক্ষণ কতকটা প্রত্নানুশীলনের এলাকাভুক্ত। বাংলা বইয়ের বাজারে সত্যিকার কাব্যরসের চাহিদা বাড়লে, তবেই হয়তো সার্থকতর, নিবিড়তর, কৃশতর—অর্থাৎ অন্যতর সংকলন প্রকাশের আয়োজন সম্ভব হতে পারবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ কবিতার সঙ্গে গবেষণা এবং কাব্যসুখের সঙ্গে বহুতর তথ্যপীড়া একই পাত্রে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকবেই। অধ্যাপক-যুগলকে আবহাওয়ার এই দুরবস্থা মেনে নিয়েই কাজ করতে হয়েছে। তা না হলে শ্রীকুমারবাবুর মতন অধিকারী ব্যক্তি কোনো কারণেই কি কুঞ্জলাল রায় বা গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বা নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর প্রগল্‌ভতাকে 'পদ্য' না বলে 'গীতিকবিতা' বলতেন? না-কি রমণীমোহন ঘোষের 'দেবশিশু'-কে গার্হস্থ্যজীবনের কবিতা বলতে তিনি বা তাঁর তরুণ সহযোগী অরুণকুমার রাজী হতেন? ঐ 'দেবশিশু'র বিষয়বস্তু মোটেই গার্হস্থ্য নয়। একটি শিশু একলা পথের ধারে বসে খেলা করছিল,—চোরে চুপিচুপি তার গা থেকে সোনার গয়না খুলে নেয়,—শিশু কিন্তু তাতে কাঁদে নি,—'কেবল উঠিল হাসি'! এবং ফলে,

নিমেষের তরে　　　　রিক্ত-ভূষণ
গৌর শিশুর পানে
চাহি'—কি বেদনা　　উঠিল জাগিয়া
চোরের কঠোর প্রাণে!

চোরের এই চিত্তদাহ রোম্যাণ্টিক বটে,—কিন্তু এ-রচনা আর যাই হোক গার্হস্থ্যজীবনের রোম্যাণ্টিক গীতিকবিতা নয়। একে বরং সুনীতিব্রতী পদ্য বলা যেতে পারে!

কিন্তু সম্পাদকরা এ-ক্ষেত্রেও অসহায়। কারণ, তাঁদের সংকলন থেকে এ-ধরনের লেখা বাদ দিতে হলে বাংলাদেশের বহুশ্রুত কবিত্বের খ্যাতি সত্ত্বেও সে পর্বের বাংলা কবিতার তিন-চতুর্থাংশই হয়তো বর্জিত হওয়া দরকার! সে দিকে নজর রেখে, তাই, এ-ক্ষেত্রে এইকথাই বক্তব্য যে পদ্যের প্রতি উপেক্ষার ভাবটুকু পরের সংস্করণে ভূমিকা থেকে তাঁরা প্রত্যাহার করতে পারেন কি না ভেবে দেখবেন। বিষয়বিভাগের যে পরিকল্পনা তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সেটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়বস্তুর বিভাগে আপত্তি নেই, কিন্তু তা কাব্যগুণের অধীনস্থ থাকা দরকার। অর্থাৎ, আগে কাব্যগুণ আছে কিনা তাই বিচার্য,—তার পরে বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে।

আরো একটি কথা ভেবে দেখা উচিত। অসংখ্য মন্দকবির মধ্যে সত্যিকার ভালো কবিও ভিড়ে হারিয়ে যান। খুব বড়ো কবিদের কথা আলাদা। কিন্তু এখানে 'ভালো কবি' মানে মাঝারি কবি। এবং মাঝারি যাঁরা, ভিড়ের মধ্যে তাঁদের হারাতে দেওয়া কখনোই সমীচীন নয়। প্রস্তুত সংকলনে সম্পাদকরা সেদিকে দৃষ্টি রাখলে পাঠক সুখী হতেন।

কিন্তু আমাদের দেশ, কাল, রুচি এবং সামর্থ্যের পরিসীমা সম্বন্ধে অবহিত থেকে, ১৮৬০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত, মোট পঞ্চাশ বছরের বাংলা গীতিকবিতা এবং বাংলা পদ্যধারার ভেতর দিয়ে বাঙালী জীবনের অন্তরালোড়নের প্রকৃতিটি বেশ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া কি অসম্ভব? এই সময়সীমার শেষ প্রান্ত সম্বন্ধে আপত্তি নেই। বঙ্গভঙ্গের ঢেউ নেমে যাবার তারিখ মোটামুটি ঐ ১৯১০। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বস্বীকৃত আদর্শ। কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন আর কেউই ছিলেন না। বাংলা কবিতার ধারায় সে-কালটিকে বিশেষ এক পর্বান্ত এবং পর্বসূচনার সন্ধি বলে মেনে নিতে প্রবল কোনো আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু ১৮৬০-এর ঐ আদি-সীমা থেকে কয়েক বছর পেছিয়ে যেতেই বা আপত্তি কি? ভূমিকায় সম্পাদকরা বলেছেন : 'নবজাগ্রত কাব্যরসপিপাসু বাঙালি চিত্তের উদ্বোধন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী উপাখ্যান" কাব্যে।' মধুসূদনের 'অন্তর্মুখী গীতিকবিতার রোম্যাণ্টিক বিষাদের সুরটি' যেহেতু আরো কয়েক বছর পরের ঘটনা,—তাঁর 'আত্মবিলাপ' যেহেতু ১৮৬১তে প্রকাশিত হয়, সেজন্যে ১৮৬০ থেকেই আলোচ্য পর্বটি সূচিত হয়েছে। বেশ, তাও স্বীকার্য। কিন্তু কবিতার রাজ্যে নতুন ভাবাদর্শের প্রবর্তন-প্রয়াস আরো কয়েকবছর আগেকার ঘটনা। রঙ্গলাল তাঁর বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব শুনিয়েছিলেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫০ থেকে ১৯০০ হলেই এখানকার পর্ববিস্তারটি হয়তো সমীচীন হোতো। তবে, ১৮৫০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত এগিয়ে যেতেও বাধা নেই। এবং এই বিস্তারের মধ্যে বাংলা কবিতায় দেশের মানুষের সামাজিক, আর্থিক এবং পারমার্থিক ভাব, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা কী-ভাবে আবর্তিত হয়েছে সেটা ভালোভাবে দেখতে সাহায্য করবার সুযোগ ছিল এ-রকম সংকলন-প্রয়াসের মধ্যেই। এই দিকটি বিশদ করবার জন্যেই একটি দৃষ্টান্ত মনে আসছে। কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যাপারের কথা হলেও, সে-কথা

এই সূত্রে পরিবেশণ করলে ভাবের দিক থেকে দূরান্বয় দোষ ঘটবে না।

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃতি নিরীক্ষার কাজে নেমে একজন অধ্যাপক এই ধরনের বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস অবিশ্যি এক জিনিস,—ইংরেজি কবিতার সংকলন অন্য ব্যাপার! ইতিহাসে যা বলা যায়, কাব্যসংকলনের মধ্য দিয়ে ঠিক সে-কাজ কি করা যায়? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই স্বীকার্য। কিন্তু সে-রকম সংকলনের আদর্শও ইংরেজিতে আছে কিছু কিছু। যাই হোক, কোনো একটি পর্বের কবিতা সংকলনের কাজে উদ্যত হলে ইতিহাস প্রদর্শনের ঝোঁকটুকু মেনে নিতে পারলে ভালো হয়। সেইজন্যেই এ-প্রসঙ্গের অবতারণা। ইংরেজিতে আলোচ্য ধরনের বই অনেকই আছে। এখানে তারই একখানির কথা তোলা গেল।

বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই ইংলণ্ডের রাজনীতিতে সংরক্ষণপন্থী দলের পরাজয় এবং উদারনৈতিক দলের প্রাধান্য ঘটেছিল। সে-দেশের উদারপন্থী দল উনিশ-শ' ছয় খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা হাতে পাবার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই জনসাধারণের যাতে উপকার হয়, এ-রকম কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. ডব্লিউ. কানলিফ তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বইয়ের মধ্যে সংক্ষেপে এইসব ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। ১৯০৬ সালে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন (Workers' Compensation Act), ১৯০৭ সালে ক্ষুদ্র-ভূ-সম্পত্তি আইন (Small Holdings Act), ১৯০৮ সালে বার্ধক্য-ভাতা-ব্যবস্থা (Old Age Pensions), ১৯১১ সালে জাতীয় বীমা আইন (National Insurance Act), —এবং ১৯১২ সালে ন্যূনতম বেতন আইন (Minimum Wage Act) চালু হয়। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কয়েক বছর আগে লয়েড জর্জ জাতীয় বীমা আইন বিধিবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সেকালের সেই দীনবন্ধু লয়েড জর্জই যুদ্ধের ধাক্কায় পড়ে অতঃপর যুদ্ধ-বিজয়ের নেশায় মেতে উঠেছিলেন বলে শোনা যায়। যুদ্ধের দুর্যোগের মধ্যে একমাত্র রাশিয়া ছাড়া সারা য়ুরোপ প্রচুর পরিমাণে অ্যামিরিকার কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিল। উনিশ-শ' উনিশ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-চুক্তির সাহায্যে ছিন্ন-ভিন্ন য়ুরোপের আর্থিক দুর্গতি রোধ করবার ক্ষীণ চেষ্টা দেখা গেল বটে, কিন্তু দেশের বুকে দুর্ভাগ্য তার আগেই তার চরম আঘাত হেনে গেছে।

রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে তখনকার সেই ব্যাপক দুর্গতির আবহাওয়া গভীর কোনো শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল যে ছিল না, সে-কথা বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার নেই। সমাজে যখন ব্যাপকভাবে অবসাদ আর অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে, সাহিত্যের সৃষ্টিপ্রেরণাও তখন দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়।

বিশ শতকের সূচনাপর্বে ইংলণ্ডে অর্থনীতি, বিজ্ঞানসাধনা এবং ধর্মবিশ্বাস, এই তিন ক্ষেত্রেই নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী ইংলণ্ডের যুব-চিত্তের প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে চার্লস ই. জি. মাস্টারম্যান লিখেছিলেন যে নানা তথ্য ঘেঁটে এই সিদ্ধান্তই তাঁর কাছে গ্রাহ্য মনে হয়েছিল যে ইংলণ্ডে খ্রীষ্টান ধর্ম-বিশ্বাসে বা খ্রীষ্টানোচিত মনোধর্মে তখন ভাঁটা লেগেছে,—খ্রীষ্টান ইংলণ্ড তখন 'পেগ্যান' হয়ে পড়েছে! এ মন্তব্য যাঁদের কাছে প্রকৃত অবস্থার অতিরঞ্জন বলে মনে হবে, অধ্যাপক কানলিফ তাঁদের জন্যে ধর্মযাজকপুত্র ই. এফ. বেন্‌সনের একটি লেখা থেকে তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে 'ধর্মবিমুখতার ঢেউ' (A wave of irreligion) কথাটি স্মরণ করেছেন। ১৯১৪

থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত সারা ইংলণ্ডে এই ঢেউয়ের প্রবলতা অনুভব করা গেছে। যুদ্ধের আগে থেকেই এর সূত্রপাত হয়,—এবং যুদ্ধের চার বছরের মধ্যে তার তীব্র প্রকোপ দেখা যায়। আর, ১৯৩২ সালে বার্মিংহামের বিশপ তাঁর লেখার মধ্যে এইকথাই বলে গেছেন বলে অধ্যাপক কার্নালিফ উল্লেখ করেছেন। ধর্মবিশ্বাসের এই দুরবস্থার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। সমুচিত দৃষ্টান্ত দিয়ে অধ্যাপক সে-কথাও বুঝিয়েছেন। যে প্রবল অধ্যাত্মবিশ্বাসের জোরে শেক্‌স্‌পীয়র হ্যামলেটের মুখ দিয়ে বলতে পেরেছিলেন —'There's a special providence in the fall of a sparrow',—

কিংবা— There's a divinity that shapes our ends,
Roughhew them how we will,

সেই ধর্মবিশ্বাস, পরলোক-ধারণা এবং ঈশ্বর-স্বীকৃতি যদি শেক্‌স্‌পীয়রের সমকালীন পাঠকচিত্তে একেবারেই না থাকতো, তাহলে তাঁর কথা শুনতো কে? ওয়ার্ডস্বার্থের লেখা থেকেও অধ্যাপক কার্নালিফ এইরকম অধ্যাত্ম-প্রত্যয়ের উদাহরণ তুলে দিয়েছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের দুশো বছর পরে এসে কবি ওয়ার্ডস্বার্থও বলতে পেরেছিলেন যে মানব-জীবনের বিচিত্র ঘটনাধারার যাবতীয় বিষাদসত্যের অস্তিত্ব উপেক্ষা না-করেও একথা মানতে বাধা নেই যে, অসীম শক্তি ও অশেষ করুণাময় কোনো এক সত্তার সজ্ঞান অভিপ্রায়ের মধ্যেই আমাদের অদৃষ্টের যাবতীয় উত্থান-পতন আশ্রিত! আমাদের খণ্ডিত দৃষ্টিতে যেসব ব্যাপার আপতিক বা পূর্বাপর-সংযোগহীন বলে মনে হয়, সে-সব ঘটনাও আমাদের অগোচর কোনো এক পরমকারুণিক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত!* তারপর উনিশ শতকের মধ্যপর্বে কবি টেনিসনের 'In Memoriam'-এর মধ্যে দেখা গিয়েছিল যে কতকটা ক্ষীণ-ভাবে হলেও তিনিও সেই একই প্রত্যয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন—

stretch faint hands of faith, and grope,
And gather dust and chaff, and call
To what I feel is Lord of all,
And faintly trust the larger hope.

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্বে পৌঁছে এই আশাবাদ, আস্তিক্য এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাসের জোর আরো কমে গিয়েছিল। অধ্যাপক কার্নালিফ বলেছেন যে গত শতকে বিজ্ঞানের প্রতি অতিশ্রদ্ধার ফলে যে অধিযান্ত্রিক নিয়তিবাদ (Mechanistic determinism) দেখা দিয়েছিল,—বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে অন্ধ বিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, বিশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার নতুনতর গবেষণার ফলে সে-গোঁড়ামির গোড়া আলগা হয়ে যায়। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক স্যর জেম্‌স জীন্‌স্‌ এবং স্যর আর্থার এডিংটনের আবিষ্কার এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কেম্ব্রিজের গণিতবিদ্‌ বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই নব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই কারণেই লিখেছিলেন যে আমাদের এতোকালের অভ্যস্ত নিউটনীয় ঘনবস্তুতত্ত্বের ধারণা হরণ করে এ-বিজ্ঞান ক্রমশঃ এক অবাস্তব স্বপ্নমায়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে

---

* That the procession of our fate, howe'er
Sad or disturbed, is ordered by a Being
Of infinite benevolence and power;
Whose everlasting purposes embrace
All accidents, converting them to good.

স্যর জেম্‌স্‌ জীন্‌সে জানালেন যে বৈজ্ঞানিকরা আজ জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা পেয়েছেন, সে হয়তো তাঁদের আপন মনেরই ধারণা মাত্র,—মনের বাইরে হয়তো আর কিছুই নেই,—বিজ্ঞানী বহু প্রযত্নে যে জ্ঞানের চর্চা করছে, সে হয়তো শুধুই স্বপ্ন, আর আমরা সেই স্বপ্নদ্রষ্টার মস্তিষ্কের কোষ ছাড়া অন্য আর কিছুই হয়তো না হতেও তো পারি!*

এও অধ্যাপক কানলিফের দেওয়া উদ্ধৃতি। জীন্‌সের কথার পরেই তিনি অক্সফোর্ডের আর-এক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জন স্কট হ্যালডেনের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন যে, হ্যালডেন বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মের গুরুত্ব বেশি বলে স্বীকার করেছেন, কারণ বিজ্ঞান তো আমাদের শ্রেয়ের কথা ভাবে না,—ধর্ম যে আমাদের শ্রেয়ের দিকে চালিত করে!

ধর্ম এবং নীতিজ্ঞান হয়তো পরস্পরের প্রতিশব্দ! তবে, ধর্ম তো শুধু সঞ্চয়যোগ্য জ্ঞান নয়,—ধর্ম কর্মের মধ্যেই সার্থকতা খোঁজে। বিশ শতকের শুরু থেকে ইংলণ্ডে ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষীণতা এবং নৈতিক শৈথিল্য তাই পাশাপাশি অথবা যুগপৎ দেখা দিয়েছিল। লণ্ডনের বস্তিজীবন সম্বন্ধে জন মার্টিন নামে এক ভদ্রলোকের উল্লেখযোগ্য আলোচনা ছাপা হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। সে বইখানির নাম *"A Corner of England!"* তাতে জন মার্টিন জানিয়েছিলেন যে, সে-সময়ে বস্তি অঞ্চলের ইংরেজ অধিবাসী চুরি বা মোটর-ডাকাতিতে নাম করতে পারলে পাড়ায় তার মর্যাদা বাড়তো! হয়তো বস্তি-জীবনের নৈতিক আদর্শ সব দেশেই সমান। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রেই বা সে লোকব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? কিন্তু মার্টিনের এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কানলিফ আরো একটু মন্তব্য জুড়ে দিয়ে জানিয়েছেন যে বস্তির বহির্বর্তী সম্মানিত ভদ্রসমাজের মধ্যেও পুরোনো নীতিবোধের বিচ্যুতি একালের অনস্বীকার্য ঘটনা।

এইভাবে গত শতকের সঙ্গে বর্তমান শতকের তুলনার ফলে পাঠকের মনে এরকম বিশ্বাস দেখা দেওয়া অসম্ভব নয় যে, উনিশ শতকের ইংরেজের তুলনায় বিশ শতকের ইংরেজ বুঝি জাতিগতভাবে হীন হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক বেশ জোরের সঙ্গে সেটাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সে দেশে জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম এবং সুখসম্পদের উত্তরোত্তর উন্নতিই চোখে পড়ে। অতএব অধ্যাপকের এ-সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত যে বর্তমানে সৃজনী প্রতিভার পক্ষে সেদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা যতোই প্রতিকূল মনে হোক, সেখানকার সাহিত্যিক মহলে বস্তুজগতের আনুকূল্য একালে বেড়েছে বই কমেনি। তাছাড়া উনিশ শতকের শেষ দশকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব-আইন প্রবর্তিত হবার ফলে ইংরেজ লেখক-পাঠকের কাছে মার্কিন সাহিত্যের প্রচার বেড়ে গেছে; নাটক আর উপন্যাসের মহলে উৎসাহ-বৃদ্ধির কারণ ঘটেছে; ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রি জেম্‌স্‌ তো তদানীন্তন নবীন ইংরেজ কথাসাহিত্যিকদের যৌনপ্রসঙ্গবীক্ষার সৎ সাহসের প্রশংসাই করে গেছেন; মনোবিজ্ঞানের আগ্রহ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ফলে নিঃসংকোচ বিশ্লেষণেরও আর বাধা রইলো না! নারীজগতেও স্বাধীনতাবোধের আর দায়িত্ববৃদ্ধির সুযোগ এলো। অধ্যাপক কানলিফ দেখিয়েছেন যে, এই শতকে নানাবিধ প্রচারের কাজে উপন্যাস এবং নাটকের প্রচলন তো বেড়েইছে, তাছাড়া রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের দিকে এরকম ব্যাপক আগ্রহ ইতিপূর্বে আর কখনোই দেখা যায়নি।

* "The universe which we study with such care may be a dream, and we brain-cells in the mind of the dreamer."—Eos, or the Wider Aspects of Cosmogony (1929).

আর বেশি কথা নিষ্প্রয়োজন। একজন বিদেশী অধ্যাপকের লেখা বিদেশের সমাজ এবং সাহিত্যের এই বিশ্লেষণ এখানে এই উদ্দেশ্যেই স্মরণ করা গেল যে, উনিশ শতকের শেষার্ধ আর বর্তমান শতকের প্রথম দশকান্ত মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ-ষাট বছরের বিস্তারে, সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থসম্পর্কের ঢেউ খেতে খেতে এ-পর্বের বাঙালী কবিদের মন যে কী পরিমাণে বদলেছে, এ-সময়ের কবিতাবলীর আদর্শ একখানি সংকলনের ভেতর দিয়ে সেটা ভালোভাবেই দেখিয়ে দেবার সুযোগ ছিল। কিন্তু আলোচ্য সংকলনের সম্পাদকরা আহরণে যতোটা উৎসাহী, নির্বাচনে সে-রকম নন। বাংলায় এ-রকম বিশ্লেষণভিত্তিক একখানি কবিতাসংকলন সম্পাদিত হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?*

হরপ্রসাদ মিত্র

---

* উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। মডার্ন বুক এজেন্সি। কলিকাতা ১২। মূল্য বারো টাকা।

সমালোচনা

সমুদ্র মানুষ—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। মূল্য পাঁচ টাকা।
মনামী—নারায়ণ সান্যাল। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য চার টাকা।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জনপ্রিয় লেখক নন, সাহিত্য জগতে খুব পরিচিতও নন। নূতন লেখকের আবির্ভাব ঘটলে তাই আগ্রহ হয়। সাহিত্যে নূতনের অভিনন্দন প্রয়োজন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাই স্বাগত জানাচ্ছি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন লেখা আগে পড়িনি। তিনি আগে কিছু লিখেছিলেন কিনা সে-সংবাদ আমার জানা নেই। সুতরাং পূর্ব অনুশীলনের ধারাটি ধরতে আমি অক্ষম।

"সমুদ্র মানুষ" উপন্যাসটি মানিক স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা। লেখককে আগেই বিচারকের দেউড়ি পেরিয়ে আসতে হয়েছে। অনুমান করি বহু তরুণ লেখকের সঙ্গে লেখককে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হয়েছিল। সুতরাং বইটির যে অসামান্যতা আছে তাতে সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিককালে নগদ বিদায়ের সম্বন্ধে আশঙ্কা থাকলেও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এমন একটি গুণ আছে যে লেখক সম্বন্ধে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছি।

মোবারক এবং শেখরের জাহাজী জীবন নিয়ে কাহিনীসূত্র বয়ন করা হয়েছে। শেখর গৌণ চরিত্র। চট্টগ্রামের অধিবাসী মোবারক তার বাপেরই মত জাহাজে কাজ নিয়েছিল। জাহাজেই জীবনের অধিকাংশ সময় কেটে যায়। বিচিত্র শহর আর বিচিত্র লোকের সঙ্গে মোবারকের ক্ষণিকের পরিচয় গড়ে ওঠে। কিন্তু কোথাও আশ্রয় নেবার উপায় নেই। জাহাজের গুটিকতক নাবিক, সালোন নিয়ে মোবারকের এই দীর্ঘস্থায়ী জীবন। গৃহসুখ থেকে বঞ্চিত এই সব নাবিকরা কিছু পরিমাণে হয়ে ওঠে অসহায়, কিছু পরিমাণে উদ্দাম। জীবিকা তাদের মনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। মনও হয় যাযাবর। নীড়ের সুখ যেমন তাদের হাতছানি দেয় তেমনি দূরের দিগন্তটাও মন ভোলায়। এরই টানাপোড়েনে মোবারকের, জাহাজের নাবিকদের জীবন গঠিত।

উপন্যাসটিতে দুটি অংশ। এক মোবারকের ফেলে আসা জীবন—যেখানে তার আম্মাজান, বিবি জয়নাব এবং শামীনগড়ের বিচিত্র মানুষের স্মৃতি; অন্যটি জাহাজের জীবন—যেখানে সালোন, ক্যাপ্টেন এবং প্রিয় বন্ধু শেখর। দ্বিতীয় অংশে আরও একটি কাহিনী আছে যেখানে মোবারকের সঙ্গে লিলি ব্রুর পরিচয় এবং লিলি ব্রু-কে বিবাহ করবার জন্যে মোবারকের উদ্যোগ। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের মত মোবারক জানল লিলি তারই পিতার সন্তান।

উপন্যাসটিতে মোবারকের স্মৃতি রোমন্থন অনেকটা অংশ জুড়েছে। সেজন্যে কাহিনীর গতি শ্লথ, মন্থর। গল্পটির আকস্মিক উপসংহার চমকপ্রদ সন্দেহ নেই, কিন্তু পাঠক এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ওরেস্টিসের মত যন্ত্রণা ভোগ করলেও মোবারকের দার্শনিক চিন্তা বেমানান। কয়লা, লোহালক্করের সঙ্গে দিনরাত কাটালেও মোবারকের জীবনে তার স্পর্শমাত্র নেই। চরিত্রটি রোমান্টিক, লেখকের নিজস্ব চিন্তাও চরিত্রটির উপরে আরোপিত হয়েছে বলে মনে হয়।

বাংলা উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য কম। সেদিক থেকে উপন্যাসটির বিশেষত্ব আছে। জাহাজের নাবিকজীবন নিয়ে কাহিনী লিখতে গেলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই উপন্যাসটিতেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে কিন্তু সে-অভিজ্ঞতার প্রয়োগ সর্বত্র সুচিন্তিত নয়। আর লেখক যেন ইচ্ছে করেই নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে অন্য জগতে পদচারণা করতে চেয়েছেন। ফলে উপন্যাসটি অবান্তরের পর্যায়ে পড়েছে। পড়তে পড়তে কনরাডের উপন্যাসগুলির কথা মনে আসে। কিন্তু কনরাডের উপন্যাসের বিস্মৃতি, বৈচিত্র্য, সমুদ্রের গভীরতা এবং তিক্ততার স্বাদ উপন্যাসটিতে নেই। আমার বক্তব্য হল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন যা কেবল বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্যেই দীর্ঘকাল পাঠক স্মরণে রাখত। বাংলা উপন্যাসের দিগন্তও বিস্তৃত হতে পারত। কিন্তু সে-আশা আপাতত সফল হয়নি। কেবলমাত্র একবার যেখানে ক্যাপ্টেন নিউ প্লিমাউথ থেকে সিডনীতে জাহাজ ফেরার সময়ে সেই দুর্ঘটনার কথা বলেছিল। জাহাজী শ্রমিকের জীবনের ভয়াবহতার পরিচয় সেখানে একান্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে। 'ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব জাহাজীরা তখন দেখল দূরের একটা ঢিবি। একটা দ্বীপ। রক্তলাল বালির চূর্ণ মেশানো দ্বীপ, থরে থরে আকাশের দিকে উঠে গেছে। মাথায় তার ক্রস। দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে উড়ছে একদল সমুদ্র পাখী। জাহাজটাকে দেখে ওরা বুঝি বিশ বছর আগের এক দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে কেঁদে বেড়াচ্ছে।' সমুদ্র মানুষের এই পরিচর্যাটিই আমাদের আকর্ষণ করে বেশি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় চমৎকারিত্ব আছে। সেজন্যেই লেখকের কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক। তাই পরবর্তী রচনার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

জীববিজ্ঞানের প্রফেসর অবনীমোহন বিবাহ করেছিলেন গ্রামের মেয়ে অনুরাধাকে। অনুরাধার বাবা প্রাচীনকালের। জপ তপ মন্ত্র তাঁর জীবনের অবলম্বন। অনুরাধাও এই পরিবেশেই মানুষ। অবনীমোহনের পথ বিজ্ঞানের। সেখানে প্রাচীন বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। অনুরাধা এবং অবনীমোহনের জীবন সুখের হল না। দুটি ভিন্ন মতের দুই কোটিতে অবনীমোহন এবং অনুরাধা যখন আন্দোলিত তখন আবির্ভাব ঘটল প্রথমে সুবিমলের পরে মনামীর। মনামী প্রিয়ার জাতের। প্রেম ভালবাসার সাময়িক মূল্যকে সে স্বীকার করে, কিন্তু তাদের স্থায়িত্বে সে বিশ্বাসী নয়। ফ্যাসনদুরস্ত, আধুনিকা মনামী অবনীমোহনের চিত্তে ঘোর লাগায়, সুবিমলকেও আকর্ষণ করে কিন্তু ধরা দেয়না কাউকেই। অবনীমোহন এবং অনুরাধার জীবনের দ্বন্দ্বটি ঘনীভূত হয়। শেষ পর্যন্ত অনুরাধা মৃত্যু বরণ করে। মনামী অবনীমোহনের জীবনে কথঞ্চিত শান্তি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু বিজ্ঞানের নির্মম হস্ত মনামীর জীবনে নিয়ে আসে ব্যর্থতা। পরিণামে সুবিমলের সান্নিধ্যে এল মনামী। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মনামীকে নিয়ে সুবিমল কী সান্ত্বনা খুঁজে পেল তার কোন সংবাদ আর পাই না।

বইটিতে রবীন্দ্রনাথের "দুইবোন"-এর প্রভাব পূর্ণমাত্রায়। সুবিমল এবং অনুরাধার সম্পর্কটি অবনীমোহনের মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগায় অ "নষ্টনীড়"-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। রচনাশৈলীতে "ঘরে বাইরের" প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'-এর আদর্শেই অনুরাধার জীবন গঠিত যদিচ অনুরাধা এবং তনুকা একজাতের নয়। যে-প্রেরণা থেকে লেখক বইটি রচনা করেছেন তা হল আত্মকথা রচনারীতির নূতন পরীক্ষা করবার উৎসাহ। লেখক কোনটি কার আত্মকথা শিরোনামায় তা উল্লেখ না করে আত্মকথনটিতে প্রত্যেকটি চরিত্রের

নিজস্ব স্টাইল ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেকের সংলাপে যে বিশেষ বৈচিত্র্য আছে উপন্যাসটি পড়ে তা মনে হল না। অবনীমোহনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের যে চূড়ান্ত রূপ দেখি তাও চরিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলে মনে হয় না। মনামীর জগৎটি লেখকের একান্তই অপরিচিত। সে জন্য তার আত্মকথাতে এসে বারে বারে হোঁচট খেতে হয়। তার আবির্ভাব লগ্নটিকে স্মরণীয় করে তুলবার জন্যে নারায়ণবাবু স্টেশনে যে নাটকীয় দৃশ্যটি অবতারণা করেছেন তা ভাবপ্রবণতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। "মনামী" উপন্যাসটিতে একটি চরিত্র সুচিত্রিত। সে অনুরাধা। নিরক্ষরা, গ্রাম্য আবহাওয়ায় বর্ধিত অনুরাধার সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনেতিহাসের প্রতিটি ক্ষণকে লেখক সহানুভূতি দিয়ে দেখেছেন, লেখকের নিজ হৃদয়ের উত্তাপ এবং উত্তেজনা সেই চরিত্রটিকে অসামান্যতা দিয়েছে।অনুরাধার নারীজীবনের ব্যথা এবং বেদনা অবনীমোহনের সান্নিধ্যে এসে যে-ভাবে দ্বন্দ্বমথিত হয়ে উঠেছে তার চিত্রলিপি মনোমুগ্ধকর। অনুরাধার আত্মকথায় প্রবাদ প্রবচনের উধৃতিতে, মন্ত্র তন্ত্র এবং দৈবে বিশ্বাসের কথা জানিয়ে লেখক চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন। এ-বাস্তবতা জীবনবোধেরই নামান্তর।

প্রমথনাথ বিশী

The Wayward Wife and Other Stories. *By* Alberto Moravia. Secker & Warburg. London. 15*s*.

আমাদের যুগের সাহিত্যে অনেক রকমের হাওয়া বদল অনেকদিন থেকে চলেছে—তার তাগিদ কখনো কখনো ফ্রয়েডের, কখনো মার্ক্সের, কখনো অস্তিত্ববাসের, কখনো রম্যরচনার কখনো চেতনা প্রবাহের, কখনো শুধু আঙ্গিকের। এত রকমের সুদের মধ্যে আসলের খেই অনেক সময় হারিয়ে যায়—যেমন গল্প বলতে হলে গল্প বলার ক্ষমতার দরকার হয় সে কথা কি আমাদের আর মনে আছে?

মোরাভিয়া পড়লে মনে পড়ে। অন্তত তাঁর বেশির ভাগ ছোট গল্পেই গল্প বলার ক্ষমতা জাজ্জ্বল্যমান। বস্তুত মোরাভিয়ার ক্ষমতা হয়ত উপন্যাসের বিরাট ক্ষেত্রকে ততটা ভরে তুলতে পারে না, ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরেই তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখার আপাতদৃষ্ট সরলতা সর্বদাই মনোরম, যে কোনো ঘটনার বর্ণনাই উজ্জ্বল, মানুষের শরীর মনের সম্বন্ধে উপলব্ধিতে তীব্র; কিন্তু *Agostino* এবং *Disobedience*-এর পরের উপন্যাসগুলিতে সম্পূর্ণ সার্থকতার অভাব, বিশেষত বহুপ্রচলিত *Women of Rome*-এ। সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্তি মেলে তাঁর ছোট গল্পে।

কিছুকাল আগে "চতুরঙ্গ"-এ মোরাভিয়ার 'দুই গণিকা' নামে একটি গল্পের অনুবাদ করেছিলাম, সেই গল্প বর্তমান বই-এ আছে 'Home is a Sacred Place' নামে। তাছাড়া আরো দুটি অসাধারণ গল্প এ বইয়ে আছে, তার মধ্যে The Wayward Wife অতুলনীয়। তারপরেই নাম করতে হয় প্রথম গল্পটির—Crime at the Tennis Club. মাঝে মাঝে মোরাভিয়ার মধ্যেও একটা বাহাদুরী, অতি-নাটুকে ভাব এসে পড়ে—A Bad Winter বা Contact with the Working Class-এ তার পরিচয় আছে। কিন্তু পূর্বোক্ত দুটি গল্প

অপূর্ব। কারণ তার মধ্যে গল্প বলার ক্ষমতার যে পরিচয় আছে তা হালের লেখকদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। এ সব গল্পে মনে হয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মোরাভিয়া সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। ইতালীয় নিও-রিয়ালিস্ট সিনেমায় যে আপাতদৃষ্ট নিরাসক্তি আছে, মোরাভিয়া তাকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেন শুধু গল্পই আছে, গল্প লেখক নেই। অনেক ক্লাসিক লেখকের মতো মোরাভিয়ারও গল্পের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার কোনো তাড়াহুড়ো নেই, চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অনুভব এত উজ্জ্বল, কৌতূহল এত গভীর যে গল্পের সুডৌল গড়ন কখনো হিসেবে দেখা দেয় না, অন্তরালে থাকে। কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্য তিনি অস্থির নন। চিত্রশিল্পী যেমন আপেলের বা গাছের ছবি আঁকেন তেম্নি তাঁর লেখা। যাদের বিষয়ে গল্প লেখা হচ্ছে তারা যে 'আছে' এইটে অনুভব করাই তাঁর উদ্দেশ্য। মনে হয় যেন আমাদের অনুভব করানোর কোনো তাগিদ নেই, নিজের অনুভব করাটাই সব কিছু। কোনো লোকের অস্তিত্বের অনুভূতি যখন সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠে, তখন গল্প পড়ে পাঠকের শুধু একটি অনুভূতি হয় তা নয়, যেন নিজস্ব অভিজ্ঞতা হয়। লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং নিরাসক্তির ফলেই এটা সম্ভব হয়। কোনো কিছু প্রমাণ করার তাগিদ নেই বলেই চরিত্র সম্বন্ধে অনুভব গভীর হয়ে ওঠে।

Crime at the Tennis Club-এ কয়েকটি লোক ঠাট্টা করতে গিয়ে একটি মেয়েকে আচমকা খুন করে বসে। মেয়েটির বয়স হয়েছে, অবস্থা ভালো নয়, দেখতে কুশ্রী; কিন্তু তার ধারণা সে যুবতী, উচ্চ সমাজের লোক, তাকে দেখে সবাই রোমাঞ্চিত। তার এই হাস্যকর আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়ে ঠাট্টা করতে গিয়ে হঠাৎ সেটা উদ্দেশ্যহীন খুনে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত মোরাভিয়ার বক্তব্য এই লোকদের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, এই মেয়েটির অর্থহীন আত্মপ্রবঞ্চনার করুণতা। কিন্তু সে বক্তব্য গভীরে প্রচ্ছন্ন, বাইরে থেকে গল্প শুধু গল্প—কী করে ঘটনাটা হল, কী রকম লোক, কী রকম মেয়ে এইটাই চোখে পড়ে; এবং শুধু চোখে পড়ে নয়, চোখের ওপর স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে।

আত্মপ্রবঞ্চনা মোরাভিয়ার বিশেষ কৌতূহলের বিষয়—সে আত্মপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চকের কোনো ধারণা নেই, যে লোক নিজে এক, ভাবে আরেক। অথচ তাদের সম্বন্ধে মোরাভিয়ার কোনো অবজ্ঞা বা অনুকম্পা নেই, বিরক্তি নেই। জীবন কত বিচিত্র একথাও তিনি সজোরে ঘোষণা করার কোনো চেষ্টা করেন না। শুধু লোকের ও ঘটনার সত্যতাকে উপলব্ধি করার ফলেই গল্প শেষ করে পাঠকের মনে হয় তার নিজের-ই যেন একটি অভিজ্ঞতা হল। The Wayward Wife-এর নায়িকা উচ্চ সমাজের জীবনে প্রবেশ করার জন্য আকুলি বিকুলি করে, সম-অবস্থার লোকের প্রতি তার অপরিসীম অবজ্ঞা। সম্ভ্রান্ত বংশের একটি ছেলের সম্পর্কে এসে তার প্রেমভাবও ঐ কৌলিণ্যের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করে। যখন জানতে পারে যে সে ঐ ছেলেটির অবৈধ ভগিনী তখন পৃথিবীকে কী নির্মম মনে হয়—জাতে ওঠার উপায় হাতে এসেও ফস্কে গেল। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপককে বিয়ে করে মনে হয় কী অপদার্থ। অবশেষে বিবাহ-বহির্ভূত এক যৌন অভিজ্ঞতার পর স্বামীর প্রথম পরিচয় সে পায়, যেন বাস্তব পৃথিবীকে সে প্রথম চোখে দেখল। এই মেয়েটির আত্মচেতনার অভাব, আমাদের অভিভূত করে, কিন্তু মোরাভিয়ার চোখে যেন সে, তার সুবিধাবাদী প্রেমিক, তার কুটিল পরামর্শদাত্রী, তার সাধারণ স্বামী সকলেই সমান, কেননা সকলেই বেঁচে আছে। মানুষ যেন প্রকৃতির মতো—কোনো গাছ লম্বা, কোনোটি বেঁটে, কারোর ডালপালা বেশি কারো কম, কারো শিকড় গভীর কারোর ওপর ওপর। কোথাও ছায়া, কোথাও আলো, দিন যায়, রাত্রি

আসে, আবার দিন। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ—এ প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমরা জানি যে মমতাবোধ ছাড়া আত্মবহির্ভূত কোনো চরিত্রকে উপলব্ধি করা যায় না, তার অস্তিত্বকে জীবন্ত করে তোলা যায় না।

অনেকের লেখা পড়ি যাতে তত্ত্বকথা প্রচুর, এটা ওটা প্রমাণ করার অস্থির তাগিদ—কিন্তু মানুষের পরিচয় ও উপলব্ধি সেখানে নেই। মোরাভিয়ার লেখা যেখানে ঐ পথে গেছে সেখানে তারও সার্থকতা মেলে নি, কিন্তু যেখানে লেখায় চরিত্রের ও ঘটনার উপলব্ধিও প্রধান, সেখানেই তা অতুলনীয়।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

মানুষ গড়ার কারিগর—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে সকলে তোমাকে ভালবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না।

ছোটছেলে পুণ্যব্রতকে দ্বিতীয়ভাগ পড়াতে বসে ভারতী ইনস্টিট্যুশনের প্রৌঢ় শিক্ষক মহিমারঞ্জনের কথাগুলি বিদ্রূপের মত মনে হল। জীবনের হিসাব করে তিনি অনুধাবন করলেন, এই সমস্ত কথা তাঁর অভিজ্ঞতায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাঁর স্বগোতোক্তি :

[তাই বটে! আমি মহিমারঞ্জন সেন বি. এ.—লেখাপড়ায় আলস্য করিনি, ফার্স্ট হয়েছি বরাবর। চিরদিন সত্যপথ ধরে চলেছি, দৈনিক জমাখরচে একটিবার নজর দিয়েই যে-কেউ বুঝবে। দুনিয়ার ভালবাসা তাই আমার উপরে—থার্ড বি'র বেড়াল ডাকা ছেলেপুলে থেকে নিজের আত্মজা দীপালির।]

দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষা তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল। এই কদর্য প্রত্যয়ে স্থিত হয়েছেন মহিমারঞ্জন তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে পোঁছে। তাঁর অতীত এবং বর্তমান দুই-ই সমান অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তিনি অনুভব করেছেন, তাঁর বৃত্তির দীর্ঘজীবন, তাঁর নিষ্ঠা কারো শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেনি। তিনি পুণ্যব্রতকে তাই বলছেন :

'—বানান করে করে পড়, মানে শিখে নে। কিন্তু বিশ্বাস করিসনে। সমস্ত মিছে, সমস্ত ধাপ্পা—' (পৃঃ ২৫৩)

কিন্তু মহিমারঞ্জন কি নিজেও পরবর্তী কালে এই শ্রদ্ধার যোগ্য ছিলেন! অথবা কতকাল তিনি দাবী করতে পারেন তাঁর নিষ্ঠার? বস্তুত শিক্ষকতার প্রথম দিকে দুরূহ অঙ্কের ক্লাশের ছাত্রদের তিনি অনায়াসে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকতার গুণেই। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে এমন ব্যতিক্রম ঘটল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর মনোজবাবু দিয়েছেন। তাঁর বর্তমান উপন্যাস জনৈক শিক্ষকের দিনানুদৈনিক জীবনের বৃত্তান্ত নয়। সাধারণভাবে শিক্ষকসমাজ, শিক্ষায়তন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে-শ্রেণী গড়ে উঠেছে তারই বিবরণ। এ'দের কথা বলতে গিয়ে তিনি মূল ঘটনার ওপর কোনো আবরণ দেবার চেষ্টা করেননি। অথবা কোনো রঙ লাগাবার। ফলে উপন্যাসটি পাঠ করে পাঠকমাত্রই বিচলিত বোধ করবেন। কারণ, যে-শিক্ষাকেন্দ্র

মানুষের জীবন গড়ে তোলার প্রাথমিক সোপান, তার এই কলঙ্কজনক অবস্থা এমন সহজ করে, এমন অনাড়ম্বরভাবে এর আগে বাঙলা সাহিত্যে কেউ তুলে ধরেছেন বলে জানি না।

আমাদের দেশ আত্মত্যাগের দেশ। ঐহিক জীবন সম্পর্কে আমাদের প্রচণ্ড অবিশ্বাস। কিন্তু আত্মত্যাগেরও একটি সীমা আছে।

শিক্ষায়তনের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বলবার যথাযথ অধিকার মনোজবাবুর আছে। যতদূর জানি, তিনি স্বয়ং একটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে একদা শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। তাঁর অভিজ্ঞতার মূল সুদূর প্রোথিত। শিক্ষকের জীবন তিনি সমগ্রভাবে জানেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলি সে-কারণেই আমাদের মনে ঘৃণার পরিবর্তে সহানুভূতির সঞ্চার করে। শুধু তাই নয়। আমাদের মনকে আলোড়িত করে। আশ্চর্য হব না, যদি "মানুষ গড়ার কারিগর" আমাদের সরকারকে এ বিষয়ে বাস্তব ও সক্রিয় অর্থে অবহিত করে।

শিক্ষকতা শ্রদ্ধার বৃত্তি। এই বৃত্তির ওপর দেশের ভবিষ্যৎ একান্তভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু প্রাত্যহিক প্রয়োজনের তাগিদে যদি সেই মহৎ বৃত্তির মানুষকে নানা নিন্দনীয় পন্থার দ্বারস্থ হতে হয়; তবে বোধকরি তাঁর সামাজিক মর্যাদাহানি হতে বাধ্য। তখন আর কেউ এই বৃত্তিকে আদর্শের নির্মাণ বলে অনায়াসে স্বীকার করে নেবেন না।

শিক্ষকতায় অনুপ্রবেশ অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আদর্শ বোধপ্রসূত। অনেকেই মহিমারঞ্জনের মত সাতু ঘোষের অসৎ ব্যবসায়ের অংশ হতে রাজী নন। অথবা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে বড়বাবু হওয়া জীবনের চরম মোক্ষ—এ ধারণায় অপ্রত্যয়ী। কিন্তু শিক্ষকশ্রেণী মানুষের সামাজিক জীবন হতে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁদেরও কয়েকটি দায় আছে। সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পথে যখন তাঁদের জীবনের মূল প্রয়োজনগুলির পরিপূরণ সম্ভব হয় না, তখনই তাঁদের বাঁকা, অস্বাস্থ্যকর উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। অস্তিত্ব যেখানে বিপন্ন, আদর্শে আস্থাশীল থাকা কতখানি সম্ভব? ভারতী ইনষ্টিট্যুশনের কালাচাঁদ, গগনবিহারীবাবু, সলিলবাবু এরা সকলে মহিমারঞ্জনের মত একই বৃত্তে আশ্রয়ী। বাহিরে যাবার পথ এদের কাছে রুদ্ধ। এদের জীবনের সমস্ত মূল্যবোধগুলি সে-কারণেই খণ্ডিত, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিধ্বস্ত।

মহিমারঞ্জন, সলিলবাবু তবু এক অর্থে ভাগ্যবান। মহিমারঞ্জনের মেয়ে দীপালি পালিয়ে গিয়েও সাতু ঘোষের ছেলেকেই বিবাহ করেছে। ছেলে শুভব্রত তিনটে লেটার পেয়ে ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করল।

গল্প বলার এক সহজ, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী মনোজবাবুর আয়ত্তে। কিন্তু সব সময় এই সারল্য সাহিত্য রচনার আবশ্যিক কারুকার্যের বিকল্প হতে পারে না। তাঁর বাচনভঙ্গী গল্পটি সহজ করে উপস্থিত করেছে, কিন্তু আঙ্গিক-সৌষ্ঠবে তাকে রমণীয় করে তুলতে পারেনি। মনোজবাবু খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তাঁর কাছ থেকেই তো আমরা আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সাযুজ্য আশা করব।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

তারার আঁধার—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। কথাকলি। কলকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

"ঝাঁসীর রাণী," "নটী" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের নামের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ পরিচিত। অতীত ইতিহাসের কোনো কাহিনীর রসরূপসৃষ্টিতে লেখিকা কয়েকটি ক্ষেত্রে যে উল্লেখনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন এ কথা অনেকেরই অবিদিত নয়। "তারার আঁধার"-এর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এখানে লেখিকা একটি বিশেষ তত্ত্বকে বর্তমানাশ্রয়ী একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের অতীতমুখী রোমান্টিক মন এক্ষেত্রে বর্তমানের দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবভূমিতে বিচরণ করতে আগ্রহশীল। ইতিহাসের কোন সাহায্য না নিয়ে লেখিকা ইদানীন্তন সামাজিক পরিবেশ থেকে তাঁর উপন্যাসের মালমসলা সংগ্রহ করতে তৎপর হয়েছেন। সেদিক দিয়ে তাঁর উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটির একটি গুরুত্ব আছে।

পূর্বেই বলেছি—একটি বিশেষ তত্ত্বকে ব্যাখ্যা তথা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই "তারার আঁধার"-এর সৃষ্টি। এই তত্ত্বটির স্বরূপ সম্পর্কে লেখিকা গ্রন্থের নিবেদনে যা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়।

'প্রয়োজন ও অস্তিত্ব। কথা দুটি খুব নতুন নয়। সাহিত্য ও দর্শনে বহুকাল থেকে নানাভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে—বোধহয় সেই প্লেটোর আমল থেকে। তারপর কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের ও জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথা দুটো এক গুরুতর ভূমিকা নিয়েছে—তার প্রয়োজন ও অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে সরবে ঘোষণা করেছে।

"তারার আঁধার"-এর যে নায়ক, তার জীবনের বিরাট ট্রাজেডির মধ্যে আছে একটা আঙ্কিক গোলযোগ। এই প্রয়োজন ও অস্তিত্বের বে-হিসেব। এই হিসেব অনেকটা অর্থনীতির ডিম্যান্ড ও সাপ্লাইয়ের মতো। মেপে-মেপে ভেবে-ভেবে চলতে হয়। নইলে জীবনের জটিলতায় হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আসল কথা, এ-সব চরিত্র আমার দেখা। আমি দেখেছি এই বাংলাদেশে "তারার আঁধার"-এর নায়করা জন্মায় যত, মরেও তত। দেখেছি আর ভেবেছি। তারপর একদিন আমার সেই দেখা ও ভাবাকে মিলিত করে একটা গল্পে রূপ দেবার চেষ্টা করি।'

লেখিকা এখানে যে তত্ত্বের কথা বলেছেন তা চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে সেই চিরন্তন গরমিলের ব্যাপার। চাওয়া অনুযায়ী পাওয়া ঘটে না বলেই জীবনে সংঘাতের সৃষ্টি হয় ও পরিণামে ট্রাজেডি অনিবার্য হয়ে ওঠে। বস্তুত চাওয়া-পাওয়ার বিষয়ে হিসেবনিকেশের ভুলের মূলে যে মানবিক অক্ষমতা বা দুর্বলতা তাই ট্রাজেডির মূল উৎস। যাইহোক লেখিকার উপস্থাপিত তত্ত্বটি সাধারণভাবে অগ্রহণীয় নয়। কিন্তু উপন্যাস-প্রণয়নের দিক দিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব আমদানী করাই খুব বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে ঐ তত্ত্বটিকে আশ্রয় করে জীবনের রসরূপরচনার সফলতা। উপন্যাসের মধ্যে তত্ত্ব প্রচার বা প্রতিষ্ঠার অতি সচেতন প্রচেষ্টা এর শিল্পসম্মত সৌন্দর্যসুষমাকে ক্ষুণ্ণ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মত জিনিসটা হচ্ছে সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবদেহের অন্তর্গত কঙ্কালের মতো। ওটা ভিতরে থেকেই সাহিত্যকে যোগাবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি, বাইরে থেকে প্রকাশ পাবে তার বিচিত্র দেহ-সৌষ্ঠব, তার লাবণ্য।' প্রকৃতপক্ষে কোনো মতবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে সাহিত্যিকের পক্ষে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করা অসম্ভব। আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক বিজয় দাশের মধ্য দিয়ে লেখিকার

তত্ত্বপ্রচারের সজ্ঞান প্রয়াস জীবনের বাস্তবপ্রতিম রসরূপনির্মাণে কতক পরিমাণে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বিজয় যে পরিমাণে একটা তত্ত্বের প্রতিমূর্তি সেই পরিমাণে রক্তমাংসের মানুষ নয়। তাকে একটা তত্ত্বের বাহক করতে গিয়ে লেখিকা তার মানবিক বৃত্তিগুলিকে অস্বাভাবিক-ভাবে সংকুচিত করেছেন বলে মনে হয়। বস্তুত বিজয়ের ট্রাজেডি এখানে বিশেষ কোন রসরূপ লাভ করে নি।

কাহিনীবিন্যাসে লেখিকা ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিজয়ের জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সব রকম প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, তখন সে উন্মাদ হয়ে গেল এবং তার ভাই কুমুদ তাকে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের এক এ্যাসাইলামের উদ্দেশ্যে ফোরটিন আপ ট্রেনে যাত্রা করলো। মধ্যপ্রদেশের একটি শিল্পকেন্দ্রের উপান্ত অঞ্চলের একটি স্টেশানের কাছে বম্বে মেলকে পাস করে যাবার সময় ট্রেনটি গতি শ্লথ করতেই বিজয় জানলা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে তার উন্মাদজীবনের অবসান ঘটালো। এই অঞ্চলে বিজয়ের সহপাঠী ও অন্তরংগ বন্ধু বাদল এসেছিল সরকারী কাজে বদলী হয়ে। কুমুদ স্টেশানমাস্টারের কাছে বাদলের খবর পেয়ে তাকে ডেকে নিয়ে গেল স্টেশানে। কুমুদ বাদলকে বিজয়ের আত্মহত্যার সংবাদ দিতে যেখানে তার বাসায় এসেছে, সেখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের শুরু। এর পর বাদলের জবানিতে বিজয়ের জীবনের পূর্বঘটনা বিবৃত করা হয়েছে। এই ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতি গ্রহণের ফলে উপন্যাসের পরিণতি সম্পর্কে অপরিহার্য ঔৎসুক্য অনেক কমে গিয়েছে। তা ছাড়া এই গ্রন্থের মধ্যে সত্যকার উপন্যাসের স্বাভাবিক বিস্তার ও গভীরতা অনেকাংশে অনুপস্থিত। লেখিকা গ্রন্থের নিবেদনে জানিয়েছেন যে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু প্রথমে 'ছায়াবাজি' নামে একটি একটি গল্পে পরিবেষিত হয়েছিল। তারপর লেখিকার কথায় 'কিন্তু তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে যে, বিষয়টি এত ব্যাপক, প্রশ্নটি এত গভীর যে, তাকে ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে বন্দী রাখলে অন্যায় হবে।' বিষয়টি ব্যাপক ও গভীর হলেও একে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি যে উপন্যাস রচনা করেছেন তা যেন ছোট গল্পেরই এক অনাবশ্যক দীর্ঘ সংস্করণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটিকে ছোট গল্পের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে খুব অসংগত হত না বলে বোধ হয়। ঘটনাবিন্যাসের দিক দিয়েও কয়েকটি অসঙ্গতি চোখে পড়ে। (পৃ ২, ৪, ১৪০)

চরিত্রচিত্রণের ব্যাপারে নায়ক বিজয় দাশের চরিত্রে সংগতি ও বাস্তবতার অনটন অনুভূত না হয়ে পারে না। বাংলা দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বিজয়ের মনে তার আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবন্ধুজনের স্তুতিবাদে নানা উচ্চাশা ও স্বপ্নকামনা নীড় বাঁধলো। কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার তেমন কোন পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও কেন যে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল তার কারণ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। ছাত্র, লেখক, সাংবাদিক, চিত্রকর, সংগীতগবেষক কোন হিসেবেই বিজয় কোন কৃতিত্বের প্রমাণ দিতে পারে নি। প্রতি ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা দেখেও কেন যে নিজের প্রতিভা সম্পর্কে তার ধারণা আহত হয় না তা নির্ণয় করা কঠিন। লেখিকার বর্ণনা থেকে মনে হয়, বিজয় নিজেকে ছাড়া অপর কাউকে ভালবাসতে পারে না। নিজের প্রতিভাতে সে নিজেই মুগ্ধ। শুধু নিজের প্রেমেই সে নিবিষ্ট। তাই যদি হয় তবে প্রথম থেকেই বিজয়ের মানসিক সুস্থতার বিষয়ে সন্দেহ জাগে এবং বাংলাদেশে বহু সংখ্যায় বিজয় দাশের মত চরিত্রের বিদ্যমানতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ না থেকে পারে না। বিজয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী রূপকে খুব বেশী বড় করে দেখাতে গিয়ে তার মানবিক রূপকে খর্ব করে ফেলা হয়েছে। ফলে বিজয়ের ট্রাজেডি বাঞ্ছিতভাবে মনে রসনিষ্পত্তি করে না। পাগল

হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিজয়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অপ্রতুলতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র অঙ্কনে লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট। বিজয়ের বাবা গোপালবাবুর চরিত্রটি স্বাভাবিকতার গুণে হৃদয়গ্রাহী। বিজয়ের বন্ধু অরুণ এবং তার প্রণয়প্রার্থিণীও এ উপন্যাসের প্রধান স্ত্রীচরিত্র মাধবীর মধ্যে রোমাণ্টিক ভাবালুতার আতিশয্য থাকলেও বাস্তবিকতার স্পর্শ বর্তমান এবং সেই হিসেবে কতক পরিমাণে সার্থক। তবে লেখিকা সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন রেইনী পার্কের 'সিলেক্ট'ভসার সোসালাইটদের ফানুসের মত অন্তঃসারশূন্য জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ আলেখ্যচিত্রণে। এদের মধ্যে বিশেষ করে বুলা রায় ও পিকপিক সোমের চরিত্র দুটিতে একটু চড়া রঙের স্পর্শ থাকলেও সজীবতার গুণে মনকে আকর্ষণ করে।

লেখিকার ভাষা মোটামুটি উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ ও ঝরঝরে। কোনো কোনো জায়গায় বর্ণনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুশীলকুমার গুপ্ত

SC-P I.

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খৃষ্ট

রবীন্দ্রনাথ খৃষ্ট-জীবন ও -বাণীর যে ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময়ে (১৯১০-১৯৩৬) করেছেন এই গ্রন্থে সেগুলি একত্র সংকলিত হয়েছে। সমাহৃত অধিকাংশ রচনা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল-অঙ্কিত খৃষ্ট-চিত্রে ভূষিত। মূল্য ২.৫০ টাকা।

বিভিন্ন বৎসরে (১২৯১-১৩৪১) রামমোহনের স্মরণ-সভায়, রামমোহন শতবার্ষিকীতে, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবে, মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, অভিভাষণ দিয়েছেন, ও অন্য সূত্রেও রামমোহন সম্বন্ধে যা বলেছেন, এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে তা যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ব সংস্করণের পর এই নূতন সংস্করণে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি রচনা সংগৃহীত হয়েছে। মূল্য ৩.০০, বোর্ড বাঁধাই ৪.০০ টাকা।

চিঠিপত্র

সপ্তম খণ্ড

কাদম্বিনী দত্ত ও শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্রগুচ্ছ।
মূল্য কাগজের মলাট ৩.০০, বোর্ড বাঁধাই ৪.৩০ টাকা

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত চিত্রাবলী-বিভূষিত শোভন সংস্করণ
মূল্য বোর্ড বাঁধাই ১২.০০ টাকা : এই সংস্করণে সুবিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়ও আছে
মুগা ও চামড়া বাঁধাই ২০.০০ টাকা

॥ **অন্যান্য সংস্করণ** ॥

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয় সংবলিত কাগজের মলাট : ৩.৫০ টাকা
বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় সংবলিত সাধারণ সংস্করণ যন্ত্রস্থ

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

ফিলিপ্‌স
PHILIPS

কল্যাণী
অধ্যাপকের ভালো লেগেছে
কল্যাণীতে এসে অধ্যাপকটি প্রথমেই গেলেন স্কুল দেখতে। শুনে তিনি খুবই খুশী হলেন যে এই নতুন শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হবে। ছাত্ররা যা চায় সবকিছুই কল্যাণীতে রয়েছে—মুক্ত বাতাস, পার্ক ও খেলাধুলার মাঠ, রাস্তাঘাট আর সবুজের সমারোহ। প্রকৃতির কাছে থেকেও নগর-জীবনের সুখ-সুবিধার এই ব্যবস্থা দেখে অধ্যাপকটি মুগ্ধ।
জীবন যাত্রায়
আনন্দ আনবে
কল্যাণী
যোগাযোগ করুন:
কল্যাণী সেল্‌স অফিস, ১৮৮এ, রাসবিহারী এ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-২৯, ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, রাজভবন,
কলিকাতা বা পাবলিক রিলেশন্‌স অফিসার, কল্যাণী, জেলা—নদীয়া।
PPK 16

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য GE 25016
গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় GE 25017
পান্নালাল ভট্টাঃ GE 25018
দ্বিজেন মুখোঃ GE 25019
প্রতিমা বন্দ্যোঃ GE 25020
গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোঃ GE 25021
হেমন্ত মুখোঃ GE 25022
লতা মঙ্গেশকর GE 25023
গীতা দত্ত GE 25024
গায়ত্রী বসু GE 25025
কীর্ত্তন-কলানিধি রথীন ঘোষ GE 25026
কৃষ্ণা চট্টোঃ GE 25027
এবার পূজায়
শ্রেষ্ঠ শিল্পী
সমাবেশ
বিস্তারিত বিবরণ ডীলারের কাছে দেখুন
কুমার শচীন দেববর্ম্মণ P 11934
সতীনাথ মুখোপাধ্যায় N 82887
উৎপলা সেন N 82888
তরুণ বন্দ্যোঃ N 82889
কণিকা বন্দ্যোঃ N 82890
সনৎ সিংহ N 82891
নির্ম্মলেন্দু চৌধুরী N 82892
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় N 82894
ইলা বসু N 82895
মান্না দে N 82896
নির্ম্মলা মিশ্র N 82897
শ্যামল মিত্র N 82898
'হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস' ও কলম্বিয়া
রেকর্ড

বিপদের হাত থেকে শহরকে বাঁচিয়ে দিল

১৯৫৯ সালের ১লা অক্টোবর যখন জামশেদপুরে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি হচ্ছিল, টাটা স্টীল কর্মীদের ছোট একটি দল জামশেদপুর শহরকে একটা বড় রকম বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি সুবর্ণরেখার ধারে একটি জলাধারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

জলাধার ও নদীর মাঝখানের বাঁধের ধারে ঝড়ে ভেসে-আসা একটা কাঠের ভেলা আটকে গিয়েছিল···যে কোন মুহূর্তে জলের স্রোতে প্রচণ্ড গতিতে ভেসে গিয়ে, নদীর ওপরের পুলের গা দিয়ে জলের যে মেন পাইপ শহরের দিকে গেছে সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিত।

বিপদ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন ২৭ বছর বয়সের সামসুদ্দিন খাঁ সেই ঘূর্ণায়মান জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাঁতার কেটে ভেলার কাছে পৌঁছে সে, কোনো রকমে সেটাকে টেনে সরিয়ে দিলো। তার সহকর্মীরা তাকে বীরের মত অভিনন্দন জানালে, আর, টাটা স্টীল একজন প্রাক্তন-কর্মীর এই সাহসী ছেলেটিকে নগদ ৫০০৲ পুরস্কার ও একটি স্থায়ী চাকরি দিলেন।

কর্তব্যের জন্যে জীবন বিপন্ন করার মহৎ দৃষ্টান্ত জামশেদপুরে সামসুদ্দিনের মত বীর কর্মীরা স্থাপন করেছেন। এখানে শিল্প শুধু জীবিকা উপার্জনের পথ নয়— জীবনেরই একটি অঙ্গ।

জামশেদপুর

ইস্পাত নগরী

TTN 4006 The Tata Iron and Steel Company Limited

মিহি
মোলায়েম
সুগন্ধি
স্যাভলন্
বেবি পাউডার
—'হিবিটেন'যুক্ত
Savlon
BABY
POWDER
ভারতে
প্রস্তুতকারক
ও পরিবেশক
ICI
ইম্পিরিয়াল
কেমিক্যাল
ইন্ডাস্ট্রিজ
(ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট
লিঃ
কলিকাতা
বোম্বাই
মাদ্রাজ
নয়া দিল্লী
IBC-7 BEN
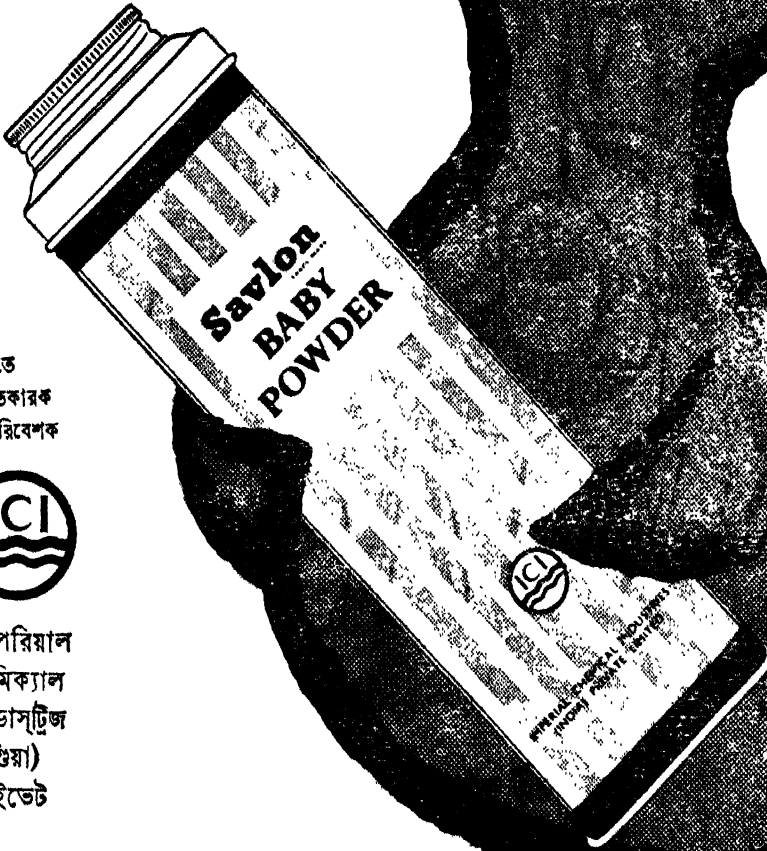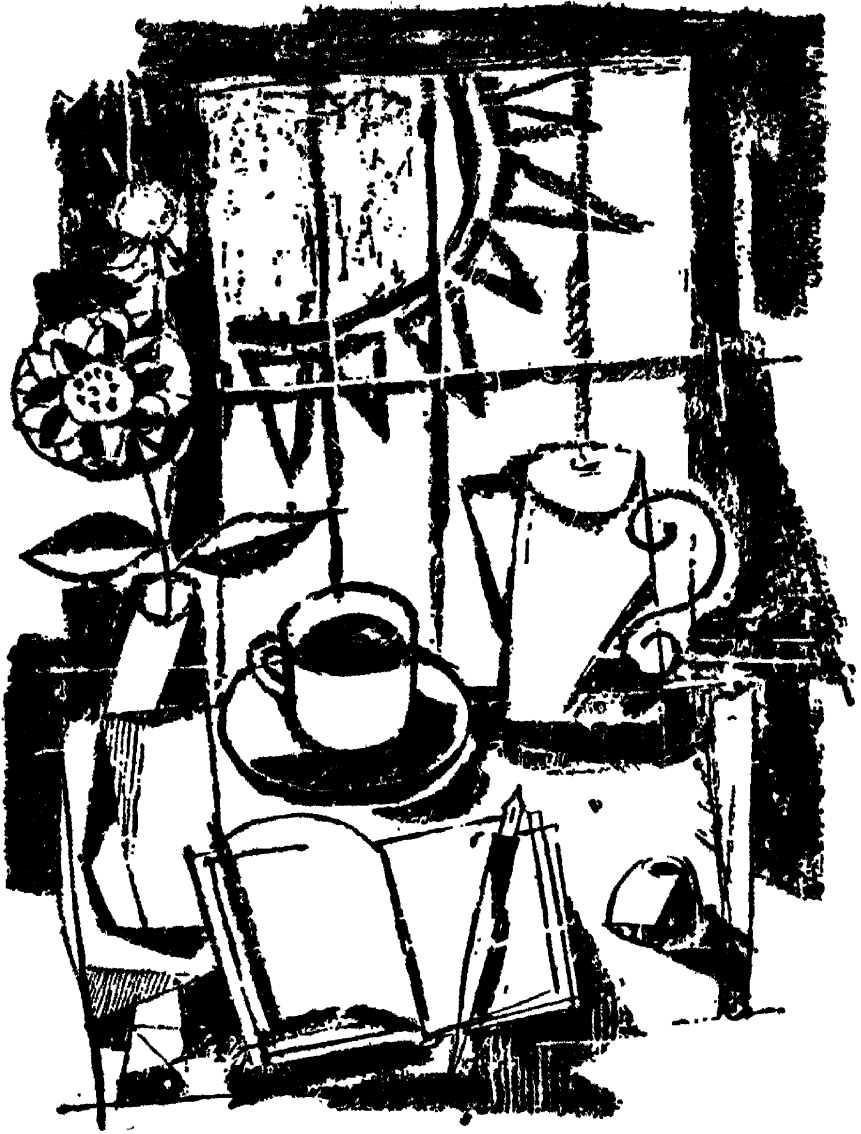
দোকানের
শো-কেসেই
দেখতে সুন্দর,
কিন্তু . . .
...একবার কাচতে না কাচতেই যে ছোট হয়ে গেল! উনি যদি 'স্যানফোরাইজড' লেবেল দেখে সুতী কাপড় ও তৈরী-জামা কিনতেন তাহলে ওঁর গায়ের-রক্ত-জল করা উপার্জ্জনের টাকা আর বৃথা নষ্ট হত না!
লেবেলে ·SANFORIZED· REGD TD MK এই ছাপ দেখে নিলে
সে-কাপড়ের পোশাক কখনো খাটো হবে না!
'স্যানফোরাইজড' রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কের স্বত্বাধিকারী ক্লুয়েট, পীবডি এণ্ড কোং, ইনকর্পোরেটেড (সীমিত দায়িত্ব সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ) কর্তৃক প্রকাশিত। এই কোম্পানীর সঙ্কুচনরোধী কঠিন শর্তানুযায়ী তৈরী কাপড়েই কেবল 'স্যানফোরাইজড' ট্রেড মার্ক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।
সবিশেষ খবরের জন্য: 'স্যানফোরাইজড' সার্ভিস, ২৫, মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই-২

দ্বাবিংশতিতম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৭
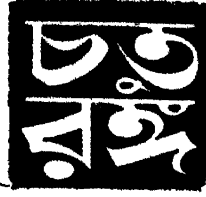
সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

পূর্বেই বলেছি যে সোভিয়েট রাষ্ট্র জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সংগঠন ও শিক্ষণে বিশ্বাসী। সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের ধারণা যে ঠিকভাবে শিক্ষা দিলে মানুষের স্বভাব ইচ্ছামত বদলান যায়, সংগঠনের ফলে আজ যা অসম্ভব মনে হয়, কাল তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা চলে। কয়েক বৎসর আগে লিসেঙ্কোকে কেন্দ্র করে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে সোভিয়েট দেশে এবং বাইরে যে তুমুল তর্ক উঠেছিল, তারও প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল এই যে প্রতিবেশ বদলে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারও বদলানো যায়। শিক্ষার ফলে স্বভাব বদল হয় এ কথা প্রায় সকলেই মানে, কিন্তু সে পরিবর্তন উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হয় কিনা, হলেও কতখানি হয়, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই।

সোভিয়েট রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং প্রাচ্যের মানববিদ্যার অধ্যয়ন এবং গবেষণার জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে, তাদের বর্ণনা পূর্বে দিয়েছি। সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সোভিয়েট রাষ্ট্রে সংগঠনের যে প্রাচুর্য দেখেছি, বর্তমান প্রবন্ধে তারই খানিকটা আলোচনা করব। সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সোভিয়েট অন্তর্গত প্রতিটি রাষ্ট্রে লেখক, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ এবং নাট্যশিল্পীদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ এবং তাসকন্দে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেখে রবীন্দ্র-নাথের কথা মনে হল : ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে। মানুষকে অনুশাসনে বাঁধবার চেষ্টা যতই প্রবল হোক না কেন, তার মধ্যেই মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যবস্থা খুঁজে নেয়।

রাজনীতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রাণ। মার্কসবাদকে ভিত্তি করে জীবনের প্রতিটি প্রকাশকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা সে দেশে স্পষ্ট। তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত সংগঠনেই যে রাজনীতির ছাপ মিলবে, একথা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখলাম যে সঙ্গীত সমাজগুলি রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেকখানি এড়াতে পেরেছে। তার কারণও আছে। প্রত্যয় বা ধারণা সঙ্গীতে তেমন স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, চিন্তার চেয়ে আবেগই সঙ্গীতে বেশী প্রকাশ পায়, তার আবেদনও প্রধানত বুদ্ধিকে নয়, হৃদয়কে।

মার্কসবাদী নিজেকে যতই বাস্তববাদী বলুন না কেন, মার্কসবাদ একান্তভাবে বুদ্ধি নির্ভর হতে চায়, যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচারের প্রয়াস করে, তাই জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশকে ব্যক্ত করতে পারে না। আবেগপ্রধান সংগীতের ক্ষেত্রে তাই মার্কসবাদের প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন প্রভাব দেখা যায় না। মস্কোতে সংগীত সমাজে এ সম্বন্ধে আলোচনায় একজন সংগীতজ্ঞ বললেন যে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গল্প অবলম্বন করে তাঁরা বর্ণবৈষম্যের সংঘাত ও দুঃখ প্রকাশের জন্য নতুন সংগীত রচনা করেছেন। শুনে দেখলাম যে ইয়োরোপীয় সংগীতে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সর্বত্র যেভাবে প্রকাশিত হয়, সংঘর্ষের শেষে শান্তি ও সমন্বয় শ্রোতাকে যেভাবে মুগ্ধ করে, এ নতুন সংগীতেও তারই পুনরাবৃত্তি। জিজ্ঞাসা করলাম যে বর্ণবৈষম্যের সংগীত না বলে যদি তাকে প্রণয়দ্বন্দ্বের সংগীত বলি, অথবা বিদ্বেষ ও প্রেমের সংঘর্ষের প্রকাশ বলি, তাহলে তাঁরা কি বলবেন? উত্তরে তাঁরা বললেন যে সংগীতের প্রকাশ সর্বজনীন। বিশেষ আবেগও সংগীতের মাধ্যমে সার্বিক হয়ে ওঠে, কাজেই বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব যদি সংগীতে সমান রূপ গ্রহণ করে, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সোভিয়েট সংগীত সমাজের অধ্যক্ষ বললেন যে ভারতীয় গুণী গায়ক ও বাদক সোভিয়েট রাষ্ট্রে এসে সোভিয়েট পদ্ধতিতে সংগীত শিক্ষা লাভ করলে ভারতীয় সংগীতের উৎকর্ষ সহজ হবে। আমি তাঁকে বললাম যে ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় সংগীতের ঐতিহ্য ও প্রকাশ ভিন্নধর্মী। ভারতীয় সংগীত সুর নির্ভর, মেলডিক; ইয়োরোপীয় সংগীতে সংগতির উপর জোর বেশী, সে সংগীত হারমনিক। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সংগীতে রাগরাগিণীর বিভাগ ও বন্ধন থাকলেও সংগীতকারের স্বাধীনতা অনেক বেশী। ইয়োরোপীয় সংগীতে রচয়িতা ও সংগীতকারের পার্থক্য স্পষ্ট, ভারতীয় সংগীতে প্রতিবারই প্রত্যেক সংগীতকারকে রচয়িতার ভূমিকা নিতে হয়। তাই ভারতীয় ছাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে বা সোভিয়েট ছাত্র ভারতবর্ষে এসে সংগীত শিখলে বেশী লাভ নেই। তবে প্রতিষ্ঠাবান ভারতীয় সংগীতকার এসে যদি সোভিয়েট সংগীতকারদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করেন, ইয়োরোপীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশের সঙ্গে পরিচিত, এবং ঠিক সেইভাবে প্রতিষ্ঠাবান সোভিয়েট সংগীতকার এসে ভারতবর্ষে গুণীদের সঙ্গে বাস করেন, তবে তার ফলে উভয়দেশের সংগীতেরই অনেক বেশী লাভের সম্ভাবনা। সংগীত সমাজের সদস্যেরা একথা মানলেন এবং বললেন যে "লায়লা মজনু"র সংগীতরূপ দেওয়া হয়ে গেছে এবং বর্তমানে তাঁরা কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটককে সংগীতরূপ দিতে চেষ্টা করছেন। "লায়লা মজনু"র কিছু কিছু অংশ আমাকে শোনালেন। তার ভঙ্গী ইয়োরোপীয় কিন্তু প্রায় সর্বত্রই প্রাচ্য সংগীতের আমেজ মেলে, দুয়েক জায়গায় ভারতীয় সুরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভারতবর্ষের সংগীত নিয়ে শুধু মস্কো নয়, সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্রই আগ্রহ দেখেছি। তবে সাধারণত ভারতীয় সংগীত বলতে তারা সিনেমার ফিল্মী গীতই বোঝে। ভারতবর্ষের ধ্রুপদ বা খেয়ালের সঙ্গে সাধারণ লোকের পরিচয় নেই, কিন্তু মস্কোর সংগীত সমাজ অথবা লেনিনগ্রাডের নাট্য পরিষদে নানারকমের ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও ভারতীয় সংগীতের সংগ্রহ দেখলাম। উজবেকীস্তানের গানবাজনা শুনে বার বার ভারতীয় সংগীতের কথা মনে আসে। তারা ইয়োরোপীয় বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করেও নিজেদের সংগীতের স্বকীয়তা রক্ষার চেষ্টা করছে।

সঙ্গীত সমাজের সভ্যদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বাধীন মনোবৃত্তির উল্লেখ করেছি। সঙ্গীতের প্রকৃতির ফলে তা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু নাট্য পরিষদগুলিও যে দলীয় প্রচার মনোভাব অতিক্রম করে অনেকখানি স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। বস্তুতপক্ষে লেখকগোষ্ঠী বা চিত্রকর সম্প্রদায়ের তুলনায় নাট্যপরিষদগুলি অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। মস্কোতেও নাট্যকারদের যে স্বাধীনতা, মনে হল লেখকদের সে স্বাধীনতা নেই। লেনিনগ্রাড এবং কিয়েভে নাট্যকারদের স্বাধীনতা আরো বেশী মনে হল। কিয়েভে একটি আধুনিক যুগের নাটক দেখেছিলাম, তাতে সরকারী কর্মচারীদের যেভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে, এক নায়ক-নির্ভর ও সমগ্রবাদী সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে তা সম্ভব, না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

মস্কোতে আজো বসত বাড়ির একান্ত অভাব—সেই অভাবকে কেন্দ্র করেই নাটকটি রচিত হয়েছে। শহরের নতুন উপকণ্ঠে এক বিরাট অট্টালিকা তৈরী হয়েছে, তাতে প্রায় একশো ফ্ল্যাট। উমেদারের সংখ্যা কিন্তু কয়েক হাজার, এবং তারা বলাবলি করছে যে মুরুব্বি না হলে ফ্ল্যাট পাওয়া কঠিন হবে। সরকারী কর্মচারীরা যে তদবিরের পক্ষপাতি এবং সুবিধা পেলেই উৎকোচ নিতে চায়, তার প্রতিও স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ডিরেক্টরের স্ত্রী অন্যায় আবদার করছে, ডিরেক্টরকে শাসাচ্ছে যে অন্যের চেয়ে বড় বাড়ি না দিলে তাকে ছেড়ে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পার্টির কল্যাণে সত্যেরই জয় হল, কিন্তু নাটকটি দেখলে সন্দেহ থাকে না যে বর্তমানের সোভিয়েট নাগরিক অনেক সরকারী ব্যবস্থাকেই উৎপাত মনে করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না।

শুধু নাটক বলে নয়। সার্কাসেও দেখেছি যে ক্লাউন বা ভাঁড় যখন কোনো সরকারী কর্মচারীকে বিদ্রূপ করে, তখনই সমবেত দর্শকমণ্ডলীর উৎসাহ ও করতালি সবচেয়ে বেশী। সোভিয়েট রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতাদের মধ্যে একজনের অভিনয় দেখলাম। প্রথম দৃশ্যে পেটের ওপর মস্ত বেলুন বেঁধে তার বিরাট মূর্তি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে এত মুটিয়েছ কি করে? তৎক্ষণাৎ জবাব মিলল—আমি যে এখন ডিরেক্টার হয়েছি। পরের দৃশ্যে ডিরেক্টরী পদ ঘুচে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা চুপসে কাঠির মতন। তখন সে দুঃখ করে বলছে যে কেন এত তাড়াতাড়ি মোটা হয়ে গেলাম, তা নইলে তো এত শীঘ্র ডিরেক্টরের পদ যেতো না। বেকার কাউকেই কাজ দিতে চাইলেই তার প্রথম উত্তর যে হয় ডিরেক্টর নয় এসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টরের পদ চাই।

সোভিয়েট নাট্যশিল্পের বিষয়ে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রত্যেক শহরেই নাট্যমঞ্চ রয়েছে এবং তারা দেশী বিদেশী নানা ধরনের নাটকের আয়োজন করে। সাইবেরিয়ার একটি শহর থেকে এক নাট্যদল মস্কোতে সেক্সপীয়র অভিনয় করতে এসেছিল। ভাষা অবশ্য রুশ, কিন্তু সেক্সপীয়রের পরিচিত কাহিনী অভিনয়ের গুণে আমাদের মতন যারা রুষ ভাষার এক বর্ণও জানে না, তাদের কাছেও মূর্ত হয়ে উঠল। কিন্তু নাটকের চেয়ে ব্যালে এবং অপেরা সোভিয়েট জনসাধারণের অধিকতর প্রিয় মনে হল। বিশেষ করে পুরনো যুগের ব্যালের দর্শকের অভাব নেই। সুবিখ্যাত বলশয় থিয়েটারে মরাল হ্রদ বা সোয়ান লেকের অভিনয় ১৯৫৬ সালে যখন মস্কো এসেছিলাম, তখন দেখেছিলাম। এবার লেনিনগ্রাডে পুনর্বার সেই ব্যালেরই অভিনয় দেখলাম। মস্কোর বলশয় থিয়েটারের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, সে তুলনায় আজকাল লেনিনগ্রাডের দ্যুতি খানিকটা

মলিন, কিন্তু তবু মনে হল যে মোটের ওপর লেনিনগ্রাডের অভিনয় মস্কোর চেয়েও উৎকৃষ্ট। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন যে লেনিনগ্রাড থিয়েটার বহু গবেষণার ফলে মরাল হ্রদের প্রথম পরিবেশের আবহাওয়া পুনরাবিষ্কার করেছে। বিপ্লবের যুগে মস্কোতে যতখানি পরিবর্তন হয়েছে, লেনিনগ্রাডে তা হয়নি বলে আদি ব্যালের রস লেনিনগ্রাডেই বেশী মেলে।

রুশ সমালোচকের এ মন্তব্যে অনেকে হয়তো আশ্চর্য হবেন। পৃথিবীর বহুদেশে, এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে অনেকেরই ধারণা যে বিপ্লবের ফলে রুশ সমাজের চেহারা একেবারে বদলে গেছে; মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিও আর আগেকার মতন নেই। পরিবর্তন অবশ্য অনেক হয়েছে,—বর্তমানকালে পৃথিবীতে সব দেশেই পরিবর্তনের বেগ বেড়ে গেছে, আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তন এসেছে, কোন কোন বিষয়ে সে পরিবর্তন সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরিবর্তনের চেয়ে কম নয়,—কিন্তু তবু রুশ জাতির ঐতিহ্য এবং রুশ-দেশের মানুষের স্বভাব মূলত বদলায়নি। পুরনো নাটক ও ব্যালের প্রতি অনুরাগ তো আছেই, এবং সে সমস্ত রচনার মধ্যে যেগুলিতে রাজরাজড়ার আড়ম্বর ঐশ্বর্য জাঁকজমক যত বেশী, সেগুলি বোধ হয় তত বেশী জনপ্রিয়। শ্রমিক জীবনের দুঃখ দৈন্য নিয়েও নতুন ব্যালে রচিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি জমে নি। দর্শকের দল ভিড় করে পুরনো কালের ব্যালে দেখতে এসেছে এবং আসে। হয়তো তার একটি কারণ যে বাস্তব জীবনের অভাব অভিযোগ তো দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ব্যাপার, নাটকে ব্যালেতে আবার তা নতুন করে দেখবার ইচ্ছা হয় না। বরং তারা চায় যে প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা ও বঞ্চনা কল্পনার রাজ্যে মিশে যাক, সেখানে সব কিছু রঙীন স্বপ্নের মধ্যে দেখে ক্লান্ত চিত্ত আনন্দ এবং উৎসাহ পাক। বহু বিষয়ে রুশ দেশের সঙ্গে আমেরিকার মিল খুবই স্পষ্ট। রাজরাজড়ার প্রতি উভয় দেশের নাগরিকের আগ্রহ ও অনুরাগ দেখেও সে কথা বারবার মনে হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে সঙ্গীত ও নাটক দেখে যতখানি আনন্দ পেয়েছি, সেখানকার সাম্প্রতিক সাহিত্য বা চিত্রকলায় তা পাইনি। চিত্রকলার উৎকর্ষের জন্যে সোভিয়েট একাডেমী তো রয়েছেই। তা ছাড়া ইউক্রেন, উজবেকস্থান, জর্জিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র একাডেমীও রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দেখা যায় যে একাডেমীর আধিপত্য যত বাড়ে, চিত্রকলার বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা তত কমে যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার লক্ষণ আরো স্পষ্ট। সোভিয়েট একাডেমী রাষ্ট্রের সমস্ত উচ্চ শিল্প শিক্ষাশালাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রশিল্প বা সঙ্গীত শেখানো হয়, তাদের বেলায়ও শেষ পরীক্ষার মান নির্ণয় এবং ডিপ্লোমা দেওয়া একাডেমীর অন্যতম কর্তব্য। মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে ছাত্রছাত্রী এ সমস্ত শিল্প শিক্ষাশালায় আসে এবং পাঁচ ছয় বছর সেখানে অধ্যয়ন করে। সাধারণত চব্বিশ বছরের আগে কেউ ডিপ্লোমা পায় না, এবং সে ডিপ্লোমা না পেলে কোন স্কুলে শিক্ষকের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। একাডেমীর এ আধিপত্যের ফলে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের চিত্রকলায় এক বৈচিত্র্যহীন এক ঘেয়েমীর পরিচয় মেলে।

মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ এবং তাসকন্দে এ প্রসঙ্গ নিয়ে চিত্রশিল্পী সাহিত্যিক-দের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। মস্কোতে একাডেমীর সভাপতি মণ্ডলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে পুরাতন ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির

যে দ্বন্দ্ব ইয়োরোপের সমস্ত দেশেই দেখা দিয়েছে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার প্রতিধ্বনি ওঠেনি কেন? ভারতবর্ষেও শিল্পীদের মধ্যে কেউ প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুগামী, কেউ ইয়োরোপের ধ্রুপদী পদ্ধতিকে স্মরণ করেন, আবার অনেকে নতুন নতুন বিপ্লবী অঙ্কন পদ্ধতিকে বরণ করতে চান। তাঁরা বললেন যে ১৯২০ সালের পর কয়েক বৎসর এ নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা চলেছে, সে সময় সোভিয়েট শিল্পীরা নানানভাবে প্রাচীন শৈলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেই চিত্রশিল্পী সার্থকতা খুঁজে পান। তাঁরা একথাও বললেন যে জনতার সমাদরই শিল্পীর সিদ্ধির পরিচায়ক, তা নইলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্পে ব্যক্তিত্ববাদ বহুক্ষেত্রে অনাচারে পরিণত হয়। তাই বর্তমানে সমস্ত শিল্পীই একই পথের পন্থী, তার নাম দিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ। তাসকন্দের একাডেমীর সভ্যরা একথা আরো স্পষ্ট করে বললেন। সমস্ত শিল্পী একই পদ্ধতিতে একই শৈলীতে শিক্ষালাভ করেন, তাই তাঁদের সকলের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও অঙ্কন পদ্ধতি এবং নতুন ধরণ-ধারণ নিয়ে কোন সংঘর্ষ বাধবার সম্ভাবনা নেই।

উত্তরে আমি বললাম যে সব দেশে সব কালেই শিল্পী জনমানসের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে চান। কিন্তু জনসাধারণ যে কি চায় তা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। শিল্পীর স্বভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অভাব হলে শিল্পী সমাজকে কিছুই দিতে পারে না, তাই সমস্ত চিত্রকর ভাস্কর একই পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাতে শিল্পের অবনতি হবার সম্ভাবনা। স্বাধীনভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ না থাকলে শিল্পের বিকাশ হয় না, একথা তাঁরা মানলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে যতটুকু স্বাধীনতা তাঁদের প্রয়োজন, সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা তাঁদের মেলে।

মস্কো বা তাসকন্দে যে উত্তর পেয়েছিলাম তাতে তুষ্ট হতে পারি নি। মনে হয়েছে এবং তাঁদের বলেছিও যে আসল প্রশ্ন তাঁরা এড়িয়ে গেছেন। স্বাধীনতা মেপে ঠিক করা যায় না, অবশ্য একথাও ঠিক যে স্বৈরাচারেও শিল্পের স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। স্বতন্ত্র হয়েও সমাজের সঙ্গে যোগ স্থাপনেই শিল্পের সার্থকতা—তাই সার্থক শিল্প একই কালে একান্তভাবে বিশিষ্ট ও সার্বিক।

লেনিনগ্রাডে এবং বিশেষ করে কিয়েভে কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর খানিকটা অন্যভাবে মিলল। লেনিনগ্রাডে শিল্পীরা স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেন যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে শিল্পের মূল্যায়ন বদলে যায়। কিয়েভে শিল্পীগোষ্ঠী বললেন যে রাষ্ট্রীয় চিত্রশালা একাডেমীর বন্ধন থেকে মুক্ত নয়, কাজেই তারা যে সমস্ত ছবি সংগ্রহ করে তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু সোভিয়েট নাগরিক ব্যক্তিগত খুশীমত নানা ধরনের ছবি পছন্দ করে, কেনে। সেখানকার সাংস্কৃতিক দফতরের মন্ত্রী বরং দাবী করলেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্যের যতখানি অবকাশ অন্য কোন সমাজে তার তুলনা মিলবে না। নিজের বক্তব্যকে পরিষ্কার করবার জন্যে বললেন যে অন্য সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্র শ্রেণী নির্ভর, তাই ব্যক্তি সেখানে স্বাধীন নয়, তার রুচি এবং শিক্ষা দীক্ষা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাঁর মতে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রেণীভেদ নেই, তার শ্রেণী নির্ভর বিশ্বাস বা সংস্কারের প্রভাবও নেই, ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অবারিতভাবে নিজের স্বভাব ও প্রতিভাকে বিকশিত করতে পারে।

উত্তরে আমি বললাম যে সোভিয়েট সমাজবাদীর ধনতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে ধারণা অনেক ক্ষেত্রে ভুল। তাঁরা ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীবিভাগের যে কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন,

তা অনেকক্ষেত্রে বাস্তব নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যোগাযোগ বহুমুখী, কেবলমাত্র শ্রেণী সংঘর্ষের কথা বলে তার সম্যক পরিচয় দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত রুচিও সর্বত্র শ্রেণীবিভাগ মেনে চলে না এবং ধনী ও দরিদ্র সকলের মধ্যেই রুচির বৈচিত্র্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের শাসন অপেক্ষাকৃত শিথিল বলে অন্যান্য দেশে রুচির ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক বেশী, তাই সে সমস্ত দেশে শিল্পকলার বিকাশের সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

ইউক্রেনের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী একথা মানতে চাইলেন না। বললেন যে বর্তমানে হয়তো আমার কথার খানিকটা যৌক্তিকতা থাকতে পারে, কারণ এখনো সোভিয়েট রাষ্ট্র দারিদ্র্যের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান করতে পারে নি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করে সোভিয়েট রাষ্ট্র বর্তমানে যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে অল্পদিনের মধ্যেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক ইয়োরোপ বা আমেরিকার যে কোন দেশের নাগরিকের চেয়ে অনেক বেশী বিত্তবান হবে এবং তখন সমস্ত শ্রেণীবন্ধন মুক্ত সোভিয়েট নাগরিক শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে মুক্তবুদ্ধি ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দেবে, বর্তমানের ধনতান্ত্রিক দেশের নাগরিক তা কল্পনাও করতে পারে না। উত্তরে আমি বললাম যে তাঁর এ স্বপ্ন সফল হোক, এ আশা আমিও করি, কিন্তু যেদিন এ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে, সেদিন বর্তমানের সোভিয়েট রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, সমাজ ব্যবস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গীরও আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

এ আশা যে একেবারে অমূলক নয়, তার খানিকটা নিদর্শন এখনো মেলে। আমি যখন মস্কো ছিলাম, তখন সেখানে নিকোলস রোয়েরিকের চিত্রের এক প্রদর্শনী হচ্ছিল। চিত্রশালার অন্য সমস্ত কক্ষ বর্জন করে যেভাবে জনতা রোয়েরিকের আদর্শবাদী ধর্মনির্ভর ছবি দেখবার জন্যে ভিড় করে আসত, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঠিক তেমনি লেনিনগ্রাডে দেখলাম যে সোভিয়েট শিল্পীদের চিত্র দেখবার জন্যে যত আগ্রহ, আধুনিক ফরাসী চিত্রকরদের বাস্তবদৃষ্টিমুক্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তববিরোধী ছবি দেখবার জন্য আগ্রহ তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। অথচ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সোভিয়েট নাগরিক এ সমস্ত ফরাসী চিত্রকরের ছবি দেখবার সুযোগ পায়নি, লেনিনগ্রাডের বিরাট চিত্রশালার কক্ষে সে সমস্ত ছবি লোকচক্ষুর অগোচরে বন্ধ ছিল। কয়েক বছর আগে ভারতীয় চিত্রের একটি প্রদর্শনী আমরা সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলাম, বহু চিত্রশিল্পীর কাছে শুনলাম যে সে প্রদর্শনী যে রকম সমাদর পেয়েছিল, বোধ হয় তেমন সমাদর বহুদিন অন্য কোন প্রদর্শনী পায়নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বললেন যে মরুভূমিতে তৃষ্ণায় উদ্বেল পথিক জল পেলে যে আনন্দ পায়, সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদী চিত্র দেখে দেখে ক্লান্ত শিল্পরসিক সোভিয়েট নাগরিক ভারতীয় চিত্র দেখে তেমনি আনন্দই পেয়েছিলেন।

যেমন চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মার্কস্‌বাদের বন্ধনের ফলে সোভিয়েট সাহিত্যিক মুক্ত বুদ্ধি মুক্ত হৃদয় নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। মস্কোতে যখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বললেন যে জনসাধারণকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না, জনসাধারণের দাবী মেটানো সাহিত্যিকের ধর্ম। উত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে জনসাধারণ কি চায় সেটা স্থির করবে কে? সমস্ত দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখি যে যুগে যুগে মানুষের রুচি বদলিয়েছে, এবং

সাধারণত প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সাধনার ফলেই রুচির এ পরিবর্তন ঘটেছে। যা সবাই গ্রহণ করেছে, সাহিত্য যদি তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে এবং বারবার শুধু তারই পুনরাবৃত্তি করে, তবে মানুষের অনুভূতি ও প্রকাশ ক্ষমতা দুয়েরই ক্ষতি। আরো জিজ্ঞাসা করলাম যে তাঁরা যে সাহিত্য-সংঘের উপর এত জোর দিচ্ছেন, তাতে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনাই বেশী। সাহিত্য-সংঘে সবাই মিলে আলাপ আলোচনা করতে পারে, পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান প্রদানও সেখানে সম্ভব, কিন্তু সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শিল্পীর একক সাধনা। অনেক আলাপ আলোচনার পরে লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীকার করলেন যে সাহিত্য-সংঘের প্রধান কর্তব্য লেখকদের সামাজিক অধিকার রক্ষা, সাহিত্য সৃষ্টির কাজে সংঘের হস্তক্ষেপে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।

কিয়েভেও সাহিত্য-সংঘের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় এ প্রশ্ন তুলেছিলাম। সেখানে দেখলাম সাহিত্য-সংঘের সভায় চিত্রকর ও সঙ্গীতকাররাও এসেছেন। বস্তুতপক্ষে, অনেক ব্যাপারেই ইউক্রেনে স্বাধীনতার প্রসার খানিকটা বেশী মনে হল। আলাপ আলোচনা শুরু হবার গোড়াতেই ইউক্রেনের বিখ্যাত লেখক প্লাটোন ভারেঙ্কো বললেন যে ভারতবর্ষে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে তিনি ধন্য—প্রকৃতির ঐশ্বর্য এবং মানুষের সৃষ্ট শিল্পে সৌন্দর্যের এত প্রাচুর্য তিনি আর কোথাও দেখেন নি। তাঁকে দেখে সত্যিকার শিল্পী মনে হল। তর্ক বিতর্কে তিনি বিশেষ যোগ দেন নি, নিজের কল্পনা অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ এবং সে সাহিত্য তার দেশ ও সমাজ অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেছে।

কিয়েভে উপস্থিত লেখকদের মধ্যে অনেকে যে স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করলেন, তা সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্য কোথাও দেখি নি। সবচেয়ে বেশী কড়াকড়ি দেখেছি মস্কোতে, লেনিনগ্রাড রাজধানী নয় বলে এবং বহুদিনের পুরনো ঐতিহ্যের জোরে লেখকদের মধ্যে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার রেওয়াজ রয়েছে। কিয়েভে সে স্বাধীনতা আরো বেশী পরিস্ফুট। ইউক্রেনিয়ান একজন লেখক বললেন যে তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সাহিত্যিক এবং কবি শিভোশেঙ্কোর প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি ইউক্রেনের সাহিত্যে নবীন জীবনের সঞ্চার করেন এবং জাতির জীবন যে ভাবে প্রভাবান্বিত করেন তাতে বাঙলাদেশের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা মনে পড়ে। একজন সাহিত্যিক বললেন যে শিভোশেঙ্কোকে ইউক্রেন দেশের রবীন্দ্রনাথ বলা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সমাদর প্রায় সর্বত্রই দেখলাম। তাঁর রচনার অনুবাদ শুধু ইউক্রেন বলে নয়, সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্য অনেক রাষ্ট্রেও স্বভাষায় হয়েছে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রুশ ভাষায় তাঁর রচনা প্রকাশের যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, বারান্তরে তার আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। ভারতীয় মহৎ সাহিত্যের অনুবাদের নমুনা আরো মেলে কিন্তু তবু একথা মানতে হবে যে অনুবাদের জন্য ভারতীয় সাহিত্যের নির্বাচন বহুক্ষেত্রেই ভুল পদ্ধতিতে চলেছে। এমন অনেক ভারতীয় লেখকের অনুবাদ সোভিয়েট রাষ্ট্রে হয়েছে যাদের নাম কোনদিন দেশে শুনি নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রীকে বললাম যে এ ধরনের নিকৃষ্ট সাহিত্যের অনুবাদে ভারতবর্ষ এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র উভয়েরই ক্ষতি। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বদলে বাদবিতণ্ডামূলক প্রচার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট নাগরিক ভারতবর্ষের সত্যিকার পরিচয় পাবে না। অন্যপক্ষে এ ধরনের সাহিত্য বিতরণের ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সোভিয়েট নাগরিকের ভ্রান্ত

ধারণা ভারতবর্ষেরও ক্ষতি। এ কথা মোটামুটিভাবে তাঁরা মানলেন এবং আমাদের সাহিত্য আকাদমীর সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগের প্রস্তাব কার্যকরী করবেন বলে জানালেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভারতীয় সাহিত্যের যেমন অনেক অপ্রয়োজনীয় ও নিকৃষ্ট বই অনূদিত হয়েছে, সোভিয়েট সাহিত্যের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদেও সেই একই গলদ দেখা যায়। রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বই বাদ দিয়ে রাজনৈতিক কারণে মাঝে মাঝে যে সব বই অনূদিত হয়েছে, তাতে ভারতীয় পাঠকের রুশ সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে না। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে অনুবাদ অত্যন্ত খেলো। বাঙলা, হিন্দি এবং উর্দু কয়েকটি অনুবাদে দেখলাম যে ভাষা অনেক জায়গায় কাঁচা, এমন সব কথা এমনভাবে ব্যবহার হয়েছে যে কানে লাগে। বাঙলা অনুবাদকদের মধ্যে আমাদের কয়েকজন নামকরা সাহিত্যিক রয়েছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা যে কাজের ভার নিয়েছেন, তার বাঙলা এত দুর্বল কেন? উত্তর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাঁরা বললেন যে তাঁরা অনুবাদ করবার পরে রুশ বিশেষজ্ঞ তার সংশোধন করেন এবং সে সংশোধন সময় সময় এমন মারাত্মক হয়ে পড়ে যে তাকে আর বাঙলা বলে চেনা যায় না।

এ বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

[ক্রমশঃ]
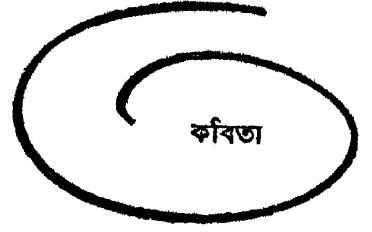
মনে আসবে

অরুণ মিত্র

প্রজাপতি ওড়ার ছোট্ট জায়গা। হালকা আর গাঢ় কিছু রঙে হাওয়া বুঁদ হয়। গুটি কয় মাত্র কুঁড়ি, কিন্তু তারা বুঝি সারা আকাশ জুড়ে ফুটবে। নরম জমিতে কয়েকটা উল্লসিত পায়ের দাগ। কারা ছুটে গিয়ে সূর্যের আলোর মধ্যে উধাও হয়েছে।

অস্থির উত্তাল ক্ষেতটা আরও দূরে। তবু এখান থেকেই দেখা যায় কাস্তেগুলো হঠাৎ অবাক হ'য়ে থেমে গিয়েছে। এক প্রতিশ্রুত অপরূপ আকাশ যেন তাদের উপর। মাঠভাঙা দুরন্ত নিষ্ঠুর স্রোত থিতিয়ে যেন সোনার দীঘির মতো হয়েছে।

কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। রোদের ভিতর নতুন নগর উঠেছে। বাড়ীঘর রাস্তা যদি জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে ডুবে যায় তাহলে প্রদীপ্ত উৎসব কি ক'রে হবে? ঝাড়বাতি সাজাবার আছে, তোরণ তুলবার আছে। তারপর আবার নতুন নগর।

বড় বড় স্তম্ভের পেছনে হয়তো বন্ধুদের মুখ; অভ্যর্থনা অভিনন্দন উচ্ছ্বাসের দমকে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। আমরা কেউ কারো খোঁজ পাব না। কিন্তু এ জায়গাটুকুর কথা আলাদা ক'রে আমাদের সবারই মনে আসবে। অশ্রুর পথ পেরোতে গিয়ে এখানে সবাই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছি। একা একা।

এই পথ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

চোখে চোখ পড়তে

পুরনো বন্ধু
একটু হেসে
হাত নেড়ে চলে গেল।

কাঁচের গায়ে চোখ রেখে
পেছন ফিরে একবার চাইলেই
দূর থেকে দেখতে পেত

ময়রার দোকানের
কান-বেঁধানো এক উট্‌কো শালপাতা
একটা মধুর স্মৃতি ঠোঁটে ক'রে নিয়ে
ডানাভাঙা পাখির মত
একটু উড়তে চেষ্টা করেছিল।

তাকে জুতোর তলায় চেপে,
চারিদিকে তাকিয়ে,
ভাল ক'রে গাড়িঘোড়া দেখে,
তারপর খুব সাবধানে
আমি রাস্তা পার হলাম।

২

বুড়োধাড়ি গাছ
যেন কোমরে ঘুন্‌সি বেঁধে
দিগম্বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে

ভাঙা জং-ধরা লোহার বেড়াটার গায়ে
দড়ির আগুনে
নিভে-যাওয়া সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
হাসি পেল।

একদল লোক হরিবোল দিতে দিতে
খই ছড়িয়ে গেছে রাস্তায়
একদল কাক তাই
খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

কলের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।
ছলৎ চ্ছল ছলৎ চ্ছল
ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ।

মাথার ওপর একটানা দীর্ঘ তারে
ছড় টেনে
ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল
একটা মন্থর ট্রাম।

তারপর আবার ছলৎ চ্ছল ছলৎ চ্ছল
জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে
ঝাঁঝরিতে।

আমি আজও ভুলিনি

সামনে পেছনে সশস্ত্র পাহারা
আকাশ পত্রজালে ঢাকা
আমরা বন্দীর দল
পাথরে পা টিপে টিপে উঠছি

হঠাৎ আমরা কথা বন্ধ করলাম
তারপর কান পেতে শুনতে লাগলাম
স্তব্ধ পাহাড়ে
ছলৎ চ্ছল ছলৎ চ্ছল
এক অদৃশ্য ঝর্নার শব্দ।

একটা ঘুড়ি কেটে এসে পড়তেই
রাস্তায় খুব হল্লা হল।
পুলিশের কালো গাড়ি এসে থামতে
কে একজন পেছন থেকে বলল—

মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে।

আশ্বিনের ফেরিওলা

হরপ্রসাদ মিত্র

কলুটোলা, চীনেবাজার, মুর্গিহাটা জুড়ে এই জগৎ।
তাতেই আসা-যাওয়ার, হাঁটা-চলার খেলা।
ফেরিওলা হাঁকছে তো হাঁকছেই—
চাই চুড়ি, চাই পুতুল, চাই ভুলে থাকবার কিছু!

মাঝে মাঝে আকাশে ঘাড় উঁচিয়ে দেখে যাও
উচ্চাশার ইঁটে গাঁথা হতাশার প্রাসাদ।
বাতাসে লোহালক্কড়ের ঝম্ঝম্, ঝম্ঝম্!
এমন কোনো মৌন নেই
—যেখানে প্রাণ আত্মস্থ হয়।
এমন কোনো ঝর্না নেই
—যাতে গা ডুবিয়ে নিলে
শরীর সুখী হতে পারে!

জগতের সেরা আঙুর থেকে তৈরী মহামূল্য মদ
নিয়ে বসেছেন আমার মনিব।
জগতের বিশুদ্ধতম বিষ্টিতে পিপাসা মেটাতে চাইছেন অতৃপ্ত আমার কবি।
এদিকে, প্রকাণ্ড বাড়িটার ভিতে
রোদে চিক্মিক করছে অশথচারাটি,
আকাশে পায়রা উড়ছে,
সামনের রাস্তায় লোক-চলাচলের বিরাম নেই।

মানব-সংসারের কলগুঞ্জন চলেছে কলকাতার এই
উঠোন ভেদ করে।
এই অলিগলি-ঘিঞ্জির মধ্যেই আশ্বিনের রোদ এলো।
বেজে উঠলো সে কোন্ ঝিঞ্জীর!
ব্যক্ত আর অব্যক্ত, দৃশ্য আর স্মৃতি এক হোয়ে দেখা দিল
সজল সকালের রুদ্দুরে।
ফেরিওলা হেঁকে উঠলো—
চাই চুড়ি, চাই পুতুল, চাই ভুলে থাকবার কিছু!

মাইফেলের পর

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরা-সুরভিত রাত; বাতিগুলো জাগে শুধু বেলোয়ারি ঝাড় আর লণ্ঠনের নিচে।
মথিত ফরাসে ছিন্ন মল্লিকার ম্লান মালা, গেলাস, বোতল আর তাকিয়া গড়ায়—
নাচের নূপুর স্তব্ধ; তারের যন্ত্রেরা মূক, রাত ঢের, কান্না-ঝরা ক্লান্ত নটী একা
খোলা জানলার কোলে আকাশে চাঁদের নৌকো মেঘের ঢেউয়ের আড়ে দেখা
শেষ ক'রে ফিরে আসে শ্লথ পদে; কেঁদে যুঁই মালা ছেঁড়ে, দু'পায়ে মাড়ায়।
নেশাড়ী পুরুষ ক'টি যাদের মসৃণ মুখে সুরা ও সুরতক্লান্তি ক্লিষ্ট বর্ণে লেখা—
প'ড়ে আছে ইতস্তত; দেখে বিবমিষা লাগে—কেন আর কবে থেকে জেনেছে কি নিজে
অন্তরে লুণ্ঠিতা নারী জীবনের যৌবনের কান্না আর ঘেন্না মেখে গিয়েছে যে ভিজে?

দ্বৈত

রাম বসু

আমার জন্যেও নয় এ নয় তোমার জন্যে জ্বলা
আমাদের মর্মে মূলে সঞ্চারিত পিঙ্গল অভাব .
বনে অন্ধকারে শুনে ধারা-পতনের গাঢ় গলা
চেতনা কশায় জাগি, খুঁজি হৃত সত্তার স্বভাব।

উড়িয়ে কণ্ঠের পাখী ভালবাসি আমি ভালবাসি
—এই শুদ্ধ উচ্চারণে দিগন্ত ধরিয়ে দিলে থাকে
কস্তুরী নৈঃশব্দ্য, তার নম্র আভা দিব্য অবিনাশী
ওষ্ঠতটে নগ্ন ঢেউ তুলে শূন্যে ভাসায় আমাকে।

শিখার সর্বাঙ্গ রক্তে অরাজক সুরের প্রবাহ
বর্বর দেবতা আমি সুরভিত ক্ষুধার কণকে
প্রেমিকা আমার তুলে নাও প্রবল সুন্দর দাহ
চুম্বনে চরম চিহ্ন এঁকে দেবো আনন্দিত ত্বকে।

নীথর বিদ্যুৎ-গাছ বিপর্যয়-ভাষা বলে' কানে
দৃষ্টিদানে উদ্ভাসিত;—আমরা সে মায়ার দর্পণে
প্রিয়-কণ্ঠ ছায়ানদী, শান্ত স্থির রূপের নির্মাণে
স্বেচ্ছা-নির্বাসিত শিল্পী অস্তিত্বের দুর্গম নির্জনে।

এই তো জন্মের দেশ মেরু-স্তব্ধ প্রাগৈতিহাসিক
বন্য ব্যস্ততায় লুপ্ত; দায় নেই দিক-নির্ণয়ের
নির্মম প্রতিভা রক্তে ভ্রান্তিহীন বীজমন্ত্র দিক
এখন আমরা আদি মৃত্তিকার ও পরস্পরের।

সমালোচক

অমলেন্দু বসু

সমালোচনায় অধিকার কার? যিনি স্বয়ং সাহিত্যস্রষ্টা, যিনি কবি, সমালোচনায় তাঁরই অধিকার না সাহিত্য উপভোগ করার রুচি সত্ত্বেও সাহিত্যসৃষ্টি যাঁর ক্ষমতার বাহিরে?

প্রশ্নটি হাল্‌কা নয় কেননা এ-প্রশ্নের সঙ্গে আরো কয়েকটি প্রশ্ন অনুলিপ্ত।

সমালোচনা কাকে বলি? ইওরোপীয় সাহিত্যে ক্রিটিক্‌ বলতে যা' বোঝায়, বিশেষত রেনেসাঁস-উত্তর যুগ থেকে যা' বুঝিয়েছে, ইংরেজি সভ্যতার অভিসংঘাতের পরে থেকে বাঙলা সাহিত্যেও আমরা যা' বুঝেছি, ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ বা সমালোচনার তেমন কোনো অভিধা সংস্কৃত চিন্তার ঐতিহ্যে ছিল কিনা সন্দেহ, ইওরোপীয় ঐতিহ্যেও বোআলো-ড্রাইডেন্‌-জন্‌সন্‌-এর পূর্বে তেমন স্পষ্ট ছিল না। ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ আর সমালোচনা, এই শব্দ দু'টির উৎপত্তি বিবেচনা করুন। ইংরেজি শব্দটির মূলে লাটিন ক্রিটিকাস্‌, গ্রীক ক্রিটিকোস্‌। মূল গ্রীক ও লাটিনে (মধ্যযুগীয় ফরাসী ভাষায়ও) এ-কথাটির চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় মানে ছিল। 'ক্রাইসিস্‌' থেকে 'ক্রিটিক্যাল', সে-অর্থ ইংরেজি ভাষায় এখনো চলছে। ব্যাধির সঙ্কটমুহূর্তে চিকিৎসকের সতর্ক বিচার শক্তিতে যে-ভরসা রাখি, সে-শক্তিই ক্রিটিকের শক্তি। কালক্রমে (অন্যান্য বহু শব্দের মতো) এ-শব্দটি এর গোড়াকার সঙ্কীর্ণ অভিধা ছাড়া ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করল, সে-অর্থে প্রবল হ'ল বিচার শক্তি, ত্রুটিনির্ণয় শক্তি। ইংরেজি ভাষায় critic, critical, criticism, criticize শব্দগুলি আবির্ভূত হয়েছিল মধ্য-ষোড়শ থেকে মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী কালে আর সে কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতীচ্যের সাহিত্য চিন্তার পরিণামে ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ কথাটির আধুনিক অভিধা জন্মেছে। সংস্কৃতে সমীক্ষা বলতে বোঝাতো গ্রন্থ আলোচনা কিন্তু তা'তে আধুনিক সমালোচনার তাৎপর্য ছিল না। (লক্ষ্য করা দরকার যে সমীক্ষা ও আলোচনা—যে দু'টি শব্দে সংস্কৃত যুগে সাহিত্য-আলোচনা বোঝাতো—এ-শব্দ দু'টির তাৎপর্য ঈক্ষণ, দৃষ্টিপাত, অবলোকন, কিন্তু এ-অর্থে বিচার ক্রিয়ার সে-ইশারা নেই যা' গ্রীক ও লাটিনের মূল শব্দে পাওয়া যায়।) সংস্কৃতের ভাষ্যকার ছিলেন অর্থবেত্তা, রসবেত্তা, সমঝদার লোক। আধুনিক অর্থে সমালোচক মূল্যবেত্তা, জহুরী, বিচারবিৎ। এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যালোচনায় পার্থক্য প্রচুর এবং মৌল কিন্তু দু'টি বিষয়ে তারা সমগোত্র : (১) দু' রকম আলোচনাতেই তারিফ করার শক্তি থাকা দরকার। রসের প্রশংসা করবেন রসিক, শিল্পের কদর বুঝবেন জহুরী, তবেই না জমবে তাঁদের আলোচনা! (২) দু' রকম আলোচনারই গোড়াতে সাহিত্যরূপ কী সে-সম্বন্ধে খানিকটা থিওরি বা ভাবয়িত্রী ধারণা বিদ্যমান, সে ধারণা হয়তো সবসময় খুব স্পষ্ট, সুসম্বন্ধ ও প্রকট নয়, তবুও বিদ্যমান। যিনি ভাষ্যকার ও রসবেত্তা তিনি অবশ্যই রস-শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁর রসশাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য পাঠ সুসম্মত ব'লেই তিনি ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তবুও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে (এবং গ্রীকো-রোমান রেটরিক শাস্ত্রেও) ইস্‌থেটিক্‌স্‌ বা নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে কাব্যপাঠের ও কাব্যমূল্যায়নের সে-সঙ্গতি নেই যা' আধুনিক সমালোচনা-শাস্ত্রের সর্বপ্রধান লক্ষণ। ভারতীয় ঐতিহ্যে ছিল ভাষ্যকার, টীকাকার, ছিল না আধুনিক অর্থে সমালোচক, আর এই আধুনিক অর্থ ইওরোপীয় চিন্তার ক্রম-

বিকাশেরই পরিণতি কেননা যদিচ লাটিন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ভারতের মতোই টীকা ও ভাষ্য রচিত হয়েছিল অগুণতি, যদিচ সে দেশেও সাহিত্যিক পঠন পাঠন দীর্ঘকাল সীমাবদ্ধ ছিল ব্যাকরণে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে, তবুও সোক্রাটেস্-প্লেটো-আরিস্টট্ল-হোরেস্-লন্জাইনাস্ থেকে যে-চিন্তা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল তারই উত্তরাধিকার একালের সর্বদেশীয় সাহিত্য চিন্তায়।

সমালোচনার আধুনিক অর্থ কী?

সমালোচনার সংজ্ঞা টি. এস্. এলিয়ট দিয়েছেন এইভাবে : the commentation of works of art by means of written words– (লিখিত শব্দের মাধ্যমে শিল্পকর্মের ভাষ্য ও ব্যাখ্যাবচনা)। এমন হওয়া সম্ভব যে সংস্কৃত-পড়া এলিয়ট সংস্কৃত ভাষ্যের অনুরাগী ব'লেই সমালোচনার এহেন সেকেলে অভিধা দিয়েছিলেন। কিন্তু এ-ও সত্য যে তিনি এ অভিধাতেই আবদ্ধ থাকেননি। এলিয়ট নানা কারণে (অসংগত কারণ নয় সেগুলি) সমালোচনার নামে যে সব হঠকারী রচনা সংবাদপত্রে সচরাচর দেখা যায় তা'র বিরুদ্ধে কশাঘাত করেছিলেন এবং যে-sense of fact, যে-তথ্যনিষ্ঠা সৎসমালোচকের মস্ত লক্ষণ তা'র প্রতি আমাদের চিন্তা আকর্ষণ করার জন্য বলেছেন :

Any book, any essay, any note in *Notes and Queries* which produces a fact even of the lowest order about a work of art is a better piece of work than nine-tenths of the most pretentious critical journalism in journals or in books.

(সংবাদপত্রে অথবা বইয়ে যে "খবরেকাগজে" হাম্বড়া সমালোচনা বেরয় তা'র শতকরা নব্বুই ভাগের চেয়েও অনেক উন্নত কাজ তেমন বই, তেমন প্রবন্ধ, "নোটস এ্যাণ্ড কোয়েরিস্" পত্রিকায় প্রকাশিত যে-কোনো সংক্ষিপ্ত রচনা যা'তে শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যত তুচ্ছই হোক না কেন কিছু তথ্য পাওয়া যায়।) এলিয়টের তথ্যপ্রিয়তা ঠিক প্রাচীন ভাষ্য-পন্থী নয়, ববং অতীব অধ্যবসায়ী আধুনিক textual scholarship -এর অর্থাৎ গ্রন্থ-জ্ঞানী তন্নিষ্ঠ পাণ্ডিত্যের পক্ষপাতী। Impressionistic criticism নামে এককালে যে আত্মকেন্দ্রিক স্বমতবিলাসী শিথিলদায়িত্ব বচনা সাহিত্যিক মহলে লোকপ্রিয় হ'য়েছিল তাকে বর্জন করাই এলিয়টের উদ্দেশ্য। বস্তুত স্বয়ং আধুনিক সমালোচনার অন্যতম ধারক ও বাহক হ'য়ে এলিয়ট যে সমালোচনাব আধুনিক অভিধা সম্বন্ধে সচেতন, তীক্ষ্ণ-ভাবেই সচেতন, তা'র আভাস পাওয়া যায় যখন তিনি বলেন :

Criticism must always profess an end in view which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste.

(সমালোচনার দৃষ্টিপথে সতত একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই, যে-উদ্দেশ্য—মোটামুটিভাবে বলতে গেলে—শিল্পকর্মের উজ্জ্বল ব্যাখ্যা এবং রুচিমার্জনা।) অর্থাৎ এলিয়টের বিশ্বাসে সমালোচনায় সচেতন উদ্দেশ্য একান্ত আবশ্যক, সমালোচকের এমন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যাতে তিনি বুঝতে পারেন কোন্‌টি শিল্পকর্ম কোন্‌টি সৎরুচি, এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে তিনি প্রথমে শিল্পেব ব্যাখ্যা (প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা অবশ্য) করবেন আর সেই সঙ্গে অপরের রুচি-মার্জনা করবেন। সচেতন উদ্দেশ্য, মূল্যজ্ঞান, সৎরুচিবিস্তারস্পৃহা এই তিনের অধিকারিত্বে সমালোচকচরিত্র বৈশিষ্ট্যবান। নানা কারণে এলিয়ট 'সমালোচনার' সুস্পষ্ট সংজ্ঞাদানে

বিরত থেকেছেন কিন্তু সংজ্ঞার যে-আভাসমাত্র তিনি দিয়েছেন তা'র নির্বিধ প্রকাশ ম্যাথিউ আর্নল্ডে ও আইভর্ রিচার্ড্স্-এ। এঁদের সারকথা যে সমালোচনা আসলে মূল্যায়ন, আর এ-কথায় এ যুগের অধিকাংশ সাহিত্যশাস্ত্রীর সমর্থন মিলবে অল্পবিস্তর। আর্নল্ডের সংজ্ঞা :

(Criticism is) a disinterested endeavour to learn and propagate the best that is known and thought in the world.

(জগতে শ্রেষ্ঠ ব'লে যা' কিছু জ্ঞাত হয়েছে বা ভাবা হয়েছে তা' জানবার এবং প্রচার করবার জন্য নিষ্কাম প্রয়াসই সমালোচনা)। আর্নল্ড অন্যত্র ক্রিটিসিজমের কথায় বলছেন :

Its business is, simply to know the best that is known and thought in the world, and by in its turn making this known, to create a current of true and fresh ideas.

(জগতে শ্রেষ্ঠ যা'কিছু জানা হয়েছে বা অনুভাবিত হয়েছে তাই জানা এর কাজ, আর কাজ এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রচার ক'রে সত্য ও সজীব চিন্তাধারার সৃষ্টি করা)। যেমন এলিয়টের উক্তিতে তেমনই আর্নল্ডের উক্তিতে প্রধান বক্তব্য যে জ্ঞান অর্জন করতে হবে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ চিন্তা সে-বিষয়ে, সে-জ্ঞান অপরের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হবে, এবং এতদ্বারা নবীন চিন্তাধারার প্রবাহন করাতে হবে। রিচার্ড্স বলেছেন :

Criticism, as I understand it, is the endeavour to discriminate between experiences and to evaluate them.

(সমালোচনা ব'লতে আমি বুঝি অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞতায় তারতম্য বিচার ও তা'দের মূল্যায়ন।) রিচার্ড্স্-এর ধারণায়ও সমালোচন কর্মে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন, সদসৎ ও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, নতুবা যে কোন অভিজ্ঞতার সংগে অপর অভিজ্ঞতার প্রভেদ বিচার করা যাবে কেমন ক'রে? তা'দের মূল্যনিরূপণ করব কী ক'রে?

তীক্ষ্ণধী আধুনিক সমালোচক আরো জনকয়েকের উক্তির উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না।

প্রতিপত্তিশালী আমেরিকান সমালোচক হেন্‌রি লুই মেন্‌কেন্ বলছেন :

The function of a genuine critic of the arts is to provoke the reaction between the work of art and the spectator ; the spectator, untutored, stands unmoved ; he sees the work of art, but it fails to make any intelligible impression on him ; if he were spontaneously sensitive to it, there would be no need for criticism.

(খাঁটি শিল্পসমালোচকের কাজ এই : শিল্পবস্তু সম্বন্ধে দর্শকের চিত্তে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করা। বিনা শিক্ষায় দর্শক দাঁড়িয়ে থাকেন অনুভূতিশূন্য অবস্থায়। শিল্পবস্তু তিনি দেখেন বটে কিন্তু তাঁর চিত্তে কোনো বোধগম্য ছাপ পড়ে না। সমালোচনার কোনো প্রয়োজনই হ'ত না যদি তিনি স্বতঃই শিল্পের প্রতি সংবেদনশীল হতেন।) এখানেও সংরুচি বিস্তারের কথা আছে কিন্তু রুচিবিস্তার তিনি কী ভাবে করবেন যদি সংরুচি কোন্‌টি সে-বিষয়ে তাঁর নিজেরই জ্ঞান না থাকে?

বহু সাহিত্যিকের চিন্তাগুরু এজরা পাউন্ড বলছেন :

Excernment. The general ordering and weeding out of what

has actually been performed . . . . the ordering of knowledge so that the next man (or generation) can most readily find the live part of it, and waste the least possible time among obsolete issues.

(বাছাইয়ের কাজ। যে-কাজ বাস্তবিক করা হয়েছে তা'র বিন্যাস ও নিড়নো। জ্ঞানের বিন্যাস যা'তে এর পরের জ্ঞানার্থী (অথবা পরবর্তী পুরুষপর্যায়ের জ্ঞানার্থী) চট ক'রেই প্রাণবান অংশটি খুঁজে পায়, অপ্রচলিত সমস্যা নিয়ে সময় নষ্ট হয় না।)

ইদানীংকার প্রভাবশালী ইংরেজ অধ্যাপক-সমালোচক ডক্টর লীভিস্ বলছেন :

The critic's aim is, first, to realize as sensitively and completely as possible this or that which claims his attention, and a certain valuing is implicit in the realizing . . . . A philosophic training might possibly—ideally would—make a critic surer and more penetrating in the perception of significance and relation and in judgment of value . . . . the business of the literary critic is to attain a peculiar completeness of response and to observe a peculiarly strict relevance in developing his response into commentary; he must be on guard against abstracting improperly from what is in front of him and against any premature or irrelevant generalizing.

(সমালোচকের লক্ষ্য, প্রথমত, যে-বিষয়ে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, যতদূর সম্ভব সংবেদিত ও সম্পূর্ণভাবে সে-বস্তু প্রণিধান করা, আর এই প্রণিধানে কিছুটা মূল্যায়নকর্ম অবশ্যই নিহিত থাকে। সমালোচকের যদি দার্শনিক অনুশীলন থেকে থাকে—তেমন হওয়াই আদর্শ মনে করি—তাহ'লে তাৎপর্যজ্ঞান, সম্পর্কজ্ঞান এবং মূল্যনিরূপণ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি নিশ্চয়তর ও গভীরতর হবে......সাহিত্য-সমালোচকের কাজ সংবেদনায় পূর্ণতা অর্জন করা আর এ-সংবেদনাকে প্রসঙ্গনিষ্ঠ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে পরিণত করা। তাঁকে সতর্ক হ'তে হবে যেন বক্ষ্যমান সাহিত্যবস্তু থেকে অবৈধ অর্থ আকর্ষণের চেষ্টা না করেন অথবা অপ্রস্তুত ও অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ মন্তব্যে লিপ্ত না হ'ন।)

দেখা যাচ্ছে, আধুনিক অর্থে সমালোচনা ও মূল্যায়ন সমার্থ। মূল্যায়ন কী ভাবে হবে, কেন মূল্যায়ন, সে-মূল্যায়নেরই বা কী মূল্য, কোন্ তৌলদণ্ডে মূল্যায়ন, এহেন অনেক সূক্ষ্ম প্রশ্নে সমালোচকদের মধ্যে অনেক বিতণ্ডার উদ্ভব হ'য়ে থাকে কিন্তু আধুনিক সমালোচনা-তত্ত্বের ইমারত গড়ে' উঠেছে কয়েকটি সর্বস্বীকৃত চিন্তার বুনিয়াদের উপরে। যদি মানি যে সমালোচনা মানে মূল্যায়ন, তাহ'লে এ-ও মানব যে মূল্যায়ন মাত্রেই তুলনাশীল। কোনো বস্তুরই পরম মূল্য নেই (বাক্যাতীত চিন্তাতীত তুরীয় জ্ঞান ছাড়া), মূল্য মানেই আপেক্ষিক গুণারোপ। যে-বস্তু অদ্বিতীয়,—ধরা যাক, মীনাক্ষী মন্দির, সেলিমশাহ্ চিশ্‌তীর সমাধি, এল গ্রীকো'র 'জনৈকা মহিলা'—তা'রও মূল্যায়ন চলে একটা শিল্পাদর্শের তুলনায়। অর্থাৎ এমন মন্দির তৈরি হ'তে পারে যা' মীনাক্ষী মন্দিরের চেয়ে মহৎ, অথবা তা'র তুলনায় অখ্যাত। সুতরাং সুন্দর অনন্য বস্তুরও সৌন্দর্যের মাপকাঠি আছে। আর মাপকাঠি জানতে হ'লে সুন্দর বস্তু সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মীনাক্ষী মন্দির দেখতে হবে, আরো অনেক মন্দির দেখতে হবে, তবেই না শিল্পাদর্শ গড়ে' উঠবে। মূল্যায়নের গোড়ার কথা, প্রচুর জ্ঞান।

আধুনিক সমালোচনার প্রথম সর্বস্বীকৃত চিন্তা যে মূল্যায়নই সমালোচনার বিশিষ্টতম গুণ। দ্বিতীয় চিন্তায় পৌঁছই এই ধারণায় যে সমালোচনা মাত্রেই কোনো না কোনো থিওরির অর্থাৎ ভাবয়িত্রী জ্ঞানের, কোনো না কোনো দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমালোচক স্বয়ং খুব দর্শনবিৎ না হ'তে পারেন (অনেক সমালোচকই তেমন নয়) কিন্তু তাঁর মূল্যায়নে যে-সদসৎ জ্ঞান, সুন্দর-অসুন্দরের যে-তারতম্য নিহিত রয়েছে সে-জ্ঞান সে-তারতম্য মূলতঃ দার্শনিক চিন্তা থেকেই উদ্ভূত। বিচক্ষণ দর্শনবিৎ সাহিত্যের এলাকায় এসেছেন—কতটা সাহিত্যের তাগিদে তা' বলা মুস্কিল তবে সাহিত্যের আলোচনা উপলক্ষে তাঁদের দার্শনিক শক্তি হয়তো সহজস্ফূর্ত হ'তে পারে—এমন ঘটনা বিরল নয়। সমালোচনার ইতিহাসে আরিস্‌টট্‌ল্‌, টমাস্‌ অ্যাকোয়ায়নাস্‌, হেগেল, নীশে, ক্রোচে প্রভৃতির স্থান দার্শনিক সমালোচক হিসেবে। অপর পক্ষে কোল্‌রিজ্‌ ও ওয়ল্টর পেটার-এর মতো সমালোচকের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন, এ'রা দুজনেই দর্শন-অনুরাগী ছিলেন, যেখানেই এ'রা সাহিত্যের কথা বলেছেন সেখানেই তাঁদের উক্তির দার্শনিক পশ্চাৎপট সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁরা সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন সাহিত্যের কারয়িত্রী সৌন্দর্য অনুভব করার জন্য, কোন্‌ কবিতাটি ভালো, কোন্‌ কবি মহৎ, কোথায় কাব্যবিশেষের আবেদন এ সব শিল্পকৃতি আলোচনার জন্য। অন্য এক শ্রেণীরও সমালোচক আছেন, তাঁরা কোনো দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন নন—যদিও একেবারে দর্শনবর্জিত মানুষ সম্ভব নয়—কিন্তু সাহিত্য কর্মের তুলনায় ও মূল্যায়নে সুপটু। দৃষ্টান্তস্বরূপ হ্যাজ্‌লিট্‌ ও স্যাঁৎ বোভ্‌-এর উল্লেখ করতে পারি। এ'রা স্বয়ং দর্শন-সচেতন যদি না-ও হ'য়ে থাকেন, এ'দের মূল্যায়নের দার্শনিক পশ্চাৎপট রচনা করা আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু থিওরি সম্বন্ধে চেতনা থাক বা না থাক, সাহিত্য সম্বন্ধে রুচি না থাকলে সমালোচক হওয়া অসম্ভব। দার্শনিক পশ্চাৎপটে রুচি প্রশিক্ষিত হয়, রুচিই বড়ো কথা, দর্শন গৌণ, রুচির জন্য শিক্ষার জন্যই দর্শন।

তৃতীয় সর্বস্বীকৃত চিন্তায় মানতে হয় যে সমালোচকের কাজে প্রচারপ্রবৃত্তি বর্তমান। সমালোচক নিজে ভালোমন্দ জেনে ক্ষান্ত নন, সে-জ্ঞান আরো পাঁচজনে না বিলানো অবধি তাঁর তুষ্টি নেই। অন্য সব প্রচারকের মতো সমালোচকও মস্ত একটা সামাজিক দায়িত্ব-বোধে উদ্দীপ্ত। আর্নল্ড বলছেন যে সমালোচক স্বয়ং শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করবেন এমন নয়, সে-জ্ঞানের প্রচার করবেন। কেন প্রচার করবেন? না, সে-প্রচারের শক্তিতেই নূতন চিন্তা-ধারার পথ সুগম হবে, তা'র ফলে সমাজের অতএব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে। এজ্‌রা পাউণ্ড ভাবছেন সৎসমালোচকের কাজের ফলে আগামী জ্ঞানার্থীর উপকার হবে—এখানেও সামাজিক দায়িত্ব চরিতার্থ হচ্ছে। সমালোচনা যে প্রচার, সমালোচকের যে কর্তব্য সমাজের প্রতি, সে কথা বলেছেন সব সমালোচনাশাস্ত্রী, হয় স্পষ্টভাবে নয় তো প্রকারান্তরে।

বস্তুতঃ সমালোচকের কাজ আমার এই অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যতটুকু নির্দেশিত হয়েছে তা'র চেয়ে অনেক বেশি জটিল। সে-কাজের বৈশিষ্ট্য কত রকমের, আর যখন যেমন বৈশিষ্ট্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করি তখন তেমন একপেশে সমালোচনার উদ্ভব হয়—সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক, আঙ্গিকী আলোচনা, কলাকৈবল্যবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি—কিন্তু শিল্পের বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা, সুরুচি (আলঙ্কারিকদের ভাষায় সহৃদয়তা, বৈদগ্ধ্য, তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, অথবা রিচার্ড্‌স্‌-এলিয়ট-এম্‌প্‌সনের ভাষায় 'সেন্‌সিবিলিটি') এবং প্রচার কামনা যাবতীয় সমালোচকেরই গ্রাহ্য।

২

সমালোচক যদি হ'ন জহুরী, স্যাঁকরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? যিনি স্যাঁকরা, তিনিই জহুরী, না অন্য কেউ জহুরী? যিনি রেঁধেছেন তিনিই চাখবেন, না অন্য কেউ চাখবেন? যে চা-কুলী চা পাতা ফলিয়েছে, চা-রসের মর্ম সে বুঝবে ভালো না চা-চাখিয়ের আমদানী করতে হবে? সমালোচনাকর্মে যোগ্যতা কার? স্বয়ং কবির, না সমালোচক নামধেয় অন্য জীবের? এমন বলব কি যে কবি ও সমালোচক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন; তাঁদের চরিত্র, কাজ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সবই আলাদা? এ-প্রশ্ন তুলে'ই বর্তমান প্রবন্ধের সুরু হয়েছে।

এ-বিষয়ে প্রধানত দু'রকমের মত প্রচলিত। শেক্‌স্‌পীয়রের বন্ধু, যশস্বী লেখক বেন্‌ জন্‌সন্‌ বলেছিলেন: To Judge of the poets is only the function of poets.—(কবিদের বিচার একমাত্র কবিদেরই কাজ।) অনুরূপ মত পোষণ করতেন কোল্‌রিজ:

The question should be fairly stated, how far a man can be an adequate, or even a good though inadequate critic of poetry, who is not a poet, at least *in posse.* Can he be an adequate, can he be a good critic, though not commensurate? But there is yet another distinction. Supposing he is not only not a poet, but is a bad poet! What then?

—(প্রশ্নটি পরিষ্কার ভেবে পেশ করা উচিত: যিনি কবি নন, নিদেন পক্ষে কবিত্বসম্ভব নন, তিনি কি সম্যক সমালোচক হ'তে পারেন, অথবা যদিও অসম্যক তবুও সৎ সমালোচক হ'তে পারেন? এছাড়া আরো তারতম্য আছে। ধরা যাক তিনি কবি তো ননই বরং মন্দ কবি। তখন কী হবে?) বোদলেয়র বিশ্বাস করতেন যে কবিরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক হ'তে পারেন, আর ড্রাইডেন (এককালে তাঁর নামে ও কাব্যে সঙ্গতি পাওয়া যেত কিন্তু ইদানীং যে তাঁকে কবিসত্তম ব'লে মানা হয় তাতে সমালোচনার ও রুচির নির্ভর-অযোগ্যতা খানিকটা প্রমাণ হয় বৈ কি!) সমালোচক সম্বন্ধে উক্তি করেছেন অপ্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরে: The critic is the artist *manque*!—(যিনি শিল্পী হ'য়ে উঠতে পারেন নি তিনিই সমালোচক!) এলিয়ট বলেছেন:

At one time I was inclined to take the extreme position that the *only* critics worth reading were the critics who practised, and practised well, the art of which they wrote.

—(এককালে আমি এমনধারা বাড়াবাড়ি মত পোষণ করতাম যে কেবল সেসব সমালোচকই পাঠযোগ্য যাঁরা স্বয়ং তাঁদের আলোচ্য শিল্পের চর্চা করতেন আর ভালোভাবেই করতেন।)

এ-বিষয়ে অনেক উক্তি সংগ্রহ ক'রে লাভ নেই। কোন্‌পক্ষে বাচনিক সমর্থন কতগুলি তা'র সংখ্যা গুণে মতানৈক্যের ফয়সালা করতে যাওয়া হাস্যকর ব্যাপার। কথাটা হচ্ছে, কে সমালোচক সে-বিষয়ে জনকয়েক নিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী একই ধরণের মত পোষণ করছেন, এঁদের বিশ্বাস সৎ-কবি হ'লেই সৎ-সমালোচক হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ (ইংরেজি সাহিত্যে) বেন্‌ জন্‌সন্‌, ড্রাইডেন্‌, কোল্‌রিজ্‌, ম্যাথিউ আর্নল্ড, এলিয়ট, এঁদের

কথা ভাবতে পারি, এ'রা প্রত্যেকেই স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ কবি আবার প্রতিভাবান সমালোচক। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিক স্থিতপ্রজ্ঞ সমালোচক এতাবৎ জন্মাননি।

অনেকে যেমন বলেছেন যে কবি যিনি তিনিই সমালোচক, অপরপক্ষে তেমনি সংশয় প্রকাশ করা হ'য়েছে কবির সমালোচনা-পটুতায়। এ-সংশয়ের অবিস্মরণীয় প্রকাশ সোক্রোটেসের উক্তিতে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মহাতার্কিক সোক্রাটেস্ অন্যান্য বহু কথায় মধ্যে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে কিছু উক্তি ক'রেছিলেন যার ভিত্তিতে তদীয় শিষ্য প্লেটো তাঁর কাব্যতত্ত্বের ইমারত গড়েন আর অনতিকালপরে প্লেটোর শিষ্য আরিস্‌টট্‌ল্ অন্য ইমারত গড়েন বিপরীত চিন্তার ভিত্তিতে, আর সে-কাল থেকে আজ অবধি সরাসরি অথবা পরোক্ষে সোক্রাটেসের ধারণা ইওরোপীয় যাবতীয় কাব্যতত্ত্বের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সোক্রাটেস্ এমন কথা মানেননি যে কাব্যরচনায় যাঁর প্রতিভা, সে-রচনার সযৌক্তিক বিশ্লেষণও তাঁর সাধ্যায়ত্ত। বরং উল্টো কথারই প্রমাণ পেয়েছিলেন নিজ অভিজ্ঞতায় আর আদালতের জবানবন্দীতে সে-অভিজ্ঞতার বর্ণনা-ই তিনি দিয়েছেন। সোক্রাটেস্ বলেছেন তিনি নানা কবিদের কাছে যেতেন, জিজ্ঞাসা করতেন তাঁদের রচিত কবিতার মানে কী? (আমি কল্পনা করতে পারি সেই যে "আবোল তাবোল"-এর বুড়ো বেচারী শ্যামাদাসকে বুঝিয়ে বলার জন্য রাস্তার মাঝে গলার চাদর ধ'রে টেনেছিল, সোক্রাটেসের হাতে অ্যাথেন্সের কবিকুল লাঞ্ছিত হয়েছিল তেমনি সকরুণ ভাবে!) কিন্তু হায়, কবিগণ সে-প্রশ্নের জবাব নাকি দিতে পারেননি, অতএব সোক্রাটেস্ প্রথমতঃ এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কবিরা কবিতা ব্যাখ্যায় (এমনকি স্বরচিত কবিতা-ব্যাখ্যায়ও) অপারগ, হয়তো পথচারী যে-কোনো লোক কবির চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারেন। সোক্রাটেসের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হ'ল যে কবিরা কাব্যরচনা করেন অলৌকিক প্রেরণাবলে, এক ধরণের ঐশী উন্মাদনার তাড়নায়। যেই কাব্যরচনা সম্পূর্ণ হয়, সে-প্রেরণাও অদৃশ্য হয়, কবি আর তখন অসাধারণ ব্যক্তি নন, খুবই সাধারণ মানুষ। (সোক্রাটেস্ সম্ভবতঃ বিগতপ্রেরণা কবিদের অবসাধারণ মানুষ ব'লেই গণ্য করতেন!) শিল্পী যে স্বকীয় শিল্পের ব্যাখ্যায় অপারগ, একথা প্লেটোর গ্রন্থাবলীতে কয়েক জায়গাতেই পাওয়া যায়। তাঁর "আইওন" নামক গ্রন্থে দেখা যায় আইওন নামে জনৈক র‍্যাপ্‌সোড্ অর্থাৎ এক ধরণের অভিনয়-আবৃত্তি শিল্পী, হোমর্-এর কাব্যের পরম অনুরাগী কিন্তু সে-অনুরাগের যৌক্তিক বিশ্লেষণে অপারগ। শিল্পীর এই অক্ষমতা লক্ষ্য ক'রেই তর্কবাগীশ মহোপাধ্যায় সোক্রাটেস্ প্লেটোর "রিপব্লিক্" গ্রন্থে প্লৌকন্‌কে বলছেন সদয়কণ্ঠে :

We might also allow her champions who are not poets, but lovers of poetry, to publish a prose defense on her behalf.

—(আমরা হয়তো অনুমতি দেব যাতে যাঁরা স্বয়ং কবি নয় কিন্তু কাব্যপ্রেমী, কাব্যের সমর্থক, তাঁরা যেন কাব্যের সপক্ষে জবাবদিহি প্রকাশ করেন।) এখানে সোক্রাটেস্ যে-জবাবদিহির উল্লেখ করছেন সেটা আমাদের বর্তমান আলোচনার বাহিরে যদিও মূল্যবান কথা, কিন্তু আপাতত লক্ষ্যণীয় বিষয় যে তাঁর বিশ্বাসে কবি ও কাব্যপ্রেমী, শিল্পী ও সমালোচক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

সোক্রাটেস্ এবং প্লেটো মনে করেন কবি সমালোচনায় অক্ষম। এমন কথা আরো অনেকেই ভেবেছেন, এখনো ভাবছেন। কোনো কোনো শক্তিশালী সমালোচকের কথা জানি—হ্যাজলিট্, স্যাঁৎ বোভ্, রিচার্ড্‌স্, লীভিস্—যাঁরা পুরোপুরি সমালোচক, স্বয়ং শিল্পী

নন। আবার এ-ও জানি অনেক লেখক নিজ রচনার ব্যাখ্যায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেন অথবা নিদেনপক্ষে নিজ রচনার ব্যাখ্যাসম্ভাবনায় বিস্মিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমেরিকান লেখক হারমান মেল্‌ভিল্‌কে নেওয়া যাক। মেল্‌ভিলের "মোবি ডিক্‌" নামক মহাকাহিনীতে যে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়ই প্রতীকী সংকেত লুকিয়ে আছে একথা আজ ইস্কুলের ছেলেরাও জানে, কিন্তু মেল্‌ভিলের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করছি :

Your allusion to the 'spirit spout' first showed to me that there was a subtle significance in that thing—but I did not, in that case, *mean* it. I had some vague idea while writing it, that the whole book was susceptible of an allegoric construction, and also that *parts* of it were—but the speciality of many of the particular subordinate allegories was first revealed to me after reading Mr. Hawthorne's letter which intimated the part and parcel allegoricalness of the whole.

—(আপনি যখন 'অশরীরী ফোয়ারার' উল্লেখ করলেন তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে ওর একটা গূঢ় অর্থ আছে, কিন্তু এমন অর্থ আমি বোঝাইনি। যখন বইখানা লিখছিলাম তখন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে গোটা বইটিতেই রূপকার্থ আরোপ করা সম্ভব আর কোনো কোনো অংশে এমন অর্থ বাস্তবিকই নিহিত, কিন্তু মিঃ হথর্ন-এর চিঠি পড়ার পরেই আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'ল অনেক গৌণ রূপকের বৈশিষ্ট্য। তাঁর সে-চিঠি থেকেই আমি সম্পূর্ণ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ রূপকত্ব বুঝতে পেরেছি।)

এ-চিঠিতে প্রশ্নবিৎ সোক্রাটেসের সিদ্ধান্ত খানিকটা সমর্থিত হয় বৈ কি! গ্রন্থের যা মূল বৈশিষ্ট্য সে-বিষয়ে লেখক নিজেই সচেতন নন, অন্যের কাছ থেকে সে-বৈশিষ্ট্য তাঁকে জানতে হয়! "পঞ্চভূত" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নানা চরিত্রের জবানিতে 'বিদায়-অভিশাপের' নানা ব্যাখ্যা দেবার পরে বলছেন : 'এই পর্যন্ত বলিতে পারি যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়।'

সোক্রাটেস্‌ ও প্লেটো, চিন্তার ইতিহাসে মহামানী নাম কিন্তু আমার সংশয় অনপনেয়, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন কি কেন কবিরা নীরব ছিলেন, কেন কবিরা বলতে পারেন নি স্বরচিত কবিতাটি কী? সোক্রাটেস্‌ কবিদেরকে যতো নির্বোধ অথবা যতো অপটু ভেবেছিলেন সত্যই কি তাঁরা তেমন ছিলেন, অথবা, ইংরেজি ভাষায় যেমন বলা হয় The boot is on the other leg, অর্থাৎ গলতি বোধ হয় ছিদ্রান্বেষীর নিজেরই? কোনো কবিকে যদি প্রশ্ন করা হয় (ধরে' নিচ্ছি তিনি সৎ কবি), আপনি যে কবিতাটি লিখেছেন এতে আছে কী? এটি কী বস্তু? তাহ'লে সৎ কবির পক্ষে একটি মাত্র জবাবই সম্ভব : বাপু হে, কবিতাটি কোন্‌ বস্তু আর হবে, এটি কবিতাই, কাব্যবস্তু, এতে থাকবে আর কী, আছে কাব্য। এমন জবাব দিলে কবি নিতান্তই যথার্থ কথা বলবেন। এ কথার মানে, কবিতায় (অথবা যে কোনো শিল্প কর্মে) অনন্য সত্তা, তা'র প্রতিভূ নেই, বিম্ব নেই, নেই তা'র সম্যক সমান্তরাল। যদি প্রশ্ন কর, হে কবি, কোন্‌ কথাটি তুমি বলেছ কবিতায়? কবির জবাব হবে, আমি যে-কথাটি বলতে চেয়েছি তা' আছে কবিতাতেই, সে কথার আর

কোনো রূপ আমার চিত্তে ছিল না, ছিল যে-অনন্য রূপ তাকেই আমি প্রকাশ করেছি আমার কবিতায়। যদি সে-কথা অন্যরকমে বলা যেতে পারত, যদি কেউ 'কোটী-জীব-কল্লোলিত—দাঁড়াইয়া, এ জীবন-বারিধি-বেলায়, / মোর চক্ষে অশ্রু উথলায়!'—এ-ছত্রটির হুবহু সমান্তরাল, হুবহু সমার্থ আরেকটি ছত্র রচনা করতে পারতেন, তাহ'লে বলা সম্ভব হ'ত না যে কবিতা অনন্য বস্তু, তাহ'লে কাব্যের শিল্পপ্রাণ হ'ত দ্বিধা অথবা বহুধাগ্রস্ত, প্রাণ তা'র থাকত না, শিল্পের সুডৌল রূপে বঞ্চিত হ'য়ে সে পরিণত হ'ত এক খণ্ডিতঅবয়ব বাক্য-সমাবেশে। একথা সত্য যে আমরা (মানে সাহিত্যের পঠনপাঠনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা) কাব্য-বস্তুর ব্যাখ্যায় নিরত থাকি। আমরা জানতে চাই কবি কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছেন? তাঁর জীবন-দর্শন কী, তাঁর সমাজবীক্ষণ তীক্ষ্ণ কিনা, তাঁর প্রিয় শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ও ভাবানুষঙ্গ কোন্ ধরণের, ইত্যাকার কূট প্রশ্নে ছাত্র অধ্যাপক ভাষ্যকার সমালোচক মশ্‌গুল থাকেন বটে কিন্তু প্রশ্নোত্তরের সেই ক্ষণে কাব্য পরিণত হয়ে যায় ব্যবচ্ছিন্ন শবদেহে।

সোক্রাটেসের প্রশ্নশঙ্কিত কবি যদি নিরুত্তর অথবা স্বল্পোত্তর থেকে থাকেন তাহ'লে তিনি সৎ কবির উচিত কাজই করেছিলেন, অন্তত এবিষয়ে প্রশ্নকর্তার চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন।

তবুও সোক্রাটেসের উক্তিতে মস্ত একটা স্বীকৃতি আছে, যে কাব্য ও কাব্যের আলোচনা পৃথক বস্তু, আর এই পার্থক্যের দরুণ সোক্রাটেস ভেবেছিলেন কবি ও সমালোচক বিভিন্ন ব্যক্তি, যিনি কবি তিনি নন সমালোচক, যিনি সমালোচক তিনি কবি নন।

দেখা যাচ্ছে সোক্রাটেস্ ও বেন্ জনসন্—যদি এই দুইজনকে দুই ভিন্নপন্থী চিন্তার প্রতিভূ মনে করি—উভয়েই মেনেছেন যে কবিকর্ম ও সমালোচন কর্ম আলাদা ক্ষেত্রে বিচরণ করে। তবে গ্রীক দার্শনিক যেখানে বলছেন যে কবি-নয়-এমন-সমালোচকের সমালোচনাই গ্রাহ্য, ইংরেজ কবি-সমালোচক সে-প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধ ভাষায় বলছেন যে কবি-সমালোচকই একমাত্র সমালোচক।

তা হ'লে মানব কাকে? দুই পন্থার ভিন্নতা কি আপাত-ভিন্নতা, না দূরপনেয়?

৩

সমালোচকের কাজ পরগাছার কাজ। তার নিজ মূল নেই, অপরে যে-কাব্য রচনা করেছে, যে-শিল্পের রূপ দিয়েছে, তা' থেকেই সমালোচক স্বীয় কর্মের প্রাণরস আহরণ করেন। যদি সংসারে শিল্প না থাকত, তাহ'লে শিল্প-সমালোচক থাকতেন না। শিল্পের জগতে শিল্পী প্রথম, সমালোচক দ্বিতীয়—এ-ব্যবধান অলঙ্ঘ্য, তা' সে-শিল্পী যদি দুর্বল কারুকর্মা হ'য়েও থাকেন। এ-ব্যবধান ব্যক্তির নয়, গুণকর্মের ব্যবধান। সোক্রাটেস্ অথবা বোদলেয়র যে যে-পক্ষের কথাই বলুন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে সৎ কবি সৎ সমালোচক হ'তে পারেন আবার না-ও হ'তে পারেন। স্পেন্সার, ডান, মিল্টন্ সমালোচনায় লিপ্ত হননি, আর্নল্ড, স্যুইনবর্ণ, এলিয়ট হয়েছেন। তার মানে কবি সত্তায় ও সমালোচক সত্তায় কোনো আবশ্যিক বিরোধ নেই অথবা আবশ্যিক সাযুজ্যও নেই, কোনো ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিতে কবির গুণকর্ম ও সমালোচকের গুণকর্ম সমাবেশিত হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। যে ক্ষেত্রে সমাবেশিত হয়েছে—যেমন এলিয়টে—সেখানে বলব যে সাহিত্যিক এলিয়ট কখনো কখনো সৃষ্টিশীল, তখন তিনি কবি, কখনো বা মূল্যায়নশীল,

তখন তিনি সমালোচক, কিন্তু যে-মুহূর্তে তিনি কবি সে-মুহূর্তে তিনি আর সমালোচক নন, আবার মূল্যায়নকালে তিনি কবি নন।

যত সুস্পষ্ট ভাষায় আমি এ-ব্যবধান বর্ণনা করলাম, বস্তুতঃ কবি-সমালোচকের চরিত্রে ততটা সুস্পষ্টতা নেই। একদা জগতে সমালোচকের সংখ্যা ছিল কম, অন্তত বাক্যপরায়ণ সমালোচকের। (নীরব সমালোচক হয়তো, এক হিসেবে, প্রত্যেকেই ছিলেন, যেমন কার্লাইলের মতে প্রায় সব কর্মীই নীরব কবি!) তখনকার দিনে তারিফ যত হ'ত, ছিদ্রান্বেষণ কম হ'ত সে-তুলনায়। সমালোচনার সঙ্গে তখন সৃষ্টিকর্মের সম্পর্ক খুবই মৃদু ছিল, কবিগণ রাজারাজড়ার সভায় অথবা মুরুব্বির বৈঠকখানায় রচনা আবৃত্তি করতেন, স্তুতি প্রশস্তির রেওয়াজ ছিল সর্বত্র, খুঁতখুঁতে মন্তব্যের ভয় ছিল না, সুতরাং কবি লিখেই যেতেন কল্পনার আবেগে, সমালোচনার প্রতিফলনে নিজ কবিকর্ম যাচাই করার প্রয়োজন ছিল না। আধুনিক আত্মজিজ্ঞাসায় সে কালের কবিকর্ম কণ্টকিত হয়নি। কিন্তু একালে, অর্থাৎ রেনেসাঁস-পরবর্তী কালে মানুষের আত্মচেতনা বেড়ে ওঠার ফলে শিল্পীমাত্রেই শিল্পকর্ম বিষয়ে অতীব সচেতন হয়েছেন। আর আধুনিক আত্মচেতনা আসলে ব্যবচ্ছেদ-পরায়ণ, বিশ্লেষণাত্মক। অতএব একালের কবিগণ, এমনকি যাঁরা প্রধানতঃ অরোধ্য ভাবাবেগে লেখেন তাঁরাও, নিজ শিল্পসম্বন্ধে নিয়ত বিচারশীল, নিজ অন্তরের দিকে তাঁরা নিয়ত বিশ্লেষণেব আলোকসম্পাত করেন।

এই তীব্র আত্মচেতনার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে রবীন্দ্রনাথে। "রবীন্দ্ররচনাবলী"র চতুর্থ খণ্ডে কবির লেখা খানিকটা আত্মপরিচয় দেওয়া আছে। কবি বলছেন : 'আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই,—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।' এই পশ্চাৎ দৃষ্টির ফলে কবি বুঝেছেন যে তাঁর খণ্ড কবিতাগুলি একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ, তা'রা নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ বটে, মুহূর্তের মাধুরীতে ভরাট, আবার তা'রা এক বৃহৎ মহৎ ভূমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। নিজ সাহিত্যিক অভিব্যক্তির যে-মূল ছন্দটি রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন তা'র অধিকতর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা কোনো ভবিষ্যৎ সমালোচক করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যাঁর কাব্যরচনা স্বচ্ছন্দগতি, উপলব্যথিত কোনো শৈল্পিক আত্মসংশয়ের আভাস যাঁর অনায়াস কাব্যে অনুপস্থিত, তিনি আবার গভীরতম মূল্যায়নের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। এমন বলতে পারিনা যে প্রাচীন কালের সাহিত্যিকদের আত্মোপলব্ধি ছিল না কিন্তু কালিদাস-দান্তে-শেক্‌স্‌পীয়রে আধুনিক লেখকের সূচ্যগ্র নিয়তশাণিত আত্ম-বিশ্লেষণের প্রমাণ পাই না। পক্ষান্তরে, আধুনিক লেখক নিজেই নিজের চূড়ান্ত সমালোচক হ'য়ে পড়েন, যেমন ব্যর্ণার্ড শ', আঁদ্রে জিদ্‌।

কিন্তু আমি আরো গভীরতর অর্থে কবি ও সমালোচকের সম্পর্ক দেখতে পাই, যে-অর্থে লাটিন কবি হোরেস্‌ বলেছিলেন, 'যে-কবি শিল্পসম্বন্ধে বিবেকবান, তিনি সততার সঙ্গে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হবেন।' ইদানীং সর্বত্র যে সাহিত্যিকের integrity-র কথা, সততার কথা উল্লিখিত, সে-সততা আত্মবিচারের, শিল্পসাধনার সততা। সেকালে শিল্প সাধনায় বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ থেকে তেমন কোনো বাধা পেতেন না কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যজীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে অন্ততঃ মোটামুটি সঙ্গতি থাকত, তাঁর শিল্পবিচার সৎ হ'তে পারত, কিন্তু এ-যুগের সভ্যতার সংকটে শিল্পীর আত্মবিচার অসংখ্য প্রশ্ন-বিদীর্ণ। নিরন্তর আত্মবিচার ছাড়া আজ কোনো কবিকর্মই সমাপ্ত হয় না। এমন বিশ্বাস

করা সম্ভব নয় যে স্বর্গ থেকে যেমন সাতনরী মালাগাছি নেমে আসত ব'লে রূপকথায় শোনা গেছে তেমন ধারা কোনো মহৎ কবিতা একেবারে সর্বাঙ্গীণ অনবদ্যতা নিয়ে অকস্মাৎ শিল্পীচিত্তে মানসরূপ গ্রহণ করে ও তার পরে কথায় বা রংয়ে বা সুরে শিল্পরূপ ধারণ করে। A sonnet is a moment's monument—(মুহূর্তের মনুমেণ্ট একটি সনেট।) মনুমেণ্ট হ'তে পারে (অনেক সনেটই সার্থকতার তুঙ্গ শিখরাসীন) কিন্তু মুহূর্তের নয় কেননা হোক না সনেটের অবয়ব সংকীর্ণ, তবুও তার শিল্পকৃতি আকস্মিক নয়, এক মুহূর্তে তা' গড়ে' ওঠেনি, পরন্তু হয়তো অগণিত মুহূর্তের এমন কি অগণিত বৎসরের তিল তিল বেদনার ও ভাবনার আশ্চর্য নির্যাস সে-সনেটটি, দীর্ঘকালের কামনা ও প্রয়াস হয়তো উদ্ভাসিত হয়েছে একটি সংহতক্ষণ ভাবনায়। পাঠক দেখছেন স্বল্পাবয়ব স্বল্পবাক্ একটি কবিতা। পাঠক অনুমান করলেন এহেন ক্ষুদ্র কবিতা হয়তো সহসা উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু যেমন মানবশিশু অকস্মাৎ জন্মগ্রহণ করে না, জননীর জঠরে মাসের পর মাস অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রাণ অর্জন করে, যেমন বৃক্ষপ্রাণ দীর্ঘকাল নিহিত থাকে ভূমিতলে বীজগর্ভে, তেমনি শিল্প-ভাবনা তা'র চরম রূপ গ্রহণের পূর্বে কিছুকাল (কতকাল, তা'র কোনো নিশ্চিত সীমানা নেই) শিল্পীচিত্তে ভেসে বেড়ায় নীহারিকাপুঞ্জের মতো। কিন্তু বেড়ে-উঠতে-থাকা মানব-প্রাণ বা বৃক্ষপ্রাণ বেড়ে চলতেই থাকে, তিলেকের জন্যও তার ক্ষান্তি নেই, তিলেকক্ষান্তিতেও তা'র মৃত্যু, পক্ষান্তরে বেড়ে-উঠতে-থাকা শিল্প শিল্পীর ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে ক্ষান্ত হ'তে পারে। কবি যখন কবিতা-রচনায় নিযুক্ত, তাঁর যে-অবস্থায় 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ', যখন চিন্তা ও অনুভূতির নীহারিকাকে অন্তর থেকে নিষ্কাশিত ক'রে ভাষায় রূপায়িত করার চেষ্টায় তিনি একাগ্রচিত্ত, সেই উন্মথিত কালে বারংবার সৃজনচক্র থেমে যেতে পারে, কবি তাঁর সৃষ্টিকার্য থামিয়ে দর্শক-সমালোচকে পরিণত হ'তে পারেন, আপনার বিচারবুদ্ধিতে ও মূল্যায়নশক্তিতে শিল্পকর্মটিকে (সেই মুহূর্ত অবধি যতটুকু সৃষ্টি হ'য়েছে) যাচাই ও পরিমার্জনা ক'রে নিয়ে আবার অগ্রসর হ'তে পারেন সৃষ্টিকার্যে। বস্তুতঃ সমগ্র সৃজনকর্মটি যেন দুই প্রক্রিয়ার টানাপোড়েন। গতি ও ক্ষান্তি, রচনা ও সম্মার্জনা, আবেগ ও বিচার, সৃষ্টি ও মূল্যায়ন—এই দুই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাযুজ্যে এক আশ্চর্য ছন্দে সমগ্র সৃষ্টিকাল লীলায়িত হ'য়ে থাকে। যিনি গাইয়ে তিনি সুর ভাঁজেন অনেকক্ষণ, একই কলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত ভাবে না গুণগুণ করেন যতক্ষণ অবধি না তাঁর শিল্পাদর্শের সঙ্গত রূপ ধরা পড়েছে তাঁর কণ্ঠে। তিনি সৃজনরত একমুহূর্তে, পরমুহূর্তেই সৃষ্টি থামিয়ে মূল্যায়নে, বিচারে প্রবৃত্ত; বিচার থেকেই সরাসরি আবার পরক্ষণেই তিনি চ'লে যান সৃষ্টিতে। ছবি-আঁকিয়ে কতবার আঁকা থামিয়ে চিত্রপট থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন—সে-দৃষ্টির সময় তিনি সৃজনরত নন, তিনি মূল্যায়নকারী, সমালোচক। কবি কতবার না রচনায় ক্ষান্ত হ'য়ে অসম্পূর্ণ রচনাটির বিচার করেন! এহেন আত্মবিচারে যে সব শিল্পীই একই পরিমাণ সময়ক্ষেপণ করেন এমন নয়, কেউবা অধীর আবেগে কেউবা প্রশিক্ষিত শিল্প-শক্তিতে রচনা সমাপ্ত করেন ক্ষান্তিহীন গতিতে, কিন্তু সব শিল্পীর পক্ষেই আত্মবিচারী সমালোচনাশক্তি শিল্পসৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ।

অতএব সমালোচনাশক্তি তুচ্ছ নয়, এ-শক্তি (এতক্ষণ যে-যুক্তি পেশ করেছি তার হিসেবে) সৃজনশক্তির সঙ্গে নিকট-সম্পৃক্ত। এই অর্থেই এলিয়ট বলেছেন, Every creator is also a critic—সব সৃজকই সমালোচক) আর জনৈক অধ্যাপক (ম্যাকেইল্) বলেছেন, The critical faculty is akin to the creative faculty

of the artist—(সমালোচন শক্তি সৃজনশক্তির সমগোত্র)।

সৃজন-সম্পৃক্ত এই যে-মূল্যায়নশক্তির বর্ণনা করলাম এ-ছাড়া অন্য অর্থেই সমালোচনার সচরাচরিক অভিধা। সে-অর্থে সমালোচনা সৃষ্টির অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, সৃষ্টি-কর্মের বাহিরে। এহেন অনাত্মবিচারী সমালোচনায় দু' ধরণের সাহিত্যিক প্রবৃত্ত হ'তে পারেন : (১) যিনি স্বয়ং কবিতা লেখেন আবার অন্যের লেখারও মূল্যায়ন করেন, (২) যিনি স্বয়ং সৃষ্টিধর্মী লেখক নন, শুধু অন্যের লেখার মূল্যায়নে নিবিষ্ট। সাধারণতঃ এ'দেরকেই আমরা বলি সমালোচক। সমালোচকেরা কোনো কোনো সৃজকের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন, ইয়েট্স্-এর কবিতা ও তদনুযায়ী জীবনানন্দর কবিতা স্মর্তব্য। কিন্তু আমি চিন্তার যে-স্তরে সমালোচনশক্তির আলোচনা করছি সেখানে ক্ষমতার বিকৃতি নয়, সুকৃতিই আলোচ্য। কবি বলতে যদি সৎ কবি বুঝি, কবি-নামধেয় পদ্য-লিখিয়েকে না বুঝি, তা'হলে সমালোচক বলতে সৎ সমালোচকই বুঝব, ছিদ্রান্বেষী অসূয়াপর অসংবেদী লেখককে বুঝব না। এককালে অবশ্য গ্রীক ও লাটিন শব্দের মানে দাঁড়িয়েছিল ত্রুটি নির্ণয়কারী, সে মানের রেশ এখনো বর্তমান। কিন্তু যেমন কামপ্রবৃত্তিকে আমরা রূপায়িত করেছি প্রেমে, তেমনি ছিদ্রান্বেষণ থেকে আমরা উন্নীত হয়েছি মূল্যায়নী সমালোচনায়।

এখন প্রশ্ন, উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকের মধ্যে কি একে অন্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট? এ-বিষয়ে কতকগুলি মতামত এ-প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে কবিতা লেখায় নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকলে সমালোচক সে-অভিজ্ঞতার উপরে আপন সমালোচনা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, অতএব তাঁর সমালোচনা অতীব গ্রাহ্য। যিনি সৃষ্টিকার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি, তিনি কী ক'রে সে-কার্য সম্বন্ধে মতামতের অধিকারী?—কিন্তু এ-যুক্তিতে মস্ত ফাঁক র'য়ে গেছে। যাবতীয় জ্ঞান, সকল অনুভূতি ও চিন্তা কি কেবল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর? যে-বস্তু আমার ইন্দ্রিয়ের আওতায় আসেনি, যে-জিনিষ আমি দেখিনি শুনিনি ছুঁইনি, যে-কাজ আমি নিজে করিনি, সে-বিষয়ে কি আমার অজ্ঞতা স্বতঃসিদ্ধ? যদি নিজস্ব অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস ব'লে মানি তাহ'লে মানতে হবে যে উপন্যাসের (তথা কাব্যের, নাটকের) একমাত্র অধিকারী সমালোচক সে-ব্যক্তি যিনি নিজে উপন্যাস লিখেছেন, অন্যেরা সবাই ফালতু। কিন্তু এ-মেনে রেহাই নেই। তর্কের অপ্রতিরোধ্য যুক্তিতে আরো মানতে হবে যে যিনি নয়খানা উপন্যাস লিখেছেন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর উপন্যাস-আলোচক যিনি দশখানা লিখেছেন! উপরন্তু, এ-ব্যক্তি কেবল উপন্যাস-আলোচনারই অধিকারী, কাব্যের নন, নাটকের নন!

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সোপান-পরম্পরায় অগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পোঁছচ্ছি, পোঁছচ্ছি কেননা সোপানের প্রথম ধাপটি-ই অগ্রাহ্য। এই তর্ক-প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নও ওঠে, সে-প্রশ্ন কোল্রিজ তুলেছিলেন। যদি ধরা যায় যে কবি-সমালোচকের দাবী অগ্রগণ্য, তা'হলে কি মানতে হবে যে প্রথম শ্রেণীর কবি হবেন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচক ইত্যাদি? কোল্রিজ্ জানতে চেয়েছিলেন মন্দ কবি যদি সমালোচনার ক্ষেত্রে নামেন তা'হলে সমালোচনার কী অবস্থা হবে? ডক্টর জন্সন্ পোপ-এর চেয়ে অবশ্যই নিকৃষ্ট কবি ছিলেন, কিন্তু সে জন্যেই কি সিদ্ধান্ত করব যে সমালোচক হিসেবেও নিকৃষ্ট ছিলেন? রস্কিন্ ও এডমন্ড গস্ অল্পবিস্তর কবিতা লিখতেন, অলডাস্ হক্স্লিও লিখেছেন, ম্লানপ্রভ এ'দের কবিতা—রস্কিন্কে তো অনায়াসেই বলা যায় মন্দ কবি—কিন্তু এ'দের কবিতার দরুন কি এ'দের সমালোচনাও নস্যাৎ করব?

জ্ঞান একান্তই প্রত্যক্ষ নির্ভর এমন ধারণা না যুক্তিসহ না প্রত্যক্ষেই টে'কসই। অতএব সমালোচনার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষের আত্যন্তিক মূল্য গ্রাহ্য নয়। আসলকথা, কাব্যের শিল্পের এলাকায় প্রামাণ্য মানদণ্ড কল্পনাশক্তি—যে-শক্তিকে জিনিয়স্, ইন্‌ভেনশন্, ইম্যাজিনেশ্‌ন্, ক্রিয়েটিভ্ ফ্যাকাল্টি ইত্যাদি বলা হয়েছে ইংরেজি ভাষায়, বাংলায় আমরা বলছি কবিত্বশক্তি, প্রতিভা, সৃজনীশক্তি, অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া ইত্যাদি। সেই শিল্পপ্রাণ অসম্পৃক্ত নয় প্রত্যক্ষের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, কিন্তু অচিরেই প্রত্যক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে সে-শক্তি নিজের উজ্জ্বল এখতিয়ার স্থাপনা করে। একটা বিশেষ কল্পনা শক্তির অধিকারী ব'লেই কবি কবি, আরেক বিশেষ কল্পনাশক্তির অধিকারী ব'লেই সমালোচক সমালোচক। এমন হওয়া সম্ভব (কিন্তু আবশ্যিক নয়) যে একই আধারে দু'রকম কল্পনাশক্তিরই সমাবেশ হয়েছে (কোল্‌রিজে, এলিয়টে, রবীন্দ্রনাথে) কিন্তু একথা বলা চলেনা যে সে-সমাবেশের দরুন কবিত্বশক্তি হয়েছে মহত্তর অথবা সমালোচনাশক্তি হয়েছে বিচক্ষণতর। (বলা দরকার যে সৃজনশীল কবির পক্ষে আত্মবিচারী যে-মূল্যায়ন অমূল্য সম্পদ, যে-কথা এই অনুচ্ছেদের গোড়ায় বলেছি, তার কথা আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়, এখন অন্য ধরণের মূল্যায়ন সম্বন্ধে চিন্তা করছি।)

যদি বলা হয় কবির বিশেষ কল্পনাশক্তি ও সমালোচকের বিশেষ কল্পনাশক্তি, এ-দু'য়ে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য, এক রকম কল্পনাশক্তিতে শিল্পসত্তা প্রাণ পায়, আরেক শক্তিতে পায় না। কবির বোধি ও সমালোচকের বোধিতে প্রভেদ নেই, প্রভেদ প্রাণসঞ্চারক্ষমতায়। সে-ক্ষমতার বর্ণনা দেবে কে? অবাঙমনসোগোচর সে-আশ্চর্য ক্ষমতায় মানুষ পরমশিল্পীর নিকটতম হয়, সমালোচক দূর থেকে কবির লোকোত্তর প্রতিভায় মুগ্ধ। মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতায় তাঁর কল্পনাশক্তির প্রমাণ, কিন্তু তাঁর কল্পনাশক্তি নিচু স্তরের কেননা তার জীবনীশক্তি নেই, তিনি বুঝতে পারেন গড়তে পারেন না। প্রত্যেক সৎ সাহিত্যপ্রেমীর পক্ষে সৃজক ও সমালোচকের মধ্যে তারতম্য করা দরকার। শুধু যে দুজনের রচনারূপ ভিন্ন তা' নয়, একে অপরের পরগাছা তা-ই নয়, একের ধর্মে বিচার বিশ্লেষণ যুক্তি তর্ক প্রবল অথচ অপরের ধর্মে সংশ্লেষণ আবেগ ও প্রকাশের আনন্দ, তা-ই নয়, আসলে দু'জনের কল্পনাশক্তি চরম সীমানায় পৌঁছে পৃথকপন্থী। সমালোচকের কাজ মূলতঃ অবশ্যই বিশ্লেষণী কাজ। শিল্পীর চিৎপ্রবাহে উন্মথিত হ'য়ে কোনো বিমূর্ত অনুভূতি, কোনো রূপাতীত বোধি ক্রমশঃ মূর্তি পরিগ্রহ করে, যা' ছিল বহু, যা' ছিল বিক্ষিপ্ত, শিল্পসত্তায় তারই সংশ্লেষিত নিটোল রূপ, আর সেই সংহত ঐক্যের বিশ্লেষণই সমালোচকের কাজ। শিল্পসত্তাকে তিনি ভাঙেন, অখণ্ডকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার খণ্ডিত রূপের ভাষ্যরচনা করেন। কিন্তু কোনো সৎ সমালোচকের পক্ষেই এই খণ্ডন বিশ্লেষণ বিকিরণ পদ্ধতি শেষ কথা নয়। সে-পদ্ধতি ভাষ্যকারের, বৈয়াকরণের, কিন্তু সমালোচকের নয় কেননা সমালোচক এর পরেই পুনরায় ঐক্যের পথে এগিয়ে যান। From integration to disintegration, from disintegration to re-integration—ভেঙেছিলেন যে-অখণ্ড সত্তাকে, আবার তার অখণ্ড রূপেরই ধ্যান করেন আর তখনই সম্যক বুঝতে পারেন কত মূল্যবান কবির সংশ্লেষণী শক্তি!

সৎ সমালোচকের প্রধান গুণ একটি বিশেষ ধরণের হৃদয়বত্তা, যাকে আলঙ্কারিকেরা বলেছেন সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদনা। ইওরোপের আঠারো শতকে Sensibility কথাটি চালু ছিল, এ-শতকেও খুব চলেছে, সংবেদনা কথাটি খানিকটা এ-কথারই প্রতিশব্দ কিন্তু

অধিকতর ঐশ্বর্যবান এর সম্পূর্ণ অভিধা। ভারতীয় ঐতিহ্যে 'সহৃদয়' শব্দটি যে-অর্থে সাহিত্যালোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে, সে-অর্থেই আমিও এখানে প্রয়োগ করছি। সুরসিক, সহৃদয় অর্থাৎ সৎ-সমালোচক হওয়া মানে কেবল সহজাত শক্তির অধিকারী হওয়া নয়, যদিও সে-কথাও সত্য, কেননা হোরেস্-এর মত যদি গ্রাহ্য হয় যে কবিরা জন্মান, গড়ে' পিটে' কবি হয় না, তাহ'লে সমালোচকও জন্মান, তবে তাঁকে গড়ে' পিটে' সমালোচক হ'তেই হয়। সহজাত শক্তির সঙ্গে বৈদগ্ধ্য আবশ্যক। সহৃদয় কে? যিনি কবির সৃজনশীল চিত্তাবস্থা প্রণিধান করতে পারেন, অর্থাৎ কবিকর্মে যে-চিৎস্বভাবসম্বিৎ প্রভাববান, যে-ধ্যানী অবস্থায় কবি-ব্যাপার সম্পন্ন, সে-সম্বিৎ, সে ধ্যান সমালোচকেও বর্তেছে। অভিনব গুপ্ত বলেছেন যে কাব্যরসিককে অবশ্য কবিকর্মের আঁটঘাট জানতে হবে, আঙ্গিকজ্ঞান তাঁর পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজন, কিন্তু তাঁর আরো বড় গুণ থাকা দরকার—তন্ময়ীভবনযোগ্যতা। যে-গুণ কীটস্ লক্ষ্য করেছিলেন কবিচরিত্রে : The poetical character...is a thing *per se* and stands alone, it is not itself—it has no self—It is everything and nothing. (কবিচরিত্র অনন্য, তা'র তুলনা সে নিজে, তা'র নিজস্বতা নেই, স্বতন্ত্র-সত্তা নেই, সে সব কিছু আবার কিছু নয়ও), সে-গুণ সমালোচকেরও বৈশিষ্ট্য। সহৃদয় সমালোচক প্রতি কাব্যের চিৎস্বভাবসম্বিতের সঙ্গে আপনাকে পুরোপুরি মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারেন, সে-মুহূর্তে তাঁর ব্যবহারিক সত্তার লয়। এই আশ্চর্য সংবেদনা না থাকলে সমালোচক হওয়া যায় না, আর এই অর্থে প্রত্যেক কাব্যানুভূতির কালে সমালোচকের আপন সম্বিতে সৃজকের সম্বিৎ পুনর্ভব হ'য়ে যায়, তখন সমালোচক ও কবি একাত্ম, সে-মুহূর্তে সমালোচকও কবি। সৎ সমালোচকের চরিত্রে (আমি ব্যবহারিক চরিত্রের কথা বলছি না) ঔদার্য চমৎকার, তাঁর সংস্কৃতিবান তন্ময়ীভবনযোগ্য চিত্তে কত শত কাব্যের বেদনা অনুরণিত হয়, কত পরম্পরবিচ্ছিন্ন কত পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাঁর সর্বগ্রাহী প্রশস্ত রুচিতে অনুমোদিত হয়! বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কাব্যকে পুনর্ভব করার অসাধারণ শক্তির মালিক সমালোচক।

পূর্বে বলেছি সমালোচকের কাজ পরগাছার কাজ। সে-কথা সত্য কেননা কবিকর্মই সমালোচনকর্মের উপলক্ষ, তাছাড়া কবির জগতেই তিনি তন্ময়ীভূত হন। কিন্তু সমালোচকেরও নিজস্ব সৃজনক্ষেত্র আছে। সৎ সমালোচকের প্রশস্ত ও প্রশিক্ষিত সংবেদনায় কাব্যবস্তু নিত্যনব রূপ পরিগ্রহণ করে। তিনি যখন কবিতা পাঠ করেন, সে-পাঠ কেবল ঋণাত্মক থাকে না, যতটুকু তিনি পেয়েছেন কবিতা থেকে সেটুকুকে 'আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে' বাড়িয়ে তোলেন। বহিরঙ্গে কবির কবিতা এক স্থগিতগতি রূপ, কিন্তু সহৃদয় সমালোচকের মনোমুকুরে সে-কবিতা দিনের পরে দিন নূতন রূপে উদ্ভাসিত হয়। যেখানে কবি দিয়েছিলেন একটিমাত্র কবিতা, সমালোচক সেখানে আবিষ্কার করেন নিত্য নবোন্মেষ-শালিনী infinite variety, ক্লিওপাট্রার অম্লান অসংখ্য রূপ। নিজের পরাশ্রিত সীমিতসাধ্য ক্ষেত্রে সমালোচকও কবি।

কনখল

মনীশ ঘটক

কিছুতেই পেছপাও হবার মতো ধাত নয় কনখলের। সাহেবঘেঁষা চটি পবা মা যে হঠাৎ কি করে ঘোমটাবতী কুলবতী হয়ে গেলেন, দেখে তাক লাগলেও হতভম্ব হয় না কনখল। দুর্দ্ধর্ষ সাহেব বাবা হঠাৎ খালি গায়ে খালি পায়ে ধুতির কোঁচড় কোমরে বেঁধে ছাতা মাথায় এ বাড়ী ও বাড়ী করে বেড়াচ্ছেন, এবং দিনের মধ্যে গাঁয়ের সব কটা বাড়ীতে মুড়কী, নাড়ু, নারকোলের ফোঁপরা, অন্তত পঁচিশবার খাবার পরও বেলা চারটেয় তাঁর শিবুদাদার বাড়ীতে আড় মাছের ভাঙা সুক্ত, বিরাট বোয়ালের পেটি সমাকীর্ণ দগদগে লাল মরীচ পোড়া ঝোল, কইমাছের সর্ষেবাঁটা পাতুরী এবং কচি বেগুনের নৈবেদ্যার্পিত টাটকিনি খরশোলার পানসে ব্যঞ্জন সমানে খেয়ে যাচ্ছেন। তার পরও রাত আটটা বাজতে না বাজতে একবার বাড়ীতে এসে হাঁক দিয়ে যাচ্ছেন, খাওয়াটা সুবিধের হোলো না মেজবৌ। ক্ষীর চিঁড়ে কলা থাকে ত তৈরী রেখো। বড়বাড়ীতে ঝুমুর গান আছে। শেষ হলে আমি আর শিবুদা এসে খাব। বলেই ঘরের হাফ গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ থেকে অত্যাশ্চর্য টর্চ্চ লাইট হাতে আবার খালি পায়েই বেরিয়ে যাচ্ছেন। রহমৎ বলে, সাহেব দেখছি দারুণ গাঁইয়া।

ওই টর্চ্চ লাইটটার রহস্য আজো ভেদ করতে পারেনি কনখল। একটা চক্‌চকে চোঙা—গায়ে বোতাম। টিপ্‌লেই ছুঁচের মতো আলো বেরিয়ে বাড়তে বাড়তে দশ বারো হাত আগে জায়গা ঘোর অন্ধকারেও আলো করে দেয়। এই যন্ত্রটা শিলেটে ফায়ার মেরিন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাহেব দিয়ে গিয়েছিলো। বলেছিলো, হালে বেরিয়েছে। আর কত কি বেরুবে। দেখো, আমরা ইউরোপীয়ানরা জড় প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করব। এখুনি কি হয়েছে। তোমরা ভারতীয়েরা দৈবে বিশ্বাস করো, আমরা করি বাহু ও মনোবলে।

কনখল ও সব কথা কানে তুলেছে, আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। কিন্তু রাস্তা মেরামতের ঐ যে জানোয়ারের মতো ইঞ্জিনটা, ঐটে ওকে বুঝতে শিখিয়েছে, মানুষ একদিন প্রকৃতিকে জয় করবে। একদিন মানুষ জলে স্থলে পাতালে সমানে দাপট চালাবে। কনখলের "ঠাকুরমার ঝুলির" রূপকথা একদিন সাহেবদের বাহু ও মনোবলে রূপায়িত হবে। কনখল বিস্ফারিত চোখে দিগন্তে তাকায়, এ রহস্য কবে ভেদ হবে, কবে ভেদ হবে। শেষ পর্যন্ত সাহেবরা কি চাঁদের মা বুড়ীর কাছেও গিয়ে পোঁছবে?

কিন্তু কনখল ছেলেমানুষ। তার মন চায় দিগন্ত ছোঁওয়া মাঠের আনাচে কানাচে উঁকি দিতে। দু' চারটে বাবলার ঝাড়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হালে উঠে আসা গ্রাম পত্তনের কয়েকটি কুঁড়ে ঘর, প্রমত্তা যমুনার পক্ষপাতী ভাঙন, আর উদয়াস্ত খোলা মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত মার্ত্তণ্ড তাণ্ডব।

যমুনা এ পার ভাঙ্‌ছে, তো ও পার গড়ছে। ধ্বস্ নাম্‌ছে যে পারে, অপর পারে জমি জেগে উঠ্‌ছে। এ যেন জোর যার, মুল্লুক তার। এক লহমায় কনখল বুঝে নিয়েছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পড়েছে কথাটা কোনো কেতাবে, মানে কেউ বুঝিয়ে দেয়নি, কিন্তু

আভাসে আঁচ করে নিয়েছে সদর্থটা।

ওর অপরিণত মানসে এ সব তত্ত্বকথা বেশীক্ষণ আসন গাড়ে না। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। বলে, রহমৎ, চলো শিকার করে আসি বড় নদীতে। কাল ভোর রাতে। আমি চাইলে বন্দুক হাতছাড়া করবেন না মা বাবা, তুমি চাইলে নিশ্চয় দেবেন। বেরোতে হবে রাত দুটোয়।

নিভাননীকে রাজী করাতে বেগ পেতে হয় না রহমতের। তিনি ভাবেন, ছেলেটা অনভ্যস্ত পরিবেশে এসে কাহিল হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, যাক্ না, একটা খেলাধুলোর মতো শিকারে। হৃষীকেশকে আদৌ কিছু বলেন না। বারো আর ষোলো দুটো বোরের বন্দুক আন্দাজ মতো কার্তুজ দিয়ে রহমতের হাতে দিয়ে দেন আগরাত্তিরেই। শুধু বলেন, কনার কোনো অমঙ্গল না হয় দেখো রহমৎ।

নিভাননী মনে মনে আঁচেন, হৃষীকেশ গ্রামে এসে মেতে আছেন বাল্যসাথী আত্মীয়-স্বজন গ্রামীনদের নিয়ে। তাঁকে কিছু এখন বলতে যাওয়া তাঁর বহুদিন পিছে ফেলে আসা দিনগুলোর ওপর বৈব্ধস্ত আনা। বুদ্ধিমতী নিভাননী। থাক না সাহেব তাঁর অতীতের মাধুর্যে ছুটির কটা দিন আত্মবিস্মৃত হয়ে। হালের হাকিমী জীবন যেন বিস্মরণের বৈতরণীতে তলিয়ে গেছে। তিনি নিজেও ত গ্রামের সহজ সরল জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে চাচ্ছেন। বাড়ীর ছোট বৌটি হয়ে দুই বড় জার হুকুম তামিল করে যাচ্ছেন, দু' বেলা আনাজ কাটার ধুমে স্থানীয়া ঝিয়ারীদের হার মানিয়ে দিচ্ছেন, দুপুরে ঢেঁকি পাড়েও গ্রাম্য বীরাঙ্গনাদের সাথে সমান পদক্ষেপে চলেছেন। সেমিজ সায়া বাদ দিয়ে কস্তাপেড়ে লাল সাড়ী পরে বাড়ীর পাশের পুকুরে ডুব দিয়ে গৃহদেবতা শালগ্রামের মাথায় জল দিচ্ছেন, সজ নৈবেদ্য টাটে সাজিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কি কিছু দোষ ধরতে পেরেছে? তবে হেঁসেলে ঢুক্তে দেন না মেজ জা, বলেন, চাকরীর জায়গায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েছিস, যদি খেতে এসে গাঁয়ের পাজীগুলো একটা বেফাঁস কথা বলে, মাথা কাটা যাবে। থাক না নিভা, তুই জোগাড় দে, রান্না আমিই তুলে নিতে পারব। বড়জার হবিষ্যি ঘর, সেখানে ঢোকার কথাই ওঠে না, তবে দাওয়ায় বসে নারকোল কোরান, সেই যে ময়ূরের ঝুঁটি লাগানো বঁটিতে ঘসে ঘসে। ঝুরঝুরে নারকোল গুঁড়িতে বারকোষ ভরে ওঠে, হবিষ্যির চৌকাঠে ঠেলে দিয়ে বলেন,—বড়দি, আর কিছু? বড়দি বলেন, ডালফেলা তরকারীর ডাঁটা লাউগুলো ডুমো ডুমো করে কেটে দে ত নিভা। বড়ো মটরের এই ব্যঞ্জনটা ঠাকুরপো ভালোবাসে। নিভার মনই কনখলে সংক্রামিত হয়েছে। সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার আশীর্বাদ তাঁর জীবনদেবতা দিয়ে রেখেছেন। খুশী মনে দাসীবৃত্তি করে যাচ্ছেন দুই বড় জায়ের। মন ভরে উঠ্ছে, বুঝে উঠ্তে না পারলেও পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্ছেন তৃপ্তিতে।

রাত দুটোয় দুই অ-সমবয়সী শিকারী সাথী, রহমৎ ও কনখল, বড়ো ছোটো দুই বন্দুক ঘাড়ে ফেলে, বড় নদীর পথ ধরে। অত রাতে জোলা দিয়ে নৌকা বা ডিঙি বেরোয় না, হেঁটেই পাড়ি দেয় চার মাইল রাস্তা। যমুনার পারে পেঁছতে তিনটে সাঁতিনটে হয়। শেষ রাতের কুয়াশা ভেদ করে ভোরের রোশনাই ধীরে ধীরে জাগছে। জলজমিনের কুয়াশা ঘন, ওপরের দিক পরিষ্কার হয়ে আসছে। একফালি ছোটো স্রোতস্বতী, ইছামতী, মিশেছে এসে বাঘিনী যমুনার সাথে, ওরা পেঁছোয় সেইখানটায়। যমুনার পার পাহাড় সমান উঁচু, নীচে খরস্রোতা ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল সর্বনাশা বীচিবিভঙ্গ,—জল ঘোর

নীল। ইছামতীর জল ইলিশ মাছের মতো সাদা। যেখানটায় ডাকিনী যমুনার কোলে আছড়ে পড়েছে সেখানটায় নীল সাদা দুটি রং-এর বিভেদ পরিস্ফুট।

হঠাৎ কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠে যায়। কনখল নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে এই কি নদী? এপারে পৌঁছে গেছে, কিন্তু অপর পার? দিগন্তে মিশে গেছে অনন্ত জলরাশি, ও পার দেখাই যায় না। অজানা ভয়ে গুরগুর করে ওঠে কনখলের বুক। বলে, রহমৎ, এ নদী, না সমুদ্র? রহমৎ বলে, শুনেছি এটা বাইশজুড়ির মোহনা। নদী এখানে বাইশ মাইল চওড়া। ভরা বর্ষার জল এখনও নদীতে থেকে গেছে, মাঝখানের চর-টর সব জলের তলায়। ভয়ানক নদী এ কনাবাবা। হোই দেখ পদ্মার গেরুয়া জল, আর এখানকার জল কি নীল। আরে, এ ছোট নদীটা রুপোর মত চক্‌চকে, কিন্তু ধার কি!

—দেখ দেখ রহমৎ, ওগুলো কি?

—চুপ্‌ চুপ্‌ কনাবাবা, লালশির, ঝাঁকে বোধ হয় শ'পাঁচেক আছে। আর ওই যে ছাইয়ে সাদায় দেখ্‌ছো, হলদে ঠোঁট, ওগুলো দোমেলা। সাহেবরা পিন্‌টালি বলে। এ দুটোই খুব ভালো জাতের হাঁস। শুয়ে পড়ো, মাটিতে বুক দিয়ে, আমি এক দুই তিন বলব, একসাথে ফায়ার হওয়া চাই।

সদ্য পড়ন্ত চরের জিল্‌জিলে পাতলা জলবিস্তারের ওপর, ইছামতী যমুনার সংগমে এই হাঁসের পাল, রাত্রি-বিশ্রামান্তে উঁড়ি উঁড়ি করে মৃদু মৃদু ডানার ঝাপটা দেয়। এক সংগে পর পর চারটে ফায়ার আওয়াজ গর্জে ওঠে দুটো দো'নলা থেকে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে যায়। ঘাড় কাৎ করে মরে প'ড়ে থাকে মোহানায় গুটি কুড়ি। আধমরা গুটি চার পাঁচ ওড়বার বিফল চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে।

কনখলের তর সয় না। অতগুলো পাখী পড়েছে, আনতে হবে, আর ও ত পারের কাছেই। হরিণের মতো বেগে দৌড়ে ইছামতী যমুনার বাঁকে নামে, ও জায়গাটা ঢালু, খাড়া পার নয়। জলে পা দেবার সাথে সাথে আর্তনারী কণ্ঠের আর্তনাদ ওঠে,—নেমো না, নেমো না, প্রাণে মরবে—

কিন্তু কনখল এ সাবধানবাণীর মানেও বোঝে না। হাতের কাছে এতগুলো শিকারের পাখী, নাম্‌বে না ত আনবে কি করে? ও ঝাঁপ দিয়ে পড়ে থার্মোমিটর ভাঙা পারার মতো তিন আঙুল জলের নীচের বালিতে। হায় হায় করে ওঠে নারীকণ্ঠ। রহমতের কোনো পাত্তা নেই। বুড়োমানুষ, ধীরে সুস্থে এগোয় হয় ত। কিন্তু কনখল ছোট হলেও নারীকণ্ঠের সাবধানবাণীর মানে বোঝে এইবার। এক পা, যেটা আগে পড়েছিল, দেবে গিয়েছে হাঁটু পর্যন্ত। আর এক পা বালিতে দিতে সেটাও দেবে যায়। পার হাত তিনেক দূরে। তারপর যতো চেষ্টা করে ততোই দু'পা পাতাল প্রবেশ করতে থাকে ধীর কদমে, পাঁচ মিনিটে আধ ইঞ্চি রেটে। ওর অজ্ঞাত মানসে ঝলকে ওঠে একটি কথা,—চোরাবালি? তবে, তবে, উপায়?

তীব্র আদেশ আসে পার থেকে—বন্দুক ছুঁড়ে দাও খোকা পারে, ওর ওজনে আরো তাড়াতাড়ি পুঁতে যাবে। এই বুড়ো, একটা বাঁশ-টাশ দেখ্‌না শিগগির, খোকা ত গেল, হতভাগা বুজরুক কোথাকার—

রহমৎ বন্দুক ফেলে বাঁশের সন্ধানে যায়। ইচ্ছে মতো সহজপ্রাপ্য নয় গ্রামদেশে কোনো জিনিষই। আস্‌তে দেরী হয়। কোমর পর্যন্ত চোরাবালিতে ডোবে কনখল।

কনখলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে, কিন্তু কাতর হয় না। ঘাবড়ায়, কিন্তু ভয় পায়

না। ভয়ের জন্ম বিপদ ঘটবার আগে, ভয় ঘাড়ে এসে পড়লে শুধু সংগ্রাম, ভয় কাটিয়ে ওঠ্‌বার তোড়জোড়। কিন্তু তবুও নিরুপায়, অসহায় মনে হয় নিজেকে। নাভীমূল পর্যন্ত কবরের তলায়, নিশ্চিত মৃত্যু তাকে টেনেই চলেছে নীচের দিকে।

হঠাৎ একটা সাড়ীর আঁচল এসে ঘাড়ে পড়ে। আবার সেই নারীকণ্ঠ—কোমরে বাঁধ দাও খোকা, শক্ত গিঁট। তারপর দুহাত ছড়িয়ে বুক আছড়ে পড়ো জলে। খাড়া হয়ে থেকো না। নির্দেশ মতো কষে কোমরে সাড়ীর আঁচল বাঁধে কনখল। তারপর—তারপর ওর আর কিছু মনে পড়ে না। যেন কত যুগ পরে চৈতন্য ফেরবার পর দেখ্‌তে পায় ওকে কোলে নিয়ে কে যেন বসে আছে পারের ওপর। সস্নেহে চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, তার আঁচলের গেরো এখনও কনখলের কোমরে বাঁধা। আলুলায়িতাকেশা, উন্মুক্ত-স্তনা, অপূর্বসুন্দরী, শ্যামামূর্তি। সুস্থ সবল দুটি হাত কনখলকে কোলে টেনে রেখেছে। কোমরের গিঁট ছাড়িয়ে গায়ে কাপড় জড়ায় নারীমূর্তি, বলে, আর কোন ভয় নেই। সুস্থির হয়ে শুয়ে থাকো কিছুক্ষণ। কনখল পরম নির্ভয়ে সেই মেয়েটির বুকে মাথা রেখে চোখ বোঁজে। কী যেন ক্লান্তি, থেকে থেকে বিস্মরণ, অভিভূত করতে থাকে ওকে। কখন যে সত্যিই সত্যিই ক্লান্ত অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে জানেও না।

ঘুম ভাঙে প্রাণদাত্রীর তর্জনে। 'কেমন লোক তুমি বুড়ো মিঞা, একটা বাঁশ আনতে দিন কাবার করে দিলে? খোকাকে ত আমি তুলেছি, এখন বাঁশ দিয়ে আঁকশি বানিয়ে যে কটা পারো শিকারের পাখী তোলো। জ্যান্তগুলো অনেক দূর চলে গেছে। ডিঙি ছাড়া আনা যাবে না। তা না যাক্‌, ছেলে প্রাণে বেঁচেছে, নিয়ে বাড়ী যাও। কোন গাঁ তোমাদের?' রহমৎ গাঁয়ের নাম বলে। বাবার নাম বলে। মেয়েটি হাতের ও-পিঠ গালে লাগিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়, বলে, চিনেছি।

হঠাৎ জেগে কনখল বলে, তোমার নাম কি? ফিক করে হেসে ফেলে শ্যামাসুন্দরী। বলে, কি নাম পছন্দ হয় খোকা? কনখল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলে,—যমুনা হলে খুশী হই। মেয়েটি, বয়েস কুড়ি বাইশ হবে, বলে—ঠিক বলেছ—অমনি কালোই আমি। তবে, নামটা আমার এলোকেশী।

কনখল অবাক বিস্ময়ে ভাবে, কি মিল যমুনাতে আর এলোকেশীতে। কালো রং নীল চোখ, চূর্ণ-কুন্তল,—নদীতে মেয়েতে যেন দুই যমজ বোন। একটা অলৌকিক শক্তিতে ভরা যেন দুজনারই সর্বাবয়ব।

এলোকেশী বলে, বাইরে থাকো, জানো না ত এসব দেশে কতরকমের বিপদ। চরের পলিমাটিতে কেউ নামে কখনো? সব জায়গায়েই যে চোরাবালি আছে, তা নয়। কিন্তু জলটানের সময় জাগন্ত চরের বেশীর ভাগই চোরাবালি। বুঝলে বুড়ো মিঞা, ওসব জায়গায় ছোট ছেলে নিয়ে শিকার খেলতে এসো না।

রহমৎ খুঁটে খুঁটে কনখলের উদ্ধারের ইতিবৃত্তান্ত সব জেনে নেয়। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে বুড়োর মন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় খোদার দোয়া প্রার্থনা করে। বলে, মা, আজ কি সর্বনাশ থেকে বাঁচালে তুমি আমাদের। মেমসাহেব যখন শুনবেন আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন কিনা আল্লা জানেন।

মেমসাহেব কে? সুধোয় এলোকেশী। ও খোকাবাবার মা? তা তাঁর যদি বুদ্ধি থাকে, তবে কিছুই দোষ নেবেন না। এ তল্লাটের নদী নালার হালচাল তোমাদের দেশের কেউ হয়ত জানেই না। এতবড় নদী ত তোমাদের দেশে নেই, থাক্‌লেও এমন ভাঙন নেই। ভাঙে

বললেই ত বালি মাটি পড়ে, ভেসে এসে, চোরাবালির সৃষ্টি করে। যাক্, খোকাকে নিয়ে বাড়ী ফেরার আগে আমার ওখানে চলো, বাড়ীর গাইয়ের দুধ আছে, দুয়ে দিচ্ছি, দু'জনে দু'বাটি খেয়ে নাও। ওইত নদী পারেই ঘর আমার। আমি জেলের মেয়ে কিনা, তাই ফুটিয়ে নিতে বলছি তোমাদের।

রহমৎ ফোক্লা দাঁতে একগাল হেসে পাকা দাড়ি চুমড়ে বলে, আজ তুমি ওর মায়ের কাজ করেছ গো মা, তোমার হাতে খেলে আমাদের অক্ষয় স্বর্গবাস হবে। তুমিই ফুটিয়ে দাও।

—চলো।

পকেট থেকে টোয়াইন সুতো বার করে পায়ের দিক গেঁথে গেঁথে পাখীর মালা বানায় রহমৎ। সেই মালা দু ফেরতা গলায় জড়িয়ে রহমৎ চলে, দুটো বন্দুকই ঘাড়ে নিয়ে। কাদামাখা হাফপ্যাণ্ট পরে এলোকেশীর কোলে চড়ে চলে কনখল, ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও এলোকেশী ছাড়েনি, হাঁটতে দেয়নি। এলোকেশীর সতেজ সবল আস্ফালনের কাছে কনখলের সব দ্বিধা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বাড়ী পেঁছে ছবির মতো নিকোনো দাওয়ায় বসিয়ে দেয় ওদের। একখানি ঘর, আর একটি হেঁসেল। ওদেশে রাংচিতে কি জিকে গাছের চল নেই। পাতাবাহারী কচু, আর মান, আর ওল, আর দু'চারটে বকফুলের গাছ দিয়ে বাড়ীর চৌহদ্দি ঘেরা। ভারী শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ ভাব বাড়ীটা জুড়ে। দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে দিয়ে এলোকেশী দুধের খবরদারীতে যায়। কনখলের গা এইবারে সত্যিই এলিয়ে আসে। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে কনুইয়ে মাথা রেখে। রহমৎ অনির্দেশ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে একদিকে। ঠোঁটদুটো বিড়বিড় করে যায়, বাক্য ফোটেনা। চোখের কোণা দিয়ে জল গড়ায়, বোধ হয় প্রার্থনার অনুচ্চারিত মন্ত্রের তাপে বুকের কৃতজ্ঞতার জমাট বরফ দ্রব হয়ে বেরিয়ে আসে চোখ দিয়ে।

দু জামবাটি উষ্ণ এক্বল্কা দুধ ভিজে গামছায় পেতে দুহাত প্রসারিত করে এলোকেশী এসে এ দৃশ্য দেখে। ওরও মনের মধ্যে মোচড় দেয়। শক্ত মেয়ে এলোকেশী। সামলে নিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—এই বুড়ো চাচা, চ্যাংড়ার মতো কাঁদছ কেন? খোকা যে খালি চাটাইয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ভিজে কাদা কাপড়-চোপড় পরে, হুঁস্পবন নেই তোমার? দেখো ত বাছার গায়ে চাকা চাকা চাটাইয়ের দাগ বসে গেছে? ডাক্তে হয়না আমাকে? কি রকম বে-আক্কেলে লোক গো তুমি? এই রইল দুধের বাটি। খোকাকে ওঠাও আমি পাতবার কিছু আনি। কনখল ধড়মড় করে জেগে উঠে বসে' চোখ কচলায়। ততক্ষণে এলোকেশী খুঠে দিয়ে কাচা ফরসা থান এনে ভাঁজ করে পেতে দেয় চাটাইয়ে। নিজের উরুতে ওর মাথা রেখে বলে, না, ওঠ্। বসিয়ে দেয়। —দুধটা খেয়ে নে। একচুমুকে ঈষত্তপ্ত দুধ শেষ করে কনখল। বলে, বাড়ী যাব না?

—কি করে যাবি? ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে যে। বুড়োচাচা, তুমি শিকার আর বন্দুক নিয়ে চলে যাও। ঐ যে কি বললে মেমসাহেব, তাঁকে নিয়ে এসো। আধ ঘণ্টার পথও নয়। না না—উত্তরে না—পশ্চিম দিকের ঐ যে পুকুর—ওর পারেই গাঁয়ের ইস্কুল। ওরই পেছনেই তোমাদের গাঁ। তোমরা ত ঘুর পথে এসেছিলে, তাই দেরী হয়েছিল। যাও, বেলা এখন এক পহরও হয়নি। খোকা ঘুমোক।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কনখল বলে—তাই যাও রহমৎ, আমি ঘুমোই। এলোকেশীর কোলশিয়রি হয়ে কনখল গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে যায়।

এলোকেশীর ঘড়ি নেই, তবে সত্যি বেলা তখন সাতটার বেশী হয়নি। কনখলের এলোমেলো চুলে হাত বুলোয়, আর আপন মনে বলে—শতেকখোয়ারী মা! মেমসাহেব! যমদুয়ারে ছেলে পাঠিয়ে ফেরিঙ্গিপনা হচ্ছে! এসো না একবার—দেখব কতো বড়ো মেম তুমি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মা বাবার দল পৌঁছে যান। কনখল তখনো ঘুমে, নিভা এসে বুকে সাপ্‌টে হুমড়ী খেয়ে পড়েন ছেলের ওপর। এলোকেশী উরু সরিয়ে নেয়, মাথায় কাপড় দেয়না, তবে সাড়ীর আঁচল সামাল করে গায়ে বুকে জড়ায়। উঠে দাওয়া থেকে এক কোণায় দাঁড়ায়।

বড় বাড়ীর শিববাবু বলেন—কেরে—মাধব জেলের বিধ্‌বা মেয়ে এলোকেশী না? তাই বলি, এত সাহসই বা কার হবে, আর গায়ে এত জোরই বা কোন মেয়ের। রহমতের কাছে শুনে একবার যে মনে হয়নি তা নয়, তবে চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন হোলো। শুনেছি রে, সব শুনেছি। আচ্ছা, আচ্ছা, ভগবান ত তোর ভালোই করবেন, আমরাও যা পারি করব।

ফিক্ করে আঁচলের আড়ালে হেসে ফেলে এলোকেশী। সঙ্গে সঙ্গে সিংহীর মতো হিংস্র হয় চোখের চাউনী। বড় বাড়ীর বড়বাবুর যা পারি তা করবার কথা এ তল্লাটে আটদশ-খানা গাঁয়ের বিধবারা জানে। জেলে, চুণে, এমনকি ভদ্দর ঘরের কচি রাঁড়িদেরও অজানা নয়। দু' দুবার দূতী পাঠিয়ে, সন্ধ্যের অন্ধকারে নিজে এসে, সব চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছেন তিনি। আজকের এই অন্তরঙ্গতা আবার কি অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসবে ভেবে শঙ্কিতা হয়, কিন্তু দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে হেঁসেলে ঢুকে মনে মনে বলে—কোরো ঠাকুর। কেশী জেলেনিকে সবটুকু চেনোনি। নীচু ছাদের সাথে টাঙানো শিকেয় দুদুটো মাটির পাতিলের ওপর একটা ছ'ফলা ট্যাঁটার আধ হাত হাতল সমেত ফলাটা দেখা যায়। দেখেই আশ্বাসে বুক ভরে ওঠে।

হঠাৎ ঝাঁপ খুলে নিভাননী এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। কিচ্ছু বলতে পারেন না, খালি ফুলে ফুলে ওঠেন কান্নার ধমকে। এলোকেশী ভাবে, এ কেমন মেমসাহেব? সেমিজ সায়া জুতো মোজা নেই, কপাল জোড়া সিঁদুর আর আদুল গায়ে লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী, দুচরণে আলতা, হাতে নোয়া, শাঁখা, আটগাছা করে চুড়ি—এ কেমন মেমসাহেব? বলে, অধৈর্য হবেন না, খোকা ত ভালোই আছে। সঙ্গে সঙ্গে গরম দুধ খাইয়ে দিয়েছি। ওকেও, বুড়োচাচাকেও। তার পর খিলখিল করে হেসে ফেলে। বলে, জেলেনীর হাতে দুধ খেয়ে তোমার ছেলের জাত গেছে—

নিভাননী ওকে বুকে পিষে ফেলেন। কপালে, গালে চুমো খেয়ে বলেন, জন্ম জন্ম জাত যাক মা, ওর মায়ের পেটের বড়ো বোন ওকে নিজ হাতে দুধ খেতে দিলে যদি ওর জাত যায়ই, যাকগে সে জাত। তোর নাম ত এলোকেশী?

এলোকেশী বলে—কেশী বলে সবাই ডাকে মা।

বাড়ীর দাওয়ায় একটা সোরগোল ওঠে। দুজনে বেরিয়ে দেখেন, কোমর পর্যন্ত কাদা লেপা এক সাঁই জোয়ান, বয়েস সাতাশ আটাশ হবে, দাঁড়িয়েছে এসে। এক হাতে গামছায় বাঁধা গুটি পাঁচেক হাঁস, আর এক হাতে হাত চল্লিশেক লম্বা বিপর্যস্ত এক তল্লা বাঁশের লগী। ঠোঁটের কোনো অপরাধীসুলভ বিনীত হাসি। বলে, খোকাকে কেশী যখন টেনে তুলল, তখন বলছিল, ডিঙি না হলে জ্যান্ত পাখী কটা আনা যাবে না। আমি হুই বাঁকে নাও বেঁধে ছিলাম। কেশী ত খোকাকে চ্যাংদোলা করে কোলে তুলে বাড়ীর দিকে রওনা দিল, আমিও ডিঙি খুললাম চোরাবালির ফটিকজলে। কি শয়তান ওই হাঁসগুলো কর্তা, ধরি ধরি, হুস্—

পাঁচহাত দূরে। সবকটা ত পাকড় করলাম, ওই বড়ো দোমেলাটা জ্বালিয়ে খেয়েছে। লাগালের মধ্যে আছে মনে করে যেই ঝুঁকেছি, ডিঙি কাৎ হয়ে পড়ে গেলাম গাঙে। গাঙ ত ভারী—দেখিনা হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে গিয়েছি। ভাগ্যিস লগিটা হাতেই ছিল—ভর দিয়ে, পারে এসে উঠ্‌লাম। এই বাঁশের দাগ দেখেন কর্তা, ত্রিশ বত্রিশ হাত চোরা—তার পর শক্ত মাটি। উঃ, এই হিমের বিয়ানেও ঘেমে নেয়ে উঠেছি কর্তা।

—শুধু ঘাম কেন, কালঘাম ছোটা উচিত ছিল তোর। গোঁয়ার-গোবিন্দ বোম্বেটে ডাকাত কোথাকার। বলে এলোকেশী ছোটে হেঁসেলে। পাটকাঠির আগুনে তপ্ত করে খানিকটা দুধ। বাটি ভরে এনে দুম করে উঠোনে বসিয়ে দেয়। বলে, বসে খা। তারপর ঘুমোগে যা। হতচ্ছাড়া, মুখপোড়া, গাধা।

নিভাননী যেন আভাসে বোঝেন সব। কেশীকে ধরে হেঁসেলে আনতে এবার কেশীর ফুলে ফুলে কাঁদার পালা। কিন্তু একটি কথাও বার করতে পারেন না নিভাননী তার মুখ থেকে। নির্বাক সান্ত্বনা দিয়ে যান তিনি।

কনখল বীরপূজারী। যেখানে এলোকেশীর আঁচল না থাক্‌লে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত ছিল, সেইখানে এই মানুষ একটা লগি নিয়ে ঠেস দিয়ে উঠে আস্‌তে পেরেছে। উঠে এসে লগিটা দু'হাতে তুলতে যায় কনখল। দু আঙুল উঠে আবার পড়ে যায় বাঁশটা উঠোনে। লোকটা হেসে বলে—ভয়ানক ভারী খোকাবাবু, তোমার কর্ম না।

—যখন ভর দিলে, হাতে খুব লাগছিল তোমার?

—কাঁধ কব্জি বিষ হয়ে আছে বেদনায়। পার থেকে আর দুহাত দূরে থাক্‌লে বাঁচার আশাই ছিল না।

শিবুবাবু হৃষীকেশকে বলেন, এর নাম মনোহর হলদার। এরও সাতকুলে কেউ নেই, বাড়ীও নাই, ঘরও নাই। নৌকা একখান আছে, শোয়া, বসা, রুজি-রোজগার সব তাতেই। কিন্তু ভারী সৎ, আর—হেসে ফেলেন বড়বাবু—ভারী বোকা। দেখলে ত কেশী জেলেনী যা তা বলে গেল—আর ও কেমন ভ্যাকা ভ্যাকা মুখে' তাকিয়ে থাক্‌ল?

হৃষীকেশ বলেন,—আমি ও দু'জনের কথাবার্তায় একটা রহস্যের—না না, রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত পেয়েছি দাদা। তবে দেখুন, বেলা বাড়ছে এবার বাড়ী ফেরা যাক। এ হাঁসকটা এরাই রাখুক। কনা মাকে ডাক ত।

এলোকেশীর কপোল চুম্বন করে নিভাননী ঘোমটা টেনে বেরোন। কনখলকে বুকে নিয়ে চুমো খায় এলোকেশী। দুচোখে জল। রহমৎ অনেক নীচু হয়ে আদাব দেয়।

দলটা একটু এগিয়ে গেলে, ফিরে এসে নিভা কেশীকে বলেন,—মনোহরকে খাইয়ে-দাইয়ে নৌকোয় ঘুমোতে পাঠিয়ে আসিস আমাদের বাড়ীতে বিকেলে। গল্প করব। এলোকেশী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, কিন্তু কান আর গাল বেগুনী হয়ে ওঠে।

১৯

—ন' বছর বয়সে বিধবা হয়েছি মা। আমার বাবার নাম ছিল সাধু, তার সাথে মনহরার বাবার বড়ো কাজিয়া ছিল, যেদিন মনার বাবা আমাকে বৌ করে নেবে বলে প্রস্তাব নিয়ে এলো, আমার বাবা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মনাও মনের দুঃখে দেশছাড়া হোলো। গোয়ালন্দে গিয়ে সাদেকের ইলিশের নৌকোয় তাঁবেদার হোলো। ওর বাবা

মরলো দেশে। ও খবর ও পেলোনা। কুঁড়ে একটা ছিলো, পাঁচ জ্ঞাতিতে ভাগাভাগি করে নিল। মনোহর দেশে ফিরে বাড়ী পেলনা। সেও আমার বিয়ের পর বিধবা হওয়ারও চার বছর পরে। আমি তখন তের, মনা আঠারো। আমার বাবা তখনো বেঁচে। বাবা হুঁকোয় টান দিয়ে কাশতে কাশতে বলতেন,—দেখলি কেশী, ওই বাউণ্ডুলেটার হাতে তোকে তুলে দিলে কি তোর দশা হোত! বাড়ী নেই, ঘর নেই, সাদেকের চাকরী নেই, থাকার মধ্যে একটা জেলেডিঙ্গি। হতচ্ছাড়া হাড় হাভাতে!

—আমি মা, কথার পিঠে কথা বলতাম না। বাবা শুধু জেলেই ছিল না, ডাক্‌সাইটে ডাকাতও ছিল। পুজোয় পালে পার্বণে গেরস্ত নৌকো লুট করে গওনা টাকা আনত, আর মাটিতে পুঁতে ফেলত। কিন্তু সেই বাবাও মরল আমার ষোল বছর বয়সে। মনোহরের খোঁজ আমিই করেছিলাম, কিন্তু পাত্তা পেলাম না। লোকমুখে শুনলাম আশুগঞ্জ না ভৈরব, কোন বন্দরে চলে গেছে। সে নাকি মেঘনা নদীর ওপর, সমুদ্র সেখানে কাছে, জল সেখানে গহীন।

—মাগো, তারপর কী দুঃস্বপ্নে দিন কেটেছে আমার। চরের মধ্যে ওল্লী আছে জানো ত, ঐ বড়বাবুদের চরের জমিতেও আছে। ফাঁপা জল টান দিলে বড়ই কাঁটা ফেলে চরের গর্ত ঢেকে দিলে অনেক মাছ আটকে যায়। সারা শীত কাঁটা তুলে ঐ মাছ ধরে বিক্রী করে জমিদারেরা। সর্দার থাকে প্রত্যেক জমিদারের। হাফিজ মিঞা বড়বাড়ীর সর্দার। একদিন রাত নিশুতিতে এসে কুপ্রস্তাব করে আমার কাছে বড়বাবুর জবানীতে। আমি ঘুম তরাসে লোক, অনেক রাত নদীর ধারে বসে থাকি। হাফিজ বাবার থেকে ছোট, চাচা বলি আমি। কিন্তু সেদিন মা আমি তাকে এমন বাঁ পায়ের লাথি মেরেছিলাম, শীতের পর্বতপ্রমাণ নদীর পার থেকে ঝপাং করে নদীতে পড়ল। আমি বাড়ী ফিরে এসে বাবার বোয়ালমারা কোঁচটা—ঐ যে ছ'ফলা বর্শী, ডাণ্ডা কেটে ছোট করে ছুরির সাইজ বানিয়ে নিলাম। নিরুপদ্রবে কাট্‌ল দিনকতক।

—কিন্তু মা, বাবার জমানো অধর্মের টাকার সন্ধান জানলেও এক পয়সা ভাঙিনি, রোজ ছোট ডিঙিটা নিয়ে মাছ ধরে আইরচার ষ্টীমার বাজারে বেচে আসতাম। দুটাকা, আড়াই টাকা হোতো। একার খরচ বাদে টাকা দেড়েক জম্‌ত। নির্ভাবনায় ছিলাম। ট্যাঁটা কোমর ছাড়া করিনি, সেদিন আশ্বিনের ঝড়ে তোমাদের গাঁয়ের ঘাটে নৌকো ভিড়োতে হোলো। ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলেন বড়বাবু। জোলার মধ্যে তাঁর নৌকো, তাতে বিধু চুণেবৌ। সবাই জানে ওঁর সাথে ওর সম্পর্ক। আত্তি দেখিয়ে বললেন—নৌকো ওইখেনে ভিড়ো কেশী, ভারী পাক, ডুববি। পাক সত্যিই ছিল। আমি গিয়ে কথামত নৌকো ভিড়োলাম।

—এদিকে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি আইরচার কেনা মুড়িকদমা খাই, হঠাৎ পিছন থেকে লোহার মতো শক্ত হাতে কে যেন আমার বুক বেড়ে টান দিয়ে কোলে নিয়ে ফেলল। খানিকটা গরম নিঃশ্বাস, খানিকটা ঝাপটাঝাপটি, তার পরই—উঃ মেরে ফেলেছে রে—আর্তনাদ। ট্যাঁটা মেরে দিয়েছি পিঠে। খালি গায়ে থাকেন না উনি সেই থেকে। ছ'ছ'টা ফোঁড়ের দাগ পিঠে কায়েম হয়ে গিয়েছে। আমার হাত পায়ের জোরের ত পরিচয় পেয়েছ। তার পরেই এক লাথিতে ঠেলে দিলাম জোলার জলে। শব্দ হোলো ঝপাং। ঝড় তখন নেই। সোজা বাড়ীর পথে ডিঙি চালালাম।

—তারপর সুরু হোলো উপদ্রব। কথা নেই, বার্তা নেই, আজ কোনো মেয়েলোক, কাল একজন চৌকীদার,—বড়বাবু পিসিডেণ্ট কিনা—অনবরত ঘুর ঘুর করে। মনোহরের

কোনো পাত্তা নেই, ভাবলাম, আজ আইরচা যাওয়ার পথে মাঝ গাঙে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দেব। কিন্তু প্রাণের মায়া, পারলাম না। সূর্যি পাটে বসার আগে ফিরে মাছভাত খেয়ে গাঙপারে গিয়ে বসলাম। আমরা জেলের মেয়ে, বিধবা হলেও মাছ খাই। রাইত তখন অনেক, ঘরে ফিরে বারিন্দায় শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা চেনা গলার আওয়াজ—কেশী লো, ওঠ্, ওঠ্, ওই পিঠালী গাছের তলা দিয়ে নেমে ইছামতীর মধ্যে আমার ডিঙিতে যা, দেরী করিস না, ধস্ নাম্বে। তাকিয়ে দেখি, মনোহর। হাতে ওই পেল্লায় বাঁশের লগি, কাঁধ বুক ফুলে ফুলে উঠ্ছে ঝড়ের ঢেউয়ের মতো। আমার ঘরের পিছনে তিনজন জোয়ান মাটিতে পড়ে, আর দু'জন আস্ছে পার বেয়ে। মনোহর এক ধাক্কায় আমাকে পিঠালি গাছের দিকে ঠেলে দিয়ে, লগি উঁচিয়ে ওই দুটো লোকের দিকে দৌড়য়। আর তখুনি, গাঙের পর্বতপ্রমাণ পার ধসে—তিন মুর্দা, জিন্দা গাঙ পাড়ে' তলিয়ে যায়। মনোহরের পায়ের দু ইঞ্চি দূরে বেবাক ফাঁক—জমিন নেই। আমার ঘরটা বেঁচে যায়। ঝট্কা দিয়ে মনাকে টেনে নেই পিছনে—বলি, উজ্বুক, বাঁদর, পাঁঠা—কে তোকে অত ধারে যেতে বলেছে? গাধার মত দাঁত বের করে লোকটা, বলে, তা ঠিক্, তা ঠিক্, আর একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি।

—এত বড় কাণ্ডকারখানার পর ঘুম আসে না। দুইজনে উঠোনে বসে খবর বার্তা নেই। মনোহর নাকি আজ চারদিন ভৈরব থেকে ফিরে ডিঙি নোঙর করেছে ইছামতীর খাঁড়িতে। রোজ নাকি আমার ওপর নজর রাখে—সমস্ত রাত জেগে পাহারা দেয়। একটা দৈত্যের মতো হয়েছে শরীরটা। কি খায়, কি পরে, কিছু বলে না। শুধু চলে হাসে, চলে যায়। আমি বলি,—সাদেক মিঞার কামে আবার গোয়ালন্দ যা না কেন? বলে—উঁহু, এসে যা শুনলাম, আমি এই দিক্দেশ থেকে নড়ছি না।

—নির্ভরসার থেকে ভরসার মুখ দেখি। কচি ছুঁড়ির মতো লজ্জা লজ্জা করতে থাকে। ঝড়, ঝাপট, অত্যাচার, সব মুছে যায় মন থেকে, কিন্তু বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে ভয়ে। পাঁচ পাঁচটা লোক ধসে তলিয়ে গেল, সোরগোল উঠ্বেই। তবে গাঙের ভাঙনে অমন কত প্রাণ যায়, সুলুক সন্ধান সুরু হয়, আবার ভুলেও যায় সবাই। গাঙ্ আমাদের মা দুর্গা, একহাতে অসুর মারে, আর কত হাতে পালন করে।

এলোকেশী দম ফেলে কাহিনী বন্ধ করে। নিভাননী নির্বাক স্নেহে ওর চুলের রাশে হাত বোলান। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেন না। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, উপায় একটা হবেই। সাধুর অধর্মের টাকা তুলে ফেল। গাঁ ছাড়তে হবে। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পর আমরা ফিরব। ঐ গোয়ালন্দেই তোদের স্থিতি করে দিয়ে যাব। সাদেকের কারবার এখনো চালু আছে?

—যদি বাবার টাকাকড়ি তুলি তবে মাঝারী কিসিমের ব্যবসা আমরাই চালাতে পারব। সাদেকের নোক্রী করার দরকার হবে না।

—তবে তাই হবে। তুই মনহরাকে পয়সা কড়ি দিয়ে ডিঙি, জাল, কিনতে পাঠিয়ে দে কালকেই। আর দিন দশেকের বেশী ত নেই। আবার তার আগে তোর বিয়ের জোগাড় যন্তর করতে হবে। এখন বাড়ী যা, ভর সন্ধ্যে হয়ে এলো। বিপদ আপদ নেই ত?

—বিপদ আপদ পদে পদে, তবে এই যে,—বলে এলোকেশী ছ'ফলা কোঁচটা দেখায়। নিভাননীর পায়ে প্রণাম করে স্কুল বরাবর বাড়ীর পথ ধরে। যতক্ষণ না ভট্চাজদের পোড়ো-বাড়ীর মণ্ডপের আড়ালে অদৃশ্য না হয়ে যায়, নিভাননী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তার পর

উঠে গৃহকর্মে মন দেন।

হৃষিকেশ যথারীতি পাড়া বেড়াচ্ছেন, কনখল রায়বাড়ীতে ঝুমুর গান শুনতে গেছে। ঝির ঝির করে বিষ্টি এলো। এক লহরা শেয়ালের ডাক সুরু হয়ে থেমে গেল। অশ্রান্ত ব্যাঙের সারিগান সুরু হয়েছে। বাড়ীর পেছনে ডোবার দিক থেকে দু একবার কোনো নাম না জানা রাতচরা পাখীর হৃদয়ভেদী টিট্টিকার শোনা যায়। শরতের বর্ষণভরাক্রান্ত রাত তার বিপুল দেহভার নিয়ে সমস্ত দিনের হর্ষোজ্জ্বল জীবনচাঞ্চল্যভরা ছোট্ট জনপদটির বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বস্‌তে আরম্ভ করে। নিভাননী উত্তর দুয়োরীর দাওয়ায়, শিলেট থেকে আনা ডিট্‌জ লণ্ঠনের পল্‌তে উস্‌কে, হালে আসা "প্রবাসী"র পাতা ওলটান। মলাটের উদ্ধৃতি প্রতি মাসে পড়েন, পুরোনো লাগে না।

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
পরো লৌহ বিনির্মিত হার বুকে।
পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে॥"

রবিবাবুর দু চারটে গান, প্রভাত মুখুজ্যের নবীন সন্ন্যাসী, চারু বাঁড়ুজ্যের ছোট গল্প, ঘণ্টাখানেক মনোহরণ করে রাখে নিভাননীর। সম্পাদকের বিবিধ প্রসঙ্গে রস পান না, তাই উলটে যান। কিন্তু তাতে যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়, তার প্রত্যেকটিই ওঁর মতের অনুকূল। তবে নিজের মনের কথা আর একজন গুছিয়ে বলছে শোনবার ধৈর্য থাকে না। এসব ত নিজেই ভেবেছেন, নিজেই বলতে পারেন।

শিবু চৌধুরী হাঁসের রোষ্ট খাবেন, তবে মুসলমানের ছোঁওয়া খাবেন না। রেঁধেছে রহমৎ, সদরে কাছারী ঘরের পেছনে পাটশোলার আগুনে। তাকে সাত্ত্বিক করতে হবে। জনকয়েকের মতো রান্না পাখী নিয়ে আসেন নিভাননী, পেতলের ডেক্‌চিতে ঢেঁকিঘরের বাইরে উঠোনে খোঁড়া উনুনে দু'হাতা গাওয়া ঘী ঢেলে মরা আঁচে বসিয়ে রাখেন। সুঘ্রাণে বাড়ী ভরে যায়। সাদা ভাত। মেজবৌ এখনো বসান নি, ছোট্‌ঠাকুরপো'রা এলে গনগনে বাঁশের জ্বালে বসিয়ে দেবেন, দশ পনের মিনিটে হয়ে যাবে। ঐ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ঝুল-কালিপড়া অন্ধকার হারিকেন নিয়ে লাঠি কাঁধে নিধি চৌকীদার আসছে। পেছনে চৌধুরী, হৃষিকেশ, কনখল আর রায়বাড়ীর বিশু—ও কনখলের সমবয়সী। নিভাননী কপটতাকে উপেক্ষা করতে শিখেছেন—রহমতের রসুই নিজের বলে গেঁয়ো গোঁড়াকে খাওয়াবেন তাতে একটুও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছেন না। দুদিনেই মালুম করে নিয়েছেন, এ সব গাঁ দেশে সব চলে, খালি মুখপাত দোরস্ত্‌ রাখতে হয়।

হৈ হৈ করে দল এসে পড়ে। কাছারী বাড়ীতে ফরাসে বসেন কর্তারা, ছেলে দুটো ভিতর বাড়ীতে যায়। নিভাননী শোলার উনুনে বাঁশের চোঙে ফুঁ দিচ্ছেন, চিক্‌মিক করে আঁচ উঠ্‌ছে আর পড়ছে। বলেন, গা হাত পা ধুয়ে আয়। ওটা কেরে? জয়ার ছেলে বিশু না? আয় বাবা আয়। বিন্দি ঝিটা গেল কোথা? যা যা, বাইরে সদরে বালতি ঘটি গামছা তোয়ালে দিয়ে আয়। ছোট কর্তার চটি নিয়ে যাস্‌।

মেজ বৌ ডেকে বলেন,—ভাত চড়ালাম রে ছোট বৌ—দেখতে দেখতে হয়ে যাবে। তুই মাংসের ডেগ্‌ নামিয়ে ওদের জায়গাগুলো করে রাখ। নিভা বলেন সেকি আর করে রাখিনি,

বিশ্ব আসবে জানতাম না, আর একটা পিঁড়ি দিচ্ছি। বড়দির তহবিল থেকে কিছু তেঁতুল-কাশন বের করে রেখো মেজদি। তোমার ছোট্‌ঠাকুরের লালচের অন্ত নেই। কতো যে খেতে পারে মানুষ। মেজবৌ বলেন, জিভ সামাল দে নিভা, কি খাওয়া ওর দেখলি তুই! প্রাণভরে দশদিন সবরকম ভালোমন্দ করে খাওয়াতেই পারলাম না! চাক্‌রী আর বিদেশ, কি যে খায়, কি যে করে, বুঝিও না, জানিও না।

নিভাননী আলগোছে মুচকি হেসে কাজে মন দেন।

আহার পর্ব সুরু হয়। পরিবেশন মুখ্যত করেন মেজবৌ। কেবল মাংসের হাঁড়ি নিয়ে নিভা বসে থাকেন। বাগ্‌চি ও চৌধুরীর পাতে দুটি করে আস্ত পাখী ছেলেদের দুজনাকে একটা করে, দিয়ে নিভাননী কনখলকে বলেন,—কেটে দেব? কনখল বলে, খুব নরম হয়ে গেছে মা, হাত দিয়ে পারব।

শিবু চৌধুরী দুটি পুরন্ত হাঁস সাবাড় করে বলেন,—অমৃত। বলেই লুব্ধ দৃষ্টিতে ঢাক্‌নী চাপা ডেক্‌চির দিকে তাকান। আরো দুটো পাখী তুলে দেন তাঁর পাতে নিভাননী। তিনি হাঁ হাঁ করে ওঠেন, আরো করো কি বৌমা। একটা একটা, অতো কি মানুষ খেতে পারে। কিন্তু যথারীতি ও দুটিরও হাড় কখানি পড়ে থাকে। তৃপ্তির উদ্গার তোলেন শিবু চৌধুরী। হবিষ্যিঘরের কাউনেবীজের পায়েস দিয়ে ভূরিভোজন সমাধা হয়।

মুখ ধুয়ে পানের বিরদানী হাতে সদরে যেতে যেতে চৌধুরী বলেন,—ধন্য রান্নার হাত তোমার বৌমা। নবমীর দিন ভেড়া বলি আছে। খানিকটা সরিয়ে রাখব—এমনি মোগলাই করে আলাদা রেঁধো। এসব দেবভোগ্য খাদ্য, আমরা কল্পনায়ও আনতে পারিনে। কি বলো হে হৃষিকেশ?

হৃষিকেশ বলেন না কিছুই, কিন্তু ঘোঁৎ ঘাঁৎ শব্দ করে সম্মতিই জানান মনে হয়। শিবু চৌধুরী বিশুর হাত ধরে বাড়ীমুখো রওনা হন। কনখল পশ্চিমদুয়ারী ঘরে শুতে যায়। হৃষিকেশ বর্মাচুরুট ধরিয়ে পায়চারী করেন। নিভাননী তোলা জলে স্নান করে ছাপাছন্দ হয়ে মেজবৌয়ের সাথে রান্নাঘরে খেতে যান।

সুষুপ্তির পরিবেশ নামে গেরস্তালি ঘিরে।

সত্যিই কি সুপ্তি? রাত্রির একটা মুখর জীবন আছে। রাত কথা কয়। কিছুটা হাওয়ার হুহুশ্বাসে, কিছুটা রাত্রেয়দের বাচনিক প্রকাশে, কিছুটা রাত্রিশেষের প্রথম অরুণোদয়ের ইঙ্গিতে। কনখল বিছানা ছেড়ে খোলা উঠোনে এসে বসে পড়ে, সেই একরাতে আয়েষার আকর্ষণে যেমন ডুবে মরতে গিয়েছিল। কিন্তু আজকের আকর্ষণ যেন বিশ্ব-প্রকৃতির। চোরাবালি থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা, গ্রামীন পরিবেশের অনেক কিছু জানা, মা-বাবা থেকে ধীরে ধীরে দূরে দূরে সরে যাওয়া, ওর ব্যক্তিত্ববোধকে উদ্বুদ্ধ করে। এগারো বারো বছরের কনখল আজ মনোহরের মতো সাঁই জোয়ান হয়ে যেতে চায়। চায় আকাশ পাতাল পৃথিবীকে কাগজি লেবুর মতো টিপে রস করে খেয়ে ফেলতে। বুকের দুরাশা। সমস্ত সত্ত্বায়, আশ্চর্য একটি মুখ, এক জোড়া চোখ, সম্মোহন আনে ওর মনে। দাফিয়ে ওঠে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে। ঠোঁট ফেটে বাক্য ফোটে না, কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রশান্ত প্রশ্বস্তি ওকে স্বপ্নে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ও যাবে, যাবে, ফিরে যাবে,—সেই শাহ্‌জলালের দরগায়, সেই দেবমূর্তি ইমাম সাহেবের কোলে, সেই অগণন কবুতর কবলিত মিনারের তলায়, সেখানে শান্তি, সেখানে তৃপ্তি, সেখানে আনন্দ। জীবনদেবতা বোধ করি একটি মানুষের মধ্যে রূপায়িত হয়ে দেখা দেন, তা না হলে রক্তমাংসের মানুষ তাঁর নাগাল পাবে কেন।

কনখলের স্বপ্নস্তিমিত চোখে, মনে, বুকে হাজি সাহেবের বলা একটি গল্প রূপ নেয়। ভারত মহাসাগরের এক দ্বীপে কোনো এক রাজকুমারীর কোলে এক ছেলে এসেছিল। রাজকুমারী তাকে ভাসিয়ে দেন ভেলায়। সেই ছেলে আর এক দ্বীপে এসে পৌঁছল। সে দ্বীপে মানুষ নেই। এক হরিণী তাকে ডাঙায় তুলে ছেলের মতো মানুষ করলো। সদ্যোজাতের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা আকিঞ্চন হরিণী-মা মেটালো। জীব, জন্তু, গাছ, পালা এই সব সে দ্বীপের বাসিন্দা। ব্যতিক্রম রাজকুমারীর নন্দন। শিখ্‌লো পশুদের আত্মরক্ষার সহজাত সহবৎ। হিংস্রদের হাত থেকে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়, কি করে আহার সংগ্রহ করতে হয়, কি করে উল্লাস উল্লম্ফনে জীবন যাপন করতে হয়। হরিণী-মা সব সময়ে সাহচর্য দেন। যেন হাতে কলমে জীবন যাপন শেখান। বিশাল সূর্যকে ঘিরে বিশালতর আকাশ, কুমারের চন্দ্রাতপ। সমস্ত দ্বীপ তার শয্যা ও ক্রীড়াঙ্গন। অগাধ সমুদ্র তার কেলিভূমি। কিন্তু হরিণী-মা মরে গেল একদিন। মরণ কি কুমার জানতো না। শুধু অভিভাবকত্ব ঘুচে গেল, এই বোধ জাগলো মনে। সাথে সাথে সাবালক মনে হোলো নিজেকে।

মানুষের বাচ্চার সাথে জীবজন্তুর প্রভেদ ধীরে ধীরে স্ফুট হয়। গাছের শেকড় পাতা দিয়ে কটিবাস তৈরী করে কুমার। বড়ো গাছের বাকল গায়ে জড়িয়ে শীতাতপ নিবারণ করে। কিন্তু না, এ ত যথেষ্ট নয়। তার হরিণী-মায়ের মতো অনেক পশুপক্ষী মরে পড়ে থাকে এখানে সেখানে। তাদের বৃহত্তর জানোয়ার এসে খেয়ে ফেলে। কেবল মাত্র ঈগল পাখীর দেহের দিকে কেউ যায় না। অনেক পালক, অনেক রোম। কুমার তাই খুলে নিয়ে নিজের দেহবাস বানাতে লাগলো। আপাদমস্তক ঈগলের পালক আর রোমে নিজেকে ভূষিত করলো কুমার।

কী ভয়াবহ চেহারা হোলো তার। অন্য বন্য জীবজন্তু ভয় পেতে লাগলো। শীতে শরীর উত্তপ্ত থাক্‌লো, নগ্নতা নিবারণ হোলো।

আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর কুমার ভাবতে লাগলো, কেন হরিণী-মা মরে গেলো। কাল যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বনবাদাড় উদাল করে ঘুরেছে, আজ কেন সে স্থির হয়ে পড়ে আছে। ছুরীর মতো বাঁশের চাঁচ, তীক্ষ্মফলা পাথরের টুক্‌রো, এইসব দিয়ে সে পালিকা মাকে কেটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলো। শরীরের সব যন্ত্রের শেষে এসে পৌঁছলো বুকের বাঁ দিকে ধুক্‌ধুকি একটুক্‌রো রক্তপিণ্ডের ওপর। সেটাও স্পন্দ শেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। এইবার হরিণী-মা একেবারে নিথর হয়ে গেলো। কুমার অনেকক্ষণ ভাবলো, তারপর হরিণীকে নিয়ে কবর দিয়ে এলো।

আদিম প্রকৃতির নিঃসঙ্গ রাজত্বে, সেই বন্যপশুপক্ষী অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ বনভূমে, আত্মরক্ষা, আত্মসংরক্ষণ, জীবনধারণ এইসব সহজাত সংস্কারের সাথে কুমারের মানসে প্রকৃতির দুলালদের বশ করবার অভিলাষ মূর্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগলো দিনের পর দিন। ক্ষুধাতাড়ন ভোজনোপযোগী মৎস্য মাংস আহরণ, পরিধেয় বস্ত্রহরণ, বাবুই পাখীর কুলায় নির্মাণ কৌশলদৃষ্টে স্বগৃহ নির্মাণ, বন্য অশ্ব বশ করে আরোহণোপযোগী করে নেওয়া—দিনের পর দিন কুমার এই সমস্ত জৈব প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা আয়ত্তে আনবার প্রয়াসে সফলকাম হোলো। মিট্‌লো জীবন ধারণের দৈনন্দিন দুশ্চিন্তার পালা।

পায়ের তলায় পৃথিবী ভোগ্যা হয়ে এলো, কিন্তু রাত্রিনিশীথে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুমার মনের মধ্যে অন্তহীন জিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়ে উঠতে লাগলো। এই আকাশ, এত তারা, চাঁদ, সূর্য—কিন্তু সবায়ের আবির্ভাব নিয়মতন্ত্রী। তাহলে কে এদের চালাচ্ছে?

একজন নিশ্চয় সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্রষ্টা। তিনি ছক্‌মাফিক চালাচ্ছেন। তিনিই একমাত্র সত্তা। তিনি অনন্ত। তিনিই অখণ্ড পরিপূর্ণতা। তিনিই সুন্দরতম। তিনিই শক্তি, তিনিই সার্থকতম প্রকাশ। তিনি তিনিই। তাঁর পায়ের নীচে সমস্ত স্বর্গমর্ত্য পাতাল অবনত। তিনি স্বয়ম্ভু।

স্বপ্নাচ্ছন্ন কনখল খোলা উঠোনে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। সকালে নিভাননী বেরিয়ে খোলা গায়ে ছেলে পড়ে আছে দেখে হায় হায় করে ওঠেন। ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে, কোলে তুলে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। আর্তনাদ করে ওঠেন,—মেজদি, বলে। দুই জা'য়ে ছেলেকে ঘরে ওঠান। আচ্ছন্নের মতো কনখল ঢলে পড়ে বিছানায়। সেদিন ওর অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুম ভাঙে না।

২০

পুজো এসে গিয়েছে। আজ সপ্তমী। কেশী মনোহরের বিয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নিভাননী হৃষিকেশ। ওরা দুজনেই আজ এ বাড়ীতে। মনোহরের ডিঙি বাবলা বনের তলায় জোলার মধ্যে বাঁধা। মনোহর বলির পাঁঠা ধোয়াতে গেছে, এলোকেশী ইয়া জগদ্দল পাটায় মশলা পিষ্‌ছে। বাড়ীতে পুজো, তবুও হৃষিকেশের পাড়া বেড়ানোর কামাই নেই। বাজনাদারেরা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বাজনা বাজিয়ে চলেছে, বাল্যভোগের বাজনা। হরনাথ ঠাকুর পূজারী, টিকিতে ফুল বাঁধা, খালি গা, উত্তরীয় জড়ানো, মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য এনে ভুল মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। আশে পাশের পাঁচখানা গাঁয়ের ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে পুজো মণ্ডপের সামনে। কে যে কি করছে, তার তদারক করবার লোকের অভাব। ভেতর বাড়ীতে তিন জা'য়ের ব্যস্ততার অন্ত নেই। হরনাথের হুঙ্কারে বড়বৌ ফাইফরমাস খাটছেন। মেজবৌ ভোগ রান্নার ঘরে, জোগানদারনী রায়বাড়ীর সর্বজায়া ঠাক্‌রুণ, বিশুর মা। ঢেঁকিঘর থেকে ঢেঁকি সরিয়ে দুটো উনোন পাতা হয়েছে, তাতেই বিরাটকায় কড়াই চাপানো, মাছ এখনো আসে নি, অন্যসব নিরামিষ উপাদান চড়ে গেছে।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সর্বজয়া ঠাক্‌রুণ যেন ঘূর্ণি লাটিম। এই ডালে কাঠি দিচ্ছেন, এই কচুর শাকে খোন্তা ঘোরাচ্ছেন। আর থেকে থেকে বলছেন,—মেজবৌ, যাওনা কেন, একটু মিছ্‌রীজল মুখে দিয়ে এসো। সেই ভোর রাতে উঠেছো, ধকল ত সমস্ত দিনমানই আছে, শরীরে সইবে কেন? মেজবৌ বলছেন—তোর শুক্‌না মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কোন প্রাণে জলগ্রহণ করি বল। সর্বজয়া বালবিধবা—নিরম্বু উপবাসিনী। কিন্তু মুখরা। বলেন, —আ মর। আমরা যমের অরুচি। তুমি সধবা, তুমি শুকিয়ে মরবে কেন।

নিভাননী, আরো দু একটি গিন্নীবান্নীর সাথে পেল্লায় বঁটি পেতে আনাজ কোটায় ব্যস্ত। তরিতরকারীর পাহাড় জমে উঠ্‌ছে পরাতের ওপর। কল কল করে কলকাকলীর অবধি নেই, কিন্তু গিন্নীদের হাত ধারালো বঁটির ওপর চলছে কলের মতো তাকে, একটুও বে-হিসেবী অঙ্গুলী চালনা নেই। এই সময়ে মাছ এসে পড়ল। পরাণ জেলের মাথায় চ্যাঙারী, উঠোনের মাঝখানটায় উপুড় করে ঢেলে দিল। সাত আট সেরী গুটি চারেক রুই, একটা প্রকাণ্ড বোয়াল, আর আধ মণ আন্দাজ টাটকিনি খরসোলা। মেজবৌ ঝামটা দিয়ে ওঠেন—তোর কি হুঁস পবন হবে না কোন দিন পরাণে? মাছ কোটা হয় ঐ জগডুমুরের তলায়, নামালি মাঝবাড়ীতে?

পরাণ একগাল হেসে বলে,—সবাই দেখুক মা, তার পর আমি আর মদ্‌না ঠিক জায়গায় মাছ নিয়ে পেঁাছে দেব। মদ্‌না পরাণ-জেলের ছেলে, বছর দশবারো বয়েস হবে। ছাতাপড়া দাঁত বের করে হেসে বলে,—হেঁ কর্তামা, সব ঠিক্ জায়গায় পেঁাছে দেব। মাছ দেখতে ভিড় হয়ে যায় গোল করে। একজন বলে,—বোয়ালটা একটা জ্যান্ত মানুষের সাইজ রে, মণখানেক হবে। আর একজন টিপ্পনী কাটে—রুইগুলো কি টক্‌টকে লাল রে, এখনো কান নড়ছে। মেজবৌ মাছ দেখে আহ্লাদিতা, নিভাকে ডেকে বলেন—ছোটবৌ, মাছ দেখে যা।

মৎস্য পর্ব শেষে আবার গতানুগতিক কর্মব্যস্ততা বাড়ীটাকে ব্যাপৃত করে রাখে। বিশু আর কনখল এ পাড়া ও পাড়া টহলদারি করে ফিরে আসে। কনখল সোজা এলোকেশীর সামনে গিয়ে সিঁথেয় দগ্‌দগে সিঁদুর দেখিয়ে বলে, মাকালী সেজেছিস্ কেন কেশীদি? এলোকেশীর মুখে কটুকাটব্য ফুট্‌তে গিয়ে ধন্দ খেয়ে যায়—তোকে খাব বলে। সাম্‌লে নিয়ে বলে, আমি কালো, তাই বলছিস ত? কনখল বলে,—না না, অতো সিঁদুর লেপেছিস কেন কপালে? এলোকেশী ফিক করে হেসে বলে,—মাকে জিজ্ঞেস কর। কনখল দাঁড়ায় না। কিন্তু হাত ধরে ভোগরান্নার জায়গায় উঁকি দেয়, সর্বজয়াকে দেখিয়ে বলে—তোর মা'ই যেন দুর্গাপ্রতিমা, মুখে কেমন জ্যোতি দেখেছিস্। সর্বজয়ার মুখে আশীর্বাণীর প্রলেপ পড়ে। বলেন,—তোরা দুটিতে কিছু খেয়ে নেত এইবার। মধ্যাহ্ন ভোগের ঢের দেরী। মেজবৌ উঠে আসেন। দু' ছেলের হাত ধরে হবিষ্যি ঘরের সামনে বসিয়ে দেন। খিচুড়ি, ভাজা, একটা ঘণ্ট তরকারী, পেট ভরে খেয়ে নেয় ওরা। খাওয়া শেষ হলেই আবার বেপাত্তা হয়ে যায় একাধিক পুজোবাড়ীর আঙিনায়। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে দিন। পুজোর সমস্ত আঙ্গিক একটার পর একটা সুষ্ঠু ভাবে সংঘটিত হয়ে চলে। বলির সময় লুকিয়ে থাকে কনখল। বন্দুক দিয়ে পাখী মারতে যে নির্মম, হাড়িকাঠে ফেলা হাত পা বাঁধা অসহায় ছাগশিশু বধে তারই মনে আর্তনাদ জাগে। বলে, এ অন্যায়, এ ভালো না। বলির বাজনা থামলে স্বপ্নাবিষ্টের মতো চোখ মুছে ওঠে। চোখের কোণের জলের ধারা মোছে। আড়াল থেকে একজন ওর কীর্তিকলাপ দেখছেন, দেখতে পায় না কনখল। নিভাননী আঁচলে চোখ মুছে নিঃশব্দে সরে যান।

রাত্তিরে বড় বাড়ীতে যাত্রা। পালা সেই চিরন্তন রাধাকৃষ্ণের। নাম বুঝি 'চতুরালী'। আয়ান ঘোষের গাঁক্ গাঁক্ গর্জন, জটিলা কুটিলার অপদস্থ হওয়া, কেষ্টর কালী হয়ে যাওয়া, ফুটো কলসীতে রাধার জলভরা—দেখে দেখে আশ মেটে না কনখলের। কানে হাত দিয়ে একটানা সুরের গানগুলো মোহিত করে ওকে।

'ওদের বাড়ী আর যাব না,
ক্ষীর সর ছানা, নবনী আমি
চুরী করে আর খাব না—'

যশোদার কপট গঞ্জনা বুঝতে পারে কনখল। সুবলটা দেখতে অনেকটা বিশুর মতো। নিজেকে দেখতে পায় না, কিন্তু কেন যেন মনে হয় কেষ্টর সাথে কিছুটা মিল আছে ওর। কেষ্টর অলৌকিক কার্যকলাপ সব যেন করতে পারে, এমনি মনে হয় ওর। যাত্রা ভাঙ্‌লে মা'র হাত ধরে বাড়ী ফেরে। চেনা জগতে পা পড়ে না, যাত্রার জগৎ দখল করে থাকে মনপ্রাণ। বুকে গুণ্‌গুণ্ করে গান ঠেলে ঠেলে ওঠে। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে খামখাই। নিভাননীর হাতে ঝাঁকি দিয়ে বলে,—খুব ভালো যাত্রা, না, মা? নিভাননী ছেলের পাগলামীতে অভ্যস্ত, বলেন—ভালোই ত।

পুজোর কটা দিন বেশ কাটে। নবমীর দিন শিবু চৌধুরীর বাড়ীর বলির ভেড়ার খানিকটা চালান হয়ে আসে বাগচি বাড়ীতে। যথারীতি রহমৎ কোর্মা বানিয়ে ডেক্‌চি চালান দেয় নিভাননীর কাছে। উনি আবার দই ঘী দিয়ে আর একবার ফুটিয়ে বসে খাওয়ান সবাইকে। রান্নার তারিফ পড়ে যায়। নবমীর রাত শেষে বিজয়ার ভোরে সানাইয়ে করুণ তান ওঠে। 'নবমীর নিশি তুমি আজ আর পোহায়ো না, তুমি গেলে উমা আমার চলে যাবে, আর আসিবে না'। বিষাদের সুর। প্রত্যুষে চোখ মেলে কনখলের মন উদাস হয়ে যায়।

মেয়ে বৎসরান্তে বাপের বাড়ী এসেছিল, আজ ফিরবে শ্বশুর ঘরে। আবার একটি বছর অদর্শন। মেয়ের মায়ের বিলাপ ঐ রাগিণীতে বেদনা ঝরায়। এ সব "কথা ও কাহিনী" বই পড়ে আর শাস্তর শুনে কনখলের জানা হয়ে গেছে। তাই মেনকার দুঃখে ওরও মন কাঁদে।

কিন্তু না। হৈ হুল্লোড়ের ব্যাপার আছে—ভাসান ও বিসর্জন। নদীতে যাওয়া হবে বিকেলে। নতুন কাপড় পরতে হবে। বিসর্জন অন্তে প্রণাম কোলাকুলির ধুম পড়ে যাবে। এ বাড়ী ও বাড়ী মিষ্টিমুখ, অনেক রাত হবে সারতে সারতে। পুঙখানুপুঙখ নির্দেশ দিয়ে রাখেন নিভাননী।

প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে যায় আগবেলায়। গোটা তিনেকের সময় সোরগোল করে নামানো হয় উঠোনে। ছেলেমেয়েরা ডাকের সাজের সাড়ীর আঁচল, শোলার গয়না সংগ্রহ করে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীর গা থেকে। কার্তিকের হাতের তীর ধনুক কনখল খুলে নেয়। গণেশের কলা বৌ হুমড়ী খেয়ে পড়ে পড়ে, হরনাথ ঠাকুর টিকি নেড়ে সামাল সামাল করেন। আটজোয়ানের স্কন্ধবাহিনী হয়ে মা দুর্গা সপরিবারে নৌকাভিমুখীন হন, বাড়ীতে মা জ্যেঠিরা ঘন ঘন শাঁখ বাজান, খই ছেটান, যারা নৌকোয় যাবে তারা বীরদর্পে এগোয়, যারা যাবে না তারা খালি মণ্ডপে মাথা ঠোকে।

বড় গাঙে এসে বিরাট জোড়া নৌকোর সন্ধিস্থলে প্রতিমা বসানো হয়। ঢাকি, ঢুলি, করতালবাদকেরা মৌহ করে বসে কান কালা করা বাজনা বাজায়। কর্তারা শশব্যস্ত হয়ে বিপদ-আপদের তদারক করেন। আসেটিলিন গ্যাসবাতির আট দশটা ডাণ্ডা তৈরী করে রাখা আছে, সূর্যাস্তের পর জ্বলবে। ছেলেমেয়েরা থেকে থেকে ধমক খায় নৌকোর কানাচে ভিড় করবার জন্য, মাঝখানে এসে বসতে হয়। এইবার নৌকো ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘণ্টাখানেক পার থেকে মাঝনদী, এক ফেরতা, দু' ফেরতা পরিক্রমা করতেই সন্ধে ঘনিয়ে আসে। ঠিক মাঝ গাঙে নয়, অথচ জল গভীর, এমন জায়গায় নৌকো থামে। তারপর জোড় খুলে দিয়ে দু' নৌকো দু'ধারে হটতে থাকে। ঢাক ঢোল করতাল উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রতিমা বিরাট শব্দ তুলে তলিয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে নদীর জল এ ওর গায়ে ছেটায়। গ্যাস্‌বাতি জ্বলে ওঠে। কোনো সৌখীন কর্তার নাও থেকে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান সুরু হয়। তারপর, ধীরে ধীরে বাড়ীমুখো। কড়া কড়া নির্দেশ আসে, যে যার বাড়ী গিয়ে আগে মণ্ডপ প্রণাম করবি, তারপর প্রণাম কোলাকুলি।

প্রণাম কোলাকুলি সুরু হতে আশপাশের গাঁ অবধি গতায়াত চলে। মাইলখানেক দূরে উত্তরের গাঁয়ে খুব ডামাডোল, একটি যুবককে কেন্দ্র করে। চক্রবর্তী বাড়ীর নরেশ। আঠারো বচ্ছর বয়সে আন্দামান হয়েছিল কোন লাটের গাড়ীতে বোমা ফেলার সন্দেহে, বারো বচ্ছর কারাবাসের পর সচ্চরিত্র মেয়াদী বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে

করোনেশনের বছর বলে। কনখল আগামী ডিসেম্বরে দিল্লী দরবার হবে জানে, পঞ্চম জর্জ কুইন মেরী আসবেন শুনেছে। বিশুতে ওতে নরেশকে দূরে থেকে দেখে আসে। রোগা-পটকা বিশ্রী চেহারা, কিন্তু সবাই মিলে তাকে নিয়ে কি যে করছে। কেউ বলছে দাদা, কেউ কাকা, কেউ বা তুই তোকারি করছে, কিন্তু ভাবখানা একই। নরেশ যেন মস্ত বীর, হয়ত একটা রাজ্য জয় বা করে এসেছে। বিশু কনখল গাঁয়ে ফেরে। কনখল রাত্রে মাকে বলে, আচ্ছা মা, চক্রবর্তী বাড়ীর নরেশ কি খুব বীর?

নিভাননী নরেশের পূর্বাতিহাস হৃষিকেশের কাছে সব শুনেছেন। বলেন,—কেন রে, তাকে দেখে এলি বুঝি? শুনেছিলুম ছাড়া পাবে।

--হ্যাঁ মা, ছাড়া পেয়েছেন ত বটেই, কিন্তু কথাবার্তা শুনে ভালো লাগ্‌ল না। পরেশদার মতো নয়।

—এরা সব অন্য দলের। পরেশরা অন্য দলের। এরা ধর্মাধর্ম মানে না। পরেশদের সেবাব্রতই মূল লক্ষ্য। ওরা সব স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য কিনা। নরেশরা ভালো লোক নয়, ওদের সাথে যেন ভাব করতে যাস্‌ নে।

কনখল বুঝ্‌তে চায় কেন একটি লোক বহুজনের আকর্ষণের মধ্যমণি হবে যদি তার ভেতরে লোকত্তর গুণ কিছু না থাকে। মায়ের কথায় সন্তুষ্ট হয় না। শুতে যায়। ঐ বয়সে কনখলের মনে অনেক কথা বলা, অনেক কথা জিজ্ঞেস করা, অনেক ভাবের আদান-প্রদানের সংকল্প জাগে, কিন্তু ভাষায় কুলোয় না। কে ওকে সব ভাষা শেখাবে? ভাষা না হলে ভাব প্রকাশ করা যায় না, ফুঁসে ফুঁসে ওঠে ওর চিত্তচাঞ্চল্য, কিন্তু বৃথা, সব বৃথা। রাত্রির স্বপ্নে না বলা কথার তুবড়ি ছোটানো যায়, কিন্তু দিনে? দিনে ওর ঠোঁটে লাগসই কথাগুলো কে জুগিয়ে দেবে? ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। ভেসে ওঠে মানসে ইমাম সাহেবের সৌম্য মূর্তি। তিনি যেন হাত বুলিয়ে ওর মনের চোখ খুলে দিচ্ছেন, ঠোঁটে ভাষা দিচ্ছেন, কি জাদু আছে তাঁর ধ্যানে, এ সব সমস্যা সমাধানের আগেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরের দিন এসে পড়ে। আজ কনখলেরা শিলেট ফিরবে। রহমৎ বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে ষ্টীমার ঘাটে গিয়ে বসে আছে সকাল থেকে। কেশীদি মনোহর গোয়ালন্দে গিয়ে অপেক্ষা করছে। ষ্টীমার ছাড়বে নটায়। ফেণা ভাত খাইয়ে চোখের জলে ভেসে বড়বৌ মেজবৌ দেওর ভাজকে বিদায় দেন। শিবু চৌধুরী বাগ্‌চিকে সহোদরের চেয়েও ভালো বাসেন। দুজনে অশ্রুসজল আপ্যায়নে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে চান। কনখল বিশুর মা সর্বজয়াকে প্রণাম করে আসে। বিশু ষ্টেশনে যাবে। কনখল কানে কানে বলে, উঁচু ক্লাসে উঠি, এক সাথে পড়ব একদিন, কি বলিস? বিশু ফুঁপিয়ে সম্মতি জানায়।

ঘাট থেকে ষ্টীমার ছাড়ল। সেই চেনা শব্দ, সেই সোরগোল, সেই পার থেকে রুমাল নাড়া—কনখল রহমতের হাত ধরে দোতলার ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে সব দেখে। ফিরে যায় যখন, তখন বাগ্‌চি আর গাঁইয়া নেই। পুরোদস্তুর সাহেব। মা আবার মেমসাহেব। রহমৎ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

দু' ঘণ্টায় গোয়ালন্দ পেঁৗছে যায় ষ্টীমার। আর একবার নামবার পালা, চাটগাঁর বিরাট ডাকজাহাজে ওঠবার পালা। কিন্তু ডাকজাহাজ ছাড়তে প্রায় দু' ঘণ্টা দেরী। ঘাট থেকে দুটি প্রাণী যে হা প্রত্যাশে জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে, প্রথম নজরে পড়ে

নিভাননীর। চেঁচিয়ে উঠেন তিনি, ওগো ওই দেখ, কেশী আর মনোহর। ডাকো না ওদের।

হৃষিকেশ বলেন—তার চেয়ে চলো আমরাই নামি। এখনো কলকাতার গাড়ী আসেনি, ঢের সময় আছে।

রহমৎ খবরদারীতে থাকে, মা, বাবা, কনখল নেমে আসে ঘাটে। এলোকেশী কনখলকে কোলে নিয়ে বলে,—চল্, আমাদের বাড়ী দেখ্‌বি চল্। মনোহর বোকার মতো দাঁত বের করে হাসে। কথা বলতে পারে না।

ষ্টীমার ঘাট থেকে এক রশি দূরে দুটি নৌকো বাঁধা। একটা দুই কামরার ছইঅলা নৌকো, আর একটা ইলিশ মাছের জাল সমেত জেলেডিঙি। বসবাস করবার নৌকোর ব্যবস্থা চমৎকার। শোবার ঘর, রান্নাঘর, সব সুন্দর। নিভাননী বলেন,—খাসা বাড়ী হয়েছে ত কেশী।

—দু'জন দাঁড়ি রাখতে হয়েছে মা। একজন ওকে নিয়ে মাছ ধরতে বেরোয়, আর একজন ঘাটের নৌকোয় পাহারা থাকে।

—টাকা কড়ি কি করলি?

—বাবা ত ব্যবস্থা করেই দিয়েছেন। রাজবাড়ীর ডাক ঘরে জমা আছে।

—তোদের ভালো হোক। দ্যাখ্, তোর বাবা হয়তো এইখানেই বদ্‌লী হয়ে আস্‌তে পারেন।

খুশীতে উপ্‌ছে পড়ে এলোকেশীর চোখ মুখ। তারপর হঠাৎ মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে,—ওরে বাঁদর, হাড় গিলে—নোন্তা ইলিশের হাঁড়ি?

মনোহর থত মত খেয়ে বড় নৌকোয় ঢুকে এক বিরাট হাঁড়ি বার করে নিয়ে আসে। এলোকেশী বলে, মা গো,—গোটা আষ্টেক বড় ইলিশ নুনজারা করে দিয়ে দিয়েছি। দুদিনের রাস্তা অনায়াসে চলে যাবে। হৃষিকেশ হৃষ্টচিত্তে বলেন, ফাইন। নিভাননী এলোকেশীর কানে কানে বলেন,—তোর বাবাটি বড় লোভী রে, হয়ত জাহাজে উঠেই বলবেন ইলিশ মাছ ভাজা আনো। আর ঐ যে তোর বুড়ো চাচা, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমারের বাবুর্চি-খানা থেকে ভাজিয়ে আনবে। তা ভালোই করেছিস। এ ইলিশ 'ত শিলেটে কেউ দেখতেই পায় না।

অনেক প্রণাম, অনেক আশীর্বাদ, অনেক চোখের জল। বাগচিরা জাহাজে ফিরে আসেন। ঘাট পারে দাঁড়িয়ে থাকে মনোহর এলোকেশী। কলকাতার মেলগাড়ী এসে গেছে। জাহাজও পুরো দমে থর থর করে কাঁপে। যাত্রী ওঠার পালা শেষ হয়ে যায়। সিঁড়ির পাটাতন খালাসীরা হেঁইও হেঁইও করে ওঠায়। মোটা শিকলের কড় কড় শব্দ, জলদ গম্ভীর সুরে জাহাজের শিঙা, তারপর বয়লারের বাষ্প নিকাশের সাথে জাহাজ ছাড়ে। ডাঙায় এলোকেশী ফুঁপিয়ে কাঁদে, জাহাজে নিভাননী চোখ মোছেন।

২১

শিলেটে পেঁৗছে কনখলের প্রথম কাজ হয় কাঞ্চনের তদবির। এতদিনের অনুপস্থিত বন্ধুর প্রতি অভিমান করে থাকে কাঞ্চন। অনেক ঘাড় দলাইমলাইয়ের পর আড় চোখে তাকায়, তারপর ল্যাজ দুলিয়ে চিঁ হিঁ হিঁ শব্দ করে। ভাব হয়ে যায় সাথে সাথে। মাকে

গিয়ে বলে,—আমি দরগায় ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে আসব মা?

—যা না। কিসে যাবি?

—কেন, কাঞ্চন।

—আচ্ছা যা। আর দেখ্, ফেরবার পথে আয়েষাদের বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে আসিস।

—আস্তে বলব?

—না, থাক। শুধু আমরা ফিরেছি, খবর দিয়ে আসিস।

সকৌতুকে তাকান ছেলের দিকে নিভাননী। কিন্তু তাজ্জব বনে যান লক্ষ্য করে যে কনখলের আয়েষার নামে কোনো ভাব বৈলক্ষণ্য হয় না। সে উস্খুস করে ছুট্তে, তার ঊর্ধ্বনেত্রে অপার্থিব অঞ্জন লেগেছে। এটা তো কোনো মানুষী আকর্ষণ নয়। হঠাৎ ভয় পেয়ে যান নিভাননী। বলতে চান, ওরে থাম থাম—কিন্তু বলবার আগেই টগ্‌বগ্ করে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যায় কনখল। নিভাননী ঘর দোর গোছগাছে মন দেন। ব্যাঙা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে আঙিনায়, সব আদর ঢেলে দিতে চান তার ওপর। ব্যাঙা কেঁদে ফেলে। বলে,—বাবা মরে গেছে।

—কি হয়েছিল রে?

—কালো জলের জ্বর না কি, আমি ত বলতে পারব না মা। তবে উকীল হরেনবাবু হাঁসপাতালে ভর্তি করেছিলেন, উনি সব জানেন।

—তোদের চল্‌ছে কি করে? খাস-দাস কোথায়?

—কনাবাবার নতুন মাসী আমাদের সব ভার নিয়েছেন। আমি ত হারুণের সাথে এই বাড়ীতেই খাই। মা এখন নতুন মাসীর বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে।

কথা শেষ হবার আগেই ঊষা এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। নিভা ঊষার থুত্নী ধরে চুমো খেয়ে বলেন,—কি লো, খবর সব ভালো ত? ঊষা ম্লান হাসি হাসে। নিভা বলেন,—চল ঘরে যাই। ব্যাঙা, তুই হরেনবাবুর বাসায় একটা খোঁজ দে ত যে আমরা এসেছি। ব্যাঙা চলে যেতে বলেন,—ওদিকের খবর কি সব?

ঊষার কাছ থেকে যে খবর সংগ্রহ করেন, তা মোটামুটি হোলো যে প্যারীবাবু পক্ষাঘাত হয়ে শয্যাশায়ী। কলকাতার ব্যারিষ্টার এসে সলা পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। ফায়ার মেরিনের এক পয়সাও পাওয়া যাবে না, তবে আগুন লাগানোর ফৌজদারী হয়ত ফেঁসে যাবে। তেমন জোর প্রমাণ নাকি হয়নি। ঊষা গিয়ে পরেশের মায়ের পায়ে একদিন পড়েছিল, মা পরেশকে ডাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, যাতে ঊষার সর্বনাশ না হয় গীতা সোসাইটি যেন দেখে। পরেশরা নির্দোষ প্রমাণ হয়ে গেছে। তারা আর প্যারী-বাবুর বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ আনতে চায়নি। অপরাধী অজ্ঞাত কেউ, এই সিদ্ধান্তই সাব্যস্ত হয়ে আছে। আর বিপিন কার্লাইলকে কারা যেন পুজোর ছুটিতে দেশে যাবার পথে বদরপুর জংশনে চলন্ত সুরমা মেল থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। প্রাণে মরে নি, তবে একটা পা আর একটা চোখ গেছে। এখন সেইটেই মামলা, আবার গীতাসোসাইটির ওপর হাম্‌লা হচ্ছে। বেলুড় থেকে কে একজন স্বামীজি এসেছেন, সমস্ত শহর ভিড় করছে সন্ধ্যেবেলায় তাঁর কথকতা শুনতে।

এক নিঃশ্বাসে এত খবর দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে ঊষা। বাইরে হরেন চাকীর হাঁড়ি চাঁছার মতো কর্কশ ডাক শোনা যায়—কই হে মিষ্টার,—বৌদি কোথায়,—আরে এই যে, তা একখান এক পয়সার সরকারী দূত পাঠাতে বাধা কি ছিল বৌদি, অন্তত একবেলা অধমের

আতিথ্য গ্রহণ করে ঘরদোর গোছাতে পারতেন।

হৃষিকেশ এসে হরেনবাবুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে যান। বলেন,—চলো হে, বসিগে চলো। ওরে হারুণ, বিদ্যাভূষণ ম'শায়কে সেলাম দে। ওগো শুনছ, কিছু চা' টা—

ঊষার দিকে তাকিয়ে কপট রোষে নিভাননী বলেন,—কি বেআক্কেলে লোক রে বাপু। ঘণ্টাদুয়েকও হয় নি,—চলত, ঠাকুর ত এসেছে, দেখি কি হয়।

লুচি আলুর দম করে চায়ের সাথে পাঠিয়ে দেন বাইরে বিদ্যাভূষণ মশায় আবার খাবার সময় জুতো ছাড়বেন। তাঁর বসবার এবং খাবার দুটি জলচৌকীই ধুয়ে মুছে বাইরে পাঠান। হাত মুখ ধোবার জল নিজে নিয়ে রেখে আসেন ঘোমটা টেনে। হাঁ হাঁ করে ওঠেন হরেনবাবু—আরে একি, একি, মানে—

হৃষিকেশ বলেন—থামো হে চাকী, এ হোলো সহবৎ। গোঁড়া বামুনের সহধর্মিণী, আচারনিষ্ঠ হিন্দু ঘরের বৌ, পুজোর পর আসছে গাঁয়ের বাড়ী থেকে। কি করতে হয় না হয়, বেশ জানেন উনি।

বিদ্যাভূষণ দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।—চিরায়ুষ্মতী হও মা, ধনে-পুত্রে সার্থক হও। ও হরেনটার কথায় কান দিও না। ওটা অতি ফিচেল। হরেনবাবু কপট রোষকষায়িত চোখে বলেন,—বটে ভট্চায, আচ্ছা, Fair presence, এখন কিছু বলছি না, তবে দেখে নিচ্ছি দাঁড়াও।

আড্ডা জমে ওঠে। ঊষা যা যা নিভাননীকে বলেছিলো, সে সবও আলোচনা হয়ে গেল। হৃষিকেশ বলেন,—বিপিনবাবুর ব্যাপারটা ত নতুন জটিলতার সৃষ্টি করল হরেন।

হরেনবাবু চট্ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।—জটিলতা? জটিলতা কোথায়? ও, হ্যাঁ, প্রাণে বেঁচে গেছে, তাই জটিলতা থেকে যাচ্ছে বটে। একেবারে সাবাড় হয়ে গেলে কেস্ সাফ্ হয়ে যেত। ফৌজদারী ব্যাপারে মোক্ষম প্রমাণ ছাড়া কাকে দায়ী করবে বাপু অপরাধী বলে? পুলিশ সন্দেহ করছে পরেশদের গ্রুপকে, কিন্তু ওদের একজনও শহর ছাড়ে নি ঘটনার দিন। অ্যাক্সিডেন্টটা হোলো বদরপুর জংশনে—এটা পিওর অ্যাক্সিডেণ্ট হতে বাধা কি? আর কার্লাইল যে গেঁজেল, সে ত ওর চেহারায়ই মালুম। ছোট কল্কেয় বড় তামাক ডবল ফুঁকে পড়ে যায়নি, তার প্রমাণ?

বিদ্যাভূষণ মশায় বলেন,—হরেন, লোকের চরিত্রে মসীলেপন তোমার বড় বদভ্যাস। আইন আদালত হচ্ছে, সেখানেই যা হবার ধার্য হয়ে থাক্ না কেন। মনে মনে এ যুক্তির সমর্থন করেন হৃষিকেশ। কিন্তু মুখে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন। বলেন,—ওহে, প্যারী-বাবুর পক্ষাঘাত ত একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা।

মুখফোড় হরেন চাকী বলেন,—স্বকৃত।

বিদ্যাভূষণ এবার দুঃখিত হন। বলেন,—হরেন, শুনেছি জীবনের নতুন মা মর্মাহত হয়ে মরার বাড়া দিন যাপন করছেন। মনে হোলো যেন তিনি এই বাড়ীতেই আছেন। বেফাঁসে এ সব কথা তাঁর কানে গেলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো লাগবে।

যৌক্তিকতা বোঝবার মতো বুদ্ধির অভাব নেই হরেনবাবুর। মাথা নীচু করে থাকেন, জবাব দেন না। হৃষিকেশ প্রসঙ্গ বন্ধ করবার জন্য বলেন,—কনাটা আবার দেখলুম কাঞ্চন সওয়ারী হয়ে ছুটলো। কোথায় গেল এই অবেলায়—

ভেতর থেকে নিভাননী মৃদু কণ্ঠে বললেন—ইমাম সাহেবের কাছে। ডাক্তারের বাসায়ও খবর দিতে বলেছি।

বিদ্যাভূষণ মশায় বলেন—বুঝলে হে বাগচি, বুঝলে হরেন, ধর্ম মত যার যাই হোক, এই ইমাম সাহেবটির দেবাংশে জন্ম। এত মহৎ, এত উদার, এত ধর্মপ্রাণ লোক লাখে একজন মেলে কিনা সন্দেহ। আর পাণ্ডিত্য—অসাধারণ। সুফীধর্ম নিয়ে একদিন আলোচনার অবকাশ হয়েছিল, অবাক হয়ে গেলাম শুনে। উনি জালালউদ্দীনরুমীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সুফী সাধকদের মর্মবাণী বুঝিয়ে দিলেন। আরো অনেকের। সেদিন অভিভূত হয়ে ফিরেছি।

হৃষিকেশ আন্তরিক সমর্থনে ঘাড় নাড়েন।

এই সময়ে কনখল ফিরে আসে। ঘোড়া আস্তাবলে হারুণের জিম্মা করে লাফাতে লাফাতে মার কাছে যায়। গিয়ে বলে—ইমাম সাহেব খুব খুশী হয়েছেন মা। কত আশীর্বাদ করলেন, তোমার কথা, বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি চোরাবালিতে পড়ে যাওয়া, কি করে কেশীদি আমায় বাঁচালো, সব বললাম। শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাক্‌লেন। ফাসীতে মন্ত্রের মতো কি যেন বলে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

নিভাননী জিজ্ঞেস করেন,—জাফর ডাক্তারদের ওখানে যাস্‌নি?

—গিয়েছি ত। ওঁরা আসছেন। আর জানো মা, আয়েষার নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। নতুন ডাক্তার সাহেবের সাথে। বলতে বলতে কনখলের মুখ লজ্জারাঙা হয়ে ওঠে। নিভা বলেন,—আরে বিয়ের কনে আয়েষা, তুই অমন মুখ চোখ সিঁদুরে করছিস্‌ কেন? কোন জবাব না দিয়ে কনখল নিজের ঘর গুছোতে যায়।

ইতিমধ্যে জাফর ডাক্তারের গাড়ী কম্পাউণ্ডে ঢোকে। বোরখা ঢাকা দুটি নারী খিড়কি দিয়ে অন্দরে যান। জাফর বারান্দার আড্ডায় এসে বসেন। কুশল সম্ভাষণাদি শেষ হলে জাফর কথাটা তোলেন।—আরে বাগচি সাহেব, আয়েষা মাই-র বিয়ে প্রায় ঠিক্‌ হয়ে গেল যে। নতুন যে সিভিল সার্জন এসেছে লেঃ আব্বাস, তার সাথে। ঢাকার নবাব গুষ্টির সাথে কি যেন দূর সম্পর্ক আছে, চেহারাটিও ভালো।

বাগচি বলেন—কিন্তু বয়েসে বেমানান হয়ে যাবে না?

—হ্যাঁ,—তা—তবে সেটা এমন বেশী কিছু নয়। আয়েষা প্রায় পনেরয় পড়ছে, আর আব্বাস প্রায় চব্বিশ পঁচিশ। ওটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিয়ে হলেও আয়েষা কনভেণ্টে পড়বে, বলেছে ক্যাপটেন ডাক্তার সাহেব।

—তাহলে ত খুব উদার মতাবলম্বী হে জাফর।

—বিলেত ফেরৎ কিনা, চায় যে স্ত্রীও ইংরেজি জানা কেতাদুরস্ত মেয়ে হয়।

—আচ্ছা, এ বিয়ের যোগাযোগ ঘট্‌ল কি করে?

—সে এক মজার ব্যাপার। নতুন ডাক্তার সাহেব আমার হাসপাতাল ইন্‌স্‌পেক্‌সনে আসবেন। উনি যখন টিলায় উঠেছেন, মনে আছে তোমার পুরোনো বাংলার পিছে অনেক কটা ছোট বড় গাছ আছে? সেই যেখানে কনা আর আয়েষা হরিয়াল মেরেছিল? তারই একটা গাছে হ্যামক টাঙিয়ে আয়েষা দুলে দুলে বই পড়ছিল। শিক্ষিত সভ্য লোক—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো অভব্যতা করেন নি। হাসপাতালে তদারক শেষে যাবার সময় আমায় খালি জিজ্ঞেস করলেন যে দোলনায় বসে যে মেয়েটি বই পড়ছে, সে কে। আমি বললুম যে আমার একমাত্র সন্তান। তারপর থেকে ডাক্তার সাহেবের কাজে অকাজে আমার ওখানে আসা বেড়ে গেল। একদিন, বোধ হয় দিন দশেক পর, মুখ ফুটে নিজেই বিয়ের প্রস্তাব করলেন।

হৃষিকেশ মনে মনে ভাবেন, এ যে রীতিমত রোম্যান্স। আয়েষা মেয়ের মতো, তাই মুখে কিছু বলেন না।

হরেন চাকী ও বিদ্যাভূষণ প্রায় এক সাথেই বলেন,—এত সর্বাংশে যোগ্য বিয়ে। আয়েষার মতো অপূর্ব সুন্দরী ও সম্বংশের মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। আমরা বড়ো খুশী হয়েছি ডাক্তার জাফর।

ওদিকে বাড়ীর মধ্যেও খুঁটিনাটি আলাপচারী হয়। আয়েষা কনখলের ঘরে, কাজেই খোলাখুলিই নিভাননী বলেন,—হ্যাঁরে, এ ত প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ে বিয়ে। তার ওপর ঘর বর দুইই ভালো। রূপে গুণে আমার আয়েষার তুলনা নেই। তুই ভাগ্যবতী, কুলসম।

কনখলের ঘরে আয়েষা পড়ার চেয়ারে বসে। কনখল খাটের ওপর। এ ওর দিকে মাঝে মাঝে তাকায় আবার মুখ নীচু করে। কেউ কথা কয় না। মনে মনে কত কথার আদান প্রদান হয় অনুচ্চারিত ভাষায়, ওদের ভাবভংগী দেখলেই বোঝা যায়। এ বই সে বই নাড়ে আয়েষা, খানিক পর স্তব্ধতা ভেঙে যেন জোর করে সহজ হবার চেষ্টায় বলে—কিরে বাঁদর, ধন্দ ধরে গেলি কেন? ছুটি কাটিয়ে এলি দেশে, গল্পটল্প কর।

ড্যাবডেবে চোখে আয়েষার দিকে তাকিয়ে কনখল হাসে। করুণ সে হাসি। হঠাৎ কাঁধ ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যে আবেগ ঠেলে ঠেলে উঠ্‌ছিলো বুক থেকে গলা পর্যন্ত, ঝাঁকি দিয়ে দাবিয়ে দেয় তাকে। তারপর খুব সহজভাবে আয়েষার হাত ধরে বলে,—চল পুকুর পারে যাই। ছুটির অনেক গল্প আছে, সব বলি গে চল।

চোরাবালির গল্প শুনে আয়েষার গাম্ভীর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ঠিক আগেকার মতো ওকে বুকে বেঁধে, চুমো খেয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। ভালো লাগা আর ভালোবাসার বিভেদ রেখা বড় লাজুক, কখন কিসের ছোঁয়া লেগে সে রেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। দু'জনে গালে গাল ঠেকিয়ে জড়াজড়ি করে অনেকক্ষণ বসে থাকে। মায়ের ডাকে যখন উঠে আসে অপরিসীম তৃপ্তিতে দুজনেরই বুক ভরে থাকে।

[ক্রমশঃ]

নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লবযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

১৮৭১ সাল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মরাজের জয় হল কিন্তু ধর্মরাজ্যের পত্তন হল না। ইটালী ও জার্মানী রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করল, ইটালী ও ফ্রান্স স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হল, জয়ী হল জাতীয়তা ও গণতন্ত্র কিন্তু জনতার দুঃখমোচন হল না, জনতার অধিকার অর্জিত হল না। সামন্ততন্ত্রের দুর্গপ্রাকার ধূলিসাৎ করে চলে গেল বিপ্লবের ঝড়, তার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উঠল ধনতন্ত্রের সাতমহলা কুঠি, সমাজতন্ত্রের স্বপ্নসৌধ হতবাক্ সংগ্রামীর চোখের সামনে মিলিয়ে গেল।

বিধাতা এই নিষ্ঠুর তামাসাটি খেললেন যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে সেটি হল প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়। এর আশু পরিণাম প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম, ইটালীর রাষ্ট্রীয় একায়নের সমাপ্তি, ফ্রান্সে একনায়কত্বের অবসান। তৃতীয় নেপোলিয়নের জায়গায় রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র বসবে তা যখনো স্থির হয় নি, পারি যখন জার্মান সেনাদ্বারা বেষ্টিত ও ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন তখন সমাজবাদী, নৈরাজ্যবাদী ও উগ্র প্রজাতন্ত্রবাদীরা মিলে পারিতে এক স্বাধীন কমিউন বা শ্রমিকতন্ত্র স্থাপন করল। এরা অন্যান্য শহরগুলিকেও আহ্বান করল বুর্জোয়া শাসন উচ্ছেদ করে পারির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে। এর আগেই বাকুনিনের পরিচালনায় লিয়ঁতে কমিউন গঠিত হয়, মার্সাই, তুলু প্রভৃতি গুটিকয়েক শহরেও অনুরূপ বিপ্লব ঘটল কিন্তু একটিও টিকল না। অবশেষে বিজয়ী জার্মান সেনা অবরোধ তুলে নেবার পর ভার্সাই থেকে এল ফরাসী জাতীয় মহাসভার ফৌজ, পারি অবরুদ্ধ হল দ্বিতীয়বার। পারিকে বাঁচাবার সাধ্য ক্ষুদ্র বিপ্লবী সেনার ছিল না। ২৬শে মার্চ থেকে ২১শে মে (১৮৭১) পর্যন্ত দুমাসের মিয়াদের পর কমিউন বিধ্বস্ত হল, ভার্সাই সেনা নগরীতে প্রবেশ করল। গৃহযুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গে ডুবে গেল এই অভিনব গণবিপ্লব। ক্ষণজীবী পারি কমিউনের সাথে সাথে কমিউনিস্ট ও এনার্কিস্টদের আশা ভরসা বিলুপ্ত হল, ফ্রান্সে বহাল হল বুর্জোয়া গণতন্ত্র।

কুরুক্ষেত্রের রণপর্বের পর ব্যাসদেব লিখেছিলেন শান্তিপর্ব, শ্মশানের মহাশান্তি নিয়ে। উনিশ শতকের শেষ পাদে বিপ্লবপীড়িত ইয়োরোপের কপালেও শান্তি জুটেছিল, জার্মানীতে কাইজারতন্ত্রের আর রাশিয়ায় জারতন্ত্রের শান্তি। জার্মানীর সমরনায়কেরা গোটা জাতিকে দাস বানিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে আত্মহারা হল—ইয়োরোপের আকাশে এই ধূমকেতুর আবির্ভাব বাকুনিনের দৃষ্টি এড়ায় নি। রুশ সরকার সন্ত্রাসবাদের জবাবে বিপ্লবীদের নির্যাতন করে ক্ষান্ত হলেন না, সকল প্রকার স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধিকারবোধের মূলোচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলগুলিও নতুন রাস্তার নিশানা দিতে পারল না, তাদের নিস্তেজ বাক্সর্বস্ব প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মন সাড়া দিল না। কলকারখানার দৌলতে দেশে দেশে উৎপাদন বাড়ল, সম্পদ জমল কিন্তু কুলিমজুরের কপালে ধনিকের উচ্ছিষ্টও জুটল না। বিপ্লব হল, গণভোট নির্বাচন ও দায়িত্বশীল সরকার নিয়ে এল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, যুগ বদলাল কিন্তু মানুষের ভাগ্য বদল হল না। একের বদলে এল আর এক হুজুর, আর এক মালিক। এই যখন

ইয়োরোপের অবস্থা সেই সময়ে আশার ভাণ্ড শূন্য করে বাকুনিন মৃত্যুশয্যায় শয়ান হলেন আর ক্রপটকিন শুষ্ক সলিতার নিভন্ত দীপশিখাটি আগলে অন্ধকারে পথ খুঁজতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে নৈরাজ্যবাদের চিন্তাধারা ফ্রান্স, সুইৎজার্ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সীমানা পেরিয়ে দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাকুনিন স্পেনবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি ইস্তাহার প্রচার করে তার পিছনে ফানেলি নামে একজন বিশ্বস্ত দূতকে স্পেনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ক্যাটালনিয়া ও বার্সিলনায় ঘাঁটি তৈরী হল। ইটালীতে নিরাজমন্ত্র নিয়ে এলেন কার্লো কাফিরো ও এনরিকো মালাতেস্তা। মিলান থেকে নেপ্‌ল্‌স পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় জোট গজিয়ে উঠল। ১৮৭৬ সালে বাকুনিনের মৃত্যুবৎসরে সুইৎজার্ল্যাণ্ডের বার্ন শহরে একটি আন্তর্জাতিক এনার্কিস্ট কংগ্রেসের অধিবেশন হল। এখানে কাফিরো ও মালাতেস্তা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তাব পাস করালেন। পরের বছর তাঁরা নেপ্‌ল্‌স্‌-এর বেনেভেন্তোর আশপাশে চাষীদের ক্ষেপিয়ে কিছু গোলমাল সৃষ্টি করলেন বটে কিন্তু এ বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করতে ইটালীর সরকারকে বেগ পেতে হয় নি।

১৮৭৯ সালে পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশন হল সুইস জুরার লা শো-দ্য-ফ নামক স্থানে। এখানে খোলাখুলিভাবে প্রস্তাবিত হল 'কাজের দ্বারা প্রচারের' নীতি, রাষ্ট্র-নায়কদের হত্যা করে বিভীষিকা সৃষ্টি করবার নীতি। ১৮৮১ সালে আরো তোড়জোড় করে লণ্ডনে আবার এক বৈঠক বসল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, স্পেন, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইৎজার্ল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধি এল, কিন্তু কংগ্রেস কোন কার্যকরী সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

আসলে রামরাজ্যের রঙীন চিত্র ছাড়া তাদের দেবারও কিছু ছিল না। জ্যাঁ গ্রাভের 'মুমূর্ষু সমাজ ও নৈরাজ্য' এবং চার্ল মালাতোর 'নৈরাজ্যবাদের দর্শন' এই চিত্রের ওপর দাগা বুলানো ছাড়া আর কিছু নয়। স্বর্গলোকে পৌঁছবার জন্যে মর্ত্যলোকের কোন কর্মসূচী তাঁরা দিতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের বিচারধারা থেকে একটা সূত্রের প্রতিপাদন হল অনায়াসে—যদি আইন ও কর্তৃত্ব অন্যায় হয় তা হলে তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত। অবশ্য বলপ্রয়োগ হবে দেশব্যাপী, তার আগে কোথাও না কোথাও তাকে শুরু করতে হবে। দেশলাই কাঠির ছোট্ট একটু আগুন না জ্বাললে ঘর পোড়ে না। তেমনি গুপ্তহত্যার স্ফুলিঙ্গ না তুললে কোনকালে সর্বগ্রাসী হিংসার দাবানল জ্বলবে না। বাকুনিন ও নিহিলিস্টরাও হত্যা ও হিংসার পথে নেমেছিলেন। কিন্তু তাঁদের হত্যা ছিল বিপ্লবী দর্শন ও কার্যক্রমের অঙ্গ। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনে হতাশার অন্ধকারে যারা হত্যার সুড়ঙ্গপথে পা বাড়াল নৈরাজ্যবাদের তক্‌মা আটলেও তাদের মাথায় কোন বিপ্লববোধ ছিল না। 'কাজের দ্বারা প্রচারের' গরম গরম বুলি তাদের দুর্বল মগজে জট পাকিয়ে বসল, বংশধারা ও পতিত জীবনের অপরাধবৃত্তি বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়ালকে আমন্ত্রণ করল বিচার বিবেক-হীন নরহত্যার উৎসবে।

নৈরাজ্যবাদের নামে বেপরোয়া খুনখারাবির পিছনে যে মনোবৃত্তি ও সমাজপরিবেশ কাজ করছিল এদের দু' একজনের পরিচয় দিলে তা বোধগম্য হবে। ফ্রান্সে লোয়ার নদীর উপত্যকায় একটি মিলমজুরের বস্তিতে রাবাচল মানুষ হয়েছিল। এক রঞ্জকের দোকানে সামান্য বেতনে সে কাজ করত। কোন কারণে মালিক তাকে বরখাস্ত করে। কোথাও কাজ না পেয়ে সে চুরি ডাকাতি শুরু করল। এ কাজের সমর্থনে নৈরাজ্যবাদী প্রচারপত্র থেকে সে

একটি যুক্তিও খাড়া করল। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত নানাস্থানে নিরীহ লোকদের খুন করে ও নিরর্থক বোমা ফাটিয়ে সে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। অবশেষে সে ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। মৃত্যুর পর কোন কোন নৈরাজ্যবাদী পত্রিকায় সে শহীদের সম্মান লাভ করল।

ফ্রান্সের অগস্ত ভাইয়াঁ ছিল মায়ের অবৈধ সন্তান। শিক্ষাদীক্ষা তার কিছুই হয় নি। চৌদ্দ বৎসর বয়সে নিঃসম্বল অবস্থায় তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হল। কিন্তু এখানে সেখানে দৌড়দৌড়ি সার হল, সে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেল না। একটু শান্তির আশায় সে ঘর বাঁধল কিন্তু স্ত্রী একটি শিশুকন্যাকে ফেলে ঘর ভেঙে পরম শান্তির আশ্রয়ে চলে গেল। ভাইয়াঁর কোন বদখেয়াল ছিল না, কাজে কর্মে তার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট, তবু কেন তার এই দুর্ভোগ তার কোন মানে সে খুঁজে পেল না। সে স্থির করল অভিশপ্ত জীবন আর রাখবে না কিন্তু কারও না কারও ওপর প্রতিশোধ নিয়ে একটা আদর্শের জন্যে মরতে হবে। শুধু শুধু সে মরবে না। নৈরাজ্যবাদী পুস্তিকায় আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল। ১৮৯৩ সালে ফ্রান্সের বিধান সভায় দর্শকদের মঞ্চ থেকে সে বোমা ছুড়ল। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হল এবং সে শহীদের বরমাল্য লাভ করল।

লুইগি লুছেনির জন্ম হয় পারিতে। সেও জারজ সন্তান। জন্মের কিছু পরেই মা তাকে ফেলে চলে যায় এবং সে ইটালীতে পার্মার এক অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়। বাল্য বয়সে সে মজুরের কাজে ভর্তি হল। এ কাজ তার ভাল লাগল না। কাজ ছেড়ে সে রাস্তায় নামল। বেকার ভবঘুরে জীবনে নানা উৎকট চিন্তা মাথায় ঘুরত। একটা কিছু করে চমক লাগাবার নেশা তাকে পেয়ে বসল। ১৮৯৮ সালে সে অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ ফ্রান্সিস জোসেফের রানী এলিজাবেথকে হত্যা করে মনের সাধ মেটাল।

এই হতভাগ্য বেকারের দল যারা সমাজে পতিত, যাদের বেঁচে থাকবার অধিকারও স্বীকৃত নয়, যাদের কঙ্কালের ওপর হৃদয়হীন আমলাতন্ত্র তার ঠাটঠমক জাঁকিয়ে বসেছে তাদের কাছে ন্যায় অন্যায়ের মূল্যবোধ কতটুকু? তাদের মনের দুয়ারে ঘা দিল রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীদের জেহাদ,—'কাজের দ্বারা প্রচারের' নীতিতে তারা খুঁজে পেল তাদের হিংসাবৃত্তির সমর্থন। তা বলে এ কালের সকল হিংসাত্মক কাজের পিছনে যে নৈরাজ্যবাদী মন্ত্রণা ছিল তা নয়। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনে অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে যার সঙ্গে কোন রাষ্ট্রদর্শনের সম্পর্ক ছিল না। তার কারণ এসব দেশে গণতান্ত্রিক শাসনে সাধারণ লোক কোন সামাজিক অধিকার পায় নি, তাদের দুর্গতির কোন উপশম হয় নি। কোন ধ্বংসাত্মক মতবাদের চেয়ে এই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশই এই অপরাধগুলির জন্যে বেশী দায়ী।

কিন্তু দুর্নামের কলঙ্কটুকু লেগে রইল নৈরাজ্যবাদের গায়। রক্ষণশীল কাগজগুলির অবিরাম প্রচারের ফলে নৈরাজ্যবাদ হয়ে দাঁড়াল গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্রের নামান্তর। তার ওপর দেশে দেশে চলল অবাধ দমননীতির মহড়া। ফলে সাচ্চা ও ঝুটার তফাত চলে গেল, যারা ছিল আদর্শনিষ্ঠ নৈরাজ্যবাদী তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল।

এদিকে ইয়োরোপের চেহারা বদলে যাচ্ছিল খুব দ্রুত। শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মজদুর শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হল, ঘোরাল হয়ে উঠল শ্রেণী সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের বৈধানিক পন্থায় নির্ভর না করে তারা নিজেদের পাওনা আদায়ের জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। এই ঘনায়মান শ্রেণী সংগ্রামকে অবলম্বন করে, শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্যবাদের

নবরূপায়ন হল, অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে উঠল দীপশিখা, তার আলোয় মেহনতী জনতা দেখতে পেল নিঃশোষণ সমাজের ছবি।

১১। সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌

ফরাসী সিণ্ডিকেট্‌ বা মজুর ইউনিয়ন থেকে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ কথার উৎপত্তি। নৈরাজ্যবাদের নূতন ভিত্তি হল শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কর্মপন্থা হল শ্রমিক সংগ্রাম। ইউনিয়ন কেবল লড়াইয়ের হাতিয়ার নয়, ইউনিয়ন হবে ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠাম। প্রুদ'র যুক্তকরণের নীতি অনুসরণ করে ইউনিয়নগুলি পরস্পর চুক্তি করবে, মাঠে খনিতে কারখানায় তারা উৎপাদনের কাজ পরিচালন করবে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সরিয়ে আনবে শ্রমতান্ত্রিক সমাজ। যারা পরিশ্রম করে না, সমাজে যাদের কোন কাজ নেই, শ্রমতান্ত্রিক সমাজে তাদের জায়গা হবে না। যারা সমাজের খোরপোষ জোগায় সমাজ তাদের—এইটেই সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর মোদ্দা কথা। এতদিন সমাজবাদ ও নৈরাজ্যবাদ ছিল বুদ্ধিজীবীর কপোলকল্পনা, এবার তাদের প্রতিষ্ঠা হল শ্রমজীবীর কর্মশালায়। সমাজবাদীরা এতকাল মজদুর ইউনিয়নকে কাজে লাগিয়েছে ক্ষমতা করায়ত্ত করবার ফিকিরে, সমাজতান্ত্রিক বিধানে তাদেরকে কোন স্থান দেয় নি। মার্ক্‌স্‌ এবং তাঁর অনুচররাও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগিয়ে তোলার বেশী ইউনিয়নের কোন ভূমিকা দেখতে পান নি এবং তাঁদের শ্রেণীহীন সমাজে ধনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নগুলিরও বিলোপ প্রতিশ্রুত হয়েছে।

১৮৬৯ সালে বাসেলে শ্রমিক আন্তর্জাতিকের চতুর্থ অধিবেশনে এই মতের প্রতিবাদ হল। বেলজিয়ান প্রতিনিধি ইউজেন হিন্‌স্‌ একটি ইস্তাহার পেশ করলেন, সুইস্‌ জুরা ও ফরাসী প্রতিনিধিদের সমর্থনে সেটি গৃহীত হল। এই ইস্তাহারের মর্মে একটি প্রস্তাব পাস হল :

> এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে শ্রমিকরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিরোধ সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। একটি ট্রেড ইউনিয়ন খাড়া হওয়া মাত্র ইউনিয়নগুলিকে জানাইতে হইবে যাহাতে এক এক শিল্পে একটি করিয়া জাতীয় শ্রমিক সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে। জাতীয় সংহতিগুলির কর্তব্য হইবে আপন আপন শিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা। যৌথভাবে প্রতিকার-সাধনের পথ দেখান এবং সেই পরামর্শ অনুসারে যাহাতে কাজ হয় সেদিকে নজর রাখা—যাহাতে অন্তিমে বর্তমান অন্নদাস প্রথা দূর হইয়া মুক্ত মজুরদের একটি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উৎপাদন পরিচালনা যাতে এককালে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে আসে তার প্রস্তুতির জন্যে শ্রমিক পরিষদ গড়বার প্রস্তাবও এই কংগ্রেসে হয়। কিন্তু ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধ ও পারি কমিউনের পতনে সব জল্পনা কল্পনা বরবাদ হয়ে গেল।

যদিও যন্ত্রশিল্প ও তার আনুষঙ্গিক শ্রমিক ইউনিয়নের জন্ম হয় ইংল্যাণ্ডে তবু সিণ্ডিক্যালিস্ট মত ও বিশ্বাস পরিপুষ্ট হল ফ্রান্সের জলহাওয়ায়। তার কারণ ফ্রান্সে দলীয় রাজনীতি এতদূর দূষিত হয়েছিল যে সরকার ও সরকারী ব্যবস্থায় কারও আর আস্থা ছিল না। কুখ্যাত দ্রেফুর মামলা এর একটি বিশিষ্ট নজির। ১৮৯৪ সালে আলফ্রে দ্রেফু নামে একজন ইহুদী সামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে বিদেশে গোপনীয় সংবাদ

পাঠাবার অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও সামরিক আদালতে তিনি যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হলেন। লোকসমক্ষে চূড়ান্ত অপমানের পর তাঁকে দক্ষিণ আমেরিকার একটি অস্বাস্থ্যকর দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হল। দু'বছর পরে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা কর্নেল পিকার আবিষ্কার করলেন যে দলিলটির ওপর নির্ভর করে দ্রেফুকে সাজা দেওয়া হয়েছিল আসলে সেটি দ্রেফুর লেখা নয়, সেটির হস্তাক্ষর আর একজনের। সমরবিভাগের কর্তারা খুশী হলেন না, তাঁরা পিকারকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসালেন কর্নেল হেনরি নামে এক অফিসারকে। কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ হল না। একটা সাংঘাতিক রকমের অবিচার হয়েছে এরকম আশঙ্কা চারিদিকে মুখর হয়ে উঠল। প্রতিবাদের মুখপাত্র হলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক এমিল জোলা। ন্যায়বিচার দাবি করার অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড ও জরিমানা হল।

এর অল্প পরে হেনরির এক জালিয়াতি ধরা পড়ল এবং সে আত্মহত্যা করল। দ্রেফুর নির্দোষিতার আর একটি প্রমাণ পেয়ে ফরাসীরা ক্ষেপে উঠল। সামরিক কর্তারা তাঁর পুনর্বিচার করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মর্যাদা খোয়ানো বড় কঠিন। আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস না করে দণ্ডের মিয়াদ কমিয়ে করল দশ বৎসর, আর রাষ্ট্রপতি তাঁকে মাপ করে মুক্তি দিয়ে জিদের মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের সামঞ্জস্য করলেন। দ্রেফুর সমর্থকরা দাবি করল ক্ষমা নয় দোষ স্খালন। অবশেষে এ দাবি মানতে হল। ফ্রান্সের সদর আদালত সামরিক আদালতের রায় নাকচ করে ঘোষণা করল দ্রেফুর বিরুদ্ধে সাজানো অভিযোগ ভিত্তিহীন।

ফ্রান্সের ইতিহাসে দ্রেফুর বিচারপর্ব এক দুরপনেয় কলঙ্ক। সামরিক আদালতের অবিচার ও অসাধুতার চেয়েও যা বেশী লজ্জাকর সে হল রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলির ভূমিকা। দলীয় স্বার্থ ও নেতৃত্বের লোভ মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে এই ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া গেল। সমরবিভাগের সঙ্গে যে সব ক্যাথলিক, ইহুদীবিদ্বেষী ও রাজতন্ত্রবাদীরা হাত মিলিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রজাতন্ত্রকে বেইজ্জত ও ঘায়েল করা। এই ষড়যন্ত্রের সামনে ন্যায়বিচার ও আইনের মর্যাদারক্ষার জন্যে প্রজাতন্ত্রবাদীরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে নি। তাদের নীতিহীন ও মেরুদণ্ডহীন আচরণে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদ শিথিল হয়ে গেল।

সমাজতন্ত্রী নেতারাও কোন সদ্‌দৃষ্টান্ত রাখতে পারল না। সমাজবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করা দুরূহ হয়ে উঠল। ১৮৯৯ সালে বিধানসভায় নির্বাচিত সমাজবাদী নেতা আলেকজাণ্ডার মিয়েরাঁ দলত্যাগ করে বিরোধী দলের মন্ত্রীসভায় স্থান করে নিলেন, শ্রেণীসংগ্রাম ছেড়ে শান্তির নামাবলী গায় দিলেন। এর পরে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সকল ভরসা খুইয়ে সিণ্ডিক্যালিস্টরা শ্রমিকদের নিজেদের শ্রেণীসংস্থার ওপর নির্ভর করতে আহ্বান করল।

ফ্রান্সে সিণ্ডিক্যালিজম্‌-এর জন্মবৃত্তান্ত খুঁজলে যেতে হয় ১৮৮৬ সালে যখন শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ওপর থেকে আইনের নিষেধ প্রত্যাহার করা হল। ১৮৯২ সালে ফার্নাঁদ্‌ পেলুতিয়ের নেতৃত্বে তৈরী হল বুর্সে দ্যু ত্রাভাই নামে একটি মজদুর ফেডারেশন। এক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের মজুর ইউনিয়নগুলি মিলিত হয়ে গড়ল বুর্সে, নানা অঞ্চলের বুর্সে একজোট হয়ে গঠিত হল বুর্সে দ্যু ত্রাভাই। মালিকের হয়ে চেম্বার অব কমার্স যে কাজ করে মজুরের হয়ে বুর্সে দ্যু ত্রাভাই করে সে কাজ। এ রাজনীতির ধার

ধারে না। এর কাজ ইউনিয়নকে মজবুত করা আর সাধারণ ধর্মঘট এবং অন্যান্য উপায়ে শ্রমিকের লড়াই চালিয়ে যাওয়া। এর সংগঠন প্রুদ'র পরিকল্পিত বিকেন্দ্রায়ন ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সকল শিল্প ও শিল্পাঞ্চল এই সংগঠনের সামিল হয় নি। খনিমজুর, বস্ত্রমজুর, ছুতারমিস্ত্রি এরা সব যার যার জাতীয় ফেডারেশন করে বসেছিল। ১৮৯৫ সালে এদের একত্র করে আর একটি শ্রমিক সংস্থা গঠিত হল—কংফেদেরাশিয়ঁ জেনেরাল দ্যু ত্রাভাই। বুর্সে ছিল চরমপন্থী, কংফেদেরাশিয়ঁ কিছুটা নরমপন্থী। উভয়ের মিলনের এই অন্তরায়টুকু দূর হল দ্রেফুর মামলা ও মিয়েরাঁর দলত্যাগের ফলে। গ্রিফুয়েলে প্রমুখ বামপন্থী সমাজবাদীরা এবং পুজে ও দেলেসাল প্রমুখ নৈরাজ্যবাদীরা কংফেদেরাশিয়ঁতে যোগ দিয়ে একে সংস্কারমুক্ত করলেন। এঁদের আন্দোলনের ফলে বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ওপর দুই সংগঠনের ঐক্য সাধিত হল। ১৯০২ সালে বুর্সে কংফেদেরাশিয়ঁতে যোগদান করল।

কংফেদেরাশিয়ঁ বা সিজিটি আসলে একটি সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এতে প্রত্যেকটি ইউনিয়ান ও বুর্সের স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত। প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে দুটি ফেডারেশনে ঢুকতে হয়। একবার এক অঞ্চলের অন্যান্য শিল্পের ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে জুটতে হবে স্থানীয় বুর্সের সঙ্গে, স্থানীয় বুর্সেগুলি যুক্ত হবে তাদের ফেডারেশনে, আর একবার অন্যান্য অঞ্চলের সমশিল্পের ইউনিয়নগুলির সঙ্গে মিলে সেই শিল্পের জাতীয় ফেডারেশনের সামিল হতে হবে। আঞ্চলিক প্রীতি ও বৃত্তিগত স্বার্থ উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে এই ব্যবস্থা। দুই ফেডারেশনের ইমারত উঠেছে তলা থেকে উপরে, ইউনিয়নগুলির স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায়, স্বার্থের সমতা ও বিশ্বাসের একতা ছাড়া তাদের আর কোন বন্ধন নেই। এই বিকেন্দ্রিত সংগঠনে শ্রমিক শ্রেণী একাধারে পেল তাদের লড়াই-এর হাতিয়ার এবং ভবিষ্যতের মুক্তসমাজের কাঠাম।

১৯০৪ সালে মোট সংঘবদ্ধ মজদুরের মধ্যে শতকরা ২০·৯ জন ছিল সিজিটির সভ্য আর মোট ইউনিয়নের শতকরা ৪২·৪টি ছিল সিজিটির অন্তর্গত। ১৯১০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় শতকরা ৩৬·৬ ও৫৭·১।[১] সংখ্যার অনুপাতে এর শক্তি ছিল বেশী কারণ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়নগুলি প্রায় সবই সিজিটিতে ভর্তি হয়েছিল।

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর মতবাদ ও পথনির্দেশ রচিত প্রুদ'র নৈরাজ্যবাদ ও মার্কস্‌-এর শ্রেণীসংগ্রামের মিশ্রণে। প্রুদ'র কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা ও যুক্তকরণের আদর্শ, মার্কস্‌-এর কাছ থেকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলিতারিয় সংগ্রামের পদ্ধতি। ধনতন্ত্র ও তার হাতিয়ার রাষ্ট্রকে একসঙ্গে নিপাত করা এর লক্ষ্য। এ কাজ রাজনৈতিক দলের নয়। সরেল ও তাঁর শিষ্য লাগার্দেল রাজনৈতিক দল ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সমাজবাদী দল বিভিন্ন স্তরের লোক নিয়ে তৈরী একটা জগাখিচুড়ি, এদের চিন্তায় ঐক্য আছে বটে কিন্তু স্বার্থের মিল নেই। তারা দল করে কারণ রাজনীতি তাদের নেশা, রাজনীতিতে তাদের অহঙ্কার মেটে ও স্বার্থসিদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে শ্রেণী সমস্তরের লোক নিয়ে তৈরী, তাদের স্বার্থ এক, যার বন্ধন মতবাদের চেয়ে দৃঢ়।[২]

দলের দুর্বলতার একটি জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত জার্মানীর সোস্যাল ডিমক্র্যাট দল।

---

[১] জে. এ. এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজম, লণ্ডন, ১৯১৩, ৪৬ পৃষ্ঠা।
[২] হুবের লাগার্দেল : স্যাঁদিকালিজ্‌ম্‌ এ সোসিয়ালিজ্‌ম্‌, ৪৫ পৃষ্ঠা।

১৯৩২ সালে ডায়েটে তাদের বল ছিল দ্বিতীয়। তাদের পক্ষে ছিল এক কোটি কুড়ি লক্ষ ভোটার আর হাতে ছিল ষাট লক্ষ ইউনিয়ন মজদুর। প্রাশিয়ার যুক্তসরকারে তারা ছিল প্রধান দল এবং মন্ত্রীসভায় নেতৃত্ব ছিল তাদের। তা সত্ত্বেও যখন ভন প্যাপেন জার্মানীর চ্যান্সেলার হয়ে জুলাই মাসে জোর করে প্রাশিয়ার মন্ত্রীসভা ভেঙে দিলেন তখন তারা কোন বাধা না দিয়ে হাইকোর্টে আপীল করতে গেল। জার্মানীতে গণতন্ত্রের পতনের সূত্রপাত এই থেকে। হিটলার যখন ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন তখন সমাজবাদী দল টু শব্দটি করল না এবং মাসকয়েকের মধ্যে তাদের ইউনিয়নগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

সিন্ডিক্যালিস্টদের কর্মপন্থা প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ যার মানে লড়াইর দায়িত্ব অপরের হাতে তুলে না দিয়ে মজুরদের নিজের হাতে রাখা। তাদের লড়াইর চূড়ান্ত কৌশল সাধারণ ধর্মঘট। চলতি ধর্মঘটের উদ্দেশ্য মজুরদের দাবিদাওয়া আদায় করা। সিন্ডিক্যালিস্টদের বিপ্লবী ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ধনতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে শ্রমতন্ত্র প্রবর্তন করা। সুতরাং অন্য সকল উপায় ব্যর্থ হলে যে ধর্মঘটে নামতে হবে তা নয়, যখনই সুযোগ মিলবে তখনই এই অস্ত্রে শান দিতে হবে। এমিল পুজের কথায় বলতে গেলে "কাজের সমর্থন কাজে : ফল কি হবে তার খোঁজে দরকার নেই।"

সকলে একসঙ্গে না নামলে যে সাধারণ ধর্মঘট সম্ভব হবে না তা নয়। অল্প কয়েকজন লোকও কোমর বেঁধে নামলে ধনতান্ত্রিক বিধানকে অচল করতে পারে। পুজে দেখিয়েছেন যে গুটিকয়েক মৌলিক শিল্পে ধর্মঘট হলেই কাজ হাসিল হয়। খনিমজুররা যদি কয়লা তোলা বন্ধ করে, ডকমজুররা যদি জাহাজের মাল না নামায়, রেলমজুররা যদি মাল ও মানুষের চলাচল আটকে দেয় তাহলে একদিনের মধ্যে ধনিক অর্থনীতি বেসামাল হয়ে যাবে এবং বিপ্লব ঘটবে। মূল শিল্পগুলি রাষ্ট্রের হাতে আসার ফলে এই কৌশল আরো সুসাধ্য হয়েছে। "রাষ্ট্র মানুষের শরীরের মত ক্ষণভঙ্গুর, একটি মাত্র শিরা কেটে দিয়ে তাকে খতম করা যেতে পারে।"[৩]

সিন্ডিক্যালিস্ট দার্শনিকদের অগ্রগণ্য জর্জ সরেল (১৮৪৭-১৯২২) তাঁর রেফ্লেকসিয়ঁ স্যর লা ভিওলাঁস নামক গ্রন্থে (১৯০৮) সাধারণ ধর্মঘটকে নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর দর্শন রচনা করলেন। তাঁর আসল বক্তব্য হল যে মানুষ সংগ্রামের প্রেরণা মতবাদ থেকে পায় না, পায় যুক্তিহীন বিশ্বাস থেকে। এক একটি কথায় এমন জাদু থাকে যে তার সামনে যুক্তি-তর্ক দাঁড়াতে পারে না।

> বড় বড় সামাজিক আন্দোলনে যাহারা শরিক হয় তাহারা সর্বদা স্বপ্ন দেখে যে যুদ্ধে তাহাদের জয় অবধারিত। এই বিশ্বাসগুলিকে আমি বলিতে চাই মিথ্; সিন্ডিক্যালিস্ট সাধারণ ধর্মঘট ও মার্ক্স্-এর সর্বনাশা বিপ্লব এই প্রকারের মিথ্।[৪]

আদিম খৃষ্টান ধর্ম, ষোড়শ শতকের রিফর্মেশন, আঠার শতকের ফরাসী বিপ্লব,—যাবতীয় বিরাট জন-আন্দোলনের পিছনে আছে মিথের শক্তি, সুনিশ্চিত জয়লাভে যুক্তিহীন বিশ্বাসের শক্তি। যুক্তি দিয়ে এর থেই পাওয়া যায় না, কারণ এখানে সংগ্রামের উপজীব্যই হল অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাস জোগায় সংকল্প ও সংগ্রামের বল। আর যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে

[৩] হার্বার্ট রীড : এনার্কি এন্ড অর্ডার, লন্ডন, ৫২ পৃষ্ঠা।
[৪] রেফ্লেকসিয়ঁ, অনুবাদ, টি. ই. হিউম, লন্ডন, ১৯২৫, ২২ পৃষ্ঠা। পরবর্তী পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীতে দেওয়া হল।

গড়া হয় ইউটোপিয়া, আদর্শ সমাজচিত্র, এতে মনের ক্ষুধা মেটে রক্তে নেশা ধরে না। দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমাজবাদ ছিল ইউটোপিয়ার আদর্শবিলাস। মার্কস্ অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের অন্ধ বিশ্বাস আমদানি করে সমাজবাদকে বৈপ্লবিক শক্তি দিলেন।

অযৌক্তিক হলেও মিথ্ অবৈজ্ঞানিক নয়। সমাজবিজ্ঞানের কাজ সামাজিক শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করা, আর বিপ্লবীর কাজ নতুন সমাজগঠনে সেগুলিকে প্রয়োগ করা। এক একটা মিথের পেছনে প্রচণ্ড সামাজিক শক্তি দানা বেঁধে ওঠে। যীশুখৃষ্ট আবার ফিরে এসে মানুষের মনের ময়লা মুছে ফেলবেন এই অলীক কল্পনা মধ্যযুগে কত সহিষ্ণুতা, কত বলিদানের খোরাক জুগিয়েছে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মায়ামন্ত্র হাজার হাজার লোককে পাগল করেছিল বলেই না ফরাসী বিপ্লবে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ হতে পেরেছিল। আসন্ন প্রলিতারিয় বিপ্লবে সাধারণ ধর্মঘটেরও হবে এইরূপ ভূমিকা। শ্রমিকশ্রেণীর সকল আশাআকাঙ্ক্ষার নির্যাস নিয়ে উচ্চারিত হবে ধর্মঘটের জাদুমন্ত্র। যুক্তি দিয়ে, সম্ভাবনার মাপকাঠি দিয়ে এর যাচাই হবে না, শুধু দেখতে হবে এই মন্ত্র দিয়ে মজুরদের মাতিয়ে তোলা গেল কিনা।

মজুরদের সবচেয়ে বড় শত্রু রাষ্ট্র। চরম ক্ষমতা মুঠোর মধ্যে এনে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচালনায় রাষ্ট্র পোপের চেয়েও শক্তিশালী একটা দানবিক পীড়নযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সিণ্ডিক্যালিস্ট রাষ্ট্রকে শোধরাতে চায় না, চায় নাশ করতে। মার্কস্ অবশ্য তা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন যতদিন না শ্রেণীস্বার্থের বিলোপন হয় ততদিন প্রলিতারিয় একনায়কত্বে রাষ্ট্রশক্তি বজায় থাকবে। মার্কস্ ধনতন্ত্রের বিস্তারকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রলিতারিয় বিপ্লবের পথও ঠিক বাতলিয়েছেন, কিন্তু প্রলিতারিয় সংগঠন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানতেন না এবং বলেনওনি, শ্রেণীসংগ্রামের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তেও তিনি আসেননি।

> যে সকল ঘটনার সঙ্গে আজকাল আমরা পরিচিত মার্কস্-এর তাহা জানা ছিল না। ধর্মঘট কি ব্যাপার আমরা তাঁহার চেয়ে ভাল করিয়া জানি কারণ আমরা সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সাধারণ ধর্মঘটের মিথ্ জনপ্রিয় হইয়াছে, মজদুরের মনে কায়েম হইয়া বসিয়াছে। মার্কস্-এর হতভাগ্য শিষ্যরা এতকাল ধরিয়া তাঁহার শাস্ত্রবাক্যের টিকা রচনা করিয়াছে। তার বদলে আমাদের উচিত তাঁহার দর্শনের অভাব পূরণ করা। (৩৪-৩৫)

নিশ্চয়ই মার্কস্ চান নি একদল সংখ্যালঘুকে সরিয়ে আর একদল সংখ্যালঘু সরকারের গদিতে বসুক। তাঁর ভক্তরা বুর্জোয়া বিপ্লবীদের দৃষ্টান্ত নকল করে ঠিক তাই চেয়েছে, শুধু বুর্জোয়াদের জায়গায় এনেছে শ্রমিকদের। বলপ্রয়োগ চাই কিন্তু শাসনকর্তৃত্ব লাভ করবার জন্য বলপ্রয়োগ আর শাসনকর্তৃত্ব উচ্ছেদ করবার জন্যে বলপ্রয়োগ এক জিনিস নয়—এ তাদের খেয়াল নেই। সিণ্ডিক্যালিস্টদের কার্যকলাপ মার্কসীয় ছকের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তারা কালের দাবি অনুসারে মার্কস্‌বাদের সংস্কার করে নেবে।

রাজনৈতিক ধর্মঘট ও প্রলিতারিয় ধর্মঘট উভয়ের পার্থক্য মৌলিক। রাজনৈতিক ধর্মঘট বুর্জোয়াদের একটা চাল। নির্বোধ জনতার হয়ে ভাববার গুরু দায়িত্ব তাদের মাথায়। জনতার মনে আছে রাষ্ট্রের জাদুকরী শক্তিতে অটল আস্থা। ওপরে ধনিকরা ধর্মঘটের আতঙ্কে অস্থির। একের অজ্ঞতা ও অপরের ভীরুতা উভয়ের সুযোগ নিয়ে বাক্যবীর সমাজবাদীরা দলের হাতে সকল ক্ষমতা দখল করে নেয়।

এদের ধাপ্পাবাজি ফাঁস করবার একমাত্র উপায় প্রলিতারিয় ধর্মঘট। প্রলিতারিয়

ধর্মঘট ধনিক-শ্রমিক সংঘর্ষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং চরম শক্তিপরীক্ষা,—শ্রমিকের দুর্বার সংঘর্শক্তির প্রমাণ। এর লক্ষ্য শ্রমিকের দাসত্বমোচন, সরকার বদল নয়। শ্রমিকের সকল চিন্তাভাবনা আশাআকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে মূর্তিমান হয়ে ওঠে।

> ধর্মঘট শ্রমিকের মধ্যে গভীরতম ও উচ্চতম আবেগের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সাধারণ ধর্মঘট তাহাদিগকে নানা স্থান হইতে আনিয়া একত্র করে, একটি চিত্রে সন্নিবেশ করিয়া প্রত্যেককে চরম উত্তেজনায় টানিয়া আনে। (১৩৭)

সফলতা দিয়ে একে মাপা যায় না। ধর্মঘট সমাজবিপ্লবের প্রস্তুতি, সংগ্রামের মহড়া। এর মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যচেতনা জেগে ওঠে। সুতরাং বাস্তবে এর ফলাফল যাই হোক না কেন, এর দূরবর্তী সম্ভবনার দিকে তাকিয়ে সুযোগ পেলেই ধর্মঘটের সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।[৫]

রোম জয় করার পর জার্মানরা নিজেদের বর্বরতায় লজ্জা পেয়ে রোমানদের কাছে সভ্যতার শিক্ষানবিসি করেছিল। এই অধমতাবোধ থেকে শ্রমিকদের বাঁচতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শিখলে তাদের বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদীদের ফাঁদে পড়তে হবে। জ্যাঁ জরে প্রমুখ[৬] গণতন্ত্রী সমাজবাদীরা দুই শ্রেণীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে নির্বাচনের রাস্তা পরিষ্কার করে। বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে তারা ধনিকদের কাছ থেকে কাজ বাগায় আর শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করবার ভান করে তাদের ধাপ্পা দেয়। ধনিকদের বেশী চটাতে তারা সাহস করে না কারণ তাহলে ধনিকরা বিগড়ে গিয়ে দেশ রক্ষণশীল সরকারের হাতে তুলে দেবে। এইসব কারচুপিগুলোকে ফাঁসিয়ে দিতে হলে একমাত্র অস্ত্র প্রলিতারিয় ধর্মঘট।

ধর্মঘটের আগে মালিক বলে থাকে ব্যবসার যা অবস্থা তাতে মজুরের দাবি মেটান চলে না। ধর্মঘটের চাপে শুকনো গরুর বাঁট থেকে দুধ বেরোয়, পাওনাগণ্ডা আদায় হয়। দেখা যায় ধর্মঘটের অবিরাম চাপ না থাকলে ন্যায়বিচার মেলে না। সুতরাং সামাজিক কর্তব্য বা দায়িত্ব সব বাজে কথা। কাজের কথা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে দাবি আদায়। শ্রমিকদের বোঝাতে হবে তারা ভিক্ষা চাইছে না, যা চায় তা কেড়ে নিচ্ছে। সরকারও ধর্মঘটকে ভয় পায়, তারা আপস করবার জন্যে মালিকদের চাপ দেয়। ধনিকদের এই দুর্বলতা ধনতন্ত্রের পতনের পূর্বাভাস এবং শ্রমিক ধর্মঘটের সুস্পষ্ট সমর্থন।

কিন্তু এ ব্যাপারটা বিপ্লবের পক্ষে খুব শুভ নয়। বিপ্লবের পূর্ণ সফলতা নির্ভর করে উভয় পক্ষের তেজস্বিতার ওপর। একপক্ষ নিস্তেজ হয়ে গেলে অপর পক্ষও দুর্বল হয়, তার শক্তির ঠিক পরীক্ষা হয় না। ধনিকশ্রেণী যদি শান্তির আশায় ধনতন্ত্রের সংস্কার শুরু করে আর শ্রমিকশ্রেণী যদি আপসে রাজী হয় তা হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করতে হলে এ হতে দেওয়া চলবে না, বুর্জোয়াদের আপস ও আত্মসমর্পণ করতে দেওয়া হবে না। একটু নতি স্বীকার করলেই দাবির মাত্রা বাড়িয়ে ধর্মঘটের চাবুক মেরে তাদের শান্তির স্বপ্ন ভেঙে দিতে হবে।

---

[৫] সরেল এবং লাগার্দেলের মত ধর্মঘটকে এপ্রকার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অন্যান্য সিন্ডিক্যালিস্টরা দেননি। এদের মধ্যে গ্রিফুয়েলে, পেলুতিয়ে প্রভৃতি যাঁরা ইউনিয়ন চালিয়েছেন তাঁরা ফলাফল চিন্তা না করে ধর্মঘটের পক্ষপাতী ছিলেন না।

[৬] ফ্রান্সের এই গণতন্ত্রী সমাজবাদী নেতার বিরুদ্ধে সরেল প্রাণ খুলে বিষোদ্গার করেছেন। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে গণতন্ত্রবিরোধী পত্রিকাগুলির প্ররোচনায় একটি রেস্তরাঁয় তিনি নিহত হন।

> ধনতন্ত্র যখন পূর্ণবয়স্ক, যান্ত্রিক বলে পূর্ণতা লাভ করিয়া যখন ইহা ঐতিহাসিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে, অথচ যখন অর্থব্যবস্থা উন্নতিশীল, মার্কস্-এর বিপ্লববাদ বলে ধনতন্ত্রের মর্মস্থলে আঘাত করিবার তাহাই প্রশস্ত সময়। যদি অর্থব্যবস্থা নিম্নগামী হয় তাহা হইলে কি হইবে এ প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগে নাই।......ঐতিহাসিক যুগ হইতে যুগান্তরে উত্তরণকে মার্কস্ দায়াধিকারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নূতন যুগ পুরাতন যুগের সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। যদি অর্থনৈতিক অবনতির মধ্যে বিপ্লব ঘটে তবে এই সম্পদ কি কমিয়া যাইবে না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরায়িত করিবার কি কোন আশা থাকিবে? (৯১-৯২)

যে শ্রেণীসংগ্রামের ওপর মার্কস্ তাঁর গোটা বিপ্লববাদকে দাঁড় করিয়েছেন ধর্মঘট তাকে ঘনীভূত করে। যারা একটু উঁচুদরের মজুর, যেমন এঞ্জিনীয়ার ফোরম্যান কেরাণী, এবং সংগ্রামে দোমনা, ধর্মঘটের বেলায় তারা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

> যখন হইতে দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, প্রত্যেকটি সংঘর্ষ শ্রেণীগত যুদ্ধের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়, যখন প্রত্যেকটি ধর্মঘট এক সর্বান্তক ধ্বংসের চিত্র তুলিয়া ধরে, তখন সামাজিক শান্তির সম্ভাবনা, গতানুগত্যে আত্মসমর্পণ কিংবা দরদী মালিকের উপর ভরসা সব নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়। সাধারণ ধর্মঘটের ধারণার পিছনে এমন একটা দুর্নিবার শক্তি রহিয়াছে যে ইহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই বিপ্লবের রাস্তায় টানিয়া নামায়। এই ধারণার ফলে সমাজবাদের থাকে চিরযৌবন। সামাজিক শান্তির চেষ্টা ছেলেমানুষি বলিয়া মনে হয়, সাথীদের মধ্যবিত্তদলে যোগদান জনতাকে নিরাশ করে না বরং তাহাদিগকে বিদ্রোহ করিতে আরো উত্তেজিত করে; এক কথায় দুই দলের ভেদরেখা মুছিয়া যাইবার কোন ভয় থাকে না। (১৪৫)

এদিকে ধর্মঘট ধনিকদেরকে নিজ শ্রেণীস্বার্থে সচেতন করে তোলে, তারা সংগ্রামে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয় এবং তাদের তেজস্বিতা ফিরে আসে। ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক সম্পূর্ণতা লাভের জন্যে এবং তার সম্পদ বিপ্লবের হাতে সমর্পণ করবার জন্যে ধনিকদের শ্রেণীবলকে জাগিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। প্রলিতারিয় সংগ্রাম এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে।

> যে সকল স্পার্টান বীররা থার্মপীলির গিরিপথ আগলাইয়া প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করিয়াছিল তাহাদের নামে যেমন গ্রীকরা মাথা নোয়াইত আমরাও তেমন সভ্যতার ত্রাণকর্তা প্রলিতারিয় বিপ্লবীকে নমস্কার করিব। (৯৯)

সরেলের বইর নাম "বলপ্রয়োগের ভাবনা"। বইএর পাতায় পাতায় ভিয়োলাঁস বা বলপ্রয়োগ শব্দটির উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি। এ থেকে আশঙ্কা হতে পারে তিনি বুঝি-বা হত্যা ও নাশাত্মক কাজে প্ররোচনা দিচ্ছেন। বস্তুত তাঁর ভিয়োলাঁস শিল্পযুদ্ধের বলপ্রয়োগ, ধর্মঘটের জুলুম। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মত এতে মারামারি খুনোখুনি নেই। বিপ্লবী শ্রমিক ধনিকশক্তিকে আঘাত করে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকগুলিকে নয়। সমাজের দুঃখ-দুর্দশার জন্য জনকয়েক দুষ্ট লোককে তারা দায়ী করে না। তারা জানে যে,

> গোটা সমাজব্যবস্থা এক অনড় নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ। ইহাকে এড়াইবার উপায় নাই। ইহা একটি অখণ্ড সত্তা। ইহাকে নাশ করিতে হইলে চাই সর্বাত্মক বিপ্লব যাহাতে গোটা ব্যবস্থায় ঘা পড়ে। (১১)

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপ্লবীরা চার্চ ও রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ক্ষমতাশীল লোকগুলোর উপর আক্রমণ চালায়। দৈবাৎ তাদের হাতে যদি ক্ষমতা আসে তাহলে তারা প্রজাপীড়নে চার্চ, বুরবোঁ রাজা এবং বিপ্লবনায়ক রোব্‌স্‌পীয়েরের চেয়ে কম যাবে না।

একদিন ছিল যখন ফরাসীদের বুকে ছিল রক্তারক্তির নেশা। তারা রাস্তায় নেমে বাস্তিল দুর্গে আগুন লাগিয়েছে, নেপোলিয়নের পিছনে পিছনে সারা ইয়োরোপ চষে বেড়িয়েছে। জেকবিনদের বিভীষিকা, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবিস্তার তাদের ওপর মায়াজাল বিস্তার করেছে। সেদিন আর নেই। হিংসার পুরোহিতরা আজ আর বীরের সম্মান পায় না। এ যুগের বীরপুরুষ প্রলিতারিয় যোদ্ধা, ধর্মঘটের পরিচালক। ক্ষমতালোভী বিবেকহীন রাজনীতিব্যবসায়ীগুলোকে সরিয়ে প্রলিতারিয় বীর এক বলিষ্ঠ নীতিমান রচনা করবে, সমাজকে সে দুর্নীতির পাঁকে ডুবতে দেবে না।

দ্রেফুর ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া থেকে বোঝা যায় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নৈতিক সম্বল ফুরিয়ে গেছে। এখন এর নীতি ফটকা বাজারের নীতি।

> পুঁজিওলা বাজারে ঢাক পিটাইয়া বড় বড় কোম্পানী খুলিয়া বসে, বছর কয়েকের মধ্যে কোম্পানী ফতুর হইয়া উঠিয়া যায়। আর রাজনৈতিক পাণ্ডা দেশবাসীকে অজস্র কল্যাণকার্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ জানেনা কেমন করিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করিবে, প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের গাদা গাদা নথিপত্রে পর্যবসিত হয়। দুজনার মধ্যে খুব বেশী তফাত নাই। (২৫৯-৬০)

দুই রত্ন পরস্পরকে বেশ ভাল করে চেনে। শেয়ারহোল্ডারদের সভা ও পার্লামেণ্টের সভা ভর্তি করে বসে থাকে এদের হাততোলার দল। গণতন্ত্র তাই জুয়াচোর ফাটকাবাজদের ভূস্বর্গ।

এই লোকগুলোর কোন ন্যায়নীতির বালাই নেই বলে কি মানুষ উচ্ছন্নে যাবে? প্রলিতারিয় বীর এদের সঙ্গে এদের দুর্নীতি জুয়াচুরি ঝেঁটিয়ে দূর করবে, মানবসমাজে নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে।

সাধারণ ধর্মঘট ও শ্রমিক বীরকে ঘিরে সরেল যে মায়াময় পরিমণ্ডল রচনা করেছেন তাতে বাস্তববাদী বিপ্লবী সিণ্ডিক্যালিস্টরা সায় দেয়নি বটে, তবে সাধারণ ধর্মঘটকে শ্রমিকদের ব্রহ্মাস্ত্র বলে সবাই গ্রহণ করেছে। ১৯০৬ সালে সিজিটির শ্রমিকরা দৈনিক অনধিক আটঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করে প্রায় বৈপ্লবিক অবস্থার সূচনা করেছিল।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের দ্বিতীয় অস্ত্র কাজ পণ্ড করা বা সাবতাজ। ধনিকের বিধানে শ্রম পণ্যবিশেষ। বাজারের নীতি,—যেমন দাম দেবে তেমন জিনিস পাবে। তেমনি নীতি,—যেমন মজুরি দেবে তেমন কাজ পাবে। মজুর পাওনা না পেলে কাজে অবশ্যই ফাঁকি দেবে—এ বাজারের নিয়ম, শ্রেণীদ্বন্দ্বেরও নিয়ম। দরকার হলে সে যন্ত্রপাতি এবং মাল-পত্রও নষ্ট করে দেবে। পুজে উদাহরণ দিয়েছেন—একমুঠো বালি একটা মেশিনকে বন্ধ করতে পারে, দরজী পোশাকের ছাঁটকাট খারাপ করে মালিককে নাস্তানাবুদ করতে পারে কিংবা ক্ষেতমজুর খারাপ বীজ বুনে জমিদারের ফসল মাটি করতে পারে।[৭] সাধারণ ধর্মঘটের চেয়ে এতে ঝক্‌কি কম অথচ ফল বেশী। ১৯০৬ সালের মে মাসে পারির সেলুন-গুলোকে কস্টিকের ছোপ দিয়ে বিকৃত করে নাপিতরা আটঘণ্টা কাজের দাবি আদায়

---

[৭] ল্য সাবতাজ, ৩৪ পৃষ্ঠা। যে সরেল এত করে জবরদস্তির প্রশস্তি গেয়েছেন তিনি কিন্তু এ সব কাজ সমর্থন করেননি, কারণ এতে শ্রমিকের উৎপাদনশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

করেছিল। মালিক পুলিশ ও দালাল লাগিয়ে ধর্মঘট ভাঙবার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু যন্ত্রকে বিকল করে ধর্মঘটে ভেড়াতে পারলে আর সে ভয় নেই।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের আর এক হাতিয়ার সেনাবাহিনীকে দলে টানা। এরা ধনিকতন্ত্র ও ধনিক রাষ্ট্রের খুঁটি। শ্রেণীসংগ্রাম সঙ্গিন হয়ে উঠলে সরকার ফৌজ লাগিয়ে শ্রমিকদের দমন করে। অথচ সেনা ও শ্রমিক একই শ্রেণীর লোক, একই সামাজিক স্তর থেকে এসেছে তারা। শ্রমিকদের শায়েস্তা করে তাদের কোন লাভ নেই। দেশরক্ষার জন্যে তাদের জীবন বলি দিতে বলা হয় অথচ দেশের একটুকরো চাষের জমিও তাদের নেই। এই মন্ত্রগুলো তাদের কানে ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে তারা যেন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে।[৮] তাবলে সিণ্ডিক্যালিস্টরা সেনাবাহিনী ভেঙে দিতে চায় না বা শান্তির স্বপ্ন দেখে না। সৈন্যদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া শ্রেণীযুদ্ধের এক কৌশল।

সিণ্ডিক্যালিস্ট শ্রেণীসংগ্রামের আরো নানারকম কায়দা আছে। যেমন মালের ওপর লেবেল লাগানো। যে কারখানায় ইউনিয়নের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে সেখানকার মালের ওপর ইউনিয়ন একটা লেবেল মেরে দেবে। অধিকাংশ ক্রেতা শ্রমিক এবং শ্রমিকরা লেবেল ছাড়া জিনিস কিনবে না। লেবেল তাই দাবি আদায়ের একটা অস্ত্র। এছাড়া সভা, জলুস, হরতাল, বয়কট এসব ত' আছেই।

এনার্কিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে একটি কর্মপন্থা ও সংগঠন জুড়ে দিয়ে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ তৈরী। শতাব্দীর অন্তে ঘোর দুর্দিনে পড়ে এনার্কিস্টদের অনেকে সন্ধান করেছিল একটি বাস্তব কর্মপদ্ধতির এবং এমন একটি শ্রেণীর যাদের স্বার্থ নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে জড়িত, যারা এ নিয়ে লড়াই করবে। এই শ্রেণী হল প্রলিতারিয় শ্রমিক, কর্মপন্থা হল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। শ্রমিকরা ইতোমধ্যে ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, ইউনিয়নকে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এমতাবস্থায় নৈরাজ্যবাদীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেয়ে উৎপাদনে ধর্মঘট করে অচলতা সৃষ্টি করা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব দেখে পেলুতিয়ে, পুজে, দেলেসাল প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিক্যালিস্ট শিবিরে যোগ দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ রয়ে গেল বাইরে। তারা সিণ্ডিক্যালিস্ট সংগ্রামে সহানুভূতি জানাল কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহের বদলে সাধারণ ধর্মঘটকে নিতে রাজী হল না। ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে আমস্টার্ডামে এক আন্তর্জাতিক এনার্কিস্ট কংগ্রেসে সমবেত হয়ে তারা ঘোষণা করল,

> সকল দেশের সাথীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তাহারা যেন শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিদ্রোহের ভাবনা, ব্যক্তিগত উদ্যম ও সংহতির শক্তি বাড়াইয়া তোলে যাহা নৈরাজ্যবাদের সার কথা।......কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে নৈরাজ্যবাদীরা মনে করে যে ধনতান্ত্রিক ও প্রভুত্বশীল সমাজকে শুদ্ধ সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি দ্বারা ধ্বংস করা সম্ভব। সরকারের সামরিক শক্তির সঙ্গে লড়িবার যাহা প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য পদ্ধতি সিণ্ডিক্যালিস্ট সংগ্রামে ও সাধারণ ধর্মঘটে উৎসাহ দিতে গিয়া তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

প্রথম প্রথম ক্রপটকিনও এই মত পোষণ করতেন। তারপর যখন তিনি দেখলেন সশস্ত্র সংগ্রামের আশা সুদূরপরাহত এবং এর পরিণতি হয়েছে লক্ষ্যহীন গুপ্তহত্যায়

---

[৮] জি. য়েভেতো : ল্যা মানুয়েল দ্যু সলদা : মরিস চার্নাই : কাতেকিজ্‌ম্‌ দ্যু সলদা।

তখন তিনি সিণ্ডিক্যালিস্টদের পুরোপুরি সমর্থন না করলেও আশীর্বাদ জানালেন। গোঁড়া নৈরাজ্যবাদীরা যাই বলুক না কেন আসলে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ শিল্পযুগের পরিপ্রেক্ষিতে এনার্কিজ্‌ম্‌-এর নয়া সংস্করণ। অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা এনার্কিজ্‌ম্‌ বলতে বোঝেন গডউইন, স্টার্নার ও প্রুদ'র ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রজ্ঞানির্ভর দর্শন, বাকুনিন ও ক্রপটকিনের যূথকেন্দ্রিক সংগ্রামনির্ভর নৈরাজ্যবাদের কথা তাঁরা চিন্তা করেন না।[৯] সরেল প্রমুখ অনেকে এনার্কিস্টদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর কল্পনাবিলাসী বলে ব্যঙ্গ করেছেন।[১০] এনার্কিস্টদের গরম গরম কথায় রাষ্ট্রের ইমারত থেকে একটি ইটও খসেনি। তবে তাদের বেপরোয়া হিংসার বাণী সিণ্ডিক্যালিস্টদের কাজে লেগেছে, "তারা মজুরদের শিখিয়েছে যে হিংসাত্মক কাজে লজ্জার কিছু নেই" (৪১)। আশ্চর্যের কথা যে প্রুদ'র শিষ্য হয়েও সরেলের মনে পড়ল না যে তাঁর নিরাজ সমাজের আদর্শ এবং স্বাধীনতা ও যুক্তকরণের নীতি নৈরাজ্যবাদের জনকের কাছ থেকে পাওয়া। মার্ক্‌স্‌-এর শ্রমিক আন্তর্জাতিকে কমিউনিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে এনার্কিজ্‌ম্‌কে লালন করেছিল যে ল্যাটিন দেশগুলি, সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর বিকাশ ঘটেছিল যে সেই দেশগুলিতেই এ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

ইউনিয়ন কেবল লড়াইর হাতিয়ার নয়, ইউনিয়ন মজুরদের শিক্ষাশালা। এর মারফত তাদের সাহস ও দায়িত্ববোধ বাড়বে, লড়াইর কায়দাকানুন রপ্ত হবে, আর চোখের সামনে ফুটে উঠবে ইউনিয়ন-আশ্রয়ী সহযোগী সমাজের চিত্র। ভবিষ্যতে সমাজ কি চেহারা নেবে সে সম্বন্ধে সিণ্ডিক্যালিস্টরা কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য করে নি। কেবল মাত্র পাতাউ ও পুজে একখানি পুস্তকে পুলিশের গুলিবর্ষণ থেকে শ্রমিক সমাজের উদ্‌ভব পর্যন্ত ঘটনা-পরম্পরার কাল্পনিক বিবরণ দিয়ে একটা মনোরম রামরাজ্যের ছবি এঁকেছেন।[১১] একদিন ধর্মঘটি মজুরের ওপর পুলিশ গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মত কলে কারখানায় ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল, মেশিন বিকল হল। জনতার কোপে পড়ে পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল, বিপ্লবীদের প্রচারের ফলে সেনাবাহিনী বন্দুক নামিয়ে বসে রইল। বিষদাঁত ভেঙে সরকার যখন কাবু হয়ে পড়েছে তখন ইউনিয়নগুলি সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের কাজ হাতে নিল—তারা জনসাধারণের খোরপোষ ও বাসের দায় গ্রহণ করল। যাবতীয় জাতীয় কল্যাণকার্য ও সেবাকার্য তারা পরিচালনা করতে লাগল, শ্রমিকদের জাতীয় সিণ্ডিকেট রেলগাড়ি চালাবার, খনিমজুর সিণ্ডিকেটের ফেডারেশন কয়লা তুলবার দায়িত্ব নিল। উৎপাদন ও জনহিতের যাবতীয় কাজের মধ্যে যোগাযোগ রাখবার ভার নিল ইউনিয়নের ফেডারেশনগুলির এক সার্বভৌম সাধারণ কনফেডারেশন।

চাষীরা জমিদারের জমি দখল করে মালিক হয়ে বসল, ক্রমশ তারাও সহযোগিতা ও যুক্তকরণের নীতি মেনে নিয়ে সিণ্ডিক্যাল ব্যবস্থার সামিল হল। শিক্ষকদের ইউনিয়ন সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন করল, শিক্ষাকে শ্রমমুখীন করল। ধনতন্ত্রের আওতায় যে সকল প্রতিভা চাপা পড়ে ছিল এখন তা মুক্ত হয়ে নূতন আবিষ্কার ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে

[৯] যেমন—এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌, ১২৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

[১০] সরেল নিজে ছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর, তাঁর নজরে পড়েনি যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব—যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—প্রথমে তাদের ভেতর থেকেই বেরোয়। রাশিয়ায় ডিসেম্ব্রিস্ট, পপুলিস্ট, বাকুনিন, ক্রপটকিন সব ছিলেন অভিজাত বংশের লোক।

[১১] কমা নু ফের' সা রেভল্যুশিয়' (কেমন করে আমরা বিপ্লব সমাধা করব?)

নিযুক্ত হল। উৎপন্ন বিত্ত ইউনিয়নগুলির মারফত সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হল, কারও হাতে কোন মুনাফা রইল না। সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং বাড়তি উৎপাদনের অনর্থ সমাজকে ভুগতে হল না। ধর্ম উঠে গেল, তার জায়গা নিল চারুকলা। এতদিন পুরোহিত, রাজামহারাজা ও বেনিয়ারা চারুকলাকে বন্দিনী করে রেখেছে—এবার চারুকলা হল সমাজলক্ষ্মী।

বিপ্লবের শেষে জন্মলাভ করল মার্কসীয় রামরাজ্যের শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন সমাজ।

> ধনতান্ত্রিক যুগের নরপশুর জায়গায় উপস্থিত হইয়াছে নূতন পরিবেশ, নবীন আবহাওয়ার সৃষ্টি মৈত্রীপরায়ণ নবজাতক। মানুষ সৎ হইয়াছে কারণ অসৎ হইয়া তাহার লাভ নাই।
>
> মানুষে মানুষে হানাহানি মারামারির পরিবর্তে আসিয়াছে চুক্তি, সৌহার্দ্য, পরস্পর সহায়তা। যুদ্ধ চলিতেছে কেবল প্রকৃতির রাজ্যে। এখানে মানুষ একযোগে প্রতিকূল শক্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়া সমাজের কাজে খাটাইতেছে। সকল সন্দেহের নিরসন হইয়াছে, পৃথিবী জুড়িয়া বিপ্লবের দামামা বাজিতেছে, ঘরে ঘরে আসিয়াছে শান্তি মুক্তি ও কল্যাণ। ভিতরে ও বাহিরে কোথাও কোন বিপদের ভয় নাই। তাই এখন জীবন মধুময় হইয়াছে, বাঁচিয়া সুখ আছে।[১২]

বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ছিল না। ইয়োরোপ ও আমেরিকার দেশে দেশে, বিশেষ করে স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্পেনে শ্রমিক আন্দোলনের প্রবর্তক প্রুদঁর শিষ্য পি ই মারগাল। তিনি ছিলেন সমাজবাদী ও রাষ্ট্রবিরোধী। তাঁর তৈরী জমিতে বাকুনিন বীজ ফেললেন। স্পেনীয় শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে লেখা ইস্তাহার এবং ফানেলির সংগঠন শ্রমিক আন্তর্জাতিকের স্পেনীয় শাখাকে মার্কস্‌বিরোধী নৈরাজ্যবাদী শিবিরে টেনে নিয়ে এল। ১৯১০ সালে ল্যাটিন স্বাতন্ত্র্যবাদের ঐতিহ্য বহন করে স্থাপিত হল কনফেদারেসিয়ন নাসিয়নাল দেল ত্রোবাজো নামে সিণ্ডিক্যালিস্ট শ্রমিক ফেডারেশন, সংক্ষেপে সিএনটি।

১৯৩৬ সালের উনিশে জুলাই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফাসিস্ত বিদ্রোহের সূত্রপাত হল। এই কালশনিকে রুখবার কাজে অগ্রণী হয়ে এল সিএনটি এবং তার সমধর্মী আইবেরিয়ার এনার্কিস্ট্‌ ফেডারেশন ফাই (এফ. এ. আই)। লড়াইর সাথে সাথে তারা জোতজমি চাষী সমবায়ের হাতে আনল, কলকারখানা শ্রমিক ইউনিয়নের হাতে আনল। ক্যাটালনিয়া ও বার্সিলনা থেকে আন্দোলন উপদ্বীপের অন্যান্য অংশে বিস্তারিত হল এবং সমাজতন্ত্রী দলের ইউনিয়নগুলিকে ফাসিবিরোধী সংগঠনে ভাঙিয়ে নিয়ে এল, চাষী ও মজুরদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবিদেরও অনেকে এসে জুটল। সকলের সমবেত চেষ্টায় ক্যাটা-লনিয়ার অর্থনৈতিক চেহারা ফিরে গেল। জমির তিনচতুর্থাংশ এল চাষী সমবায়ের যৌথকর্তৃত্বে। বাকি জমি স্বল্পবিত্ত চাষীপরিবারগুলির মধ্যে লোকসংখ্যার অনুপাতে বেঁটে দেওয়া হল। সামুদায়িক কৃষির হিড়িক এরাগনেও পেঁছিল। এখানে পতিত জমির শতকরা চল্লিশ ভাগ আবাদ হল পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্র ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগে।

যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এরা অসাধ্যসাধন করল। সিএনটি ভার নিয়ে রেলগাড়ি,

---

[১২] অনুবাদ, শার্লট ও ফ্রেডারিক চার্লস, অক্সফোর্ড ১৯২৩, ২০৩ পৃষ্ঠা।

ব্যাসলারি ও জাহাজ চালাল, বিজলি কাপড় ও যন্ত্রের কারখানা চালাল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে উৎপাদনের সংস্কার হল। যুদ্ধের রসদ পয়দা করবার জন্যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শত শত কারখানা বসল। এদিকে সিএনটির পরিচালনায় এক লক্ষ বিশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক ফাসিস্তদের সঙ্গে লড়ছে, আর ওদিকে যুদ্ধধ্বস্ত অঞ্চলের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিচ্ছে ক্যাটালনিয়া। ইংল্যান্ডের ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির সম্পাদক ফেনার ব্রকওয়ে এই সময়ে (১৯৩৭) স্পেন ঘুরে এসে লিখেছিলেন "সামনে তারা ফাসিবাদের সঙ্গে লড়ছে, পিছনে তারা গড়েছে নবীন শ্রমিকসমাজ। তারা দেখেছে যে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর সমাজবিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, দুটি কাজ অবিচ্ছেদ্য।"[১৩] স্পেনের দারুণ সংকটের কালে সিন্ডিকেটগুলি দেখিয়েছে যে তারা সমান মাত্রায় সামরিক শক্তি ও গঠনপ্রতিভার অধিকারী।

এ সত্ত্বেও তারা ফাসিস্ত বাহিনীকে রুখতে পারেনি। ফাসিস্তদের হাতে ছিল প্রচুর কাঁচা মাল, তারা পেয়েছিল হিটলার ও মুসোলিনির সামরিক সাহায্য, আর তাদের সঙ্গে ছিল গৃহশত্রু পঞ্চম বাহিনী। পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা বিদেশের শ্রমিক দলগুলির থেকে বিশেষ কিছু সাড়া পায় নি, নিজ নিজ দেশের সরকারকে স্পেনে সৈন্যসাহায্য পাঠাবার জন্যে তারা বিশেষ কোন চাপ দেয়নি।

ফ্রান্সের সিজিটি ও স্পেনের সিএনটির মত আর একটি লড়াকু শ্রমিকসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আই ডব্লিউ ডব্লিউ। ইয়োরোপের চেয়ে এখানে ধনতন্ত্র ফেঁপে উঠেছিল অনেক বেশী এবং ধনিকসংঘগুলির ছিল অপর্যাপ্ত ক্ষমতা। এখানে বিদেশ থেকে আনকোরা মজুর আসত দলে দলে যে আপদ ইয়োরোপে ছিল না। মার্কিন শ্রমিকদের হাত ছিল কাজে পাকা, তাদের মজুরিও ছিল মোটা। বলতে গেলে এখানে দুটি আলাদা শ্রমিকশ্রেণী গজিয়ে উঠল যাদের জীবনের মানমাত্রা এক নয়। সুদক্ষ কারিগররা সংগঠিত হল আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারে, আনকোরা বহিরাগতের দল এসে ভিড়ল ইন্ডাস্ট্রিয়েল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ালর্ড-এর ঝান্ডার নীচে।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে শিকাগোয় শ্রমিকনেতাদের এক বৈঠকে এই সংঘটির পত্তন হয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এর ভেতর এক মতভেদ দেখা দিল। সমাজবাদী নেতা দ্য লিওঁ চাইলেন একদিকে আই ডব্লিউ ডব্লিউ যেমন অর্থনীতির ওপর শ্রমিক প্রভাব বাড়াতে থাকবে অন্যদিকে তেমনি সমাজবাদী দল নির্বাচনে নেমে সরকার দখল করবে, করে রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করবে। বিল হেউড ও ভিনসেণ্ট সেণ্টজন প্রমুখ সিন্ডিক্যালিস্ট নেতারা এ মতে সায় দিলেন না। দলবাজি ও ভোটাভোটির মধ্যে না গিয়ে তারা চাইলেন সরাসরি রাষ্ট্রকে উৎখাত করতে। এই বিবাদে সংগঠন দু' দুবার ভেঙে গেল (১৯০৬, ১৯০৮)। বিদেশী আনকোরা মজুরদের ভোট ছিল না—তাই রাজনৈতিক দলের ওপর তারা ভরসা করত না। এদের সমর্থন পেয়ে সিন্ডিক্যালিস্টরা জিতে গেল। এ পর্যন্ত আই ডব্লিউ ডব্লিউর সংবিধানের গৌরচন্দ্রিকায় সমাজবাদী রাজনৈতিক কর্মপন্থার স্বীকৃতি ছিল। এবার সেটুকু তুলে দিয়ে সংবিধান সংশোধন করা হল। দ্য লিওঁ সংগঠন ছেড়ে এসে সোস্যালিস্ট লেবার পার্টি নামে একটি দল তৈয়ারী করলেন।[১৪]

---

[১৩] রুডলফ রকার : এনার্কো-সিন্ডিক্যালিজম, লন্ডন, ১৯৩৮, ১০১ পৃষ্ঠা।

[১৪] ১৯১২ সালে সোস্যালিস্ট পার্টি সিন্ডিক্যালিস্টদের দল থেকে তাড়িয়ে দেয়। এতে দুই মতের ভেদরেখা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সংশোধিত গৌরচন্দ্রিকায় ঘোষিত হল যে অর্থনৈতিক অস্ত্রই সর্বেব। ইউনিয়নের আওতায় গোটা শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত হবে, ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে চলবে আপসহীন সংগ্রাম যতদিন না তারা পরাস্ত হয়ে হৃতসর্বস্ব হয়।

> মজুরশ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে কোথাও মিল নাই......এই দুই শ্রেণীর পরস্পর সংঘর্ষ চলিবে যতদিন না দুনিয়ার মজদুর শ্রেণীগত ঐক্য লাভ করিয়া সারা পৃথিবী ও উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ করায়ত্ত করে এবং অন্নদাসত্বের অবসান ঘটায়।

সমাজবাদীরা বেরিয়ে যাবার পরে আই ডব্লিউ ডব্লিউকে আরো ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল। এর প্রধান অংগ ছিল পাশ্চাত্ত্য খনিমজুর ফেডারেশন। ১৯০৭ সালে এই সংঘ রক্ষণশীলদের হাতে আসার পর পিতৃসংস্থা থেকে বিদায় নিল। এ সত্ত্বেও আই ডব্লিউ ডব্লিউর তাগদ রয়ে গেল যথেষ্ট। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে গতিমুখে অজস্র নিম্ন-স্তরের মজুরকে টেনে আনল এরা। মধ্যপশ্চিমের চরমান শ্রমিকদের ঠাঁই ছিল শিকাগোর দপ্তরে—সংস্থার পত্রিকা অফিসও ছিল এখানে। এদের লড়াই সবচেয়ে ঘোরাল হয়ে উঠেছিল ১৯১২ সালে যখন ম্যাসাচুসেট্স্-এর লরেন্স সুতাকলের ত্রিশ হাজার মজদুর ধর্মঘট সফল করে দাবি পুরিয়ে নেয়। ভাষণের স্বাধীনতা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকারের জন্যেও আই ডব্লিউ ডব্লিউ লড়েছে কম নয় এবং এ সব দংগলে কখন কখন মারামারি রক্তারক্তিও ঘটেছে খুব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এদের অনেকে সরকারী ডাক অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। যুদ্ধের পর এদের ওপর সাঁড়াশির কামড় পড়ল দুদিক থেকে। একদিকে রাজ্যসরকারের দমন-নীতি, অন্যদিকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চাপ। ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে শিকাগোর আদালতে বিচারে এদের মাথা মাথা লোকেদের দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হয়ে গেল। আইন করে বিদেশ থেকে বেকার মজুর আসা রদ হল,—আই ডব্লিউ ডব্লিউর সভ্যতালিকায় ভাঁটা পড়ল। বাকি বকেয়ার মধ্যে অনেকে আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টিতে ভিড়ে পড়ল। সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এর গরম হাওয়া তুষারপাতে জুড়িয়ে গেল।

সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এর জোয়ারে ভাঁটা পড়ল রুশবিপ্লবের পর থেকে। ১৯১৯ সালে বলশেভিক দল সারা দুনিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক সংস্থাগুলিকে পরবৎসর মস্কোতে সমবেত হয়ে একটি নূতন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠন করবার জন্যে আমন্ত্রণ পাঠাল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিক্ষিপ্ত সিণ্ডিক্যালিস্ট শক্তিগুলিকে একত্র করে দলে টানবার ফিকিরে ছিলেন লেনিন। সময়টা ছিল প্রশস্ত কারণ রুশ বিপ্লবের আকস্মিক ও চমকপ্রদ কীর্তিতে তারা তখন মুগ্ধ। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে মস্কোর কংগ্রেসে সম্মিলিত হয়ে তারা তৃতীয় শ্রমিক আন্তর্জাতিক গঠনে সম্মতি দিল।

তাদের মোহ ভাঙতে বেশী দিন লাগল না। কিছুদিনের মধ্যে তারা প্রলিতারিয় একনায়কত্বের স্বরূপ দেখতে পেল। অবলশেভিক সমাজবাদীদের সঙ্গে রুশ নৈরাজ্য-বাদীদের জায়গা হল জেলখানায়। বলশেভিক রুশের কূটনীতির সমর্থনে গোটা ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলনকে কাজে লাগানো হল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কূট-কৌশল। সিণ্ডিক্যালিস্টরা বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সংঘ গড়তে চাইল, কমিউনিস্টরা রাজী হল এই সর্তে যে সে সংঘ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তাঁবে

থাকবে। ১৯২১ সালে মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তাঁবেদার একটি শ্রমিক কংগ্রেসের অধিবেশন হল—সেখানে সিণ্ডিক্যালিস্টরা হেরে গেল। ১৯২২-২৩ সালের বড়দিনে তারা বার্লিনে এক পাল্টা অধিবেশন করল। আর্জেণ্টিনা, চিলি, মেক্সিকো, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইডেন, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরা মিলে ইণ্টারন্যাশন্যাল ওয়ার্কিংমেন্স্ এসোসিয়েশন নামে এক আন্তর্জাতিক সিণ্ডিক্যালিস্ট সংস্থা তৈরি করল। নূতন আন্তর্জাতিকের বিঘোষিত নীতিমালার দ্বিতীয় দফায় বলা হল—

> বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজ্ম্ সর্ববিধ আর্থিক ও সামাজিক একাধিকারের অবিচল প্রতিদ্বন্দ্বী। দল ও সরকারের তাঁবেদারি হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত স্বাধীন শ্রমিকপরিষদের ভিত্তির উপর মাঠের ও কারখানার মজুরদিগকে লইয়া স্বাতন্ত্র্যশীল সমাজ সৃষ্টি করা ও সমাজকৃত্য পরিচালনার ব্যবস্থা করা ইহার লক্ষ্য। রাষ্ট্র ও দলের রাজনীতির পরিবর্তে ইহা নির্ভর করে শ্রমিকের অর্থ-নৈতিক সংগঠনের উপর। ইহা মানুষকে শাসন করিতে চায় না, চায় বিত্তের ব্যবস্থাপনা। সুতরাং ক্ষমতা অধিকার করা ইহার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সমাজ-জীবন হইতে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার দূর করা। ইহা বিশ্বাস করে যে বিত্তের একাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার একাধিকারেরও বিলোপ করিতে হইবে; এবং রাষ্ট্রকে যে কোন আকারে হাজির করিলে, তাহা প্রলিতারিয় এক-নায়কত্ব হইলেও সর্বদা নূতন একাধিকার ও নব নব স্বার্থের জন্ম দিবে, কখনো জনমুক্তির সহায় হইবে না।

এই থেকে কম্যুনিজ্ম্ ও সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এ ছড়াছড়ি হল—আই ডব্লিউ এম এ চলল নিজের রাস্তায়। ১৯৩৩ সালে এর কেন্দ্রীয় দপ্তর বার্লিন থেকে হল্যাণ্ডে সরিয়ে আনা হল, তারপর মাদ্রিদে। তখন এর চলবার শক্তি নেই, এর কোষগুলির জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আই ডব্লিউ ডব্লিউ ম্রিয়মান। ফ্রান্সে ১৯০৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হবার পর থেকেই সিজিটিতে ভাঙন ধরেছিল—একদল বিপ্লব ছেড়ে শান্তিময় সংস্কারের পথ ধরেছিল, আর একদল তাঁর ভিড়িয়েছিল কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকে, কেবল এক টুকরো সিণ্ডিক্যালিস্ট গোষ্ঠী বার্লিনের আই ডব্লিউ এম এ-তে এসে যোগ দিয়েছিল। মুসোলিনি ও হিটলারের অভ্যুত্থানের পর ইটালী ও জার্মানীর ছোট ছোট শাখাগুলি নিশ্চিহ্ন হল। পর্তুগাল ও স্পেনে একনায়কত্বের পাল্লায় পড়ে সিণ্ডিকেটগুলির একই হাল হল। স্পেনে প্রাইমো ডি রিভেরার তিরোধানের পর তারা আবার মাথা তুলেছিল বটে কিন্তু ফ্রাঙ্কোর কবল থেকে বাঁচোয়া ছিল না। পূর্ব ইয়োরোপের সিণ্ডিক্যালিস্টরা একদিকে জার্মান নাৎসি অন্যদিকে রুশ কম্যুনিস্টদের জাঁতাকলে পড়ে ছারখার হয়ে গেল। কেবল সুইডেনের সঙ্ঘটি এই জাঁতাকল থেকে রেহাই পেয়ে কোন রকমে টিকে রইল। আরজেনটিনার সঙ্ঘ ফেদারেসিয়ন ওবেরা রিজিয়ন্যাল আরজেনতিনা জেনারেল উরিবুরা ও পেরঁর একতন্ত্র থেকে আত্মগোপন করে রক্ষা পেল। ১৯২৯ সালের মে মাসে ফোরা সারা দক্ষিণ আমেরিকার একটি সিণ্ডিক্যালিস্ট কংগ্রেসও আহবান করেছিল। এই কংগ্রেসে তারা গঠন করেছিল সারা আমেরিকার ওয়ার্কিংমেন্স্ এসোসিয়েশন। এটি ছিল আই ডব্লিউ এম-এর আমেরিকান শাখা এবং এর কেন্দ্র ছিল বুয়েনস আইরেস, পরে উরুগুয়ে।

সিণ্ডিক্যালিস্ট আন্দোলনের ধার ক্ষয়ে যাবার কারণ শত্রুপক্ষের উৎপীড়ন ততটা নয়,

যত তার নিজস্ব ত্রুটি ও দুর্বলতা। মধ্যবিত্তদের আশ মিটিয়ে গালাগালি দিলেও এদের অনেকেই ঐ শ্রেণী থেকেই এসেছিলেন, যেমন পেলুতিয়ে, সরেল, লাগার্দেল। মধ্যবিত্ত সমাজবাদীদের সামাজিক কল্পনার মত তাদেরও সাধারণ ধর্মঘটের ভাষ্য ছিল সমান ধোঁয়াটে ও অবাস্তব। পাতাউ ও পুজের বিপ্লবের খসড়া এই কল্পনাবিলাসের একটি সুন্দর নমুনা। ক্রপটকিন 'রুটির জয়'তে যে সহযোগী মুক্ত সমাজের একটু আভাস দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন এরা তার ওপর কল্পনার রঙ্ চড়িয়েছেন। মানবচরিত্র ও বাস্তব পরিবেশকে এরা পছন্দ মত সাজিয়ে নিয়েছেন যাতে বিপ্লবের স্রোত অবাধ গতিতে বইতে পারে। সবই যেন বিদ্রোহীদের জয়যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। ক্রপটকিনের মত যে আশাবাদী তিনিও ভূমিকায় লিখছেন—

> সমাজবিপ্লবের গতিপথে যে প্রতিরোধ আসতে পারে ইহারা তাহাকে বহুলাংশে এড়াইয়া গিয়াছেন। রাশিয়ায় বিপ্লবের উদ্যোগ যে বাধা পাইয়াছে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়াছে এইরূপ কল্পনাবিলাস হইতে কত প্রকার বিপদ আসিতে পারে।[১৫]

দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক নেতাদের চেয়ে উচ্চবিত্ত প্রিন্সের বাস্তববোধ একটু বেশিই ছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং সাধারণ ধর্মঘটের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা প্রুদোঁ বাকুনিন ও ক্রপটকিন তিনজনেই টের পেয়েছিলেন। তাঁরা শ্রমিকসংস্থা ও ধর্মঘটের সাফল্য মুক্তকণ্ঠে কামনা করেছেন, মুক্ত সমাজের বাহক বলে শ্রমিককে আশীর্বাদ করেছেন। ধর্মঘটের বলে শ্রমিকরা শ্রেণীগত সুবিধা শুধু আদায় করে নি, কখনো কখনো বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনও সাধন করেছে। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় সাধারণ ধর্মঘট জারকে আধাগণতান্ত্রিক সংবিধানে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। ১৯২০ সালে জার্মানীতে এক জঙ্গীদল আচমকা সরকার দখল করে নেওয়ার পর জার্মান শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট করে তাদের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়েছিল। পার্লামেণ্টি সমাজবাদীরা বৈধ উপায়ে যে সকল সংস্কার অর্জন করেছে শ্রমিক ধর্মঘটের চাপ পেছনে না থাকলে তা সম্ভব হত না।

কিন্তু শ্রমিকধর্মঘট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতকাম হয়েছে তখনই যখন এক বৃহত্তর গণআন্দোলনের সঙ্গে এ জড়িত থেকেছে এবং জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে। অন্যথায় শ্রেণীগত সংগ্রামেও ধর্মঘট বড় একটা সফল হয় না। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে ফ্রান্সে যখন সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এর স্বর্ণযুগ তখন সেখানে যে কটি ধর্মঘট হয় তার মধ্যে সফল হয়েছিল শতকরা ২৩টি, বিফল হয়েছিল শতকরা ৪১টি, মিটমাট হয়েছিল শতকরা ৩৬টির।[১৬] ১৯০৬ সালে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে সিজিটির অতবড় যে জীবনমরণ ধর্মঘট তাও বরবাদ হয়ে গেল, অনেক শ্রমিককে বিনাসর্তে কাজে ফিরে যেতে হল, বহু ইউনিয়ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সকল যুদ্ধেই অবশ্যি হারজিত আছে। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র যখন তখন ছাড়তে নেই, তাতে তার গুণ নষ্ট হয়ে যায়। সফলতার দিকে না তাকিয়ে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা বাড়াবার জন্যে পারলেই ধর্মঘট করতে হবে এমন বেয়াড়া যুক্তি আর হয় না। ধর্মঘটে হেরে যাওয়ার পর শ্রমিকের মনে কি পরিমাণ অবসাদ আসে, সংগ্রাম এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে

---

[১৫] ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারীতে লেখা, ১৯০৫ সালের বিপ্লবপ্রচেষ্টার উল্লেখ।
[১৬] সরকারী সংখ্যা—এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ্ম্, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

পিছিয়ে যায় কত বেশি তা আজ কারও অজানা নয়। যে ইংল্যাণ্ডকে শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনে ফ্রান্সের অগ্রজ বলা যেতে পারে সেখানেও ১৯১২ সালে খনিমজুরদের ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে গিয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রের যুদ্ধ সংগঠন ও সম্বলের লড়াই। সম্বলে সর্বদা এবং সংগঠনে অধিক সময়ে ধনিকরা শ্রমিকদের চেয়ে বলবান।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের দ্বিতীয় অস্ত্র সাবতাজ। এটি শাঁখের করাত, দুদিকেই কাটে, যেমন ধনিককে তেমন শ্রমিককে। সরেল কাজে ঢিলে দেওয়া এবং মালপত্র খারাপ করার নিন্দা করেছেন কারণ এতে শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি ব্যাহত হয়, আর বিপ্লবের সফলতা নির্ভর করছে এই শক্তির ওপরই। বস্তুত সাবতাজের ভাঙননীতি শিশুমনোবৃত্তির পরিচয়, ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের যখন ইউনিয়ন গড়বার অধিকার ছিল না তখন লুডাইট নামে পরিচিত তাদের একদল মেশিন ভেঙে তার ওপর রাগ ঝাড়ত। শৈশবের এই পাগলামি পরিণত বয়সের শ্রমিক আন্দোলনে সাজে না। এসব বুঝলেও দার্শনিক সরেল আন্দোলনের নেতাদের সামলাতে পারেন নি। শ্রেণীসংগ্রাম ও হিংসার যে অনর্গল উত্তাপ তিনি বর্ষণ করেছিলেন তাতে সংগ্রামীরা এমনি তেতে উঠেছিল যে আখেরের কথা ভাববার অবসর তাদের ছিল না। শত্রুকে যে কোন উপায়ে ঘায়েল করা হল একমাত্র লক্ষ্য—এবং যন্ত্রভাঙা, মালে ভেজাল, কাজে ঢিলেমি এর চেয়ে মোক্ষম উপায় আর কি আছে? এর ফলে মালিকের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি হল খরিদ্দারের, সাধারণ লোক শ্রমিকআন্দোলনের ওপর বিগড়ে গেল।

কোনও ব্যবস্থা বিপ্লবের আঘাতে ধ্বসে পড়ে তখনই যখন নিজের গলদে তার গোড়া ক্ষয়ে যায়, যখন তার আয়ু ফুরিয়ে আসে, উন্নতির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। মার্কস্‌ও এ কথাই বলেছেন। সরেল শোনালেন এক অদ্ভুত কথা যে ধনতন্ত্র যখন চরম সৃষ্টিক্ষম তখনই তাকে নাশ করতে হবে। কজেই চাই এমন এক দৃঢ়মতি ধনিকশ্রেণী যারা সূচাগ্র ভূমি ত্যাগ করবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় ধনিকরা এরকম গোয়ার্তুমি না করে আপসের রাস্তা ধরল, শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবি মিটিয়ে বিপ্লব থেকে তাদের সংস্কারের পথে টেনে নিয়ে এল।

এখানে কার্ল মার্কস্‌ও ভুল করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ধনিকদের নির্বোধ স্বার্থপরতাই শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে দেবে, বিপ্লব আনবে। ধনিকরা স্বার্থপর বটে তবে নির্বোধ নয়। তারা বোঝে শ্রমিকরা চায় ভাতকাপড়, বিপ্লব নয়। তারা স্বভাবত শান্তিপ্রিয়, সংস্কারবাদী। মুনাফার ছিটেফোঁটা দিয়ে তাদের তুষ্ট রাখা কিছু কঠিন নয়। তার ওপর সার্বজনীন ভোটাধিকার দিয়ে, কল্যাণকর আইন করে তারা বিপ্লবের ধার ভোঁতা করে দিল, শ্রমিক বেছে নিল নির্বাচন ও আইনরচনার পথ।

সিণ্ডিক্যালিজম্‌-এর গঠনমূলক পরিকল্পনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা যান্ত্রিক শিক্ষার অভাব। ভবিষ্যতের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে সিণ্ডিক্যালিস্টরা কারিগরদের সমবায় সমিতি গড়ে উৎপাদন চালাবার চেষ্টা করেছে। এগুলো টেকে নি। হয় তারা ব্যবসা গুটিয়েছে নয়ত মালিক-মজুর সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সে চশমাওলাদের একটা সমবায় সমিতি তৈরী হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল তাদের মধ্যে ৬৫ জন সভ্য মালিক আর ১৩০০ জন মজুর।[১৭] সমবায় সমিতির না আছে পুঁজি ও যন্ত্র, না আছে যান্ত্রিক শিক্ষা। প্রথম দুটি না হয় বিপ্লব করে হস্তগত হল, তৃতীয়টি বিপ্লবে

---

[১৭] ওয়েই : ইস্তোয়ার দ্যু মুভমাঁ সোসিয়াল আঁ ফ্রাঁস, ৪৪৩ পৃষ্ঠা, পাদটিকা।

আসবে না। সরেল তাঁর লাভেনির সোসিয়ালিসৎ দে স্যাঁদিকা (ইউনিয়নগুলির সমাজ-তান্ত্রিক ভবিষ্যৎ, ১৮৮৭) পুস্তিকায় বার বার এই শিক্ষালাভের জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু ইস্পাত, রসায়ন ইত্যাদি বড় বড় শিল্পের যান্ত্রিক বিদ্যা বুর্সেগুলি পাবে কোথা থেকে যে শ্রমিকদের শেখাবে? অবশ্য এ কাজ যে অসাধ্য নয় স্পেনের সিণ্ডিকেটগুলি তা দেখিয়েছে।

সরেলের সকল মিথের সেরা সর্বহারার নৈতিক ভূমিকা। অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত, বিনাশনে, বিযোদ্গারে অভ্যস্ত, চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বিবেকমুক্ত "সমাজযুদ্ধের এই বীর সৈনিকেরা" জয়লাভের পর এক অনুপম মহানুভবতা নিয়ে সংগঠন ও উৎপাদনের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করবে, একদিকে তারা আনবে সাম্য ও মুক্তি আবার পরিচালনার জন্যে উচ্চতর প্রতিভাও বজায় রাখবে, প্রতিভার সঙ্গে সমতার, পরিচালনার সঙ্গে মুক্তির সামঞ্জস্য ঘটাবে "সর্বহারা বীরপুরুষ", সমাজবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আনবে নৈতিক বিপ্লব! বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলতে পারে কিন্তু বিপ্লব মেলে না। চরম আদর্শবাদীদের অদৃষ্টে যা থাকে সরেলের কপালেও জুটেছিল সেই হতাশা। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে বোলোনায় ইটালীয় সিণ্ডিকেটগুলির এক সম্মিলন হয়—সেখানে সরেল মত বর্জন করে এক চিঠি পাঠান ও চিঠিটা পড়া হয়।[১৮] রুশ ও ইটালীয় বিপ্লবের পর আবার তাঁর আশা উজ্জীবিত হয়ে উঠল। লেনিন ও মুসোলিনিকে তিনি সম্বর্ধনা করলেন। তাঁরা নিজ নিজ দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা নিচ্ছেন তাতে শ্রমিক গণতন্ত্রের ভিত তৈরী হচ্ছে এতে তাঁর সন্দেহ রইল না।

বিস্ময় লাগতে পারে এতরকমের আজব কথার ভেলকি দিয়ে সরেল একটা আন্দোলনের মন্ত্রদান করলেন কেমন করে? করলেন এই জোরে যে শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনায় তিনি শুড়শুড়ি দিতে পেরেছিলেন, তাদের যুক্তিহীন অবচেতন মনকে তিনি ছুঁতে পেরেছিলেন। জবরদস্তি ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রশস্তি গেয়ে তিনি শক্তিপূজারী নীট্শে ও ফাসিস্ত নায়ক মুসোলিনির মধ্যে সেতু বাঁধলেন আর তাঁর গুরু মার্ক্স্ ও প্রুদঁর আদ্যশ্রাদ্ধ করলেন। তিনি লেনিনকে প্রলিতারিয় রোমের স্থাপয়িতা বলে বন্দনা করেছিলেন, লেনিন এই বাক্য-বিলাসের জবাবও দেননি। মুসলিনি তাঁর স্তুতির প্রতিদান দিয়েছিলেন সিণ্ডিক্যালিস্ট গুরুটিকে ফাসিজ্ম্-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাতা বলে সার্টিফিকেট দিয়ে!

সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এর কিছু অদলবদল করে ইংল্যাণ্ডে গিল্ড সোস্যালিজ্ম্ নামে একটি মতবাদ গড়ে ওঠে। এর প্রচারক কোল, হবসন প্রভৃতি, এরও লক্ষ্য "মালিকমজুর সম্পর্ক তুলে দিয়ে শিল্পে শ্রমিকের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা।" রাষ্ট্রে এখন সকল দায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রায়িত। এর জায়গায় চাই এক বৃত্তিমূলক গণতন্ত্র যেখানে এক এক বৃত্তি ও সমস্বার্থ অবলম্বন করে এক একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠবে, স্বাতন্ত্র্য রেখে নিজ নিজ কাজ চালাবে। এভাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতা হবে বিকেন্দ্রিত। উদ্যোক্তাদের গোষ্ঠীর পাশাপাশি থাকবে ভোক্তাদের গোষ্ঠী, বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর পাশাপাশি আঞ্চলিক গোষ্ঠী। এরা পরস্পর চুক্তি করে স্থির করবে কাজের সময়, দক্ষিণা, দাম, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি। সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এর বৈপ্লবিক প্রণালীর বদলে গিল্ড সোস্যালিজ্ম্ ধীরগতির পক্ষপাতী। ইউনিয়ন জোরদার হলে সাধারণ ধর্মঘটের ঝুঁকি না নিয়েও কাজ আদায় হতে পারে। যেমন এনক্রোচিং কনট্রোল ও কলেক্টিভ কনট্র্যাক্ট। প্রথমটিতে শ্রমিকরা

[১৮] এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ্ম্, ২০৯ পৃষ্ঠা।

একটু একটু করে চাপ দিয়ে কারখানা চালাবার দায়িত্বে ভাগ বসাবে। দ্বিতীয়টিতে ইউনিয়ন শ্রমিকদের হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের ভার এবং তাদের মজুরি একসঙ্গে গ্রহণ করবে। গিল্ড সোস্যালিস্টরা রাষ্ট্রকে একেবারে খারিজ করে না। অন্যান্য বৃত্তি-মূলক গোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্র হবে একটি—দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, রাজস্ব ইত্যাদি সমাজকৃত্য নিয়ে সে থাকবে। রাষ্ট্রের স্থান সম্বন্ধে এরা সকলে একমত নয়। কারও কারও মতে শ্রমিক বা উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৃত্তি-অবলম্বী যে গোষ্ঠী-সমন্বয় গড়ে উঠবে, ভোক্তাদের নিয়ে আঞ্চলিক গোষ্ঠীসমন্বয় হবে তার পাল্টা, সমপর্যায়-ভুক্ত ও সমক্ষমতাপন্ন, যার শীর্ষদেশে থাকবে সরকার। গিল্ড সোস্যালিস্টরা তাদের পরিকল্পনাটিকে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজবাদ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় সিণ্ডিক্যালিস্টদের এক-চেটিয়া ব্যবসায় ঘা পড়ল, তারা নাক সিঁটকিয়ে বলল, এতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধোঁয়াটে গন্ধ—এ মাল খাঁটি নয়। রার্ট্রাণ্ড রাসেল কিন্তু এদের এই বলে সনদ দিলেন যে, "এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর হয়নি। অবিরাম হিংসায় আবেদনের যে ভয় খাঁটি নৈরাজ্যবাদী বিধানে রয়ে গেছে তাকে এড়িয়ে স্বাধীনতায় পেঁাছবার সবচেয়ে সম্ভবপর রাস্তা এইটেই।"[১১]

এঁদের কাছে দুটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রথমত, যে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে সেনা, পুলিস ও রাজস্ব সে কি অন্যান্য বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর সমপর্যায়ে কারও স্বাধীনতায় হাত না দিয়ে বিড়াল তপস্বীর মত বসে থাকবে? দ্বিতীয়ত জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী গিল্ডসমাজ গড়ে তোলবার সম্বল শ্রমিকশ্রেণীর কোথায়?

সিণ্ডিক্যালিজ্ম্ ও গিল্ড সোস্যালিজ্ম্ উভয়ের ধ্যানজ্ঞান এক শ্রেণীসর্বস্ব সমাজবাদ। এর জন্যে দরকার শ্রেণীর পূর্ণ বিকাশ, অর্থাৎ সমস্বার্থে আবদ্ধ ঐক্যসচেতন জনগণ। এই ঐক্যবদ্ধ জনগণের বিস্তৃতি এতদূর হতে হবে যাতে শাসন ও প্রভুত্ব বাদ দিয়ে সরকারী কাজ ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিপুল দায়িত্ব তারা হাতে নিতে পারে। এমন ঐক্যবদ্ধ গণশ্রেণী কোথায়? তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণী দ্বন্দ্বে ভরপুর। দক্ষ মোটা-বেতনের মজুর আর আনাড়ি দিনমজুর, জোতওলা চাষী আর ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, কারখানার শ্রমিক আর স্বাধীন হাতের কাজের কারিগর এদের মধ্যে স্বার্থ ও চেতনার কোন মিল নেই। এদের মধ্যে কিছু কিছু হতভাগ্যদের ক্ষেপিয়ে শিল্পসঙ্কট সৃষ্টি করা কিংবা সরকারী ক্ষমতা করায়ত্ত করা অসম্ভব নয়; কিন্তু এদের একসঙ্গে করে এক সমদর্শী মুক্ত সমাজ তৈরী করার কল্পনা প্লেটো ও টমাস মুরের স্বপ্নরাজ্যের মতই অবাস্তব।

স্বাধীনতার তপস্যায় সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এর অবশ্যই অবদান আছে। তবে তা সাধারণ ধর্মঘটের স্তোত্রপাঠে নয় বিপ্লবের মনোহারী চিত্রাংকনে নয়, শ্রমিকদের মধ্যে যে সাহস, স্বাধিকার বোধ ও আত্মবিশ্বাস এ জাগিয়ে তুলেছিল সেই এর অক্ষয় কীর্তি। এরা শ্রমিকদের যুযুৎসাকে বাঁচিয়ে না রাখলে ভোটের লড়াই ও আইনসভার চিৎকারে সমাজবাদ ডুবে যেত। আইনের মারফত শ্রমিকরা যাকিছু পেয়েছে তাও সংগ্রামী শ্রমিকদের দৌলতে। আধুনিক সমাজচিন্তায় এদের সবচেয়ে বড় নিবেদন বহুভিত্তিক বিকেন্দ্রিত সমাজের কল্পনা। শ্রমজীবী সমাজে বিভিন্ন বৃত্তি আশ্রয় করে স্বাতন্ত্র্যশীল সমিতি গড়ে উঠবে, এগুলি হবে মুক্ত সমাজের কোষ। এ ধারণা আজকাল বহুজনস্বীকৃত, যার বিকৃত অনুকরণের চেষ্টা ফাসিস্ত ইটালী ও কমিউনিস্ট রাশিয়াতেও হয়েছে।

---

[১১] রোড্‌স্ টু ফ্রীডম, লণ্ডন, ১৯৫৪, ৯২ পৃষ্ঠা।

বিশ্বজনীন ঐক্য

আর্ণল্ড টোয়েনবি

আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মানচিত্র পুনরঙ্কনের যে প্রচেষ্টা হয়েছে তাও অনেকটা পূর্ব ইউরোপীয় পদ্ধতিরই অনুরূপ। পূর্ব ইউরোপে ভাষাগত জাতীয়তা নামে যে মতবাদ প্রচলিত আছে ভারতবর্ষে তারই প্রয়োগ ঘটছে। আর, পূর্ব ইউরোপে ভাষাগত জাতীয়তার দাবীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে রাজনৈতিক মানচিত্র পুনরঙ্কনে, যে ক্ষোভ এবং সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়েছিল ভারতবর্ষেও ঠিক তাই দেখা দিয়েছে। এই শোচনীয় পরিণতি অবশ্য অনিবার্য। যতই নিখুঁতভাবে এবং যত্নসহকারে বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা অঙ্কন করা হোক না কেন, সেই সীমারেখার এদিকে ওদিকে কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে যেতে বাধ্য। তার ফলে বোম্বাইয়ের মত বৃহৎ বাণিজ্য ও শিল্প নগরীতে যে কঠিন সমস্যা দেখা দেয় তাও অনিবার্য। কারণ ঐ ধরনের নগরীতে ভাষার আঞ্চলিক সীমানা বহির্ভূত দূর দূর অঞ্চল থেকে নানাভাষী কর্মপ্রার্থী লোকেরা ভিড় করবেই। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষের এই বিরোধমূলক সীমানা পুনর্বণ্টন অনিবার্য ছিল। সমস্ত পৃথিবী জুড়েই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ব্রহ্মদেশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে হলেও একই ঘটনা ঘটছে। এটা অনিবার্য এই জন্য যে, তা নাহলে গণতন্ত্রকে কার্যোপযোগী রাখা যায় না। তাছাড়া, আমাদের কালে পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রমাগত গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রযুক্তও হচ্ছে। গণতন্ত্রের যথার্থ সার্থকতা যদি লাভ করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে ভাষাগত অঞ্চলে ভাগ করে নিতেই হবে। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কেবলমাত্র তার মাতৃভাষাই জানে, পৃথিবীতে দ্বিভাষী ও বহুভাষী মানুষের সংখ্যা এখনও নগণ্য।

অতএব মনে হয়, রাজনৈতিক খণ্ডীভবনের দিকে এই যে গতি চলেছে এরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রয়োজন আছে বলেই এটা যে বিভেদমূলক নয় এ কথা বলা যায় না। তাছাড়া খণ্ডীভবন অনিবার্য হোক আর নাই হোক, এর মধ্যে বিভেদের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কাজেই এ কথা কি যথার্থ নয় যে, আজকের দিনে মানুষ ঐক্যবদ্ধ বিশ্বজনীনতার উপলব্ধির পরিবর্তে বরং ক্রমশঃ পারস্পরিক ভেদবুদ্ধির দিকেই অগ্রসর হচ্ছে? তাছাড়া এ শুধু চেতনার কথা নয়, এই ভেদবুদ্ধির চেতনা এক শ্রেণীর জাতীয়তার আবেগ সঞ্চার করছে। লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরিণামস্বরূপ এক শ্রেণীর ভাষাগোষ্ঠীগত আবেগ জন্মলাভ করেছে। এশিয়ায় যদিও এ উপদ্রব নূতন, কিন্তু ইউরোপে এ উপদ্রব অনেক দিনের পুরাতন। ভারতবর্ষে বোম্বাইয়ে এই নিয়ে মারাঠা এবং গুজরাটীদের মধ্যে উত্তেজনা যথেষ্ট দেখা দিয়েছিল।

যদি আমরা বিশ্বজনীন ঐক্য স্থাপনের জন্য কৃতসঙ্কল্পই হই—ঐক্য স্থাপিত না হলে বিশ্বব্যাপী যে মহাপ্রলয় ঘটবে সে বিষয়েও যদি নিশ্চিত হই তাহলে বৃথা সুখকর কল্পনাবিলাসে নিমজ্জিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বরং এ বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন যে, বর্তমান মুহূর্তে ঐক্যের বিপরীত দিকেই ঘটনার গতি অগ্রসর হ'চ্ছে। এই ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলির প্রভাব বা ক্ষমতাকে যেন কেউ তুচ্ছ জ্ঞান না করেন।

বর্তমান কেন্দ্রাভিগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলির কোন্‌টার কতখানি ক্ষমতা সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা রাখতেই হবে।

ভেদমূলক শক্তিগুলি কি কি হতে পারে? আমরা ইতিমধ্যেই একটির পরিচয় নির্ণয় করেছি। ভাষাগত জাতীয়তা গণতন্ত্রের উপজাতক। বর্তমান মুহূর্তে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দিগন্তে যে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ঘটেছে, তাও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে,—কিছুদিন পূর্বে অতলান্তিক সমুদ্রোপকূলবর্তী ইউরোপীয় উপদ্বীপের আধ ডজন রাষ্ট্র মিলে পৃথিবীর বৃহৎ এক অংশজুড়ে, বৃহৎ জনসংখ্যার উপরে যে শাসনাধিপত্য চালিয়ে গেছে এ তারই পরিণাম। ইউরোপের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি বিশ্বগোলাধের্বর চতুর্দিকে যে শাসন-জাল বিস্তার করেছিল সে একটা অস্বাভাবিক রাজনৈতিক উপসর্গ। এখন প্রমাণিত হল যে, এ উপসর্গ শুধু অস্বাভাবিক নয় অস্থায়ীও।

আমাদের জীবদ্দশায়ই দেখছি, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির বিলুপ্তি আরম্ভ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই বিলুপ্তির পর্ব দ্রুতবেগে অগ্রসর হ'চ্ছে। বস্তুত পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র স্বাভাবিকতায় ফিরে আসছে।

এই ঘটনাকে স্বাভাবিক বলছি এইজন্য যে, পশ্চিম ইউরোপের ঔপনিবেশিক যুগের বহুদেশের মানুষকে যে পরাধীন অবস্থায় বাস করতে হয়েছে সেটা স্বাভাবিক ছিল না। আবার, এই স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার মানে অবশ্য এই নয় যে, পৃথিবী ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বেকার অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তন করছে। সাম্রাজ্যগুলি মনুষ্য জাতিকে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ঐক্যের সন্ধান দিতে পারেনি। এদের ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক অসাম্যের উপরে, কাজেই এগুলি নিতান্তই বালির বাঁধের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। অতএব ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-গুলির রাজনৈতিক কাঠামো যে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু এগুলি কেবলমাত্র রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না, এদের ভিতর দিয়ে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, সহযোগ এবং সম্মিলনের একটা ধারা প্রবাহিত হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্বল্পস্থায়ী সাম্রাজ্য শাসনের ঊর্ধ্বে স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব দুইই লাভ করবে।

বর্তমান জাতীয়তাবাদের বৈনাশিক দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে যদি এর সৃজনশীল অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে একথা আরও সুস্পষ্টরূপে লক্ষণীয় হয়। বৈনাশিক দিক থেকে দেখলে, এ একটা বিদ্রোহ, পরাধীনতার এবং রাজনৈতিক অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ স্বাভাবিক এবং শ্রেয়। আবার, অপরপক্ষে এর সৃজনশীলতার দিক থেকে দেখলে, জাতীয়তাবাদের এই আন্দোলন বিশ্বজনীন নব্যসমাজ এবং নব্য সভ্যতায় প্রবেশের আগ্রহকে নিঃসন্দেহে প্রতিফলিত করছে। এই নূতন বিশ্বসভ্যতা যখন গড়ে উঠবে তখন, সন্দেহ নেই, পৃথিবীর পুরাতন সভ্যতার সমস্ত প্রান্তীয় সংস্কৃতির প্রধান দানগুলি গ্রহণ করে সে ক্রমশঃ সমৃদ্ধতর হবে, কিন্তু এই নূতন বিশ্বসভ্যতা প্রথম দিকে যে আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up Capital) নিয়ে যাত্রারম্ভ করল, সেই মূলধন প্রধানত একটি অঞ্চলেরই অবদান। পশ্চিমের সভ্যতার মূলধন নিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়েছে, এর ঐতিহাসিক কারণ সুস্পষ্ট। আধুনিক কালের বিশ্বের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ পশ্চিমই আরম্ভ করেছে। কাজেই একথা স্বাভাবিক যে, নূতন বিশ্বসভ্যতারও প্রারম্ভিক কাঠামো মূলত পশ্চিমের দ্বারাই গঠিত হ'বে। কিন্তু একথা আরো তাৎপর্যপূর্ণ এবং আরো কৌতূহলোদ্দীপক যে, বিশ্বসভ্যতার এই পশ্চিমী উপকরণ সত্ত্বেও পাশ্চাত্য-বহির্ভূত

জগতের মানুষ একে গ্রহণ করতে অসম্মত হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নবীন-স্বাধীনতালব্ধ মানুষেরা তাদের ভাগ্য নির্ণয়ের অধিকার যখন পেল, তার সঙ্গে সঙ্গেই তারা স্বেচ্ছায় এবং সুপরিকল্পিতভাবেই এই লক্ষ্যের দিকেও অগ্রসর হল। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত লোকেদের জাতীয়তাবাদ পশ্চিমের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরোধী সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিরোধিতার পশ্চাতে পশ্চিমের রাজনৈতিক মতাদর্শই অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। পশ্চিমের এই রাজনৈতিক মতাদর্শ এমন কতকগুলি ন্যায় নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেগুলি সর্বজনীন। পাশ্চাত্য-বহির্ভূত জগতের লোকেরা যে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তার মধ্যে এই পশ্চিমী মতাদর্শের এবং ন্যায়নীতির অনুপ্রেরণা ছিল। অপরপক্ষে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিন্তু সেই আন্দোলনই তাদের স্ব স্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিসদৃশ উপকরণগুলির বিরুদ্ধতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

অ-পাশ্চাত্যদেশগুলিতে আজকের দিনে যুগপৎ দুইটি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এর মধ্যে পশ্চিমের শাসনাধিপত্যের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব সে অপেক্ষাকৃত বাহ্য এবং মৃদু। কিন্তু ঐসব দেশেরই অনাধুনিক যুগের পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে বর্তমানের পাশ্চাত্য-অনুপ্রাণিত ন্যায়াদর্শের যে বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে, সে আরও প্রবলতর। সেদিক থেকে নবস্বাধীনতাপ্রাপ্তেরা তাদের জীবনাচরণের ক্ষেত্রে এমন সমস্ত আমূল সংস্কার প্রবর্তন করতে আরম্ভ করেছে, যা অতীতে বিদেশী শাসকেরা প্রবর্তনের কথা কল্পনায়ও আনতে সাহস পেত না। স্থানীয়, বা আঞ্চলিক ন্যায়াদর্শ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বন্ধন যে আজ ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে, একে আমাদের এই যুগের একটি বৃহৎ অভ্যুত্থানরূপে গণ্য করা যায়। এই শেষোক্ত বিপ্লবের গতিমুখ রাজনৈতিক বিপ্লবের একেবারে বিপরীত দিকে। এই গতি আন্তর্জাতিক ঐক্যের বিরোধী নয়, বরং বিশ্বজনীন ঐক্যের দিকেই আমাদের চালিত করছে। সভ্যতার নির্মাণকর্মে রাজনীতির চেয়েও মানবিক ব্যাপারগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য আমার মনে হয় বর্তমানে রাজনীতির স্রোত যে বিভেদের সৃষ্টি করছে—তার চেয়ে অধিকতর স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হবে এই ঐক্যমুখী ন্যায়াদর্শ এবং সাংস্কৃতিক প্রবাহ।

এমনকি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর রাজনীতির ক্ষেত্রেও ঐক্যমুখী আন্দোলন দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রাতিগ রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল বিদেশী শাসন এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপে। কিন্তু স্বাধীনতা আর পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। বস্তুত এই জন্যই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পারস্পরিক নির্ভরতার প্রশ্ন শুধু প্রয়োজনরূপে নয়, একটা বাস্তব ঘটনারূপে দেখা দিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে যে নবীন রাষ্ট্র নিজের পরিচালনা নিজেই স্বাধীনভাবে শুরু করেছে, তার পক্ষে বাইরের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং নানাবিধ ব্যবহারিক সহায়তা প্রয়োজন। নিজেকে নিজে কিভাবে সাহায্য করা যায় সেই স্বাবলম্বনের শিক্ষায় সাহায্য লাভ করাই বোধহয় তার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি প্রথমদিকে স্বভাবতই নিজেদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্পর্শকাতর থাকে। পাছে তাদের স্বাধীনতায় কোথাও কোনো বিঘ্ন কিংবা হস্তক্ষেপ ঘটে সেইজন্য তাদের দৃষ্টি সর্বদাই সন্দিগ্ধ। তথাপি এই স্বাভাবিক আশংকার মনোভাব সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রসংঘের কাছে নানাবিধ সাহায্য ও পরামর্শ প্রার্থনা করেছে। পশ্চিম ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির অবলুপ্তির পর পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সংগঠনের যে অভাব দেখা দিয়েছে, সে অভাব বা শূণ্যতা ঐ সব সাম্রাজ্যের

স্থলাভিষিক্ত স্বাধীন জাতীয় গভর্ণমেণ্টগুলি পূর্ণ করতে পারেনি। নূতন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাজ হচ্ছে ঐ শূন্যতা পূর্ণ করা। নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি এবং এই আন্তর্জাতিক সংস্থা নিজেদের মধ্যে একত্র কাজ করে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের গঠনমূলক কার্যাবলীর অভাব দূর করতে পারেন। এমনকি এক্ষেত্রে অতীতের ন্যায় শাসক এবং শাসিতের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কোনো কারণ না থাকায় তাঁদের পক্ষে বরং পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা এই কাজ অধিকতর পরিমাণে এবং আরো সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব।

নবগঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্য এই নবীন রাষ্ট্রগুলিই সর্বাগ্রে উপলব্ধি করেছে। কিন্তু এ ভবিষ্যৎবাণীও করা যায় যে, যেসব দেশ অপেক্ষাকৃত শক্তিমান এবং ঐশ্বর্যশালী এবং যেখানে অভিজ্ঞ এবং জনচেতা নাগরিকেরও অভাব নেই, সেই সব দেশকেও ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণেই গ্রহণ করতে হবে। এই ভবিষ্যৎবাণী করা যায় এই জন্য যে, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ঐশ্বর্যশালী যে রাষ্ট্র সেও সমগ্র মনুষ্যজাতির তুলনায় এবং গোটা দুনিয়ার সম্পদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। তাছাড়া, যে যুগে আমরা বলতে পারি যন্ত্রবিজ্ঞান দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন করেছে, সে যুগে মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডই আঞ্চলিকতার এবং জাতীয়তার সীমাবদ্ধ গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্ব-ব্যাপকতায় পরিণতি লাভ করতে চাইছে। যে যুগে মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য গোটা বিশ্বের বৃহৎ প্রয়োগক্ষেত্র প্রয়োজন হচ্ছে, সে যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো বিরাটাকার রাষ্ট্রের পক্ষেও পারস্পরিক নির্ভরতার প্রশ্ন জীবনধারণের অন্যতম প্রয়োজনরূপে দেখা দেবে।

অবশ্য যে বিশ্বে যন্ত্রবিজ্ঞান দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে সেখানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বকীয় ভূমিকা থাকবে তো বটেই, গুরুত্বপূর্ণরূপেই থাকবে। কতকগুলি পৌর কার্যাবলী স্বভাবতই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পালনীয় কর্তব্য। পয়ঃপ্রণালী রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষুদ্র হলেও গুরুতর কাজ। তা ছাড়া বিশ্বজনীন সমাজে অংশীদার প্রান্তীয় রাষ্ট্রগুলিকে সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা অতীতের মনুষ্যগ্রাসী দৈত্যাকার রাষ্ট্রগুলির তুলনায় নূতন যুগের এই রাষ্ট্রগুলিতে সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপরে বহুগুণ বেশী গুরুত্ব আরোপিত হবে। মনুষ্যজাতির প্রাণরক্ষার খাতিরেই এই দৈত্যরাষ্ট্রগুলির দন্তপংক্তি উৎপাটন করা দরকার। অর্থাৎ আঞ্চলিক রাষ্ট্র-গুলির যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার যে চিরাচরিত স্বাধিকার ছিল তা কেড়ে নিতে হবে। কিন্তু হিংস্রনখদন্তবর্জিত হলেই তার চেহারায় যে আর কোনো জৌলুস থাকবে না এমন কোনো কথা নেই। ঐক্যবদ্ধ বিশ্বরাষ্ট্রে তাদের ভূমিকা আরো আকর্ষণীয় হবে, কারণ লাবণ্যময় এবং সুস্থ জীবন লাভের জন্য ঐক্যের-মধ্যে-বৈচিত্র্যমূলক যে সংস্কৃতির প্রয়োজন, তা এই রাষ্ট্রগুলিই সৃষ্টি করবে।

কিন্তু সাংগঠনিক ঐক্য লাভ করতে হলে কতকগুলি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তার মধ্যে সমীকরণ এবং সামঞ্জস্যবিধান অন্যতম। এই ত্যাগ স্বীকার শুধু যে প্রাণান্তক মারণাস্ত্রের ভয়ে বাধ্য হয়ে আমাদের করতে হবে, তা নয়। বিশ্বব্যাপকতার অভিমুখে

মানুষের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের যে গতি দেখা যাচ্ছে, তার জন্যও এই ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিশ্বব্যাপী ঐক্য যতটা হতাশাব্যঞ্জক, ন্যায়দর্শের বেলায় তা হবে না বরং সেখানে এই ঐক্য উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। সমস্ত মনুষ্য জাতিকে নিয়ে যে বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাত্রবোধ জন্মলাভ করবে তার ফলে আন্তরিক উদ্দীপনা দেখা দিতে বাধ্য।

যাই হোক, ন্যায়দর্শের ক্ষেত্রে এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একদিকে এই যে বাঞ্ছনীয় এবং অনিবার্য ঐক্য সাধিত হবে, তার অন্যদিকে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যগুলিকে বাঁচিয়ে রেখে। এই বিষয়গুলিতে আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলি তাদের যথোচিত কর্তব্য খুঁজে পাবে।

যেমন ধরুন ভাষার ক্ষেত্রে। আমরা বিশ্বসংগঠনের এমন একটা স্তরে ইতিমধ্যেই উপনীত হয়েছি যে, এখন কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কেউ যদি কোনো অংশ গ্রহণ করেন, অথবা কেউ যদি পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে কোনো একটি গ্রন্থ রচনা করেন তাহলে দুই-তিনটি আন্তর্জাতিক ভাষার মধ্যে কোনো একটির বা দুইটির সাহায্য তাঁকে নিতে হয়। এক্ষেত্রে যে ভাষার প্রচলন সবচেয়ে বেশী তারই মারফৎ তাঁকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছুতে হ'বে, সেইজন্য সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার কোন একটি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই ধরনের কোনো *lingua franca* বা সর্বজনীন ভাষা ব্যবহারের কল্পনাও কোনো কবির পক্ষে সম্ভব নয়, যদি দৈবক্রমে সেই সর্বজনীন ভাষা তাঁর মাতৃভাষা না হয়। ক্লাসিক্যাল ভাষায় মহৎ কাব্য যে রচিত হয়নি তা নয়, কিন্তু তেমন কাব্যের সংখ্যা বিরল। ফরাসী-ভাষী কিংবা জার্মান-ভাষী পশ্চিমের কোনো কোনো কবি হয়ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর খৃষ্টীয় যুগে লাতিন ভাষায় কবিতা লিখে থাকবেন, হয়ত এই ধরনের সংস্কৃত কাব্যও থাকতে পারে। তথাপি একথা সত্য যে, কবির পক্ষে তাঁর মাতৃভাষাই একমাত্র স্বাভাবিক ভাষা।

এর থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্বজনীন সমাজে ক্রমশই অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষিত মানুষদের দ্বিভাষী কিংবা ত্রিভাষী হতে হবে। তাছাড়া নেদারল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ মানুষই তো আজকের দিনে ত্রিভাষী হয়ে পড়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য সর্বজনীন ভাষা তো নয়ই, এমনকি আঞ্চলিক ভাষাও নয়, মাতৃভাষারূপে আরও ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর, যেমন ওলন্দাজ কিংবা মালয়ালম ভাষার ব্যবহার থাকা প্রয়োজন। যে ভাষা অন্য লোকেরা শিখবার জন্য আগ্রহী নন, সেই রকম কোন ভাষা যদি কারো মাতৃভাষা হয় তাহলে নিজের স্বদেশীয় ভাষা ছাড়াও নিজের তাগিদেই সে অন্য কোনো একটি ভাষায়ও পড়া, লেখা এবং কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন বোধ করে। অপরপক্ষে একথাও সত্য যে হিন্দীভাষী বা ইংরেজিভাষীদের ন্যায় যাঁদের মাতৃভাষাই একটি সর্বজনীন ভাষা বা *lingua franca* তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে স্বাভাবিক একটা প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে বর্তমান পৃথিবীতে ইংরেজ ও ফরাসীরা রীতিমত কুখ্যাতি অর্জন করেছে। তারা আশাকরি স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে অন্য কোনো জাতের চেয়ে কোনো অংশেই খাটো নয়, কিন্তু যেহেতু দুনিয়ায় মাতৃভাষা দিয়েই তাদের কাজ চলে যায়, সেজন্য তারা স্বাভাবিক মনুষ্যোচিত আলস্যবোধের দাস হয়েছে। যতই হিন্দী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকবে ততই হিন্দীভাষীরাও এই আলস্যেরই দাস হয়ে পড়বে।

অবশ্য ইংরেজী ভাষীদের মত হিন্দীভাষীদের ভবিষ্যত অতটা অন্ধকার নয়, কারণ আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের জন্য ইংরেজী, ফরাসী, অথবা রুশভাষার একটি তাদের শিখতেই হবে। কিন্তু হিন্দীভাষীরা যেন এর জন্য প্রস্তুত থাকেন যে ভবিষ্যতে দ্রাবিড় ভাষীরা বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতায় তাঁদের পিছনে ফেলে যাবেন। কারণ নয়াদিল্লীতে কর্মোপলক্ষে তাঁদেরকে হিন্দী শিখতেই হবে, নিউইয়র্ক কিংবা টোকিওর জন্য ইংরেজী এবং সায়গণ অথবা লিওপোল্ডভিলে কর্মোপলক্ষে তাঁরা ফরাসীও শিখবেন।

মানুষ যদি আত্মঘাতী সংগ্রাম থেকে রক্ষা পায় তাহলে আমার বিশ্বাস জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারার পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে। বর্তমান বিশ্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা আজকের দিনে যেটা যুগলক্ষণ, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। কারণ আত্মঘাতী ভবিষ্যৎ আমাদের সম্মুখে। পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমান অধ্যায়ে মনুষ্য-জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু এই জাতীয়তাবাদ, কারণ বিশ্বসংহতির পথে জাতীয়তাবাদই প্রধান প্রতিবন্ধক। কাজেই বর্তমানকালে এই জাতীয়তাবাদের হিংস্র নখদন্তগুলি উৎপাটিত করা আমাদের প্রধানতম কর্তব্য। যদি অবশ্য আমরা এই বিশ্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় একবার সার্থকতা লাভ করি তাহলে ক্রমে অধীনস্থ আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে এই বিশ্বসংস্থার ক্ষমতাই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। হয়ত এমন একদিনও আসতে পারে যে, জাতীয়তাবাদের প্রভাবকে আর লঘু করে না দেখিয়ে বরং এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করার দিকে চেষ্টা শুরু করতে হবে, যাতে এই আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলি একেবারে হৃতশক্তি এবং অসমর্থ হয়ে না পড়ে। এই সমস্ত আঞ্চলিক রাষ্ট্রের নাগরিকেরা যদি নিজেদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে একেবারেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন এবং এদের সম্বন্ধে অযত্ন দেখা দেয় তাহলে আঞ্চলিক জীবন ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য তো ধ্বংস হবেই, এমনকি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীকরণ এবং সম্পূর্ণ সমীকরণের এই পর্ব যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে মানুষের জীবনে বৈচিত্র্যহীনতার দৈন্য যে দেখা দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া এর ফলে সমস্ত ব্যাপারে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষমতার অধিকারী এবং উদ্যোগের কর্তা হবেন।

এই বিপদেরই একটি দৃষ্টান্ত আছে রোমান সাম্রাজ্যে 'অগষ্টান শান্তির' আমলে। গ্রীকো-রোমান সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে উপনীত হয়েছিল তখন এই সংগঠনমূলক রাষ্ট্রনীতি তাকে রক্ষা করে। বর্তমান দুনিয়ায় যেমন nation-state তেমনি গ্রীকো-রোমান সভ্যতায় নগররাষ্ট্র বা city stateগুলি ক্রমাগত অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা সভ্যতাকে প্রায় ধ্বংসের কিনারায় এনে দিয়েছিল। এই সময় তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীন যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার এই বহু-অপব্যবহৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া তাদের ব্যাপকতম ক্ষমতার আর কোনো খর্বতা সাধন এর উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যাপকতম স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন এবং ন্যূনতম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্য তখনও সম্মুখে ছিল। এই রাজনৈতিক কাঠামোর পরীক্ষায় একটা সম্ভাবনীয়তা ছিল। কিন্তু এর সার্থকতার জন্য দরকার দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির আনুগত্য বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। প্রথমত রোমান বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতি মুখ্য আনুগত্য রাখতে হবে এবং দ্বিতীয়ত রোমান সাম্রাজ্যের রাজনীতিক দেহে নগররাষ্ট্রগুলি পৌরশাসনের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি করেছে, তার প্রতি রাখতে হবে দ্বিতীয় স্তরের আনুগত্য—'রোমান শান্তির' প্রথম পর্বে এই দুই শ্রেণীর আনুগত্যবোধের মধ্যে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়েছিল। যেমন সেণ্ট পল,

তিনি রোমান বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতেন, কিন্তু সেই সংগে তাঁর জন্মস্থল, টার্সাস নগর রাষ্ট্রের নাগরিক রূপেও তাঁর গর্ববোধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা পৌরশাসন সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং পৌর-গভর্ণমেণ্টগুলি ধ্বংস হয়, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে তাদের পরিচালন ক্ষমতা নিতে হয়, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তার ফলে মাথা-ভারী হয়ে উঠে এবং প্রধানত এরই জন্য অবশেষে রোমান সাম্রাজ্যেরও পতন এবং বিনাশ ঘটে। অবশ্য আমাদের বিশ্বরাষ্ট্রের এখনো পত্তনই ঘটেনি, কাজেই আপাততঃ এই ইতিহাসের নজীর স্মরণ না করলেও চলতে পারে। কিন্তু আগামীদিনে যখন সার্থকভাবে বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটবে সেদিন আমরা যেন রোমান ইতিহাসের এই অধ্যায়টি স্মরণে রাখি।

ইতিমধ্যে আমাদের সবচেয়ে জরুরী এবং সমূহ কর্তব্য হচ্ছে জাতীয়তাবাদের বিভেদ-মূলক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং মানবিক ক্রিয়াকর্মের যে সকল স্রোত বিশ্বের ঐক্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেগুলিকে বলীয়ান করা। এই কর্তব্য নিঃসন্দেহে দুরূহ, হয়ত এক এক সময় নৈরাশ্যজনকও হতে পারে। যখন মন এই প্রকার নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হতে চাইবে তখন আমরা উৎসাহ ফিরে পাব যদি পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমান অধ্যায়কে অতীতের পটভূমিতে রেখে দেখি। সেই পটভূমিতে দেখা যায় যে, মানুষের এই ঐক্যকামী প্রচেষ্টা মানুষের সভ্যতার মতই পুরাতন এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে যেদিন সভ্যতার প্রভাত সূর্য উদিত হয়েছিল সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই ঐক্য কামনা কেবলি অধিকতর বলে বলীয়ান হয়ে চলেছে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, মানবজাতির মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্য এই প্রচেষ্টা আমরা বর্তমান প্রজন্মেই প্রথম আরম্ভ করিনি। উচ্চস্তরের ধর্মগুলির সন্ন্যাসী-প্রচারকেরা সর্বদাই এই লক্ষ্য অনুসরণ করেছেন। এই শ্রেণীর ধর্মের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি—বৌদ্ধ, খৃষ্ট এবং ইসলাম ধর্ম মনুষ্যজাতিকে অভিন্ন ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করার লক্ষ্যের প্রতি অচঞ্চল দৃষ্টি রেখেছিল। আজ পর্যন্ত এদের কেউই শেষ উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারেনি। এখনও যে এই তিনটি ধর্ম পাশাপাশি প্রচলিত আছে তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, নিজেদের লক্ষ্য সাধনের কার্যক্রমে এরা কে কতখানি ব্যর্থ হয়েছে। তথাপি, গোটা পৃথিবী না হোক, এক মহাদেশ ছাপিয়ে অন্য মহাদেশ পর্যন্ত এই ধর্মগুলি বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং করেছিল সেই যুগে যে যুগে নব্য যন্ত্রবিজ্ঞান 'দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন করেনি'। আজকের দিনে জড়প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার ফলে আমরা তো শুধু অশুভ শক্তিই লাভ করিনি, জড়জগত থেকে আমরা শুভ শক্তিও লাভ করেছি। এবং পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করার এই বর্তমান প্রচেষ্টায় সেই শক্তি আমাদের সহায়ক আছে। অতীতকালে সন্ন্যাসী প্রচারকদের আমলে জড় বিজ্ঞানের কোনো শক্তিই তাঁদের করায়ত্ত ছিল না, একমাত্র হাওয়া-কল বা উইণ্ড মিল ছাড়া। সেকালে স্থলপথে তাঁদের একমাত্র অবলম্বন ছিল নিজের শারীরিক শক্তি, অথবা গৃহপালিত জন্তুর সাহায্য। তবু, যোগাযোগের এই যৎসামান্য উপায়টুকু অবলম্বন করেই তাঁরা চলে গেছেন নিজেদের বাণী নিয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে।

যোগাযোগের নব্য উপকরণ তাঁদের ছিল না, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মধ্যে নিজের ধর্মকে প্রচার করার যে দুঃসাহসিক ব্রত তাঁরা নিয়েছিলেন, তাতে একটি সহায়ক শক্তি তাঁদের স্বপক্ষে ছিল। তাঁদের প্রচার অভিযান আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হয়েছিল। অবশ্য 'বিশ্বব্যাপী' কথাটা তৎকালের কোনো সাম্রাজ্যের

ক্ষেত্রেই পুরোপুরি প্রযোজ্য হতে পারে না, কিন্তু সেদিক থেকে দেখলে ধর্মবিস্তারের অভিযানও ষোলআনা অর্থে কখনোই 'বিশ্বব্যাপী' হতে পারেনি। আক্ষরিক অর্থে এই সাম্রাজ্যগুলি বিশ্বব্যাপী ছিল না, কিন্তু সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে কয়েক শতাব্দীব্যাপী তাদের শাসনাধিপত্য বিস্তৃত ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতাব্দীর পর শতাব্দী একই শাসন চলেছে, কিন্তু তার মধ্যে অনৈক্য অথবা নৈরাজ্য দেখা দেয়নি। এই সব সাম্রাজ্য-শক্তিগুলি শুধু যে নিজেদের রাজত্বের মধ্যে সমুদ্রপথ বা স্থলপথ পাহারা দিয়েছে এবং নিরাপদ রেখেছে তা নয়, তারা সেতু নির্মাণ, পান্থশালা স্থাপন এবং অশ্বারোহী ডাক-হরকরার প্রবর্তন করে এইসব স্থলপথকে এবং পোতাশ্রয় নির্মাণ করে জলপথগুলিকে নানা-ভাবে সুগম

ইতিহাসে সর্বত্র যে সাম্রাজ্যশক্তি ধর্মপ্রচারে স্বেচ্ছায় সহায়ক হয়েছে তা নয়। কিন্তু তাদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সাহায্য ধর্মপ্রচারকেরা লাভ করেছেন সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে তিনজন সম্রাটের আমরা নাম করতে পারি—অশোক, কণিষ্ক এবং কনষ্ট্যানটাইন, এঁরা কোনো একটি বিশ্বধর্মের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সেই ধর্মপ্রচারের জন্য আপন সাম্রাজ্যের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করেছিলেন। অশোক থেরপাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মৌর্য সাম্রাজ্যকে, কণিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কুশান সাম্রাজ্যকে এবং কনষ্ট্যানটাইন খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য রোমান সাম্রাজ্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

অতএব বিশ্বধর্মগুলির প্রচার ও বিস্তারে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজগুলি যে সহায়তা দান করেছে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত-ভাবেও ঘটেছে। কিন্তু বিশ্বসাম্রাজ্য এবং বিশ্বধর্ম স্বভাবতই একে অপরের সংগী, কারণ এদের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই, যতই ভিন্ন দিক থেকে হোক না কেন, সমগ্র মনুষ্য জাতিকে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজবন্ধনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এদের মধ্যে আরো একটা সাদৃশ্যের বিষয় এই যে, উভয়েরই উৎপত্তি ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া থেকে এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য রচনাত্মক প্রচেষ্টার দ্বারা সেই ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ করা।

অতীত কালে প্রান্তীয় সভ্যতাগুলির বিকৃত সন্তানরূপে এই ধ্বংসলীলা বার বার দেখা দিয়েছে। এই বিকৃতির মূল কারণ ছিল আভ্যন্তর কলহ, সে কলহের উৎপত্তি অনৈক্য থেকে। আমাদের আজকের দিনের সভ্যতার ন্যায় অতীত কালের সভ্যতাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সার্বভৌম প্রান্তীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। পরস্পরের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্ণ স্বাধিকার এদের ছিল এবং স্থানীয় স্বার্থের অনিবার্য সংঘর্ষের পরিণতি রূপে তাদের মধ্যে এই যে যুদ্ধ দেখা দিত, তা ক্রমশঃ অধিকতর বৈনাশিক চেহারা নিতে আরম্ভ করে। বৈষয়িক ক্ষতির চেয়েও নৈতিক বিনাশ আরো ব্যাপকতর হত। তাছাড়া এই নৈতিক ধ্বংসলীলার ক্ষতিপূরণও দুঃসাধ্য ছিল। স্থানীয় রাষ্ট্রগুলিকে শান্তিস্থাপনে বাধ্য করল এই সাম্রাজ্য-গুলি, তাদের অধীনে হয় স্থানীয় রাজ্যগুলির অবলোপ ঘটানো হল অথবা কোনো একটি স্থানীয় রাজ্যের তাঁবে অন্যগুলিকে অধীনস্থ করে রেখে এই আন্তঃরাজ্য সংঘর্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বসাম্রাজ্যগুলি মাথা তুলে দাঁড়াল। কিন্তু সমাধান চেষ্টায় বিশ্বধর্মগুলি আরো গভীরভাবে এই সমস্যার কেন্দ্রমূলের কাছাকাছি পেঁাছতে পেরেছে। এই সব ধর্মের স্রষ্টা ও প্রচারকর্তারা হৃদয়ংগম করেছিলেন যে, যে বৈনাশিক রাজনীতি থেকে এই অন্তঃরাজ্য সংঘর্ষ-গুলির উৎপত্তি, তার গোড়ায় একটা ন্যায়াদর্শের প্রশ্ন জড়িত আছে। কাজেই ন্যায়াদর্শের ভিত্তিতেই একমাত্র এর সমাধান ঘটতে পারে। সমাধান হিসাবে তারা প্রত্যেকটি নরনারীকে

স্বতন্ত্রভাবে এবং সরাসরি আধ্যাত্মিক বাস্তবের সঙ্গে সান্নিধ্যযুক্ত এবং সাযুজ্যময় করার পথে অগ্রসর হলেন। এই অধ্যাত্মতৃষ্ণা বোধ হয় সমস্ত উচ্চমার্গের ধর্মেই রয়েছে। অবশ্য একথাও সুবিদিত যে, ধার্মিক জীবন যাপন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন এবং আধ্যাত্মিক বাস্তব সম্বন্ধে তাদের ধারণায় প্রচুর পার্থক্য এবং বিরোধ রয়েছে।

পূর্বেই আমি একথা বলেছি যে, না বিশ্ব-সাম্রাজ্য, না বিশ্ব-ধর্ম, কোনোটাই ষোলো-আনা অর্থে গোটা মনুষ্য জাতিকে এক সমাজবন্ধনে ঐক্যবন্ধ করতে পারেনি। ষোলো-আনা অর্থে দেখলে, আজই সর্বপ্রথম যেহেতু 'যন্ত্রবিজ্ঞান দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন' করতে সমর্থ হয়েছে সেই হেতু বিশ্বজনীন সমাজ সম্ভবপর প্রস্তাবরূপে এবং সেই সঙ্গে সমূহ প্রয়োজনরূপেও দেখা দিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় বিশ্বব্যাপী ঐক্যবন্ধতা ছাড়া আর কোনো উপায়েই মনুষ্যজাতি আত্মবিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারবে না। একালে আমাদের এই যে কর্তব্য, সে যেমনি দুরূহ তেমনি সমূহও। কাজেই আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং তাঁদের দেওয়া শিক্ষায় আমাদের চৈতন্য লাভ করতে হবে।

তাঁদের দেওয়া একটি শিক্ষা অতিশয় স্পষ্ট। অতীত কালের সাম্রাজ্যস্রষ্টারা যে সামরিক অস্ত্রের দ্বারা, বিশ্বব্যাপী ঐক্যস্থাপনের চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আজকের পারমাণবিক যুগে সে পদ্ধতি অচল। এমনকি, যে কালে মানুষ তীরধনুক দিয়ে লড়াই করত সে কালেও লড়াইয়ের পথে এবং রাজ্যবিস্তারের দ্বারা বিশ্বজনীন রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করতে গেলে চরম নৈতিক ও বৈষয়িক ক্ষতি সাধিত হত। বিশ্বব্যাপী ঐক্য দূরে থাকুক, যত বার ঐ পদ্ধতিতে অতিকায় সাম্রাজ্যের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে, ততবারই সমাজকে এই হীন এবং বর্বর পদ্ধতি গ্রহণের জন্য নিজের অপূরণীয় ক্ষতিও ঘটাতে হয়েছে। অপর পক্ষে আজ পারমাণবিক যুগে যদি এমনি বলপ্রয়োগের পন্থায় বিশ্বব্যাপী ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা ঘটে তাহলে মনুষ্যজাতির ঐক্য নয়, ধ্বংসই অনিবার্য। অতএব রাজনীতির স্তরে এই ঐক্য যদি স্থাপন করতে হয় তার একমাত্র সার্থক পথ হচ্ছে অতীত কালের ধর্মপ্রচারকদের পদ্ধতি গ্রহণ করা। সেকালে তাঁরা উপদেশ, আলোচনা ও বাণীপ্রচারের দ্বারা বিপক্ষের হৃদয়-পরিবর্তনের যে-চেষ্টা করেছেন, অদ্যকার দিনে গণতান্ত্রিক যুগে আমাদের অতিকায় সমাজ-সংগঠনগুলিতে সেই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করতে হবে গণ-আবেদনরূপে—এককথায়, প্রচারকলার সাহায্যে। অবশ্য এই প্রচারকলার অপব্যবহারের সুযোগ যেখানে প্রশস্ত সেখানে আমাদের এবিষয়েও সতর্ক হতে হবে যাতে এর অন্যায় ব্যবহার না ঘটতে পারে। যাই হোক, পারমাণবিক যুদ্ধে বিপদের তুলনায় প্রচারবিদ্যার অপব্যবহারের বিপদ অতি নগণ্য।

বিশ্ব-ধর্ম এবং বিশ্ব-সাম্রাজ্যগুলি ষোলো-আনা অর্থে বিশ্বব্যাপী ছিল সত্য, কিন্তু এই সব ধর্মাবলম্বীদের কিংবা সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের মানসিক জগতে এই প্রতীতি ছিল যে, তাদের ধর্ম কিংবা সাম্রাজ্য যথার্থই বিশ্বব্যাপী। যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং খৃষ্টানদের কাছে তাদের স্ব স্ব ধর্মগুলি বিশ্ব-ধর্ম ছিল, অথচ কার্যত এই চারটি ধর্মমত পাশাপাশি সহাবস্থান করে এসেছে। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, চীন-সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দ তাদের রাজত্বকেই 'ত্রিভুবনব্যাপী' বলে জ্ঞান করেছেন, অথচ একই সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরাও নিজেদের রাজত্বকেই 'তাবৎ মনুষ্যবাসিত জগৎ' মনে করতেন। এই দুইটি সাম্রাজ্যই মানবিক প্রত্যয়ের দিক থেকে বিশ্বরাষ্ট্রের আকার গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু এই ভূপৃষ্ঠে উভয়েই সমসাময়িক। যাই হোক, বিশ্ব-সাম্রাজ্য অথবা বিশ্ব-ধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই প্রত্যয়ের দিক থেকে যাঁরা বিশ্বজনীন

সমাজের অংগীভূত হয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে ঐক্যবন্ধ মানবপরিবারের অংগীভূত হতে কেমন লাগবে তার খানিকটা পূর্বাভাস এই মনস্তত্ত্বের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ব্যবহারিক দিক থেকেও ভবিষ্যতের এই পূর্বাভাস অবগত হওয়া প্রয়োজন। সম্পূর্ণ বিশ্বজনীন ঐক্য যদি আমরা লাভ করি কিংবা যখন আমরা লাভ করব তখন একদিকে যেমন আমাদের বহু সমস্যার নিষ্পত্তি হবে তেমনি অন্যদিকে আবার আমাদের জন্য কিছু সমস্যাও উপস্থিত হবে। এই ব্যাপারে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব।

প্রাচীন কালের আঞ্চলিক সভ্যতা যে বিকারগ্রস্ত বৈনাশিক মূর্তি গ্রহণ করেছিল তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই বিশ্বধর্ম এবং বিশ্বসাম্রাজ্য পত্তনের চেষ্টা। এবং মানবজাতির ঐক্যবিধানের পথে এই দুইটি প্রচেষ্টা পথচিহ্নিকার ন্যায় রয়েছে। কিন্তু সভ্যতার পতন ঘটার ফলেই মানুষ ঐক্যের দিকে ধাবমান হয়নি। প্রাক্তন সভ্যতার সূচনার সংগে সংগে এবং সেই সূচনারই ফলস্বরূপ মানবজাতির ঐক্যসাধনের আন্দোলনও জন্মলাভ করেছিল, কিন্তু তৎপরবর্তী কালে এই সভ্যতাগুলির বিনাশ আবার উক্ত ঐক্যসাধনের আন্দোলনকে নূতন গতিবেগও দিয়ে গেছে।

সভ্যতার সূচনা থেকেই মনুষ্যজাতি নিজের যে সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছে তার মধ্যে, আমার মনে হয়, সবচেয়ে বড় সর্বনাশ এই অনৈক্য। স্থানীয় স্বার্থের প্রতি আমাদের অবিমিশ্র আসক্তি কিংবা প্রান্তীয় সমাজের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য এই অনৈক্যের মূল। আজ ঐক্য-সাধনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা গুরুতররূপে দেখা দিয়েছে সত্য, তথাপি এখনও ঐক্যের পথে উক্ত কারণগুলি প্রধান প্রতিবন্ধক। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সভ্যতার যখন প্রথম বিকাশ ঘটেছিল তার অব্যবহিত প্রাক্কালে মনুষ্যজাতি এই প্রান্তীয় স্বার্থের স্নেহাসক্তি অর্জন করে, কিন্তু এই আসক্তির আতিশয্য এখনও অজর হয়ে রয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক এবং সমাজ-নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বড় বিপ্লব সাধিত হয়েছিল কৃষিপদ্ধতির আবিষ্কারের দ্বারা। প্রাচীন কালে প্রাক্-কৃষি-যুগের যে-মানুষেরা স্থান থেকে স্থানান্তরে অন্নের অন্বেষণে এবং আহার্য শিকারে ঘুরে বেড়াত, তাদেরও নব্যযুগের শিল্পশ্রমিকের মত কোনো প্রান্তীয় আসক্তি ছিল না। এই উভয়ের সংগে তুলনা করে দেখলে লক্ষণীয় যে, কৃষকের বৃত্তিই এমন যে, সে স্থাবর হতে বাধ্য। তার কাছে তার গ্রামীণ সমাজটুকুই বিশ্বভুবন। ঐ সীমাবন্ধ গণ্ডীতে তার মনের দিগন্ত চিহ্নিত হয়েছে। সভ্যতার যুগে সমস্ত প্রান্তীয় সমাজের মধ্যেই এই গ্রামীণ সমাজের মনোবৃত্তি বিস্তৃতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে প্রান্তীয় সমাজগুলি ভারত, চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকার আজকের দিনে লাভ করেছে তথাপি এদের নাগরিকেরা সেই গ্রাম্য মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি পায়নি।

সভ্যতা যুগে যুগে মানুষের প্রান্তীয় আসক্তির এই শিকড়গুলির মূল উৎপাটন করে মানুষকে ঐক্যবন্ধতার সার্থকতায় পেণছোনোর জন্য মুক্তি দিতে চেয়েছে। যদি কোনো সর্বনাশ না ঘটে তাহলে সমস্ত মানবজাতিকে ঐক্যপাশে আবন্ধ করার দিন অবশ্যম্ভাবী। প্রখ্যাত মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ্ রবার্ট রেড্‌ফিল্ড্ বলেছেন যে, সভ্যতা আসলে বি-কৌমীকরণের প্রক্রিয়া মাত্র। নিঃসন্দেহে এ-কথা সত্য। কৃষকসমাজকে কৌমীকতার শৃংখল থেকে মুক্ত করার যে প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত জানা যায় তা ঘটেছিল সবচেয়ে প্রাচীন নগরীর পত্তনের সংগে সংগে—জর্ডন উপত্যকায় জেরিকো নগরীর পত্তনের দৃষ্টান্ত আমি দিতে চাইছি। তার পর থেকে ক্রমশঃ নগরীকরণের প্রক্রিয়ায় প্রান্তীয় আসক্তির মূলচ্ছেদ অব্যাহতভাবে চলেছে, যার

ফলে আজ ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থান জুড়ে বলতে গেলে একটিই অভিন্ন নগরী পরিব্যাপ্ত। যদিও পেশাগত ভিত্তিতে মনুষ্যজনসংখ্যাকে ভাগ করলে এখনও কৃষকদের সংখ্যাই সর্বাধিক, তথাপি কার্যত শ্রমিকের প্রতিমূর্তিরূপে কৃষকের স্থান আর নেই। তার স্থান নিয়েছে যন্ত্রচালকরূপী শিল্পশ্রমিক, কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই শ্রমিক নারী বা পুরুষ কারখানার স্থাবর যন্ত্র পরিচালনা করছে না—শ্রমিকের মূর্তির প্রতীকরূপে দেখানো হচ্ছে তাদেরকেই যারা জঙ্গম, জলে স্থলে, অথবা আকাশে যারা চলমান যন্ত্রের সারথি। অর্থাৎ কৃষির পত্তনের ফলে সাময়িকভাবে মনুষ্যসমাজের যে স্থবিরতা ঘটেছিল তার থেকে মুক্তিলাভ করে মানুষ পুনরায় চলমান হয়েছে। তার এই যাত্রা বিশ্বের ঐক্য বিধানের আন্দোলনে প্রতিফলিত হচ্ছে। গত পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ এ যাত্রা চলেছে, তথাপি প্রস্তর যুগের (Neolithic) সমাজ-মানসকে এখনও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের আচরণ এমন যাতে মনে হয় যে, আমরা এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজেরই অন্তর্গত।

॥ তিন ॥

সর্বশেষে আমি যে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তা আমার মূল বিষয়বস্তুর অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এই আলোচনায় আমার সংকোচ এই যে, প্রসঙ্গটি ভারতবর্ষের মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত, আমি একে দেখছি বাইরে থেকে, তাঁরা দেখছেন ভিতর থেকে।

আমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটি। তার মধ্যে প্রথম কথা এই যে, আজ যেখানে ইরাক অবস্থিত সেখান থেকে পৃথিবীর আদি সভ্যতার বিস্তার প্রথম যেদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেছিল, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর ভারকেন্দ্রের স্থান অধিকার করে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আজকের দিনে মানবজাতির সবচেয়ে যেগুলি বড় সমস্যা তারও অধিকাংশই ভারতবর্ষে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। তৃতীয়ত, এই মানবিক সমস্যাগুলির সমাধান প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে, তাতে বর্তমান জগতের সমস্যারও প্রতিকার ঘটতে পারে। এই বিষয়গুলিই এক-একটি করে আমি আলোচনা করব।

ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিষিক্ত সেকথা সুবিদিত। উত্তর-পূর্ব প্রান্তে জাপান থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আয়ল্যাণ্ড পর্যন্ত প্রান্তীয় সভ্যতার যে মেখলা বিস্তৃত, ভারতবর্ষ তার কেন্দ্রবন্ধনীর মতো। দুই প্রান্তের মাঝখানে কণ্ঠহার যেমন নীচের দিকে নেমে আসে তেমনি সভ্যতার এই মেখলাও মাঝখানে বিষুবরেখা অতিক্রম করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত নেমে গেছে। ইতিহাসে বহু অনাবিষ্কৃত দেশ একে একে এই মেখলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, ক্রমে ক্রমে রাশিয়া, উত্তর ইউরোপ, বিষুব আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সভ্যতার বেষ্টনীর অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু এত সব পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যেও ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় অবস্থিতি যেমন ছিল আদি যুগে, তেমনি আছে আজও।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই কেন্দ্রীয় অবস্থিতি শুধু ভৌগোলিক নয়। বর্তমান মুহূর্তে একথা সুবিদিত যে, বিশ্বব্যাপী মতাদর্শের লড়াইয়ে ভারতবর্ষ ভারকেন্দ্রের স্থান অধিকার করে রয়েছে। আজকের দিনে এশিয়ায় পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রভাব সুবিদিত, কিন্তু তার

প্রধান কারণ ভারতবর্ষ এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। যদি ভারতবর্ষ অন্য কোনো মত অবলম্বন করে তাহলে ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী প্রত্যেকটি দেশে তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছুবে। মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকাও তার আঘাত এড়াতে পারবেন। কিন্তু রাজনীতির চেয়েও মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে যতগুলি মহান ধর্মমত প্রচলিত আছে তার অর্ধেক জন্মলাভ করেছে এই ভারতবর্ষেই। কেবল হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংখ্যাই আজকের পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক দিক থেকেও পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। প্রথম দারিয়ুসের আমল থেকে পারস্য সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ইতিহাস যদি লক্ষ্য করা যায়, যদি সিন্ধুনদের অববাহিকার সঙ্গে এবং মিশরের সঙ্গে জলপথে গ্রীকো-রোমান জগতের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পরবর্তী ইতিহাসে অর্থনৈতিক সূত্রগুলি লক্ষ্য করা হয়, যদি ভিনিস নগরীর প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্মের মধ্যযুগীয় প্রসারের পরের দিকে আমরা তাকাই এবং কালিকটে ভাস্কো ডি গামার পদার্পণের পরবর্তীকালের আধুনিক পশ্চিমী জগতে অর্থনীতির দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থিতির গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ভারতবর্ষে অন্তত চারটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, যেগুলি বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপনের প্রারম্ভিক পরীক্ষামূলক প্রয়াসরূপে অনায়াসে গণ্য হতে পারে।

অতঃপর আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা সেইসব সমস্যা সম্বন্ধে যেগুলি বিশ্বেরও সমস্যা ভারতবর্ষেরও সমস্যা। ভারতবর্ষ স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তার কি কি সমাধান দেখছে সেবিষয়েও আমি আলোচনা করতে চাই। ইতিপূর্বে আমার বর্তমান আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে প্রস্তরযুগের কৃষি সভ্যতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছি। কোনো একটি সভ্যতা যখন বিস্তার লাভ করে তখন সে তার প্রাক্তনকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেনা। সেই প্রাক্তনের উপরে নবাগত সভ্যতার আর একটি স্তর নির্মিত হয় এবং সেই স্তরের নীচে অবলুপ্ত, কিন্তু অন্তঃশীল প্রাক্তন সভ্যতা থেকেই যায়। তেমনি গত পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ যত সভ্যতার জন্ম হয়েছে সমস্তই ঐ প্রস্তরযুগের কৃষিসভ্যতার ভিত্তির উপরে। গত পাঁচ হাজার বৎসরে কৃষকেরা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, তাদের শ্রমের প্রসাদ ও সম্পদ শোষণ করে নিয়ে নগরসভ্যতার সংখ্যালঘু নাগরিকেরা সভ্যতার নব নব উপকরণ তৈরী করছে, কিন্তু সেই সভ্যতার উপকরণে এই উৎপাদনকারী কৃষক সমাজের কোনো ফলভোগের অধিকার থাকছে না। কোনোক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য যৎসামান্য যা দিতে হয় পৃথিবীর কৃষক সমাজকে সেইটুকু দিয়ে বাকি সমস্ত সম্পদ যুগে যুগে শোষণ করে নেওয়া হয়েছে এক-একটি সভ্যতা নির্মাণ করা এবং ভাঙবার জন্য। দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষকেরা জীবনের এই বাস্তবেই অভ্যস্ত হয়েছে—তারা নিজের জীবনের এবং ভাগ্যের উন্নতিতে আর কোন আস্থা রাখেনি।

কিছুকাল পূর্বেও কৃষকসমাজের এই বিশ্বাস ও মনোভাবের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার পূর্ণ সঙ্গতি ছিল। দুইশত বৎসর পূর্বে শিল্প বিপ্লবের আমল থেকে সংখ্যালঘু নগর সভ্যতার লোকেরাও উৎপাদনক্ষম হতে আরম্ভ করে এবং তখন থেকে এই কৃষকসমাজের সম্মুখেও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু তার পূর্বে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর সেই উন্নতির কোনো চিহ্ন ছিল না। সেই সময় সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য উৎপাদন এবং অন্য কোন পণ্য প্রস্তুতি কিংবা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করতে হত না। এই সুবিধাভোগী সমাজের জন্য অফুরন্ত অবসর ছিল, যে অবসর থেকে সভ্যতার

নব নব আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনশীলতার জন্ম হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে সভ্যতার পাপ এবং মূঢ়তাও দেখা দিয়েছে। যাই হোক্ আসল কথা এই যে, যে ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী সম্প্রদায় সৃজনশীলতা ও রচনাত্মক উদ্ভাবন ক্ষমতার সুযোগ লাভ করেছিল তারা গত পাঁচ হাজার বৎসরে যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৃহৎ কোন উন্নতি ঘটাতে পারেনি। তাদের হৃদয় এবং মন নিবিষ্ট ছিল অন্য রচনাকর্মে—ভাস্কর্য, স্থাপত্য, শিল্প, কবিতা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রণবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের চর্চা এবং সমৃদ্ধ জীবন যাপনের স্বপ্নে। এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কীর্তির নিদর্শন হিসাবে গিজার পিরামিড, আগ্রা পিকিং এবং ভার্সাই-এর প্রাসাদগুলি বিরাজমান। অন্যদিকে ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের কীর্তি স্তম্ভস্বরূপ আংকরভাট, বড়ভূধর, পিকিংএর স্বর্গমন্দির ও বেদী, ডারহ্যামএর গির্জা ইত্যাদি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এই সম্প্রদায় যন্ত্রবিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেছে মাত্র দুইশত বৎসর পূর্বে। এতাবৎ-কালের মধ্যে আমাদের জীবদ্দশায়ই প্রথম দেখা গেল যে যন্ত্রবিজ্ঞান ততখানি উন্নতি লাভ করেছে যাতে এখন সভ্যতার প্রসাদ সমগ্র মানব জাতিকে সমান ন্যায়সংগত ভাগে বণ্টন করে দেওয়া যায়।

মোটের উপর পৃথিবীর এই চিত্র ভারতবর্ষের চিত্রেরই সমতুল। পৃথিবীর কৃষক সমাজের একটা বৃহৎ অংশ ভারতের সীমানার অন্তর্গত। এই সম্প্রদায়কে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতীয় জনসাধারণ একটি মহৎ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এর আগেরবার ভারত সফরের সময় আমি বিভিন্ন রাজ্যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু কিছু কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেছি। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য আমার মনে হয় কৃষক সমাজের মধ্যে আশা, বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও উৎসাহ ফিরিয়ে আনা। এই প্রচেষ্টা যে কত বড় তা আমাদের অজানা নয়। এত বড় একটা বিপ্লব এত বড় এক ব্যাপক আকারে সাধন করতে গেলে তার মধ্যে কিছু কিছু নৈরাশ্য এবং বিঘ্ন দেখা দেবে একথাও সুনিশ্চিত। কিন্তু এই পরিকল্পনার স্বার্থকতার দিকে সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে, কারণ ভারতবর্ষ কৃষক সমাজকে অগ্রগতির পথে ডাক দিয়েছে। এ প্রচেষ্টা যদি সার্থক হয় সমস্ত দুনিয়ায় এর পরীক্ষা ও প্রয়োগ আরম্ভ হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি আজকের বিশ্বে আর একটি সমস্যা, যাতে ভারতবর্ষ প্রতিকারের পথ দেখাচ্ছে। এবিষয়ে অধিক বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এইটুকু বলা দরকার যে, ভারত সরকার এ বিষয়ে শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আরো একটি সমস্যা বিগত তিন হাজার বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে বিদ্যমান। গত তিন শতাব্দীর মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলি দেশ সমুদ্র পার হয়ে দূর দূর অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাটি পৃথিবী জুড়েই বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য এ সমস্যাটা সামাজিক এবং ন্যায়াদর্শগত—ওলন্দাজ ভাষায় একে বলে এপার্থেড, এর পর্তুগীজ শব্দান্তর কাস্ট এবং সংস্কৃত প্রতিশব্দ বর্ণ। এই জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম পদ্ধতির উদ্ভব সুবিদিত। যাদের শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য প্রখর তেমন দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সহসা যদি কোন সাক্ষাৎ-সংযোগ ঘটে তাহলে এই জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি হয়। দুইটি ভিন্ন এবং বৈসাদৃশ্য যুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে এই মিশ্রণ কোথাও বা ঘটেছে পররাজ্য জয়ের অভিযানের ফলে, কোথাও বা ঘটেছে বিদেশ থেকে বলপূর্বক ক্রীতদাস সংগ্রহের ফলে। বিজয় অভিযানের দরুন যে মিশ্রণ, তার একটি মুখ্য দৃষ্টান্ত এই ভারতবর্ষে আর্যভাষী বর্বরদের প্রবেশ ও বিস্তার। ক্রীতদাস আনয়নের ফলে জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তির দৃষ্টান্ত

বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যাবে। সব ক্ষেত্রেই মিশ্র জনসমষ্টির মধ্যে যারা অধিকতর প্রভাবশালী তারা অন্য অংশকে নিম্নবর্ণের জাতিরূপে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। ভারতবর্ষেও জনসংখ্যার অধিকাংশই অনার্যসম্ভূত এবং আর্যের দ্বারা প্রপীড়িত। এদের শরীরে আর্যরক্ত যদি থাকেও তাহলেও দুইএক বিন্দুর বেশী নয়। ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষী জনসমষ্টির মধ্যে এক কোটীতে আর্যভাষীরা অন্য কোটীতে টিউটনিকভাষীরা গত তিন চার হাজার বৎসর যাবৎ পৃথিবীর মনুষ্যবাসিত অঞ্চলগুলিকে বিজয়াভিযানের দ্বারা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। এই দুইটি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত লোকেরা এমন তীক্ষ্ণভাবে জাতিসচেতন কেন? নিজের দেশের প্রতিবেশী মানুষের প্রতিও তারা সংকীর্ণতা মুক্ত হতে পারেনি এবং জাতিভেদের প্রাচীর নির্মাণ না করে থাকতে পারেনি কেন? এই বর্ণাভিজাত্যের মনোবৃত্তির সঙ্গে ভাষার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে অন্যান্য জাতির নিদর্শন আছে যেমন লাতিনভাষী, স্পেনিয়ার্ড এবং পর্তুগীজেরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ মুক্তমনা। স্পেনিশভাষী এবং পর্তুগীজভাষী লোকেরা এই বর্ণাভিজাত্যের মনোভাব থেকে কিভাবে মুক্তি পেল? একটা কারণ এই হতে পারে যে, স্পেন এবং পর্তুগাল উভয় দেশেই অতীতে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত ছিল। মুসলমানেরা জাতিভেদের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত এবং শাসিতদের মধ্যে তারা কোন জাতিভেদের ফারাক রাখেনি। হিন্দুধর্মের সামাজিক ফল এবং অন্যদিকে ইসলাম ও রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সামাজিক ফলকে কি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করলে ভুল করা হবে? ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক ইসলাম বা ক্যাথলিক ধর্মপাশে আবন্ধ হলে তাদের জাতিভেদের গণ্ডী আর বজায় থাকে না, ইসলাম এবং ক্যাথলিসিজম সেই প্রভেদচিহ্ন দূর করে দেয়। অপরদিকে হিন্দুধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে ইসলাম কিংবা খৃষ্ট ধর্মের মত বিরোধ বাধাতে যায় না এবং দুই ধর্মমতের মধ্যে সংঘর্ষেরও কারণ ঘটায় না। কিন্তু ইসলাম খৃষ্টান কিংবা শিখ ধর্ম যেমন নিজের অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে জাতিভেদের কোন পার্থক্য রাখে না, হিন্দুধর্ম কিন্তু তেমন ভাবে ভারতবর্ষে বর্ণভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে দিতে পারেনি।

পৃথিবীতে আজকের দিনে দুইটি অঞ্চলেই জাতিভেদ প্রথা প্রখর সমস্যারূপে উপস্থিত। একটি অঞ্চল আফ্রিকা, সেখানে ক্ষমতাবান সংখ্যালঘুরা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের লোক এবং প্রধানত টিউটনিক ভাষী। আর একটি অঞ্চল হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষেও বৃটিশ শাসনকালে আর্যসম্ভূতদের প্রভাব এবং জাত্যাভিমান বজায় ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত এই বৃহৎ সমস্যার প্রতিকারে অগ্রণী হয়েছে। তার জন্য অবশ্য ভারতবর্ষকে বাইরে থেকে কোন পরামর্শ বা প্রেরণা নিতে হয়নি। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব এই বর্ণভেদ প্রথাকে অবলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন এবং আড়াই হাজার বছর পরে মহাত্মা গান্ধীও সেই একই বাণী প্রচার করেছেন। উভয়ের মধ্যে যখন দেখি এক সুর ধ্বনিত হচ্ছে তখন একথা বুঝি যে, এই সুর শুধু এই দুই মহৎ সন্তানের নয়। এ সুর ভারতবর্ষেরই অন্তরের সুর। হাজার হাজার বৎসর যাবৎ যে প্রথা দৈনন্দিন জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে তাকে উৎপাটন করা সহজসাধ্য নয়। এর জন্য যেমন আইনের প্রতিষেধ তেমনি মানুষের অন্তরের পরিবর্তনও প্রয়োজন। ১৯৫৬ সালে National War Academyতে শিবাজীর মূর্তি স্থাপন উৎসব উপলক্ষে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে দেখলাম সৈন্যাধ্যক্ষ একজন মুসলমান। অর্থাৎ সুপরিকল্পিতভাবেই জাতিভেদের প্রাচীরগুলিকে ভাঙবার বলিষ্ঠ প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে। যদি এই প্রয়াস ভারতবর্ষে সার্থক

হয় তাহলে আফ্রিকায় এবং উত্তর আমেরিকায় তার প্রভাব নিশ্চয় পেঁাছুবে।

চতুর্থ যে সমস্যাটি বিশ্বেরও ভারতবর্ষেরও, সেই ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমি আলোচনা করেছি। কাজেই এর বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই ভাষাগত বিভেদের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের পথে গুরুতর অন্তরায় দেখা দিয়েছে, অথচ এ বিষয়ে ভারতবর্ষের চেয়ে চীন স্পষ্টতই ভাগ্যবান। চীনের সুবিস্তৃত অঞ্চলে বহু উপভাষা আছে, কিন্তু এত অসংখ্য ভাষার বিভেদ সেখানে নেই এবং উপভাষাগুলির মধ্যে একটি, মান্দারিন চীনের প্রায় সর্বত্র কথিত এবং সুবিদিত। তাছাড়া মান্দারিন যাদের মাতৃভাষা চীনে তাদেরই সংখ্যাধিক্য। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দীর ক্ষেত্রে যেমন একথা প্রযোজ্য নয় তেমনি একথাও লক্ষণীয় যে, দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষা এবং উত্তরের হিন্দীর মধ্যে পার্থক্য দূরতিক্রম্য—প্রায় দ্রাবিড় ও ইংরেজীর পার্থক্যের সমতুল।

এবার আমার তৃতীয় প্রস্তাবনায় প্রবেশ করছি। স্মরণ থাকতে পারে যে, আমার তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ঃ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ভারতবর্ষের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। একথাও আমি পূর্বেই লিখেছি যে, এই বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথিবীর অন্যদের শিখবার অনেক আছে। ভারতীয়েরা যেভাবে নিজদের ঘৃণাবিমুক্ত রাখতে পারে তা দেখে আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি। ভারতীয়েরা অন্যদের সঙ্গে যখন সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হতে বাধ্যও হয় তখনও তারা আশ্চর্যভাবে নিজেদের মনকে অপরপক্ষ সম্বন্ধে ঘৃণার ঊর্ধ্বে রাখতে পারে। গান্ধিজীর সমাধিক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে আমার একদিন মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে আর কি কোন একজনও মুক্তিযোদ্ধার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যিনি একাধারে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা অন্যদিকে তাঁরই শত্রুপক্ষেরও মহৎ কল্যাণকামী? গান্ধিজী আমার দেশের লোকদের পক্ষে ভারত শাসন অসম্ভব করে তুলেছিলেন, আবার অন্যদিকে অসম্মান ও গ্লানি ব্যতিরেকেই ইংরেজ যাতে এদেশ থেকে মর্যাদা সহকারে পশ্চাদপসরণ করতে পারে তার পথও গান্ধিজীই প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আমার দেশের প্রতি তাঁর মহান দান স্বদেশের প্রতি তাঁর দানের চেয়ে বোধহয় খুব কম নয়।

কিন্তু একথা অস্বীকার করবার নয় যে, অহিংস অসহযোগ পদ্ধতির বিজয় শুধু একা গান্ধিজীর মনের জোরেই সম্ভব হয়নি, ভারতবর্ষের মানুষের মনের জোরও এই পদ্ধতিকে সার্থকতা দিয়েছে। আসলে এই দুই মনোবলের মধ্যে সম্মিলন ঘটেছিল। গান্ধিজী ভাষা দিয়েছিলেন দীর্ঘকালের পুরাতন ভারতবর্ষের মানসসম্পদকে। এই মনোবল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেও বুদ্ধকে এবং মহাবীরকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সমসাময়িক হিন্দু সন্ন্যাসী ও গুরুদেরও উদ্বুদ্ধ করেছে। কাজেই আমি বলতে চাই যে, অহিংস বিপ্লব ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত ধারণার এবং বৈশিষ্ট্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এই পদ্ধতির দ্বারা ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির পরেই আবার ভারতবর্ষের আভ্যন্তর ব্যাপারে ভূদান আন্দোলনের মধ্যেও এরই নূতন প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি পারমাণবিক যুগের প্রয়োজনীয়তা বোধ অশোককে অনুপ্রেরণা দেয়নি। গান্ধিজীও সেই প্রয়োজনবোধের দ্বারা তাড়িত হননি। কারণ হিরোশিমা এবং নাগাসাকির উপর ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক বোমা বর্ষিত হওয়ার বহু বছর পূর্ব হতেই তিনি অহিংসা মন্ত্রের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আমরা বর্তমান পারমাণবিক যুগের পূর্ণঝটিকার মধ্যে বাস করছি। যদি আজকের দিনের মানুষ পরস্পরের প্রতি এই অহিংসার মনোভাব অবলম্বন করতে না পারে তাহলে পারমাণবিক যুগের বিধ্বংসী

বাত্যাবিক্ষোভ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকবে না। অহিংসার মনোভাব অবলম্বন করা দুরূহ সন্দেহ নেই, কিন্তু এছাড়া উপায়ান্তরও নেই। এ যে কত দুরূহ পন্থা তা বর্তমান মুহূর্তে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় ভারতবর্ষ অনুভব করছে। কিন্তু পৃথিবীর সম্মুখে অহিংসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মহান দায়িত্ব ভারতবর্ষের উপরে অর্পিত হয়েছে। ভারতবর্ষ কোন্ পথে অগ্রসর হবে এবং এই দায়িত্ব কতখানি সার্থকভাবে পালন করতে পারবে তার উপরে সমস্ত বিশ্বের ভবিষ্যত নির্ভর করছে—বিশ্ব ধ্বংসের পথে যাবে অথবা ঐক্যের পথে, তার নিয়ামক ভারতবর্ষের মানুষ।

উদার সত্যোপলব্ধি ভারতবর্ষের চরিত্র বৈশিষ্ট্য। এদেশে কোন ধর্মগোষ্ঠীর লোক মনে করেন না যে, তাঁর নিজের ধর্মই একমাত্র সত্যের সন্ধান দিতে পারে। এমন কি তিনি একথাও কখন দাবী করেন না যে, তাঁর অনুসৃত ধর্মমতের বিকাশ একই সময়ে এক স্থানেই ঘটেছিল। যদি কোন শৈব মতাবলম্বী ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় যে, শিবের কল্পনা মহেন্‌জোদারো এবং হরাপ্পার সভ্যতায় অনার্য যুগেই জন্মলাভ করেছিল তাহলেও তিনি যে খুব ক্রুদ্ধ অথবা বিচলিত হবেন তা নয়। অথচ যদি কোন উদারমনা খাঁটি খৃষ্টান পুরোহিতকে বলা হয় যে, প্রত্নতাত্ত্বিক মতে দেখা গেছে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বহু পূর্বেই দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং মিশরে এবং কালক্রমে স্ক্যানডিনেভিয় অঞ্চলে যীশুর কল্পনাই ভিন্ন ভিন্ন বহু নামে নানাযুগে কোথাও তাম্মুজ, কোথাও আদোনিস্, ওসিরিস, আত্তিস, কোথাও বল্ডাররূপে দেখা দিয়েছিল।

ভারতীয়দের এই উদার মানসিকতা হিন্দু বৌদ্ধ দুই ধর্মেই বিদ্যমান বৌদ্ধধর্মও বিভিন্ন দেশে যেভাবে আচরিত হয়েছে তাতে যথেষ্ট পরমতসহিষ্ণুতা লক্ষণীয়। জাপানে বহুলোকই একাধারে বৌদ্ধ ও সিন্‌টো ধর্মাবলম্বী। চীন কমিউনিস্ট শাসনে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে সেখানে অনেকেই একই সঙ্গে বৌদ্ধ, তাও এবং কনফুসীয় ধর্মের অনুসরণ করতেন। খৃষ্টধর্মের মধ্যেও এক সময় এই গ্রহীতৃ মনোভাব ছিল, যা হিন্দুমানসিকতার অনুরূপ। কিন্তু পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্ম ভারতীয় ধর্মগুলির তুলনায় অগ্রহীতৃ এবং অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দেয়। অনেক খৃষ্টান মনে করেন যে, সত্য ও ত্রাণলাভের একচেটিয়া অধিকার কেবল খৃষ্টানদেরই আছে, কারো বা ধারণা যে অখৃষ্টান বিশ্বাস পৃথিবী থেকে নির্মূল করতে হবে। এই ধরনের আগ্রাসী যোদ্ধৃ মনোভাব একমাত্র খৃষ্টানদেরই বিশেষত্ব নয়। ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত *Oikoumene* বা মনুষ্যবসতি অঞ্চলে যে সমস্ত ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই মনোভাব বিদ্যমান। এমন কি রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। খৃষ্টান মুসলমান জুডা এবং জরথুস্ত্র ধর্মের প্রত্যেকের মধ্যেই এই অসহিষ্ণুতার মনোভাব রয়েছে। খৃষ্টোত্তর যুগের রাজনৈতিক মতবাদ ফ্যাসিজম, নাৎসী-ইজম এবং কম্যুনিজমের মধ্যেও এই মনোভাব লক্ষণীয়।

'এর বড় রহস্যের সন্ধান এক পথে হবার নয়'। ভারতবর্ষের কোন ধর্মগুরু এই উক্তিটি করেছেন? তিনি কি শঙ্করাচার্য, রামানুযাচার্য, নাকি গুরু নানক? বাণীটি নিঃসন্দেহে যে কোন ভারতীয় গুরুর মুখে বসান যায়। কিন্তু আসলে এই বাণী চতুর্থ শতাব্দীর রোমান সিনেটর কুইন্টাস অরেলিয়াস্ সাইমেকাসের। তৎকালে রোমান রাজশক্তি খৃষ্টধর্মকে রাজধর্মরূপে গ্রহণ করেছে এবং সমস্ত অখৃষ্টান ধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের গণ্ডী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। রোমান সিনেট হাউসে জুলিয়াস সিজার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি দেবী মূর্তি ছিল—বিজয়লক্ষ্মীর মূর্তি। মিলানের

খৃষ্টান বিশপ এ্যাম্‌ব্রোজ সেই মূর্তি অপসারণের জন্য দাবী তুললেন, অন্যদিকে সাইমেকাস মূর্তিটি সংরক্ষণের পক্ষে দাঁড়ালেন। এ্যামব্রোজেরই জয় হল, কারণ রাজশক্তির তিনি কর্ণধার। কিন্তু তার পরে বহুযুগ অতীত হয়েছে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী জগতে সাইমেকাসের বাণী অখৃষ্টান ধর্মগুলিকে অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তাঁর এই বাণীটি উত্তরকালের মানুষের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ বাণীর জবাব রোমান সাম্রাজ্য দিতে পারেনি।

সাইমেকাসের বাণীর মধ্যে খৃষ্টপূর্ব যুগের সহিষ্ণুতার মনোভাব প্রতিফলিত। এই মনোভাবই হিন্দুমানসিকতারও প্রেরণা। আমার গ্রীকো-রোমান যুগের ধর্মমত এবং দর্শন শাস্ত্রের প্রতি একটা স্বভাবগত অনুরাগ আছে। যদিও নিজে আমি খৃষ্টান তথাপি খৃষ্টানেরা যাকে প্যাগানিজম্‌ বলে থাকেন তার সঙ্গে আমি মানসিক সাদৃশ্য খুঁজে পাই। সেই জন্যই ভারতবর্ষের এবং পূর্বএশিয়ার ধর্মমনোভাব বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। বর্তমান চীনে অতীতের তিনটি ধর্মমত ও দর্শনশাস্ত্র আজ অবদমিত হচ্ছে। প্রশস্ত এবং উদার ধর্মীয় মানসিকতা একমাত্র বোধ হয় ভারতবর্ষেই আজও বেঁচে আছে। মনে হয় খৃষ্টপূর্ব যুগের উদার মানসিকতার ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব বর্তমান পারমাণবিক যুগে ভারতবর্ষের উপরেই অর্পিত হয়েছে। সাইমেকাসের বাণীকে ভারতবর্ষই সফল করার দায়িত্ব নিয়েছে। তার নূতন সংবিধানেও এই দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়েছে। রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস্‌ চতুর্থ শতাব্দীতে এবং মুঘল সম্রাট ঔরাংগজেব সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ভুল করেছিলেন বর্তমান ভারত সে ভুল করেনি। ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে হিন্দু-ধর্মকে গ্রহণ করা হয়নি, এখানে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন প্রবর্তন করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় এই অধিকার ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম তার ভারতীয়ত্বকেই রক্ষা করেছে।

১৯১৪-১৯১৫ সালে রাশিয়া যখন পোলাণ্ড অধিকার করেছিল, সেই সময় পোলাণ্ডের রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের জব্দ করার জন্যই ওয়ারস নগরীর কেন্দ্রস্থলে রুশেরা তাদের ধর্মীয় মত অনুসারে একটি গীর্জা স্থাপন করেছিলেন। বলাবাহুল্য এর উদ্দেশ্য যতটা ছিল ধর্মীয় তার চেয়ে বেশী ছিল রাজনৈতিক। ১৯১৮ সালে পোলাণ্ড যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন এই গীর্জাটি পোলিশ গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস করেন। অপর-পক্ষে আমি একথা প্রশংসনীয় মনে করি যে, ঔরংগজেবের নির্মিত মসজিদগুলিকে ভারত সরকার ধ্বংস করেননি, বিশেষত ঐ তিনটি মসজিদ এখনও আছে—তার মধ্যে দুইটি বারাণসী ঘাটেরই মুখোমুখি অপর পারে এবং তৃতীয়টি মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধনেরই উপরে স্থাপিত। ঔরংগজেব ঐ তিনটি মসজিদ নিশ্চয়ই নির্মাণ করেছিলেন হিন্দুদের রাজনৈতিক অবমাননা ঘটাবার জন্য, যে উদ্দেশ্যে রুশেরা ওরারসতে অর্থোডকস্‌ গীর্জাটি নির্মাণ করেছিলেন। সবচেয়ে আপত্তিকর স্থানগুলি নির্বাচনের ব্যাপারে ঔরংগজেবের একটা প্রতিভা ছিল। এ ব্যাপারে তিনি এবং স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ একটি জুটি। খৃষ্ট-মুসলিম-ইহুদি ধর্মগোষ্ঠীর শিরায় শিরায় যে ধর্মীয় উন্মাদনা প্রবাহিত এঁরা তারই মূর্ত প্রতীক। পরবর্তীকালে বৃটিশেরা তাদের শাসনের চিহ্নও এইভাবেই স্মৃতি স্তম্ভের দ্বারা স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছে। ভারতসরকারের পূর্ত দপ্তরের উপর আমাদের যদি কোন মতামত খাটানর অবকাশ আজও থাকত তাহলে আমার দেশবাসীরা নিশ্চয়ই এই অশিক্ষিত রুচির (Philistine) নিদর্শনগুলিকে অপসারিত করতে বলতেন। কিন্তু ভারতসরকার যে মমতা সহকারে তাজমহলের স্থাপত্যকে যত্ন করছেন প্রায় সেই মমতায়ই

বৃটিশ যুগের কুরুচির এই নিদর্শনগুলিকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভারতবর্ষের এই সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত আমার মনে যুগপৎ ভারতীয়দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আমাদের নিজেদের জন্য আত্ম ধিক্কারের উদ্রেক করেছে।

যাই হোক, এগুলি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যেরই সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্য বর্তমান পৃথিবীর কাছে মূল্যবান। যে কথা আমি ইতিপূর্বে বার বার বলেছি, আর একবার তার পুনরাবৃত্তি করি। বর্তমান বিশ্বে যন্ত্রবিজ্ঞান দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, বিভিন্ন প্রান্তের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জনগোষ্ঠী মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে তাদের আণবিক অস্ত্রের সম্ভার। শারীরিক দিক থেকে এখন আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী, কিন্তু মানসিক দিক থেকে আমরা অপরিচিত এবং অনাত্মীয়। আজ যদি পৃথিবীর মানুষ এই নৈকট্যের মধ্যে এসে মানসিক দিক থেকে অনাত্মীয় থেকে যায় তাহলে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ভীতি অনিবার্য এবং এর থেকে যুদ্ধ ও ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। অন্যথায় বাঁচবার পথ হচ্ছে পরস্পরের সংস্কৃতির বিশেষত্ব ও গুণগুলি আহরণ করা, পরস্পরকে জানা, অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করা এবং বহুর মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করা। এই জন্যই ভারতের শিক্ষা বিশ্বের কাছে আজ এত মূল্যবান।

উপসংহারে আমার আর একটি কথা বলবার আছে। গান্ধিজীকে প্রতিদিন বিপুল কর্মভারে আত্মনিযুক্ত থাকতে হত। তবু সেই ব্যস্ততা থেকে মাঝে মাঝেই তিনি অবসর নিতেন চিন্তা ও ধ্যানের জন্য, সেজন্য তাঁর সময়ের অভাব ঘটেনি। এ শুধু তাঁর নিজের চরিত্রের সত্যনিষ্ঠতার পরিচয় নয়, এতে তাঁর ঐতিহ্যনিষ্ঠার পরিচয়ও আছে। এই ধ্যান ও আত্মজিজ্ঞাসার অভ্যাস ভারতীয় ঐতিহ্যেরই বৈশিষ্ট্য।

ব্যবহারিক জগতে ভারতবর্ষ বর্তমানে বহু জরুরী এবং সমূহ কর্তব্য সাধনে ব্যাপৃত হয়েছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মারফৎ ব্যবহারিক জগতে তাকে এক বিপুল কর্তব্য সাধন করতে হবে—ভারতীয় কৃষকসমাজের বৈষয়িক জীবনমানের উন্নতিবিধান তার লক্ষ্য। কিন্তু এ কর্তব্য নিছক বৈষয়িক নয়। বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের উপরেই অধ্যাত্ম কর্মের প্রশস্ত ভূমিকা তৈরী হবে। গান্ধিজী নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে, ব্যবহারিক জীবনের কঠিন কর্তব্য সাধনের মধ্যে ব্যাপৃত থেকেও, পার্থিব জগতের উদ্বেগের মধ্যেও নিজের আত্মাকে কিভাবে শান্ত ও অবিচল রাখা যায়। আজ বিশ্বকে ভারতবর্ষ সম্ভবত এই মহত্তম শিক্ষাই দিতে পারে। মধ্যযুগের পর থেকে অধ্যাত্মজীবনশিল্প পশ্চিম সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। সেইজন্যই আজ আমরা ভারতবর্ষের দিকে ফিরে তাকিয়েছি। ভারতবাসীর অন্তরে এখনও সেই সম্পদ আছে যা দিয়ে মানুষ সত্যকার মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষ সেই সম্পদেরই নিদর্শন বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করতে থাকুক। বিশ্বকে আত্ম-বিনাশের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য এর চেয়ে বড় দান আর কিছু হতে পারেনা।*

অনুবাদ : **অমিতাভ চৌধুরী**

* আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

And now that thou art lying, my dear old Carian guest,
A handful of grey ashes, long, long ago at rest,
Still are thy pleasant voices, thy nightingles, awake,
For Death, he taketh all away, but them he cannot take.

—Heraclitus: William (Johnson) Cory.

The rest is silence.—Hamlet.

মল্লিকদা বলতেন, ওদের জীবন হ'ল মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট—মুহূর্তকে নিয়ে ওরা পাগল, মুহূর্তের পর মুহূর্ত, কিন্তু সমগ্র জীবনের কথা ওরা ভাবে না। মল্লিকদা অর্থাৎ বসন্তকুমার মল্লিক। বারো বছর অক্‌স্‌ফোর্ডে কাটানোর পর দেশে ফিরে নিয়তির অনিবার্য বিধানে তিনি এসে জুটেছিলেন আমাদের "পরিচয়" চক্রে। "পরিচয়"-এর বয়স তখন বেশি নয়, বছর খানেক হবে। মল্লিকদার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুধীন সুশোভন আমি ছিলাম ত্রিশ বত্রিশ। নীরেন একটু বড়। তার চাইতেও বছর তিন চার বড় ধূর্জটি মুখুজ্যে, গিরিজা ভট্টাচার্য ও সত্যেন বসু। এই চক্রে এসে জে'কে বসলেন মল্লিকদা; বোধ হয় অপূর্ব চন্দ তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক মনে নেই। তবে অপূর্ব চন্দ, সাহেদ সুরাবর্দি ও তুলসী গোঁসাই; "পরিচয়" চক্রের এই ত্রয়ীর সঙ্গে অক্সফোর্ডে থাকতে মল্লিকদার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, যার ফলে তিনি মল্লিকদা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। "পরিচয়" চক্রে যোগদানের পর মল্লিকদার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল সুধীনের ও আমার : তিনি হয়ে উঠলেন একাধারে আমাদের বন্ধু ও নৈতিক অভিভাবক; মল্লিকদার নীতিজ্ঞান ছিল প্রখর, আর অভিভাবকত্ব করার তাগিদ ছিল সহজাত। এই তাগিদেই তিনি সুধীনদের অর্থাৎ সুধীন, সাহেদ সুরাবর্দি ও সম্ভবত অপূর্ব চন্দর—কিন্তু প্রধানত সুধীনের মনোবৃত্তি ও জীবনের হালচাল লক্ষ্য করে প্রচার করতেন ঐ মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট থিওরি।

আজ প্রায় ত্রিশ বছর পরে সুধীনের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল মল্লিকদার ঐ মত। সুধীনের জীবন পৌঁছে গেল তার চরম মুহূর্তে, তারপর আর একটি মুহূর্তও যে বাকি রইল না। এরপর নিঃসীম নীরবতা, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস (যদিও আমি হ্যামলেট নই) আর সুধীনেরও যতদূর জানি ঐ বিশ্বাসই ছিল।

কেন বলতেন মল্লিকদা ঐ কথা? এমন কী তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সুধীনের জীবনে যা আমাদের পাঁচজনের ও অবশ্য তাঁর নিজের জীবন থেকে স্বতন্ত্র? মল্লিকদার জীবন তো

ছিল—সে কথা আমাদের দলের কেনা জানে?—ইংরেজিতে যাকে বলে একেবারে হ্যাণ্ড টু মাউথ। কিন্তু তা হ'ল জৈবিক ব্যাপার, দার্শনিক নয়। সুধীনের মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট জীবনের কথা তিনি বলতেন দার্শনিক অর্থে; তাঁর দর্শন নয়, সুধীনের দর্শন। ব্রাউনিঙের মোমেণ্ট ঈটারন্যালের কথা কী মল্লিকদার মনে ছিল? হয়তো সে কথা তিনি শোনেন-ই নি। ব্রাউনিং-দর্শন সুধীনকে কী স্পর্শ করেছিল? স্যাড্ এ্যাণ্ড ব্যাড্ এ্যাণ্ড ম্যাড্ হওয়ার ঝোঁক সুধীনের তখনকার জীবনে যে একেবারে ছিল না তা নয় কিন্তু ব্রাউনিঙ ও সুধীনের মাঝখানে ছিল যুগযুগব্যাপী মহাসমুদ্রের ব্যবধান।

সুধীনের প্রাক্-"পরিচয়" জীবনের কথা আমি বিশেষ জানি না, কেননা দু একবার রবীন্দ্রনাথের কাছে ওকে দেখলেও তখনো ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি। লোকের মুখে শুনেছিলাম ছেলেটি গুণী, সাহিত্যে অগাধ অনুরাগ। এর পর যখন আলাপ হ'ল তখন গুণ যাচাই করার প্রবৃত্তি হয়নি। কী করে হবে? এত অল্পদিনের মধ্যে এত সহজভাবে সুধীনের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল যে লোকটি ভালো না মন্দ, গুণী না গুণহীন সে সব কথা ভাববার অবকাশই হয়নি। এর পর দেখেছি এইভাবে সুধীনের মায়াজালে জড়িয়েছে আরো বহু ব্যক্তি, স্বদেশবাসী ও বিদেশী, বিদ্যায় ও মননশীলতায় যাঁরা আমার চাইতে অনেক উঁচু স্তরের। আশ্চর্য লেগেছে এই কথা ভেবে যে এত বিচিত্র ব্যক্তিকে কী বিচিত্র আকর্ষণে সে এত আপন করতে পারল। মুহূর্তের পর মুহূর্তকে আঁকড়ে যে জীবন প্রসারিত হয়েছে দিনের পর দিন, কী এত যাদু ছিল সেই জীবনে!

কেননা এ কথা আজ না মেনে পারছি না যে মল্লিকদার কথার মধ্যে অনেকটা সত্য ছিল। "পরিচয়"-এর আদি যুগের সুধীনের কথা বলছি। একদিকে সমাহিত সাহিত্য সাধনা আর একদিকে অবিরত অস্থিরতা—এই ছিল তার জীবন। কোথাও সে যেন স্থির আশ্রয় পায়নি, আর এই আশ্রয় খোঁজার জন্যে সে যেন নিরন্তর ব্যগ্র। স্বাদেশিক, সামাজিক এমন কি পারিবারিক পরিবেশও যেন তার কণ্টকশয্যা। কিন্তু এ কথা অর্ধ সত্য। কেন না আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব সকলের প্রতি তার সহৃদয়তাও স্মরণীয়। এই সহৃদয়তা মৌখিক নয়, আন্তরিক। ত্রিশ বছর ধরে দেখেছি যাকে সে একবার কাছে টেনেছে তার প্রতি সে কখনো বিমুখ হয়নি। হয়তো মনোমালিন্য ঘটেছে এমন কি কলহ: সুধীনের অভিমানবোধ ছিল প্রখর আর অনেক সময়ে তা তীব্রভাবে প্রকাশ পেত। কিন্তু এসব সাময়িক ব্যাপার। মোট কথা সুধীন মানুষ ভালোবাসত—সব রকমের মানুষ।

প্রাক্-"পরিচয়" যুগে সুধীনের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই যে খুব মননশীল তা নয়। কিন্তু এঁদের নিয়ে আড্ডা জমাতে ও মাঝে মাঝে হৈ-হুল্লোড় করতে সুধীনের উৎসাহের অভাব ছিল না। এর পর জমে উঠল "পরিচয়"-এর আড্ডা। সে এক নক্ষত্রসভা। বসন্ত মল্লিক, সাহেদ সুরাবর্দি, সত্যেন বসু, ধূর্জটি মুখার্জি, হুমায়ুন কবির, সুশোভন সরকার, তুলসী গোঁসাই, আবু সইয়দ আয়ুব, নীরেন রায়, হীরেন মুখার্জি—প্রচণ্ড ইনটেলেকচুয়াল বলে এঁরা সকলেই ছিলেন খ্যাত। বিষ্ণু দে তখন ছেলেমানুষ, "পরিচয়"-এর আড্ডায় নিয়মিত এলেও সে প্রায় মুখ বুজেই থাকত এমন কি সামনে খাবার ধরলেও। কখনো কখনো আসতেন একদা অক্‌স্‌ফোর্ডের অল্ সোল্‌স্ কলেজের ফেলো কিরণ মুখুজ্যে—সাহেদ সুরাবর্দি তাঁকে ডাকতেন প্লেটো বলে। মাঝে মাঝে আমরা পেয়েছি সুধীনের মেশোমশায় চারুচন্দ্র দত্তকে। ঐ এক আশ্চর্য লোক। সে কালের আই. সি. এস, অতএব সাহেব। কিন্তু একেবারে খাঁটি ভারতীয় মন। গালগল্পে

তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, যেমন কথায় তেমনি লেখায়। এই ছিল আমাদের "পরিচয়"চক্র।

মাঝে মাঝে বিদেশী কেউ কেউ আসতেন। অপূর্ব চন্দ বলতেন, সুধীন সাহেবদের আকর্ষণ করে চুম্বকের মত। লোকে সুধীনকেও তো বলত সাহেব। কথায় বার্তায় বাংলার চেয়ে ইংরেজি বলাই ছিল তার বেশি অভ্যাস। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছিলাম যে ছেলেবেলায় কাশীতে এনি বেসান্টের ইস্কুলে পড়ে তার ইংরেজি বলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অথচ এই ইংরেজিদুরস্ত লোকটি যখন বাংলা লিখতে শুরু করল তখন মনে হ'ল সে চিরজীবন শুধু সাধনা করেছে সংস্কৃত ভাষার। সুধীন আমাকে বলেছিল তার প্রথম বই "তন্বী"-তে যেটুকু রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার চেষ্টায় সে নতুন এক রচনা-রীতি সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মাইকেলের বেলায় তো এই যুক্তি খাটে না। তিনিও তো ছিলেন ইংরেজিদুরস্ত। এই দুজনেরই রচনারীতির বিবর্তনে একটু ঐতিহাসিক সাদৃশ্য আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে সুধীন মাইকেলের বিশেষ সমঝদার ছিল।

কিন্তু কোথায় মাইকেল আর কোথায় "পরিচয়" যুগ! আমরা আচ্ছন্ন ছিলাম রবীন্দ্র সম্মোহনে। ঠিক হয়েছিল এই সম্মোহন কাটিয়ে দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে আমাদের পত্রিকা। তাই নামকরণ হয়েছিল "পরিচয়"। আরো ঠিক হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা লেখা চাইব না। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাতেই রবীন্দ্র-নাথ আবির্ভূত হলেন, তারপর তাঁকে ঠেকায় কার সাধ্য? কিন্তু দেশবিদেশের সাহিত্য ও চিন্তাধারা যে প্রতিফলিত হয়েছিল "পরিচয়"-এর সংখ্যার পর সংখ্যায় তাতো আজ অবিসংবাদিত ইতিহাস। আর এই প্রতিফলনের উজ্জ্বলতম অংশ ছিল সুধীনের নিজের রচনা। টি. এস. এলিয়ট বা ইয়েটস্-এর সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় থাকলেও কজন রাখত ভালেরি বা মালরোর খবর? আর মার্কিন ঔপন্যাসিক ফক্‌নার তো তখন ইওরোপ আমেরিকাতেও ছিলেন প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল। পরবর্তী কালে ফক্‌নারের বিপুল প্রতিষ্ঠা সুধীনের যুগান্তপ্রসারী সাহিত্যবীক্ষার পরিচায়ক।

এই সময় সুধীনকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল বিজ্ঞান ও দর্শন। "পরিচয়"সভায় বহুদিন দেখেছি আয়ুব বা কবিরের কাছে সুধীন ইয়োরোপীয় দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান নিচ্ছে। বিজ্ঞান চর্চা সুধীন করে নি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা তাকে স্পর্শ করেছিল, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকরা যাকে বলেন এন্‌ট্রোপি তারই ধারণা। এন্‌ট্রোপির বাংলা কী করব? বোধ হয় জাগতিক বিশৃংখলা যার একটি বৈজ্ঞানিক মাপ আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক হলডেনের একটি রচনায় পড়লাম এই এন্‌ট্রোপির ধারণা নাকি প্রথম পাওয়া যায় রোমক কবি সেনেকার কবিতায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি এই লাইনটির উল্লেখ করেছেন: Tempus nos auidum denorat et chaos (Greedy time and chaos devour us)। পাঠকেরা মিলিয়ে দেখবেন সেনেকার সংকেত সুধীনের কাব্যে কতটা পাওয়া যায়।

"পরিচয়"মণ্ডলীতে সুধীন রস পেয়েছিল আর প্রভূত রস সঞ্চারিত করেছিল। মনন-শীলতায় ও ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে সুধীন ছিল এই মণ্ডলীর উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। দশ বছর ধরে এই মণ্ডলীর আলো বিকীর্ণ হয়েছিল বাংলাদেশে। তারপর মহাযুদ্ধের ধাক্কায় আমরা হলাম ছত্রভঙ্গ। বিচিত্র মতের ভার বহন করে "পরিচয়"-এর মঞ্চ দশ বছর অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু যখন ভিন্ন পথের তাগিদ প্রবল হয়ে উঠল তখন পুরোনো মঞ্চের আশ্রয় হ'ল

নিরর্থক। এর পর সুধীনের সাহিত্য সাধনায় কিছুদিন বাধা পড়ল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সুধীন একসময়ে আত্মনিয়োগ করেছিল সাহিত্য সাধনায় ও সুহৃদ সাহচর্যে। আর একবার সে ধরা দিল চাকরির জালে। বেশি দিন নয়।

চোরবাগানের দত্ত পরিবার নতুন করে শিকড় গজিয়েছিল হাতীবাগানে। সুধীনের বাবা মারা যাওয়ার পর এই আস্তানাও আস্তে আস্তে ভাঙ্‌ল। কিন্তু সুধীন তখন বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে স্বসমুখ শক্তিতে, ব্যাপকভাবে না হ'লেও দৃঢ়ভাবে। দত্ত বংশের আলো সে নিবতে দেয় নি। নব নব সুহৃদসমাগমে সুধীনের নতুন আড্ডা গমগম করত।

নতুন বন্ধুমণ্ডলী গড়ে উঠল তাকে ঘিরে : সুশীল দে, বুদ্ধদেব বসু, এরিক্ ডা কস্টা : ধূর্জটি মুখুজ্যে, মৃণালিণী ও লিণ্ডসে এমার্সন—এ'রা তো ছিলেন "পরিচয়"যুগ থেকেই। অপূর্ব চন্দ তো ঘরের লোক। আরো ছিল তরুণ সাহিত্যিকদের দল। প্রৌঢ় সুধীন যে এদের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সাক্ষ্য পেলাম "উত্তরসূরীর" সুধীন্দ্রস্মরণ সংখ্যায়। সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য সুধীনকে বলেছেন নিঃসঙ্গ নায়ক। এ কথা হয়তো সত্য। নিঃসঙ্গ বলেই কি সে পারত এমনভাবে প্রৌঢ় ও তরুণ সকলকে নিয়ে আড্ডা জমাতে?

চিরকালের মতন সেই আড্ডা ভাঙল। কিন্তু বাংলার সাহিত্য প্রাঙ্গনে দত্ত পরিবারের আলো কি কখনো ম্লান হবে?

হিরণকুমার সান্যাল

সমালোচনা

সিন্ধুর স্বাদ—প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। সুরভি প্রকাশনী। ১ কলেজ রো, কলিকাতা। মূল্য সাত টাকা।

'কোনো বিশেষ কাল ও দেশকে চিনতে বুঝতে উপন্যাসকে যদি কতকটা মানচিত্র ভাবা যায়, কবিতাকে ধরা যায় তার আকাশপ্রদীপ, তাহলে ছোটগল্পকে বোধ হয়, জানলা বলা যায়,—যে উন্মুক্ত জানলায় এক ঝলকের দেখায় একেবারে ভেতরের আসল প্রাণস্পন্দনটুকু আশ্চর্য-ভাবে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়।'

উপন্যাস, কবিতা এবং ছোটগল্প সম্বন্ধে,—সাহিত্যের এই তিন শাখাতেই অভিজ্ঞ প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই ইশারা দিয়েই "সিন্ধুর স্বাদ" গল্পসংগ্রহের 'কৈফিয়ৎ' শুরু হয়েছে। অতঃপর তিনি এই গল্পসংগ্রহের লেখকদের সম্বন্ধে এবং এই সংকলনের আদর্শ সম্বন্ধে যা বলেছেন, সে অংশটুকু এই : 'বর্তমান সংকলনে সবসুদ্ধ যে ২৮ জন বাংলা গল্পকারের বাছাই করা আটাশটি গল্প সংগৃহীত, তাঁদের সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীসুবোধ ঘোষের জন্ম ১৯০৯ ও সর্বকনিষ্ঠ দিব্যেন্দু পালিতের ১৯৩৯-এ। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন, গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৯-এর মধ্যে প্রকাশিত তাঁদের রচনাই এই সংগ্রহের উপকরণ। গল্পগুলি অবশ্য সর্বক্ষেত্রে জন্মকাল অনুযায়ী সাজান হয়নি, বরং লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশের পারম্পর্যই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।'

উনিশ শ' নয় থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত মোট তিরিশ বছরের এই সময়সীমার মধ্যে যেসব লেখক এসেছেন, তাঁরা তাঁদের চোখ খোলবার সংগে সংগেই জগতের 'বহ্নিবলয়-বেষ্টিত, বিক্ষুব্ধ দিগন্ত দেখেছেন' বলেও সম্পাদক মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু কেবল এই বিশেষ সময়সীমার ছায়া পড়লেই কোনো বিশেষ রচনা শিল্পগুণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না। তাইত সেকথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 'কাল ও দেশাশ্রয়ী হয়েও দেশকালাতীত গহন কোন 'শিল্পসত্য' স্পর্শ করা চাই। এই লক্ষ্য মনে রেখে আটাশটি আধুনিক বাংলা গল্প সংকলিত করা শক্ত কাজ। কারণ একালে গল্পলেখকদের সংখ্যা যে-পরিমাণে বেড়েছে, 'শিল্পসত্য' স্পর্শ করবার সামর্থ্য তাঁদের ঠিক সম-পরিমাণে বেড়েছে মনে করা সমীচীন নয়। কোনো কালে, কোনো দেশেই তা হয়না। এটা নিন্দার কথা নয়। যথা কথা মাত্র। এবং 'দেশকালাতীত গহন কোন শিল্পসত্য' মন্তব্যটির মধ্যে চিরন্তন মূল্যের কথাই যে সূচিত হয়েছে, সে-ধারণাও অলীক নয়। সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' সন্তোষকুমার ঘোষের 'শোক', বিমল করের 'অশ্বত্থ', সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ', রমাপদ চৌধুরীর 'ঈর্ষা', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কন্যা', লীলা মজুমদারের 'পাশের বাড়ির মেয়ে' অথবা প্রতিভা বসুর 'দাম্পত্য লীলা',—এই সব গল্পের প্রত্যেকটিই প্রসিদ্ধ, অথচ কোনো দিক থেকেই এরা কেউ কারও পুনরাবৃত্তি নয়। দু'একটি ক্ষেত্রে লেখার মধ্যে স্বাদ যতো তীব্র মনে হয়, হয়তো অন্যান্য ক্ষেত্রে ততো তীব্র নয়। 'সুন্দরম্'-এর মধ্যে ময়নাঘরের থমথমে হাওয়ায় কৈলাস ডাক্তারের চোখে মৃত রমণীদেহের অন্তরঙ্গ রূপ যেভাবে উদ্ভাসিত

হয়ে উঠেছে,—এবং সেই লাসের পাকস্থলীর মধ্যে ক্রোমরসে মাখা সন্দেশ-পাঁউরুটি-বেলেডোনার অজীর্ণ পিণ্ড দেখে তিনি 'মার্ডার' বলে চীৎকার করে,—মূর্ছিতপ্রায় হয়ে,—আবার ফিরে এসে, অস্ত্রচালনা করে, যখন 'পরিশল্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা' তুলে ধরেন,—সুবোধ ঘোষ সেক্ষেত্রে যেভাবে বলতে পেরেছেন—'মাতৃত্বের রসে উর্বর মানব-জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ির আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট, কুণ্ঠিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।—'বৈয়াকরণ' গল্পে সতীনাথ ভাদুড়ীর সে-রীতিও নয়, সে বিষয়ও নয়। কিন্তু তাঁর লেখাতেও স্বকীয়তা আছে, কৌতুকরসের বিশিষ্টতা আছে। সে আর-একরকম স্বাদ।

বিমল মিত্রের 'নীলনেশা' কিংবা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'চোর' কিংবা সমরেশ বসুর 'ছেঁড়া তমসুক' গল্পগুলির মধ্যেও একালের বাংলা গল্পশিল্পের শিল্পকর্ম এবং আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার ছায়া, দুই-ই বিদ্যমান। গৌরকিশোর ঘোষের 'জবানবন্দী'তে এই সমাজপ্রসঙ্গই আর-একভাবে দেখা দিয়েছে। 'সুন্দরম্'-এর তীব্রতা, গৌরকিশোরবাবু তাঁর এই গল্পের মেনকার জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেন কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাবে পুনরুচ্চারিত হতে দিয়েছেন। মেনকা বলেছে : 'প্রেমে সুখ আছে। একথা মিথ্যে। সুখের জন্যে কেউ প্রেম করে না। ওটা নিদারুণ ভবিতব্য। মৃত্যু যদি যম-যন্ত্রণা হয়, প্রেম তবে জীবন-যন্ত্রণা।'

বলা বাহুল্য, প্রেম মানবজীবনের চিরন্তন আশ্রয়। আমাদের একালে, সে-আশ্রয় ভেঙে পড়ছে বলে যদি কারও ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে সেই সূত্রে এও স্বীকার্য যে, প্রেম সম্বন্ধে এ-কালের সেই ধারণাটা গল্পে প্রতিফলিত হতে দেওয়াও একালের গল্পলেখকদের বিশেষ দায়িত্ব। যেমন প্রেম সম্বন্ধে, তেমনি অন্যান্য আশ্রয় সম্বন্ধেও সমাজের উদ্বাস্তু-ভাবটা আমাদের অন্যতম 'আধুনিক' অভিজ্ঞতা! "সিন্ধুর স্বাদ" সেদিক থেকে অবশ্যই আধুনিকতা দাবি করতে পারে।

হরপ্রসাদ মিত্র

হরিণ চিতা চিল— প্রেমেন্দ্র মিত্র। ত্রিবেণী প্রকাশন। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

আজকাল আধুনিক কবিতার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে গবেষণাগ্রন্থও দেখা দিচ্ছে। যদিও এতে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করি, তবু এ ধরনের উপাধিলিপ্সু রচনায় সমালোচক কোনো কোনো পূর্বনির্ধারিত অনুমানের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে ব্যস্ত থাকেন ব'লে একটু একপেশেমী দেখা দেয়, এটাও অস্বীকার করতে পারি নে।

আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা কী, এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া কঠিন। অনেক চেষ্টায় একটা সংজ্ঞা খাড়া করা গেলেও, সকল আধুনিক কবির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না। কবিতায় আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু সংস্কৃত আলংকারিকের ভাষায় 'পার্বতীপরমেশ্বরে'র মতো একাত্ম হ'লেও, অনেক কবির কাব্যপ্রকরণ যেমন আধুনিক, বক্তব্য তেমন নয়; অনেকের বক্তব্য আধুনিক, কাব্যপ্রকরণ আধুনিক নয়; আবার এমন কবিও আছেন যাঁর আধুনিকতা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে রচনার ভিতর-বাহির দু'দিকেই পরিব্যাপ্ত, তবু তাঁকে আধুনিক কবি বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা হয়। এইসব জটিলতা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ

বোধ হয়, দুটি প্রাথমিক পরীক্ষাতে কবিকে যাচাই করে নেওয়া। প্রথম হচ্ছে, কবি যে কবিতা রচনা করেছেন তা কবিতা হিসেবে সার্থক হ'য়েছে কিনা। আর দ্বিতীয়ত, সেই উত্তীর্ণ কবিতা জীবন সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে কিনা। এ'দুটি প্রশ্ন অবশ্য একই জিজ্ঞাসার এপিঠ-ওপিঠ। অর্থাৎ সেই কবিতাকেই আধুনিক বলব, যার দ্বারা আধুনিক পাঠকের চেতনার দিগন্ত আরো একটু প্রসারিত হয়; যে কবিতা তাদের ভালোবাসা পায়।

এই বিচার সামনে রাখলে, আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, এবং বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু যদি আধুনিক কবি বলে বিবেচিত হন তাহলে প্রেমেন্দ্র মিত্র কেন আধুনিক নন, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। পূর্বোক্ত কবিদের কেউ হয়ত রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ ক'রে উক্ত মহাকবির কাছ থেকে সরে যেতে প্রয়াসী হয়েছেন, কেউ রবীন্দ্রনাথকেই আধুনিক পটভূমিকায় পুনর্বসতি দিচ্ছেন, আবার কেউবা নিজেই রবীন্দ্র-নাথের আশ্রয়ে পুনর্বসতি চাইছেন; কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র মোটামুটি এ সব দুর্ভাবনার দ্বারা পীড়িত না হ'য়ে আমাদের ত্রিশ-প'য়ত্রিশ বছরব্যাপী আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা ও আনন্দকে কাব্যরূপ দিতে প্রয়াসী হ'য়েছেন। এটা বিশেষ ক'রে আজ জানা দরকার, তিনিই আমাদের ভাষায় প্রথম আধুনিক কবি। আধুনিক জীবনের গণতান্ত্রিক বোধ এবং সেই সঙ্গেই স্বসমাজে তার খণ্ডিত উপলব্ধি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় যুগপৎ হাসি-অশ্রুর মতো অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। এবং সেই জন্যেই তিনি সর্বজনবোধ্য ও সর্বজনপ্রিয় কবি। [illegible]নিক জীবনের নিশ্ছিদ্র হতাশা, তার বহুতল চেতনালোকের আলোকবিচ্ছুরণ, [illegible]নবতার রক্তাক্ত আশাবাদ, কিম্বা স্বপ্নময় অবসাদের চিত্রল প্রতিলিপি বাংলা কবিত[illegible] অন্য কবিদের কীর্তি; এবং এর কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁদের সহযোগী। কিন্তু যেখানে আলোচ্য কবির নিজ-বাসভূমি, সে হ'ল এক শান্ত দৃঢ়তার মিতভাষণ, যাতে ঘনীভূত আবেগের সরলতায় ভাষা পায় আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এই বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবন, যেখানে—

এক জানালারই মাপে গড়া চোখ কান ও চেতনা।

(ট্রেনের জানলা)

তবু সে জানে—

পায়ে পায়ে এই জড়ানো শহর
ভয়ে ভয়ে চোখ-তোলা,
খুঁজে পেতে পারে হয়ত দুয়ার
আরেক আকাশে খোলা।

(তেরো নদী)

কারণ—

শুধু তার দুঃসাহস কিছুতেই মানবে না'ক হার।
সে জানে এ বর্তমানই দুঃস্বপ্নের মিথ্যা রূপকথা।

(কাগজের নৌকো)

তাই বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে নিতান্তই স্থানিক কবি, তা মোটেই নয়। ইতিহাস ও ভৌগোলিক উল্লেখে বাংলা কবিতায় একটা নতুন চেতনা স্পন্দিত করার পথিকৃৎ বোধ হয় তিনিই, যদিও পরে অন্যত্র তার প্রয়োগ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু

যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ঐ ভৌগোলিক বা ইতিহাস-আশ্রিত ব্যঞ্জনাকে রচনায় স্বপ্নাবেশের দূরত্ব আনার জন্যেই ব্যবহার করেন না, তাঁর লক্ষ্য থাকে বর্তমান জীবনকে স্পষ্টতর ক'রে তোলার দিকে। এ বইয়ের 'দাম' নামক কবিতায় তিনি নিজেই তাঁর এই মানসিকতার হদিস দিয়ে বলেছেন, কোনো ইতিহাসবিখ্যাত স্থানে অতীতের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোনো পর্যটক—

দৈবাৎ পেতেও পারে
ভাঙা এক টুকরো শিলালিপি,
শিলীভূত কামনার মত
উরসের অংশ কোনো মূর্ত অপ্সরার।

কিন্তু সেই অতীতপ্রিয় রহস্যমদির মুহূর্তেও সে—

অকস্মাৎ চোখ তুলে চায় যদি তবু,
শস্যের তরঙ্গে ঘেরা দূরে গ্রাম
পড়বে নাকি চোখে?
সরোবরে ঘট নিয়ে চলেছে যে জনপদ বধূ
আকাশ মুখর করে উড়ে যায় যে কটা শালিখ,
যে-মুহূর্তে আদিগন্ত প্রসারিত জীবনের মেলা—
সমস্ত অতীত তার ভগ্নাংশেরও দিতে পারে দাম?

এই 'প্রসারিত জীবনের মেলা' তাঁকে এমন টানে যে, স্বপ্নপ্রয়াণ তাঁর কাছে 'ক্লান্ত মনে মরীচিকার কারসাজি' ব'লেই মনে হয়। অথচ তিনিও স্বপ্ন ভালোবাসেন, [illegible] পুনর্গঠনে বিশ্বাস করেন। পার্থক্য শুধু এইখানে যে, পলায়নে মুক্তি না খুঁজে [illegible] মুখোমুখী নেমে এসে তিনি ঘোষণা করতে পারেন,—

আছেই তবু আছে কোথায় ঘুম-পাহাড়।
জুড়ন-দ্বীপও নয়'ক অলীক স্বপ্নসার।
এই শহরের রাস্তা সারাও,
বাড়াও ত।
পায়ে পায়ে-ই জুড়ন-দ্বীপ আর ঘুম-পাহাড়।
(ঘুম-পাহাড় জুড়ন-দ্বীপ)

এবং অন্যত্র আমাদের এই নানা অসম্পূর্ণতায় ঠাসা জীবনের প্রতি পরম মমতায় উচ্চারণ করেন,—

কিছুটা ভেজাল কিছু খাদ দিয়ে
সব মধুরের খেলা।
মর্ত্যের মাটি ময়লা বলেই
এখানে প্রাণের মেলা।
(খুঁত)

অবশ্য এ-সব কথার মানে এ নয় যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র নিছক বস্তুগ্রাহ্য কবিতা রচনাতেই সিদ্ধহস্ত। চেতনালোকের রহস্যও তাঁকে প্রবলভাবেই আকর্ষণ করে। এ বইয়ের সীমান্ত, অধ্যাহার, বন্দিনী, শঙ্কাশুদ্ধি এবং দ্বিজ ইত্যাদি কবিতায় আত্ম-অতিক্রমণের বাসনায় এই পৃথিবীর জল মাটি রৌদ্র-কে তিনি ফুলের মতো সুষমার অন্তরঙ্গতায় নবজন্ম দিতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মেনে নিয়েছেন,

হাওয়ায় পর্দা দুলবে
কেবলই দুলবে।
দেখা যাবে, কিছু যাবে না।
জানা—অজানায় মনে যত ঢেউ
তুলবে,
অর্থ সবার পাবে না।
(পর্দা)

এবং স্বীকার করেছেন,

শুধু নির্যাস চায় না হৃদয়
পুষ্পতরুর বৃন্তে।
(খুঁত)

তিনি চান ভালোবাসা এবং ভালোবাসার মতো হৃদয়। এই স্পর্শগ্রাহ্য, স্নিগ্ধ সমবেদনাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার স্থায়ী ভাব। কিম্বা এ এক পরিণত ভালোবাসা, যা সব কিছুকেই তার যোগ্য পটভূমিতে দেখতে পায় এবং সাগরের 'লোনা তরঙ্গ' ও আকাশের 'চন্দ্র সূর্য' ইত্যাদির বিষয়ে সচেতন থেকেও পাশাপাশি বসে অন্তরঙ্গ মমতার সুরে বলে,—

সজল নয়ন দুটি যদি থাকে
তারি জাদু-ছোঁওয়া বুলিয়ে
পারি এই ধুলো সবুজ স্বপ্নে ভরাতে।
(ভেলকি)

আর এই জন্যেই তিনি আমাদের এত প্রিয়।

মণীন্দ্র রায়

A Street in Rome. *By* Ugo Moretti. Frederick Muller Limited, London. 13/6*s*.

সাম্প্রতিক ইতালিয়ান সাহিত্যের পাঠকদের কাছে য়ুগো মোরেত্তি বোধ করি অপরিচিত নাম নয়। ট্রেন কনডাক্টারের, নাইট-ক্লাব ম্যানেজারের কাজ থেকে শুরু করে এমন কোন কাজ নেই যা মোরেত্তিকে না করতে হয়েছে। পুরোপুরি লেখক হবার আগে তাঁকে জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে আসতে হয়েছে বলে স্বভাবতই তাঁর লেখা কৌতূহলী আকর্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়। ছোট গল্প ও প্রবন্ধ ছাড়া, মোরেত্তির উপন্যাসের সংখ্যা তিন এবং এই ত্রয়ীর মধ্যে দু'টি বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কার অর্জন করেছে। আলোচ্য গ্রন্থ তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস।

উপন্যাসের কেন্দ্রপট Via del Bubuino সংক্ষেপে Babuino. রোমের মমার্ত্রে রূপে পরিচিত এই অঞ্চল চিত্রকর, ভাস্কর, লেখক প্রভৃতির প্রধান মিলন-ভূমি, বলা যায় তাঁদের যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের মূর্ত অনুপ্রেরণা। শুধু সময় কাটাবার বা আড্ডা মারার

জন্যই যে শিল্পীর দল এখানে একত্র হন, তা নয়, তাঁদের অনেকেই এখানে ডেরা বাঁধেন। শহরের অংশ হলেও বাবুইনো কর্মপ্রবাহ বা জীবনচাঞ্চল্যের দিক থেকে নিজেই একটি ছোটখাট শহর। আর্ট গ্যালারী, অ্যান্টিক শপ, তামাকের দোকান, রং তুলির দোকান, কাফেটেরিয়া এক কথায় শিল্পী সাহিত্যিকদের যা প্রয়োজন সবই বর্তমান বাবুইনোতে। এখানে এমন রেস্তোরাঁও আছে যেখানে those who eat don't pay and those who can pay don't eat, because the waiters never serve them.

এ হেন অঞ্চলে যাঁরা থাকেন, এবং যাঁদের একটি বড় অংশ শিল্পী ও সাহিত্যিকরা, সাংসারিক দৃষ্টিতে তাঁরা ছন্নছাড়া, বোহেমিয়ান। ছিমছাম তকতকে জীবনযাত্রা-সংগত সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করা যাঁদের স্বভাব, নিয়মিতভাবে অনিয়ম করাতে যাঁদের আনন্দ, সেই ধরনের এক দল বোহেমিয়ান শিল্পী ও সাহিত্যিক বাবুইনোকে সতত প্রাণ-চঞ্চল করে রাখেন। এ'রা যে সবাই সাধুপুরুষ কিংবা অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের ব্যক্তি তা' নন, প্রয়োজন হলে মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনার আশ্রয় এ'রা নেন, কিন্তু সংগে সংগে বিপন্নের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, গৃহহীনকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া, পরকে মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নেওয়ার মতো নিখাদ মনুষ্যত্বের পরিচয়ও দিয়ে থাকেন। এবং এই জন্যেই এ'রা একান্তভাবে মর্ত্যবাসী মানুষ হিসাবে আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। এই জন্যই পাওলো, দার্শনিক সের্জে, রহস্যময়ী ইনজে, আলফ্রেদো আন্তিকো, লীলা, নোরা প্রভৃতি প্রধান-অপ্রধান প্রায় সব চরিত্র-ই আমাদের মনে ছাপ রেখে যান।

মোরেত্তির কৃতিত্ব এইখানেই। লেখায় তিনি হৃদয়ের উত্তাপ সঞ্চার কর[illegible] [illegible], কারণ, তিনি মানুষকে দেখতে জানেন, এবং গুণ এবং দোষত্রুটি নিয়ে মানুষ[illegible] [illegible] জানেন। তিনি নিজেও এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। কিন্তু তা বলে তিনি নিজেকে কোথাও উজ্জ্বল রঙে আঁকার চেষ্টা করেন নি। কুণ্ঠাবোধ করেন নি স্বীয় অপরাধের স্বীকারোক্তি-করণে :

প্রমাণ :

I 've wronged people who trusted me—friend, women. (p. 176)

Our sins come up like the chain of an anchor, but the anchor stays on the bottom, the ship never sails, and I 've been sitting in this harbour of guilt for a long time. (p. 179)

এর একটা কারণ বোধ হয় তাঁর দেখার ভংগী, নির্বিকল্পতা যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অপর কারণ বোধ হয়, যূথমনোভংগী। বাবুইনোর বাসিন্দা হিসাবে তাঁর জীবন অন্যান্য তথাকথিত বোহেমিয়ান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সংগে নিবিড়ভাবে, অনেকটা জৈব সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেখানকার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সহজ বৈশিষ্ট্যগুলির তিনিও একজন প্রধান অংশীদার; এবং এইজন্য তাঁর সহ-বাসিন্দা বন্ধুদের সংগে তিনি নিজেকেও বিশিষ্ট ও বিশ্বাস্যভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই বইয়ে বিভিন্ন জায়গায় ইতস্ততঃ-ভাবে জীবন সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভংগীর পরিচয় ছড়িয়ে আছে। এই ধরনের একটি অংশ :

Each of us has a burden of memory that he carries with him: dreams, emotions, ambitions to raise himself, as if on wings, above the happy throng, to reach a higher point, somewhere. A man is

strong then, proud, alive ; he feels that everything belongs to him, his blood runs warmer ; he is filled with hatred and love. He's like an animal let out of a cage, and nothing can stop him: not the fear of dying, nor shame, nor grief. His soul is marked with deep wounds ; but the sun shines through them. (p. 154)

আলোচিত উপন্যাসেই এর যাথার্থ্য সপ্রমাণ। দেশান্তরের পটভূমিতে প্রত্যক্ষ ও হার্দ্যস্বরে উপস্থিত কয়েকটি মানুষের বিচিত্র বর্ণিল জীবনের পৌষ-ফাগুনের পালাতে পুনর্বার উচ্চারিত হল, ভূমধ্যসাগরীয় আকাশ আসলে গাঙেয় আকাশের-ই নামান্তরিত বিস্তার।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

চর্যাপদের হরিণী— দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

মাঝে মাঝে নতুন লেখকদের এমন দু-একটা রচনা নজরে আসে যাতে চমক লাগে, বলতে [illegible]াঃ, অনেক দিন এমন লেখা পড়িনি। "চর্যাপদের হরিণী" গল্পগ্রন্থের 'ভাসান' [illegible]ড় তাই মনে হল। এতে অবশ্য 'ভাসান', 'কয়েকটি পৃথিবী', 'ঘাম', 'নরকের প্রহরী' [illegible]ং 'চর্যাপদের হরিণী' নামে মোট পাঁচটি গল্প আছে, এবং অন্য রচনাগুলি সম্পর্কে এতটা উচ্ছ্বসিত হবার কারণ নেই—যদিও ভাষা প্রয়োগে লেখকের অবাধ স্বাধীনতা দুঃসাহসের কাছ ঘেসে গিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ঘাম' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। মানুষ মুখে যার যা ইচ্ছে ভাষায় কথা বলে, 'স্ল্যাঙগ' বলবার অভ্যাস ও প্রবণতা এক শ্রেণীর লোকের থাকে—তাই বলে সেই ভাষাই নিরঙ্কুশভাবে সাহিত্যে চালিয়ে দেওয়ায় বিপদ আছে। বেগবান অশ্বের দিকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাই, সে অশ্ববাহিত দ্রুতগামী শকটে ওঠা সৌভাগ্যের দ্যোতক বলেই মনে করি। কিন্তু বল্গাহীন উদ্দাম অশ্বকে ভয় করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ঐ বল্গাহীনভাবে 'স্ল্যাঙগ'-ভাষার ব্যবহার তাই ভয়ের কাবণ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু 'ভাসান' একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্প। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মানদীর মাঝি"-র প্রভাব হয়ত এতে খুঁজলে পাওয়া যাবে, হয়ত প্রফুল্ল রায়ের কোন কোন রচনার কথাও মনে আসতে পারে, তবু 'ভাসান' এমন নিটোল সৌন্দর্যের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে যে বইখানির নাম "চর্যাপদের হরিণী" না হয়ে 'ভাসান' দিলেই বুঝি গল্পটির উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হত।

দীপেন্দ্রনাথের আরও গ্রন্থ আছে—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তা পড়িনি। বর্তমান গ্রন্থখানিতেই লেখকের স্বকীয়তা ও বলিষ্ঠতার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। তার ভাষা জোরালো এবং বাস্তবনিষ্ঠ। এমনকি সেই বাস্তবনিষ্ঠা ক্ষণে ক্ষণে রূঢ়তার মত মনে হয়। জীবনের অতি নীচুতলা থেকেই তিনি দেখেছেন এবং সেই শিল্পদৃষ্টি তাঁর আছে যাতে চরিত্রগুলিকে তিনি জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন।

"চর্যাপদের হরিণী" রচনাটিতে আধুনিকতার ছাপ পড়েছে যাতে তা ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াবার মতই মনে হয়। তবে গ্রন্থকার রচনাকুশলতার দাবী করতে পারেন। তাঁর লেখনী প্রচুর প্রতিশ্রুতি বহন করছে। আমরা সাগ্রহে তাঁর পরবর্তী রচনার জন্য প্রতীক্ষা করব।

সন্তোষকুমার দে

উৎকৃষ্ট বিস্কুট বাজার দরে

উৎকৃষ্ট বিস্কুট বাজার দরে

আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, কিন্তু সন্তানের পিতা হিসাবে আপনি আরও বেশী বিচক্ষণ। আপনি চাইছেন—আজকের তৈরী নতুন জামা সামনের বছরও যাতে আপনার ছেলে বয়স বাড়লেও গায়ে দিতে পারে। ওর ভবিষ্যতের দিকে আপনার সজাগ দৃষ্টি আছে।

শরীর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও পরিণত হতে থাকবে। তাই, তার বৃহত্তর ভবিষ্যতের জন্যে আগে থেকেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে। সব চাইতে ভাল শিক্ষার বন্দোবস্তই তার জন্যে প্রয়োজন—সম্ভব হলে তাকে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েক বছরের জন্যে বিদেশেও পাঠাতে হ'তে পারে। কিন্তু তাতে মোটা টাকার দরকার।

আজকের এই বিচক্ষণতা আপনার অটুট থাকুক। দরকারের সময় প্রয়োজনীয় অর্থ যাতে পান, তার জন্যে পাকা ব্যবস্থা এখনই ক'রে রাখুন। এর সব চাইতে সহজ ও নিশ্চিত উপায় হ'ল জীবন বীমা। একটি শিক্ষা-পলিসি নিয়ে সামান্য সঞ্চয় শুরু করুন, আপনার সন্তানের জন্যে সব চাইতে ভাল শিক্ষা ও তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবেন।

ASP/LIC-59 BEN

হ্যাঁ! কল্যানীতে থাকবো বলে বাড়ী কিনলুম!
বেশ! বেশ! খুব সুখবর!
আর জানো! আমাদের পড়বার জন্য চমৎকার স্কুল ও রয়েছে কল্যানীতে!
আর, কল্যানীতে কী সুন্দর সুন্দর পার্ক!
বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন :—
পাবলিক রিলেশন্স অফিসার, কল্যাণী
কল্যাণী সেল্‌স অফিস
১৮৮এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
এনকোয়ারি অফিস
ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, রাজভবন, কলিকাতা
পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
KF-1B-59

দুর্গাপুরের কেন্দ্রস্থলে

ব্রিটিশ যৌথ প্রতিষ্ঠান ইস্কন দুর্গাপুরের কেন্দ্রস্থলে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করছেন। ১৯৬১ সালে নির্মাণ কার্য শেষ হলে এই কারখানাটি অন্যান্য বহু ইস্পাত-নির্ভর শিল্প-সংস্থার প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে এবং ভারতের হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে দেশে সমৃদ্ধি আনবে।

ইস্কন
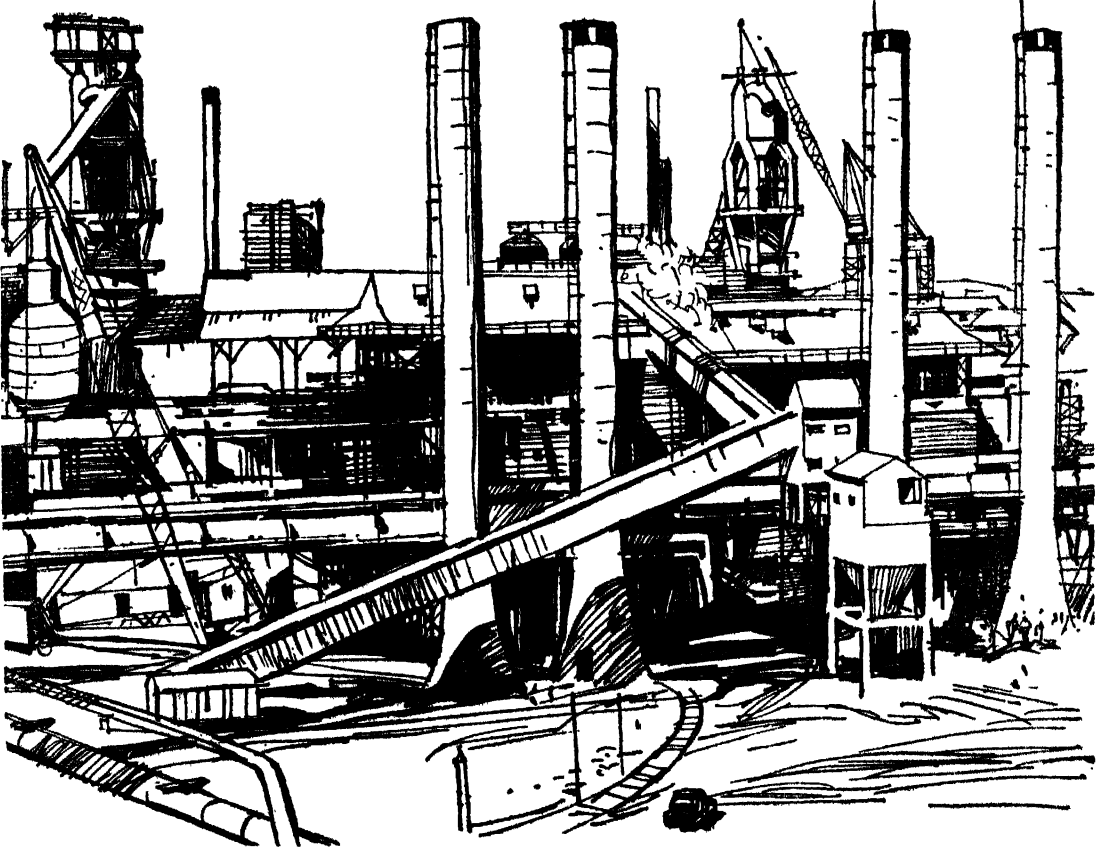
ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্‌সট্রাক্‌শন্ কোং লিঃ

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-কার্ভস্ লিঃ
দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্‌জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ
দি সিমেণ্টেশন কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ টম্‌সন্-হুস্টন কোম্পানি লিঃ
দি ইংলিশ ইলেকৃট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকৃট্রিক
কোম্পানি লিমিটেড মেট্রোপলিট্যান-ভাইকার্স ইলেকৃট্রিক্যাল
এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ স্যার উইলিয়াম এ্যারল অ্যাণ্ড
কোম্পানি লিঃ ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং
কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ্ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং) লিঃ
জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ ইস্কন কেব্‌ল গ্রুপ (সিমেন্স
এডিসন সোয়ান লিঃ এবং পিরেলি জেনারেল কেব্‌ল ওয়ার্কস্ লিঃ)

ব্লাউজ তো নয়, শক্ত ফাঁস
সকাল থেকে সন্ধ্যে ওঁর কাজ আর কাজ—একটা দিনও বিরাম নেই। প্রতিদিনের এই অফুরন্ত খাটুনি, তার ওপর আবার কুঁচকে কামড় খেয়ে ধরা ব্লাউজটাতে আরো অস্বস্তি। নতুন তৈরী—মাত্র এক ধোপ দেওয়া হয়েছে, অথচ তাতেই কুঁচকে এমন ছোট হয়ে গেছে যে নড়লে চড়লেই মনে হয় ফেটে যাবে।
সত্যি, যদি ওঁর পাড়া-পড়শীরা কেউ বলে দিত যে সুতী কাপড়ের প্রতি-গজেই 'স্যানফোরাইজড' লেবেল দেখে কিনতে হয়!
লেবেলে
SANFORIZED
REGD TD MK
এই ছাপ দেখে নিলে সে-কাপড়ের পোশাক কখনো খাটো হবে না!
'স্যানফোরাইজড' রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কের স্বত্বাধিকারী ক্লুয়েট, পীবডি এণ্ড কোং, ইনকর্পোরেটেড (সীমিত দায়িত্ব সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ) কর্তৃক প্রকাশিত। এই কোম্পানীর সঙ্কুচনরোধী কঠিন শর্তানুযায়ী তৈরী কাপড়েই কেবল 'স্যানফোরাইজড' ট্রেড মার্ক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।
সবিশেষ খবরের জন্য: 'স্যানফোরাইজড' সার্ভিস,
মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই-২

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

আগামী বৎসর রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সোভিয়েট দেশে যে সমারোহে উদযাপিত হবে, তা সত্যই বিস্ময়কর। বর্তমানেও রবীন্দ্রনাথের রচনার সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিপুল সমাদর। তাঁর যে কোন গ্রন্থের অনুবাদই প্রকাশের অতি অল্পদিনের মধ্যে ফুরিয়ে যায়। শতবার্ষিকী উপলক্ষে চৌদ্দ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলীর এক নতুন সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনের মূল্যায়ন করে নতুন প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। ভারতীয় সাহিত্য আকাদমী আট খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের রচনার যে সংকলন প্রকাশ করছে, তার কবিতা খণ্ডের জন্য আমি যে ভূমিকা লিখেছিলাম, রুষ ভাষায় তার অনুবাদের জন্য মস্কোতে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী নিজে আমাকে অনুরোধ করলেন। সে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং রুষ ভাষায় যে প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হবে, তাতেও তা সন্নিবিষ্ট হবে।

কবি, সঙ্গীতকার, চিত্রশিল্পী এবং নাট্যকার হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে পরিচিত। শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে ভারতীয় জীবনে তাঁর যে অপূর্ব দান, এসব ক্ষেত্রেই তাঁর ভাবনা বর্তমান পৃথিবীর জন্য যে কি উপযোগী, সে বিষয়ে বাঙলা দেশের বহুলোকই খবর রাখে না, কাজেই ভারতবর্ষের অন্যত্র অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নবভারতের অন্যতম স্রষ্টা এবং বর্তমান যুগের পথিকৃত হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি এখনো ব্যাপক হয়নি। তার কারণও আছে। সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি বা ধর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার অধিকাংশ আজো ভারতবর্ষের অন্য ভাষায় অনূদিত হয়নি, অথবা যেগুলির অনুবাদ হয়েছে, সে অনুবাদ আংশিক এবং বহুক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। তাই শত-বার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত রচনার একটি সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী এবং বিশেষজ্ঞ প্রায় একশজন বাঙালী মনীষীকে সাহিত্য আলোচনার বাইরে রবীন্দ্রনাথের অন্য গদ্য রচনার মধ্যে তাঁদের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিশটি প্রবন্ধ নির্বাচন করতে অনুরোধ করা হয়। প্রায় চল্লিশজন সাহিত্যরসিক এ আমন্ত্রণে সাড়া দেন এবং তাঁদের নির্বাচনের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের ত্রিশটি প্রবন্ধ নতুন করে অনুবাদ করা হয়। সে অনুবাদগুলি দেশে এবং বিদেশে বহু মনীষীর কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয়

যে তাঁদের দেশের মানুষের কাছে বিশ্ব মানবের আবেদন পৌঁছিয়ে দেবে, এমন পনেরো কুড়িটি প্রবন্ধ যেন তাঁরা তার মধ্য থেকে বেছে দেন। ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনেক মনীষীর সহযোগিতায় অবশেষে আঠারোটি প্রবন্ধ নির্বাচন করে *Towards Universal Man* বা **বিশ্বমানবের সন্ধান** নাম দিয়ে গ্রন্থখানি ভারতবর্ষে, লণ্ডনে এবং নিউইয়র্কে ১৯৬১ সালের ৭ই মে প্রকাশিত হবে। পৃথিবীর অন্যান্য বহুদেশের মতন সোভিয়েট রাষ্ট্রেও গ্রন্থখানির অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি"-কে নাটকে রূপান্তরিত করে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন দেশে তার অভিনয় এখনো হচ্ছে। তাসকন্দে তার বিপুল সমাদর হয়েছে। মস্কোতেও দেখলাম জনসাধারণের হৃদয়কে তা গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোর প্রাচ্য বিদ্যা পরিষদ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের নতুন অভিনয়ের আয়োজন করছে। পরিষদের অধ্যক্ষ বললেন যে নাটকের চেয়ে নৃত্যনাট্যই সোভিয়েট জনসাধারণের কাছে বেশী প্রিয়, কিন্তু নৃত্যনাট্যের নির্বাচন নিয়ে তাঁদের মধ্যে খানিকটা মতভেদ ছিল। কারো কারো ইচ্ছা ছিল যে "চণ্ডালিকা"-র অভিনয় হোক কিন্তু আমি তাঁদের বললাম যে "চণ্ডালিকা" একান্তভাবে ভারতবর্ষের জন্য রচিত। ভারতবর্ষের পরিবেশ বাদ দিলে তার স্বাদ অন্য দেশে পুরোপুরি গ্রহণ করা কঠিন, তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার তেমন সার্থকতা নেই। তাছাড়া, ভারতবর্ষের সামাজিক গলদ ভারতবর্ষে দেখানোর যতখানি প্রয়োজন অন্যদেশে সে প্রয়োজন নেই। "তাসের দেশ" হয়তো সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী উপযোগী, কিন্তু ঠিক যে কারণে "তাসের দেশ" সোভিয়েট রাষ্ট্রে দেখাতে বাধা আসতে পারে, ঠিক সেই কারণেই "চণ্ডালিকা" সেখানে দেখানো অনুচিত।

আমি বললাম যে আমার মতে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মধ্যে "চিত্রাঙ্গদা" সর্বশ্রেষ্ঠ। তার আবেদন কোনো দেশ কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়। নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে যে সমস্যার "চিত্রাঙ্গদা"য় রূপায়ন, সর্বদেশে সর্বকালে তা মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যা হয়ে বেঁচে থাকবে। তবে যদি তারা মত বদলান, নৃত্যনাট্যের বদলে নাটক অভিনয় করতে রাজী হন, তবে "বিসর্জন", "মুক্তধারা", "রক্তকরবী" বা "রাজা"-র অভিনয় শতবার্ষিকী উৎসবে খুবই উপযোগী হবে। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম পথিকৃত শ্রীশম্ভু মিত্র কিছুদিন আগে মস্কো গিয়েছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদের সদস্যদের মধ্যেও দুয়েকজন বোধ হয় তাঁর অভিনয় দেখেছেন। তাঁদের বললাম যে "রক্তকরবী"-র প্রযোজনা করে শম্ভু মিত্র ভারতীয় নাট্য উৎসবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। অনেক আলোচনার পরে স্থির হল যে সর্বদিক বিবেচনা করে "চিত্রাঙ্গদা"-র অভিনয়ই যুক্তিযুক্ত হবে। অধ্যক্ষ বললেন যে প্রযোজনার বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে তাঁরা একজন শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করতে চান। সেই অনুসারে রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমারোহের সঙ্গে "চিত্রাঙ্গদা"-র অভিনয় হবে, একথা এখন নিশ্চয় করে বলা চলে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গীত পরিষদও শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের নতুন সঙ্গীত রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। সোভিয়েট সিনেমাতে-ও রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে এবং তাঁর রচনাকে কেন্দ্র করে নতুন চিত্র রচনার পরিকল্পনা হয়েছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথের সফর এবং বিশেষ করে তাঁর "রাশিয়ার চিঠি" নানানভাবে প্রচারিত করবারও ব্যাপক আয়োজন হচ্ছে। তা ছাড়া, ১৯৬১ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরে

এবং গ্রামাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের নাটক, গদ্যপদ্য রচনা, সংগীত এবং তাঁর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে শতবার্ষিকী উদযাপনের বিরাট আয়োজন হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এ আগ্রহ স্বভাবতই আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যিকার কৌতূহল ও আগ্রহ সর্বত্রই দেখলাম। মস্কোর লুনাচারস্কি ইনস্টিটিউটের কথা আগেই বলেছি। নাট্যশিল্প নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে এ প্রতিষ্ঠানটির স্থান খুবই উঁচু। সেখানকার অধ্যক্ষ বললেন যে তাঁরা কালিদাসের শকুন্তলার অভিনয় করতে চান। আধুনিককালে ভারতবর্ষে শকুন্তলার অভিনয় হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন্। তাঁকে বললাম যে গত দু-তিন বছর ধরে উজ্জয়িনীতে কালিদাস সমারোহের উদ্যোগে তাঁর বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে এবং সে অভিনয় সংস্কৃতে হলেও জনসাধারণ তা সাদরে গ্রহণ করে। সেই প্রসঙ্গে বললাম যে ১৯৫৮ সালে উৎসবের সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে শকুন্তলার অভিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ পরিগণিত হয়েছিল, শকুন্তলা পরিবেশন করে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। অধ্যক্ষ বললেন যে কালিদাসের নাটকের দৈর্ঘ্য নিয়ে তাঁরা ভাবনায় পড়েছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের দর্শকবৃন্দ দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার বেশী নাটক দেখতে হয়তো চাইবে না। তাঁকে বললাম যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপ করলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সাহায্য করবেন। উজ্জয়িনীতে শকুন্তলার যে অভিনয় হয়েছিল, তা-ও বোধ হয় আড়াই ঘণ্টার বেশী সময় নেয়নি।

কেবল লুনাচারস্কি ইনস্টিটিউট বলে নয়, রবীন্দ্রনাথের মতন কালিদাসের বিষয়েও আগ্রহ সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যাপক। সোভিয়েট সংগীত পরিষদ শকুন্তলাকে সংগীতরূপ দেবার চেষ্টা করছে এবং পরিষদের সভাপতি বললেন যে কালিদাসের রচনা পাঠ করে তাঁরা যে আনন্দ পান, বর্তমান যুগের লেখকদের মধ্যে প্রায় কারু রচনাই ততখানি আনন্দ দেয় না। নৃত্যনাট্যে পুরাতনের প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুরাগের কথা আগেও বলেছি, দেখলাম যে এ পুরাতন প্রীতি কেবলমাত্র রুষ নৃত্যনাট্যে সীমাবদ্ধ নয়। সংগীত পরিষদের সভাপতি বললেন যে তাঁরা সম্প্রতি লায়লা মজনুর কাহিনী নিয়ে নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, এবং সে নৃত্যনাট্য যে সমাদর পেয়েছে তাতে শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ আরো বেড়ে গিয়েছে। লায়লা মজনুর সংগীত শোনালেন, তার মধ্যে প্রাচ্য সংগীত ভঙ্গীর আমেজ রয়েছে, কিন্তু মূলতঃ নৃত্যনাট্যটি ইয়োরোপীয় ভঙ্গীতেই রচিত। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতাব তাঁরা নতুন করে ইয়োরোপীয় ভঙ্গীতে সুর দিয়েছেন। বললেন যে এখন নতুন নতুন ভারতীয় রচনা নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করতে চান। মস্কো থেকে ফেরবার পরে আমাকে জানিয়েছেন যে আমার "সাথী" বইটির একটি কবিতা 'রাখাল'কে তাঁরা সংগীতে রূপায়িত করেছেন।

ভারতীয় সভ্যতার প্রতি অনুরাগের আরো দুয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। মস্কোতে "মুদ্রারাক্ষস"-এর যে অভিনয় হয়েছিল, তা আমি নিজে দেখিনি, কিন্তু ভারতীয় যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধা একজন ভারতীয় মনীষী আমাকে বললেন যে "মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় দেখে সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে গেছে। "মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় দেখবার আগে পর্যন্ত তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন, বলতেন যে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতাকে পদে পদে ব্যাহত করা হয়েছে, মানুষের জীবনের মূল্য বহুক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে, তিনি তাকে কখনোই স্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু "মুদ্রারাক্ষস"-এ বিদেশী সংস্কৃতি

এবং জীবনাদর্শকে যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে তা দেখে তাঁর মনে হল যে পূর্বে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাষ্ট্রে মানুষের মর্যাদা নতুন করে স্বীকার করবার চেষ্টা স্পষ্ট।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর আগের বা পরের কোনো মতই আমি পুরোপুরি মানতে পারিনি। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে ব্যক্তি চিরদিনই নিয়মকে লঙ্ঘন করে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে, চিরদিনই দৈত্যকুলেই প্রহ্লাদের জন্ম হয়। তাই স্টালিনের আমলেও সোভিয়েট নরনারী রাষ্ট্রের লৌহশাসনের মধ্যেও স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্যের চরম বিকাশ দেখিয়েছে। আজ মিঃ ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে পুরনো কড়াকড়ি বহুল পরিমাণে কমে এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শাসনের বন্ধন পুরোপুরি শিথিল হয়নি। তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ সাম্যবাদী হোক অথবা গণতান্ত্রিক হোক, সমস্ত সমাজ ব্যবস্থায়ই চিরদিনই শাসনের বন্ধন কমবেশী থাকবে। আসলে পৃথিবীতে আজো সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বারবার গণতন্ত্র স্থাপনের সাধনা হয়েছে কিন্তু ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিকতা এবং সংকীর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-স্বার্থ সে প্রচেষ্টাকে বারবার ব্যাহত করেছে। একথাও সত্য যে বর্তমান যুগের পূর্বে গণতন্ত্র স্থাপনের আর্থিক কাঠামো পৃথিবীতে কোনদিন দেখা যায়নি। বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে মানুষ অভাবের ভিত্তিতেই সমাজ সংগঠন করেছে। একক ব্যক্তি জীবন সংগ্রামে টিকতে পারে না, তাই গোষ্ঠী গড়ে উঠল। পশু সমাজেও গোষ্ঠীর পরিচয় মেলে, কিন্তু সাধারণত বহু স্ত্রী এবং একটি নরের সমাবেশেই পশুগোষ্ঠী। যৌন সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূর করতে না পারলে বহুসংখ্যক সাবালগ পূর্ণযৌবন স্ত্রীপুরুষের সমাজ গড়ে উঠতে পারে না এবং মানুষ সে সমস্যার চলনসই সমাধান করতে পেরেছিল বলেই মানুষের প্রগতি এত ব্যাপক ও দ্রুত। অন্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই যৌন সম্পর্ক অবাধ এবং বহুক্ষেত্রে সাময়িক, কিন্তু সেই সম্বন্ধকে সমাজ বন্ধনের মধ্যে স্থায়ী রূপ দিয়ে এবং স্বগোষ্ঠী বা স্বগোত্রের নারীকে বিবাহ-অযোগ্যা করেই মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়তে পেরেছিল। আদিবাসী জাতির মধ্যে আজো তার পরিচয় স্পষ্ট, প্রাচীন সভ্যতাসমৃদ্ধ হিন্দু সমাজেও গোষ্ঠী ও গোত্র বন্ধনের মধ্যে তারই ইংগিত মেলে।

সমাজ গড়বার পরেও কিন্তু বহুদিন মানুষের খাদ্যবস্ত্রের অভাব দূর হল না, বরং নতুন দাবীর সৃষ্টি হল। একদিকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা অফুরন্ত, অন্যপক্ষে তার উদ্যম সীমিত, সম্পদ অত্যন্ত পরিমিত। প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগেও বহুকে বঞ্চিত করে স্বল্পসংখ্যক লোক ঐশ্বর্য ও মর্যাদা ভোগ করছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমাজের সেই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের সৃষ্টি। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও সেদিন ছিল না, তাই শিক্ষা বা জ্ঞান যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, তাতেও আশ্চর্য হবার কারণ নেই। প্লেটো এরিস্টটলের মতন মানবধর্মী উদার দার্শনিক সেদিন বলেছেন যে সমাজে চিরকালই প্রভু এবং দাস থাকবে, এবং দাসত্বপ্রথার ফলে যে অতিরিক্ত সম্পদের সৃষ্টি, তার ব্যবহার করেই অভিজাত সম্প্রদায় চারুশিল্প, দর্শন বিজ্ঞান সৃষ্টি করবে। ভারতবর্ষে মনুসংহিতায়ও অধিকার ভেদের ভিত্তিতে মানুষের সাম্যবোধ অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত আদর্শই যে তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের ফলে অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এরিস্টটলের লেখায় তার ইঙ্গিত মেলে। "পলিটিক্স" বা রাজনীতি গ্রন্থে এরিস্টটল লিখেছেন যে যতদিন নিজের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবে, ততদিন দাসত্ব প্রথা অনিবার্য, কিন্তু যদি কখনো এমন দিন আসে যে

মানুষের উদ্ভাবিত যন্ত্র নিজের শক্তিতে মানুষের দৈনন্দিন দাবী মেটাতে পারবে, সেদিন কায়িক শ্রমের প্রয়োজন কমে আসবে এবং দাসত্ব প্রথারও আর যৌক্তিকতা থাকবে না।

গত দুশো বৎসরের শ্রমবিপ্লবের ফলে এবং বিশেষ করে বিগত পঞ্চাশ বছরের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলে আজ সেই অসম্ভবই সম্ভব হতে বসেছে। আজ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শক্তি বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। পূর্বে দশজন লোক চরকা তাঁত চালিয়ে সারা বৎসরে যে পরিমাণ কাপড় তৈরী করতে পারত, আজ যন্ত্রের সাহায্যে এক ঘণ্টায় একজন লোক তার শতগুণ বস্ত্র উৎপাদন করতে পারে। পূর্বে যে পথ অতিক্রম করতে বহু বৎসর কেটে যেত, আজ সেই পথে চলতে মানুষের ঘণ্টাভর সময়ও লাগে না। পূর্বে যে পাথর তুলতে বা সরাতে হাজার লোকের প্রয়োজন হত আজ যন্ত্রের সাহায্যে একটি বালকও তা অনায়াসে যেখানে খুসী নিয়ে যেতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিস দেখি, শুনি, বহুদূরের মানুষকে সাহায্য বা সংহার করতে পারি। ফলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করবে, এ সম্ভাবনা আজ প্রথমবার পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষ আজ জরা ও মৃত্যুকেও বহুল পরিমাণে স্ববশে এনেছে। চিরকালের সনাতন অভাবের সমাজের বদলে আজ পৃথিবীতে সর্বদেশের সকল মানুষের জন্য সমৃদ্ধির সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত। তাই গণতন্ত্রের সম্ভাবনাও আজ প্রথম মানব ইতিহাসে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে এবং গণতন্ত্রের সেই শাশ্বত মঙ্গল মানব আদর্শকে সাম্যবাদ যে পরিমাণে গ্রহণ করেছে, সেই পরিমাণেই সাম্যবাদ আদর্শবাদী তরুণের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আকর্ষণ করে।

আজ একথাও ভোলবার উপায় নেই যে মার্কস নিজে চরম আদর্শবাদী ছিলেন। মানবের কল্যাণ সাধনের প্রেরণায় সমস্ত জীবন দারুণ দুঃখ ও অভাব স্বেচ্ছায় সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেকালের আদর্শবাদী উদার মানব-ধর্মকে ভিত্তি করেই তাঁর জীবন-দর্শন, শুধু সেই দর্শনকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য যে হিংসামূলক কর্মপদ্ধতি তিনি সেদিন নির্দেশ করেছিলেন, সেই কর্মপদ্ধতি বাদ দিলে তাঁর পূর্বের উদারপন্থী মানব-ধর্মী দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পার্থক্য থাকে না। তিনি ইতিহাসের মধ্যে অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়াকে বড় করে দেখেছেন। তাঁর পূর্বে রিকার্ডোও সে কথা বলেছেন। মার্কস একথাও বলেছিলেন যে ইংলণ্ডের মতন গণতান্ত্রিক দেশে সাম্যবাদ হয়তো বিনা দ্বন্দ্বেই আসবে। একথা মেনে নিলে পৃথিবীর প্রায় সকল উদারপন্থী নরনারীই মার্কসের আদর্শবাদ গ্রহণ করতে পারে। গত একশো বছরের ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে কর্মপন্থা নির্দেশে মার্কস বহুক্ষেত্রে ভুল করেছেন। বিগত শতাব্দীর বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রগতি তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। ভাবতে পারেননি যে মানুষের জ্ঞানের সম্প্রসারণে মানবসমাজ একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছবে যে হিংসা বা সংঘর্ষের পথ প্রগতির বদলে অবধারিত মৃত্যু টেনে আনবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বর্তমান নায়ক মিঃ ক্রুশ্চেভের অন্যতম প্রধান কীর্তি যে তিনি মানব-সমাজের এ প্রগতির অর্থ বুঝেছেন, এবং তাই মার্কস বা লেনিনের মতবাদের নির্বোধ ও অর্থহীন পুনরাবৃত্তির বদলে নতুন পৃথিবীর নতুন সমস্যার নতুন সমাধান খুঁজতে এগিয়ে এসেছেন।

"মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় দেখে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মনোভাবের যে পরিবর্তন, তার আলোচনায় যে সব কথা এসে পড়ল, প্রথম দৃষ্টিতে তা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু একটু বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি আধুনিক

যুগে সোভিয়েট নাগরিকের যে আগ্রহ, এ আলোচনার মধ্যে তার কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে। মস্কোয় কিশোর নাট্য প্রতিষ্ঠান রামায়ণ অভিনয় করতে চাইছে, বিদগ্ধ সমাজ "মুদ্রারাক্ষস" দেখে নিজেরা মুগ্ধ, বিদেশীকে মুগ্ধ করে, কালিদাসের শকুন্তলাকে নাট্যরূপ, নৃত্যনাট্যরূপ দেওয়ার আগ্রহ, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে সরকারের এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ, ভারতবর্ষের অন্যান্য সাহিত্যিক ও লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হবার ঔৎসুক্য, গান্ধীর কর্মপন্থা ও মতবাদ প্রথম দৃষ্টিতেই একেবারে মার্কসবাদ ও মার্কসপন্থার বিরোধী, তা সত্ত্বেও আজ সোভিয়েট দেশে গান্ধীর সমাদর, যে টলস্টয় ডস্টয়ভস্কি এককালে উপেক্ষিত, অনাদৃত, আজ তাদের নতুন করে বোঝবার শ্রদ্ধা জানাবার চেষ্টা,—এ সমস্ত স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্র ছেড়ে দিলেও ভারতবর্ষের রাজনীতি ও অর্থনীতির সমস্যা ও সমাধান নিয়েও সোভিয়েট নাগরিকের যথেষ্ট অনুরাগ। ভারতবর্ষের প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে কেবল ভারতবর্ষের নেতা বলে সমাদৃত নন, সোভিয়েট নাগরিক আজ তাঁকে বিশ্বনেতৃবৃন্দের মধ্যে স্থান দিয়েছে এবং যে পরিমাণে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়েছে, তা অনেক সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাও পাননি। বস্তুতপক্ষে আমেরিকা সম্বন্ধে সোভিয়েট নাগরিকের ঈর্ষামিশ্রিত শ্রদ্ধা যেভাবে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সে কথা মনে রাখলে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তার আগ্রহ ও অনুরাগ বিস্ময়কর মনে হয়। সাধারণ সোভিয়েট নাগরিকের হৃদয়ে ভারতবর্ষের যে প্রভাব, এক আমেরিকা ভিন্ন অন্য কোনো ভিন্ন দেশের বেলা বোধ হয় তার পরিচয় মিলবে না।

আমেরিকা নিয়ে সোভিয়েট নাগরিকের উদ্বেগ ও আগ্রহ দুইই বোঝা যায়। বর্তমান যুগের পৃথিবীর নেতৃত্ব নিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও আমেরিকার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দুর্ভাগ্যবশত সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাপকভাবে হিংসা ও শত্রুতার রূপ নিয়েছে। ফলে উভয় রাষ্ট্রের মনে ভয় যে প্রবল প্রতিপক্ষ অতর্কিত আক্রমণে জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সম্পদে, যান্ত্রিক অগ্রগতিতে বা সামরিক শক্তিতে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকা ও রুষদেশে ভারতবর্ষের প্রতি যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, ভারতবর্ষের জীবন আদর্শই তার জন্য দায়ী। ভারতবর্ষ প্রধানত অহিংস উপায়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানও অহিংস উপায়েই করতে চেষ্টা করেছে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা এবং সাধারণ নাগরিক উভয়েই তা দেখে বিস্মিত হয়। সাম্যবাদী দেশের সর্বনায়কদের মধ্যে একজন তো স্পষ্টভাবে বললেনই যে ভারতবর্ষের রাজামহারাজাদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি স্তম্ভিত হয়েছেন। ইয়োরোপের ইতিহাসে বারবার দেখা যায় যে অভিজাত সম্প্রদায় শক্তি সম্পদ হারিয়ে নতুন রাষ্ট্রশক্তির কঠোর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে সে শত্রুতা বংশানুক্রমে তিন-চার পুরুষ ধরে অব্যাহত রয়েছে। অথচ ভারতবর্ষে অভিজাত সম্প্রদায় শক্তি সম্পদ হারিয়েও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের বিশ্বস্ত ও দেশভক্ত প্রজা, এ অসম্ভব কি ভাবে সম্ভব হল, সে কথার বিচার করে মার্কসবাদের মূলনীতি নিয়ে তাঁকে আবার ভাবতে হয়েছে, একথাও একাধিক সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতা স্বীকার করেছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ সমালোচক এবং মার্কসবাদের বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করেন যে গত চার পাঁচ বছরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মতের কড়াকড়ি অনেকটা কমে গিয়েছে, শাসনের বজ্র আঁটুনিও খানিকটা আলগা হয়ে এসেছে।

জওহরলাল নেহরু যখন প্রথম সোভিয়েট রাষ্ট্রে যান, তখন সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে যে বিপুল সংবর্ধনা করেছিল, বোধ হয় লেনিনের মৃত্যুর পরে কোনো সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতার ভাগ্যে তা জোটেনি। সামরিক শক্তিতে দুর্বল, অর্থবলে দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর জন্য সোভিয়েট নাগরিকের এত শ্রদ্ধা ভালবাসার কারণ কি, এ কথার আলোচনা করলে বোঝা যায় যে রণ ক্লান্ত হিংসানীতিশ্রান্ত শান্তিকামী সোভিয়েট জনসাধারণ তাঁর আগমনকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করেছে, স্বদেশের রাষ্ট্রনীতির প্রত্যক্ষ সমালোচনার সুযোগ বা সাহসের অভাব ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর সাদর অভ্যর্থনার মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেছে, দেশের নায়কদের বলতে চেয়েছে যে তোমরাও যদি ভারতবর্ষের নীতি অবলম্বন কর, তবে কেবল ভয়ার্ত আজ্ঞাবহ না হয়ে আমরা তোমাদের সশ্রদ্ধ ও অনুরাগী অনুচর ও সহকর্মী হব। মিঃ ক্রুশ্চভের মতন তীক্ষ্ণধী নেতা সোভিয়েট রাষ্ট্রে পণ্ডিত নেহরুর অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য অভিনন্দন দেখে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে ভেবেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত সন্দেহ তাঁর ভারত আগমনের পরে দূর হয়ে গিয়েছে। এদেশে আমাদের রাষ্ট্র নেতাদের অকুণ্ঠিত ও অবাধ চলাফেরা, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের যোগ নিশ্চয়ই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ কথাও অনস্বীকার্য যে মিঃ ক্রুশ্চভের ভারতবর্ষে আসবার পর থেকেই সোভিয়েট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন শুরু হয়েছিল।

মৌলিক জীবনদৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে সোভিয়েট রাষ্ট্র যেমন ভারতবর্ষের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারে, শিখেছে এবং শিখছে, ভারতবর্ষও ঠিক তেমনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা ও সাধনা থেকে অনেক শিখতে পারে, শিখেছে এবং শিখবে। বহুযুগের জড়তাকে স্বচেষ্টায় নিজের উদ্যমে যেভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্র জয় করেছে তা বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের বাহ্যিক প্রকাশগুলিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সোভিয়েট লুনিক সূর্যকে পরিক্রমণ করছে, সোভিয়েট পতাকা চন্দ্রে পেঁছে গিয়েছে, এসব জিনিস স্বভাবতই আমাদিগকে বিস্মিত করে, কিন্তু একথা আমরা ভুলে যাই যে সমগ্রজাতির মধ্যে জ্ঞানসাধনার নবীন আগ্রহ ও উদ্যম সঞ্চারিত করতে না পারলে এসব কীর্তি সম্ভব হত না। শিক্ষা যেভাবে সমগ্র সোভিয়েট দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সেকথা আগেও বলেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে নতুন মানুষের নির্মাণ সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী সাধনা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে শিল্পে যে সংগঠনের চেষ্টার কথা উল্লেখ করেছি তারও ভিত্তি এই শিক্ষণ মনোবৃত্তি। সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে তাতে ক্ষতিও হয়েছে, কিন্তু মনে হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র সজ্ঞানে সে ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছে।

শিল্পসৃষ্টিতে সমাজ এবং রাষ্ট্র কতখানি দখল দেবে, এ বিষয়ে আবহমান কাল থেকে মতভেদের অন্ত নেই। প্লেটোর কথা স্বভাবতই মনে আসবে, কিন্তু একথাও স্মরণ করা প্রয়োজন যে পূর্বকালে রাজানুগ্রহ না পেলে কবি বা সাহিত্যিক বাঁচতে পারত না এবং রাজাকে তুষ্ট না করলে সে অনুগ্রহ মিলত না। তবু সাহিত্য, চারুকলা বা সঙ্গীত প্রধানত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, তাই তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ততটা মারাত্মক হয় না, আর বেশী হস্তক্ষেপ করতে চাইলে তাকে অনধিকার চর্চা বলা চলে। নাট্যশিল্পের বেলায় সামাজিক ফলাফল অনেক বেশী প্রত্যক্ষ, তাই নাট্য এবং সমাজের চিত্ত বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যমের উপর সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বদাই দখল দিতে চেষ্টা করেছে। আধুনিক যুগে সিনেমা বহুল পরিমাণে নাট্যশিল্পের জায়গা দখল করে নিয়েছে, তাই সিনেমার ক্ষেত্রে সমাজ হস্তক্ষেপ করতে চাইবে এটা বোধ হয় আশ্চর্য নয়। তাছাড়া সিনেমায় শিল্প এবং ব্যবসায়ের অনুপাত নিয়ে অনেক

সময়ে মুস্কিল বাধে। ভারতবর্ষেই আমরা দেখেছি যে এককালে শিল্প হিসাবে শুরু হলেও বর্তমানে সিনেমাকে ব্যবসায়ের পর্যায়ে ফেলাই বোধ হয় সংগত। অবশ্য এখনো সিনেমার জগতে শিল্পীর পরিচয় মেলে, তা নইলে বোধ হয় সিনেমাও বেঁচে থাকতে পারত না, কিন্তু অধিকাংশ সিনেমার ছবিই আজকাল যারা সিনেমা হল ভাড়া দেয়, সেই সমস্ত ব্যবসায়ীর করুণা নির্ভর। তা ছাড়া সিনেমার প্রসারের সম্ভাবনা প্রায় অপরিমিত। নাট্যশিল্পে অভিনেতা বড় জোর হাজার দর্শকের সামনে বৎসরে তিনশ বার উপস্থিত হতে পারেন, কিন্তু সিনেমা চিত্র একবারেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সিনেমা হলে একই সংগে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন তিন চারবার করে দেখতে পারে। তাই সিনেমার মধ্য দিয়ে সমাজকে প্রভাবিত করবার শক্তিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছে। প্রায় সকল দেশেই তাই সিনেমার ছবির যাচাই করা হয়, সব ছবি সকলকে দেখতে দেওয়া হয় না। কোনো কোনো ছবি রাষ্ট্রের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে এমনিতেই নিয়ন্ত্রণ বেশী। কাজেই সিনেমাচিত্রের বেলায় যে রাষ্ট্র চিত্রের পরিচালনা, উৎপাদন এবং পরিবেশনকে নিজের হাতে রাখবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সোভিয়েট ছায়াচিত্র তাই পুরোপুরিভাবে দর্শকের রুচি নির্ভর নয়, সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয় কোন ছবি তৈরী করা হবে, কোথায় কতদিন দেখানো হবে, তা নির্ধারণ করে দেয়। অবশ্য, ছায়াচিত্রের বেলা প্রায় সব দেশেই কেবল দর্শকের রুচি দিয়ে চিত্রের ভাগ্য নির্ণয় হয় না। আজকাল নগরবাসীর একটি বিপুল অংশ সপ্তাহে একবার কি দুবার সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত—যে ছবিই দেখানো হোক না কেন, তারা ছবি দেখতে যাবেই। কাজেই যারা সিনেমা হল নিয়ন্ত্রণ করে, তারা প্রায় খুসী মতন যে কোনো ছবিই দেখাতে পারে। অবশ্য দর্শকের রুচি ষোলো আনা অগ্রাহ্য করা চলে না, কিন্তু সময় সময় আমাদের দেশে অথবা আমেরিকায় সিনেমা ব্যবসায়ীরা যে দর্শকের দোহাই দিয়ে নিজেদের বিকৃত রুচি ও অপরিণত মনোবৃত্তি প্রসূত বাজে বা ক্ষতিকর ছবির সাফাই দিতে চেষ্টা করে, তা একান্তই অযৌক্তিক। সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাই সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়ের মর্জিমাফিক ছবিই উৎপাদিত হয়, দেখানো হয়। দুয়েকবার এমনো হয়েছে যে ছবি দেখাতে শুরু করে জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তা সহসা বন্ধ করে দেওয়া হল। এ ধরনের সরকারী নিয়ন্ত্রণে আশংকা নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু সংগে সংগে তার ফলে খুব খারাপ বা কুরুচিপূর্ণ ছবি দেখবার সম্ভাবনাও অনেকখানি কমে আসে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মানুষের যৌন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে সিনেমাতে এসে পড়েছে, বহু ক্ষেত্রে তা শালীনতার সীমাও পেরিয়ে যায়, কিন্তু সোভিয়েট ছায়াচিত্রে কখনো সে ধরনের অসংযম দেখা যায় না। একথা বোধ হয় সত্য যে সোভিয়েট ছায়াচিত্রের সাধারণ মান বেশ উঁচু, পৃথিবীর অনেক দেশের ছায়া-চিত্রের তুলনায় অধিকাংশ সোভিয়েট ছায়াচিত্র শিল্পসম্পদে উৎকৃষ্ট, কিন্তু মহত্তম ছায়া-চিত্রের বেলায় সোভিয়েট সিনেমাশিল্প বোধ হয় জাপান বা ফরাসী বা হলিউডের শ্রেষ্ঠতম অবদানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীন।

সোভিয়েট দেশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অপরিমিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানেও দর্শকের রুচিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। ইংরাজিতে কথা আছে যে ঘোড়াকে টেনে নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া চলে কিন্তু জোর করে জল খাওয়ানো যায় না। সোভিয়েট রাষ্ট্রেও তার পরিচয় দেখেছি। সোভিয়েট ফিল্ম অথবা টেলিভিশনে প্রচার কার্য বেশ জোরালো-ভাবে হয়, কিন্তু বহুক্ষেত্রে তার ফল হয় উল্টো। আমি নিজে দেখেছি যে টেলিভিশনে

যেই প্রচারবার্তা শুরু হল, হয় গৃহকর্তা টেলিভিশন বন্ধ করে দিল, অথবা অধিকাংশ দর্শক সেখান থেকে উঠে চলে গেল। একজন সোভিয়েট নাগরিক তো স্পষ্ট বললেন যে প্রথম যেদিন টেলিভিশনে শুনলাম যে অমুক নদীতে বাঁধ বেঁধে এত লক্ষ কিলো ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন খুবই খুসী হয়েছিলাম, গর্বও অনুভব করেছি, কিন্তু বারবার যদি সেই একই ধরনের খবরের পুনরাবৃত্তি হয় তবে তা আর কতদিন সহ্য করা যায়? তাই তখন নিজের বাড়িতে হলে টেলিভিশন বন্ধ করে দেই। হোটেলে রেস্তোরাঁতে বা অন্যের বাড়িতে হলে হয় উঠে চলে যাই, নয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প শুরু করে দেই।

দর্শকের রুচিমাফিক ছায়াচিত্র উৎপাদনের জন্য তাই রাষ্ট্রও চেষ্টা করে। যে কোন নাগরিক মর্জিমাফিক ফরমায়েস পাঠাতে পারে, অবশ্য সে অনুরোধ রক্ষা করা না করা কর্তৃপক্ষের এক্তেয়ার। ব্যক্তি বিশেষের ফরমায়েস হয়তো অগ্রাহ্য করা চলে, কিন্তু শিল্পী-সংসদ, লেখকগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক সংস্থা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেকটিভ ফার্ম থেকে অনুরোধ এলে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষকেও ভাবতে হয়। শিল্পী হিসাবে হোক অথবা কর্মী হিসাবে হোক, সিনেমাশিল্পে যারা কাজ করে, তাদের অনুরোধগুলিরও বিশেষ ওজন দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এ সমস্ত মতামতে দেশের জনসাধারণের রুচিরও খানিকটা পরিচয় মেলে এবং কর্তৃপক্ষ সবদিক বিবেচনা করে এমন ছায়াচিত্র রচনার চেষ্টা করেন যাতে দর্শকের মনোতুষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আদর্শও প্রচারিত হবে।

সোভিয়েট সিনেমাশিল্পের আর একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশে যে শিল্পীদের নিয়ে বাড়াবাড়ি, চিত্রতারকা তৈরী করবার জন্য সমস্ত রকমের প্রচারকার্যের প্রয়োগ, সোভিয়েট ছায়াচিত্রে তার পরিচয় খুবই কম। এককালে তো অনামা চিত্রশিল্পীদের নিয়েই সোভিয়েট ছায়াচিত্র গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে চিত্রতারকাদের পরিচিতি অনেকটা বেড়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও হলিউডের তুলনায় ব্যক্তি বিশেষকে বড় করবার চেষ্টা অনেক কম। বহুক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নেওয়া হয় এবং দুয়েকটি ছায়াচিত্রে অভিনয়ের পরে তারা আবার সাধারণ নাগরিকের জীবনে ফিরে যায়। হয়তো তার একটা কারণ যে এতদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রে ছায়াচিত্র রচনায় রাষ্ট্রের প্রচারণার দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বল্প সংখ্যক ছবিই সমস্ত দেশে দেখানো হত। ভারতবর্ষের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্র অনেক কম ছায়াচিত্র প্রতি বৎসর পরিবেশন করে, একথা হয়তো কারু কারু কাছে আশ্চর্য মনে হবে। বর্তমানে ছায়াচিত্রের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে এবং তার ফলে একদিন হয়তো হলিউডের ছায়া সোভিয়েট সিনেমা শিল্পেও দেখা দেবে।

ভারতীয় ছায়াচিত্রের সোভিয়েট রাষ্ট্রে খুবই সমাদর, কিন্তু ঠিক যেমন সঙ্গীতের বেলায় ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের চেয়ে আধুনিক ফিলমী গানই সোভিয়েট নাগরিকের হৃদয় বেশী স্পর্শ করেছে, ছায়াচিত্রের বেলায়ও আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ফিল্মেরই বেশী সমাদর। হয়তো তার একটি কারণ যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কঠোর জীবন আদর্শ এবং সোভিয়েট ছায়াচিত্রের তাপস মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় ছবির অপ্রাকৃত অতিরঞ্জিত প্রেম কাহিনী তাদের আরো বেশী আকর্ষণ করে। কারণ যাই হোক না কেন, ভারতীয় ছায়াচিত্র এবং ভারতীয় ফিল্মী গান যে সোভিয়েট জনসাধারণের একান্ত প্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বোধ হয় তার ফলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ একটু বিচলিত হয়েও

পড়েছেন। কারণ আমি যখন মস্কোতে ছিলাম, তখন আমাদের সফির শ্রীমেনন একদিন অনুযোগ করলেন যে ভারতীয় ফিল্মের সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রবেশে নানা বাধার সৃষ্টি হয়েছে। সাংস্কৃতিক মন্ত্রী অবশ্য তখনি বললেন যে তাঁরা চান যে আরো বেশী ভারতীয় ছায়াচিত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে আসুক এবং সরকারের তরফ থেকে যাতে বাধা না থাকে, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

রাষ্ট্রনেতাদের মতামত যাই হোক না কেন, জনসাধারণ যে ভারতীয় ছায়াচিত্র দেখতে চায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শ্রীরাজকাপুর এবং শ্রীমতী নার্গিসকে সোভিয়েট দেশের সিনেমা দর্শকেরা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে। সে সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্পের উল্লেখ করে এবারের মতন আলোচনা শেষ করছি। বিশেষজ্ঞদের কোনো এক সভায় যোগদান করবার জন্য ভারতবর্ষের কয়েকজন মনীষী তাসকন্দ হয়ে মস্কো যাচ্ছিলেন। তাঁরা সবাই খ্যাতনামা, নিজের নিজের ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তাসকন্দে প্লেন থেকে নামবার সময় দেখলেন যে বিপুল জনতা সাগ্রহ প্রতীক্ষা করছে। তাঁরা বেরিয়ে আসতেই শুনলেন জয়ধ্বনি 'হিন্দী রুষী ভাই ভাই'। দেখলেন যে ভারতবর্ষের তেরাঙ্গা পতাকার ছড়াছড়ি। তাঁদের খুবই ভাল লাগল, ভাবলেন স্বদেশে কোনদিনই এ ধরনের অভ্যর্থনা তাঁদের মেলেনি। সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের এ নিদর্শন দেখে খুবই খুসী হলেন। একটু কাছে এসে দেখলেন কতগুলি ছবিও রয়েছে। পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই সিনেমায় বড় বেশী যান না, তাই ছবি দেখে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না, কিন্তু সমবেত জনতার মধ্যে কয়েকজন এগিয়ে এসে রাজকাপুর এবং নার্গিসের জয়ধ্বনি দিল, তাঁদের জিজ্ঞাসা করল যে রাজকাপুর কোথায়? নার্গিস এখনো বেরিয়ে আসেন নি কেন? জনতা যখন শুনল যে সে প্লেনে নার্গিস বা রাজকাপুর নেই, তখন পণ্ডিত ও সুধীদের নিরাশ করে সমবেতভাবে তারা সবাই ফিরে গেল। 'হিন্দী রুষী ভাই ভাই' জয়ধ্বনিও থেমে গেল।

গল্পটি সত্য কিনা জানি না, কিন্তু এ ঘটনা না ঘটে থাকলেও ঘটতে যে পারত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
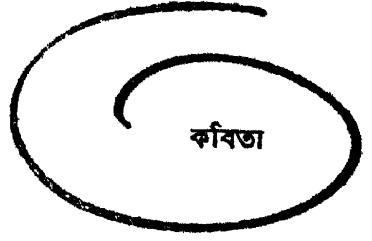
কলকাতার বোধিসত্ত্ব

আনন্দ বাগচী

দেওয়ালে লেপ্টে আছে বিপন্ন বধির অন্ধকার,
বাইরে ঘনবৃষ্টি ঝরে, দমকা হাওয়া প্রচন্ড ধমকে
সহর শাসন করে জলস্রোতে মজে বাঁকা গলি,
সঙ্কীর্ণ আলোর বৃত্তে বোধিসত্ত্ব একা জেগে আছে
মেপে জুকে দেখছে তার আত্মজীবনীর খসড়াখানা,
দর্পনের কাঁচঘরে শেষবার প্রিয়তম মুখ
নির্জন ফুলের মত ফুটে উঠছে আজন্ম-যৌবনে।
তার কড়চা গ্রন্থে সব স্বাক্ষরিত স্মৃতিচিহ্ন আছে
বহু নাটকীয় গল্পে, গল্পহীন অনেক নাটকে
মৃতদেহ নিয়ে কত খেলা হলো, কান্নার সাঁকোয়
কত পরস্পর ছায়া পার হলো নিভৃত হৃদয়ে,
কত কণ্ঠলগ্ন প্রেম, পথহাঁটা, স্বপ্নের ভিতর
আত্মঅন্বেষণ আজ আত্মহননের মত লাগে;
বোধিসত্ত্ব বলেছিল একদিন সমস্ত নারীকে
আদিম বৃক্ষের মত যৌবনের অসীম স্পর্ধায় :
'ফিরিয়ে দেব না কিছু, হে রমণী, আলিঙ্গনে চূর্ণ করে দেব।
ওষ্ঠে ওষ্ঠে বিদ্যুতের শিখা জ্বলবে পথিকে ধাঁধিতে,
পতঙ্গের মত তুমি অন্ধ হয়ে এসো প্রিয়তমা,
চতুর্দিকে শিলাখন্ড, হিংস্র কণ্টকের সমারোহ
সর্বাঙ্গে যৌবন এনো এক রজনীতে শূন্য হতে,
আচ্ছন্ন চেতনা ভ'রে জ্বলবে শুধু প্রবল বর্ষণ,
নীরন্ধ্র ঘরের মধ্যে এসো এসো আমার প্রতিমা

নিসর্গ নিহত রক্তে, স্নায়ু জুড়ে বারুদের ঘ্রাণ।
ফিরিয়ে দেবনা কিছু, হে রমণী, চিরকাল যা এনেছ তুমি
যা কিছু গরল, মৃত্যু, পাপ, দ্বিধা চূর্ণ ক'রে দেব।'

সংকীর্ণ আলোর বৃত্তে এখন চোরের মত বোধিসত্ত্ব জাগে
চূর্ণ হয়ে গেছে দম্ভ, পাশার ছকের মত অন্ধকার পাতা,
তার কড়চা গ্রন্থে সব স্বাক্ষরিত স্মৃতিচিহ্ন আছে,
কলকাতা চোখের জল এবং চোখের বালি একসঙ্গে করা,
নিঃসঙ্গতা সবশেষে, বিষণ্নতা প্রতিমার মত পূজনীয়॥

পয়ঃস্বিনী

মৃগাঙ্ক রায়

ভোর দাঁড়িয়ে আছে পথের মোড়ে
বলেছিলে তুমি আসবে
সারারাত অন্ধকার দাঁড়িয়েছিল পথ জুড়ে॥

তোমার ছড়ানো হাত
একখানি সবুজ পাতা
একটি ছায়াগাছ বাড়ছে
আমার ঘরের দেয়ালে
দুখানি পাখার উড্ডীন কালো
তোমার দুচোখ বেঁধেছে।

তুমি এসো, আমার দক্ষিণ দুয়ারে হাওয়া
তুমি এসো, আমার প্রাক্তন প্রেমে অন্ধকার
তুমি এসো, পয়ঃস্বিনী পৃথিবী ঋতুগন্ধী॥

আমার চোখের নিচে তোমার চোখ
এক একটি দিন এক একটি ভিন্ন দৃষ্টি
এক একটি রাত ভিন্ন মুখ
তার তরঙ্গিত কণ্ঠনালী প্রতিদিন
নতুন অন্ধকার॥

কুয়োর পাড়ে জলের শব্দ
ঢেউয়ের নীল পিঠের মতো আকাশ
বৃষ্টিভেজা খড়ের গন্ধ মাঠে
পাঁচটি পামগাছ ঘিরেছে আমাদের
অপরাহ্ণ।

সন্ধ্যা হবে
পাখায় অন্ধকার আনবে পাখী
আমার হাত প্রবাহিত হবে
তোমার হাতে
আমি তোমার মধ্যে ক্ষরিত হবো
দিনান্তরজনী॥

আমি আছি সেই মধ্যবৃত্তে তুমি
যার নীলনাভি।
রাত আসছে, উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে,
পাহাড়ের লাল পিঠের ওপর পা দিয়ে। রাত
আসছে, লুপ্ত ধ্বনির জিহ্বা নড়ে উঠছে,
অন্ধকার তাকিয়ে আছে তোমার দিকে আমার দিকে
আমাদের দ্বৈত মূর্তির দিকে।
আমি তোমার মধ্যে প্রোথিত,
আমার উরুতে তোমার বালুগ্রাস, আমার
আঙুল তোমার আঙুলের জংঘায় জড়িত।
তোমার মধ্যে আমার জন্ম, স্বপ্নস্বেদমৃত্যু।
রাত আসছে, অঞ্জলি পেতে
আমার প্রবাহমুখ ধারণ করো॥

কে যেন

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

এই জলে ঢেউ তুলে কে যেন হঠাৎ
চকিতে মিলিয়ে গেছে।
স্থির হ্রদে বৃত্ত আঁকে
রঙীন বুদ্বুদ—তার নাম,
চকিতে মিলিয়ে যায় জলের আলপনা।

এই মগ্ন অন্ধকারে কে যেন নিমেষে
চুপি চুপি কথা কয়ে গেছে।
অরণ্যের শাখাগুলি মাথায় মাথায় এক হয়ে
তাই নিয়ে কাণাকাণি করে;
এখনো বাতাসে ভাসে ফিস্‌ফিস্‌ সে গলার স্বর।

এ নির্জন ঘরে এসে পা টিপে পা টিপে
আধ-খোলা দোর দিয়ে
কে যেন এসেই চলে গেছে;
অসতর্ক মন তার অস্তিত্বের পায়নি নাগাল।

আধ-খোলা দোরের মতন
চিড় খেয়ে গেছে যেন হৃদয়ের এই নির্জনতা।

কৈশোরের প্রতি

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

যদি বলো যেতে পারি মাঠে, কিংবা শান্ত সমতলে।
উপরে ডেকো না অই উত্তরের পাথুরে পাহাড়...
গর্বিত লেগুনে, কিংবা ভয়ানক শব্দের জঙগলে।
তেমন উন্নত নই, হাতে নেই দাম্ভিক কুঠার।

দেখ, দেখ কত অল্পে ছায়াপথ... সাজানো সংসার
ফুটে আছে জ্যোৎস্নাবনে. শাদা-শাদা, চিত্রল নীরব—
মায়াবী জলের ফুল খুব আস্তে আনে অন্ধকার।
কোথা দর্প... কোথা ডাকো, বক্ষে নেই তেমন সৌরভ।

কিছু এই রোগমুক্তি, কিছু অই আসক্ত বাতাস
অন্তত আমারে দাও। ক্লান্ত, বাঁকা, বিষিত শরীর
জটিল শয়নে বৃদ্ধ—একা আছি অন্ধ শোকোবাস;
আমারে গ্রহণ করো যুগল বাহুতে রজনীর।
উপরে ডেকো না তুমি সূর্যোদয়ে বিহবল আকাশ,
আঁধারে নিদ্রিত আছি... এসো লজ্জা, প্রথম, মদির।

ইতিবৃত্ত

স্যাঁ-জন্‌ প্যার্স

মহাকাল, আমরা এসেছি পৃথিবীর সব উপকূল থেকেই। অত্যন্ত প্রাচীন জাতি আমরা, আমাদের মুখে কোন নাম পাবে না। যে যে মানুষ ছিলাম আমরা এককালে,—কার তার অনেক কথাই জানে!

দূরান্তের নানা পথ দিয়ে নিঃসঙ্গ আমরা হেঁটে এসেছি; আর অপরিচিত সাগরের পর সাগর আমাদের ব'য়ে এনেছে। আমরা চিনেছি ছায়া আর তার পান্নাপ্রভ প্রেতাত্মাকে। আমরা দেখেছি সেই আগুন, যার টানে পথ হারাতো আমাদের জন্তুগুলো। আর আমাদের লোহার পাত্রে আকাশ ধারণ করল রুদ্ররোষ।

মহাকাল, এসেছি আমরা। আমরা চাইনি গোলাপ, চাইনি অ্যাকান্থাস। কিন্তু এশিয়ার মনসুন আমাদের চাবকিয়েছে, ধেয়ে এসেছে আমাদের চামড়ার নয়তো বেতের বিছানা অবধি, এনেছে তার ফেনার দুধ আর চুনের জল। পশ্চিমে উৎপন্ন কত-না নদ চারদিনে গিয়ে হাজির হয়েছে সাগর-সঙ্গমে—সবুজ তাদের পলিমাটি-ঘন অম্লরস নিয়ে।

আর, লাল-মাটির ওপর যেখানে সবুজ সবুজ ক্যান্থারিস মাছি উড়ে বেড়ায়, শুনলাম সেখানে একদিন উষ্ণ বর্ষণের আগমন-ধ্বনি।

অন্যত্র, মনিবহীন অশ্বারোহীরা তাদের ঘোড়ার বদলে নিয়ে নিল আমাদের পশমী তাঁবুগুলো। দেখেছি আমরা মরুভূমির বামন মৌমাছি। আর দ্বীপপুঞ্জের বালিতে, জোড়ায় জোড়ায় দেখেছি কালো ছিট দেওয়া লাল লাল পোকা। শহরে শহরে আগুন যেচে রাত্রির প্রাচীন অজগর আমাদের পথ চেয়ে শুকিয়ে রাখেনি তার রক্ত।

আর, আমরা বোধ হয় ছিলাম সমুদ্রের বুকে, সেই সূর্যগ্রহণের দিনে, প্রথম সেই অবাধ্যতার দিনে, যখন আকাশের কালো নেকড়েটা কামড়ে ধরল আমাদের পূর্বপুরুষের পরিচিত প্রাচীন গ্রহটার হৃদয়। আর ধূসর সবুজ সেই গুহার অতলে, বীজ বোনার গন্ধে মুখর যেখানকার রঙ নবজাতকের চোখের মত, নিরাবরণ আমরা স্নান ক'রে উঠলাম—প্রার্থনা-রত : এই সর্বমঙ্গল এল যেমন অমঙ্গলের রূপে, অমঙ্গলও আসুক তেমনি সর্ব-মঙ্গলেরই রূপ নিয়ে। (*Chronique* থেকে)

[মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

কনখল

মনীশ ঘটক

নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি, অব্যাহত সুখ, স্থায়ী হয় না জীবনে। স্থিতির নিগড়ে বাঁধা পড়ে না মন। উন্মেষ-মুখর চিত্ত দয়েলখঞ্জনের মতো নেচে কুঁদে দাপাদাপি করে চলতে চায়। কনখলকে গতির চুম্বক টানে—দুর্বার সে আকর্ষণ, গন্তব্যের কোনো দিশারা নেই। ভয়ের বোধ এখনো জাগেনি, তাই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রার্থনা কনখলের অজ্ঞাত। বিজয়ীর গৌরবে বিপদ অতিক্রম করে আসা ওর যেন সহজাত সংস্কার।

সহপাঠী বা সমবয়সীদের সামনে, স্কুলে শাস্তি পেয়েই হোক বা খেলায় হেরে গিয়েই হোক, অপদস্থ হবার গ্লানি কিন্তু কনখলকে শঙ্কিত করে। তবে স্কুলের আবহাওয়ায় সে শঙ্কাও কেটে আসে। শাস্তির লাঞ্ছনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মধ্যে যেন আত্মত্যাগের মহিমা আছে, অত্যাচারের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোর বীরত্ব আছে, এমনি মনে হয় ওর। স্কুলে ভূগোলমাস্টার গোপালবাবু ছাড়া আর সব স্যারেরাই যেন এক একটি জঙ্গীলাট—খালি তম্বী, আস্ফালন, আর হুকুমদারী তামিল না করলেই সাজা। ক্লাসে ওপারের সেই বেশী-বয়সী ছেলেটি, যার নাম মাতব্বর, একদিন চৌবাচ্চার অঙ্ক বোঝেনি, বুঝিয়ে দিতে বলেছিল খগেন স্যারকে। তিনি অঙ্ক ত বোঝালেনই না, খামখা গালমন্দ করে অতোবড় ধাড়ী ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিলেন বেঞ্চির ওপর।

কনখল বোঝে না, মাতব্বরের দোষ কোথায়। ভাবে, এত ভারী অদ্ভুত! পিরিয়ড ফুরিয়ে গেলে শাস্তিও শেষ হবে, কিন্তু অঙ্কটা না বোঝাই থেকে যাবে মাতব্বরের। সেও ত নিজে না বুঝলে মাকে সব জিজ্ঞেস করে। মাতব্বরের হয়ত তার মায়ের মতো মা নেই, কিন্তু স্কুলেও ত জানতে, শিখতে, বুঝতে আসে ছেলেরা। খগেন স্যার এ সহজ কথাটা কেন বোঝে না, ভেবে পায় না। মন বিরূপ হয়। শাস্তি? ভয়? ফুঃ!

যা কিছু বারণ, অজ্ঞাতসারে তার প্রলোভন যেন দুর্জয় হয়ে ওঠে। যা কিছু গোপন, তার ঢাকা খুলে দেখার আগ্রহ মনকে অধীর করে। হাজারো বিধিনিষেধের গোলকধাঁধায় মন ঘুরপাক খায়, কিন্তু হার মানতে চায় না! ধমক, ভয়, শাস্তি, বারণ, গোপন—অনেক শত্রু। ও যে লড়ছে, তাও ওর বোধের অতীত। জানতে পারে না, তীব্র আবেগ চাপতে গিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলতে সুরু করেছে। ঘুমের মধ্যে বলা দু চারটে কথা কখনো সখনো নিভাননীর কানে গেছে। স্বপ্নে কথা বলছে মনে করে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েছেন তিনি। হয়ত হজম হয়নি, পেট ফেঁপেছে, দুঃস্বপ্ন দেখছে। পেটে টোকা দিয়ে ঢ্যাবঢ্যাব করছে কিনা পরখ করেছেন। নাঃ, সে সব কিছু নয়। নির্দোষ দেয়ালা মনে করে আমলে আনেন নি।

আয়েষার সাথে রোজ দেখা-সাক্ষাতের পালা শেষ করা হয়েছে। প্রয়োজনও মিটেছে বোধ হয়। দুজনেই দুজনাকে জেনেছে, চিনেছে। কিন্তু আব্বাসের অনুরাগে আয়েষা অননুভূত রসের স্বাদ পেয়েছে। বিয়ের কথা পাকাপাকি হবার পর থেকে দেখাসাক্ষাৎ নেই বললেই চলে। আবরু কড়া হয়ে উঠেছে, কুলসম আর আয়েষাকে ঘর থেকে বেরুই হতে দেন না। জানলার সার্শী ফাঁক করে আব্বাস আসতে যেতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে

আয়েষা, বন্ধ একা ঘরেই গাল লাল হয়ে ওঠে। কোন মায়াবী জাদুকরের ছোঁয়া লেগেছে যেন, দেহ মনে তরতর করে বেড়ে ওঠে আয়েষা। ম্যাজিকওয়ালার আমগাছের মতো। বীজ পোঁতা, গাছ বাড়া আর ফল ধরা সব যেমন দুমিনিটে হয়।

কনখল আসবে না কেন, আসে। ছুটিছাটার দিনে কাঞ্চনের পিঠে চড়ে পোলো ময়দানের ধারটিতে এসে দাঁড়ায়, হ্যাসেট যেদিন আসেন, খেলাতে নেন কখনো কখনো। এক সোয়ারী হয়ে খেলবার সুবিধে দিয়েছেনও দু'একদিন। ঘোড়ায় চড়া ও কেয়ার করে না, সার্কাসের খেলোয়ারের মতো ঘোড়ায় চড়ার কসরত জানা আছে ওর, কিন্তু বিপদ ঐ তিন মানুষ লম্বা পোলোর ডাণ্ডা নিয়ে। তাও মাঝামাঝি এক জায়গায় দৃঢ়মুষ্টিতে ধরবার কায়দা বাগিয়ে ফেলেছে। ব্রিগেডিয়ার রণছোড় সিং মনে মনে তারিফ করেন। হ্যাসেটকে বলেন,—লৌণ্ডাকো স্যাণ্ডহার্স্ট ভেজ দো। হ্যাসেট গোঁফ চুমড়ে হাসেন। বলেন— মাই ডার্লিং ডটার উইল নেভার স্পেয়ার মি। নিভাননীকে মেয়ের মতো ভালোবাসেন তিনি। লড়ায়ে তালিমে ছেলেকে ঢোকালে খুশী হবেন না নিভাননী, মনে হয় হ্যাসেটের।

খেলার শেষে একবার আয়েষাদের বাড়ী হয়ে দরগামুখো রওনা দেয় কনখল। বাড়ী ফিরে নতুন নেশায় মাতে। সাইকেল। অমৃত কোথা থেকে একটা ছোটোখাটো সাইকেল এনেছে, তাতে চড়তে শেখায় কনখলকে। প্রথম প্রথম খুব মজা লাগলেও গা শিরশির করে। অমৃত সীটের তলায় হাত দিয়ে সাইকেল ঠেলে, কনখল হাতল সোজা রেখে ব্যালান্স আয়ত্ত করে। মাঝে মাঝে হাত ছেড়ে দেয় অমৃত, কনখল দেখতে পায় না। ব্যাঙা দৌড়য় সাইকেলের সাথে, কিন্তু ভয়ে ব্যাঙার বুক গুরগুর করে। ব্রেক কষার কায়দা রপ্ত করতে পারেনি কনখল, পড়ল একদিন গাছে ধাক্কা খেয়ে ধপাস করে। অমৃত ছুটে এসে হাত ধরে তোলে, বলে,—খুব লেগেছে নাকি রে?

লাগা স্বীকার করাটা পরাজয়, এ বোধ ঠিক আছে কনখলের। সগর্বে গায়ের ধুলো ঝেড়ে মাথা দুলিয়ে বলে,—লাগলেই হোলো! কিচ্ছু লাগে নি। বাঁ দিকের কানের লতিটা থেঁতলে গিয়েছে ব্যাঙা দেখে ফেলে। বলে,—লাগেনি আবার! কানটা ত গেছে, দেখি ত মাথায় কোথাও কেটেছে কিনা। অমৃত বলে,—ব্যাড্, ভেরী ব্যাড্। ব্যাঙা, যা ত, গোটাকত গাঁদা পাতা পুকুরে ধুয়ে নিয়ে আয়। ব্যাঙা ছুট দেয়।

ইঁটের ওপর ইঁট দিয়ে ঠুকে গাঁদা পাতার নির্যাস তৈরী হয়। ক্ষতে লাগিয়ে কোঁচার খুঁট ছেঁড়া এক ফালি ত্যানার পটি লাগায় অমৃত। বলে,—ও তোর দু'দিনেই সেরে যাবে, তবে মাসিমা জানলে আর আস্ত রাখবেন না। নাঃ, ক'দিন আর এমুখো হচ্ছি না।

কনখল বলে,—আচ্ছা অমৃত, আমি বলছি মা কিছু বলবেন না। ওই ব্যাঙাকে জিজ্ঞেস কর, মাকে গিয়ে সব খুলে বললেই হোলো। মার কাছে না লুকোলে মা কিছুতেই রাগ করেন না। সেই পাখী ধরার দিন মনে নেই ব্যাঙা? তোর হাতটা ত খুবলে খেয়েছিল মাদী কোকিলটা। মা খালি উড়িয়ে দিলেন, কই বকেন নি ত? ব্যাঙা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

ছুটির বার, কিন্তু বিকেলের খেলায় ফাটা কান নিয়ে যোগ দিতে পারে না কনখল। ব্যাঙাকে একসাথে নিয়ে খেলার মর্যাদা এখনো দেয়নি ছেলের দল। কিন্তু ব্যাঙা স্কুলে ভর্তি হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে, এখনো ওকে বাদ দেওয়া হবে কেন, ভাবতে খারাপ লাগে কনখলের। মার দিকে তাকায়, মা যেন বোঝেন ওর মনোভাব। বলেন,—আজ ব্যাঙা

খেলবে কংখের বদ্‌লী। আমি জানলায় বসে দেখব। হ্যাঁ রে অমৃত, তোদের গীতা-সোসাইটির মামলা নাকি মিটমাট হয়ে গিয়েছে?

—হ্যাঁ মাসিমা। নিবারণ ছিল মূল আসামী। হ্যাসেট সাহেব বলেছেন ওর বিরুদ্ধে কোনো নালিশ টিঁকবে না। বাদ্‌বাকী প্রকাশদা, অমূল্য, আমরা—আমরা ত শুধু আগুন নেভানো, লোক বাঁচানো, এই সবই করেছি। তবে কানাঘুষা শুনি, বেণী দারোগা নাকি পণ করেছে আমাদের সবাইকে জেলে পুরবে।

—প্যারীবাবুর কি হবে?

—উনিও খালাস হবেন। সন্দেহ আছে, প্রমাণ নেই। তারপর হঠাৎ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—মাসিমা, হরেনবাবু উকীল, তিনি নাকি বলেছেন যে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর কথা, কি মতামতের আইনে কোনো দাম নেই। নতুন মাসীর সেই আপনাকে বলা কথা ছাড়া প্যারীবাবুর বিরুদ্ধে আর কোনো প্রমাণ নেই। সেই যে, আগুনলাগার দিন বলেছিলেন, গুদামে একটুও পাট ছিল না। বলেছিলেন তিনি আপনাকে, আপনি বলেছিলেন মেসো-মশাইকে, কনা শুনেছিল। কলকাতার কোম্পানীর সাহেবটাও নাকি তদন্ত করে তাই বলে গেছে। তবে হরেনবাবু বলেন, যে পাঁচফেরতা কানকথায় ফৌজদারী মামলায় সাজা হতে পারে না। খালাস হবেন প্যারীবাবু, তবে ওঁর অনেক ধারদেনা, বিষয়সম্পত্তি সব নাকি বিক্রী হয়ে যাবে।

অমৃত ছেলেটি দলের মধ্যে সাবালক, খাসা গুছিয়ে পূর্বাপর বর্ণনা করে যায়। এই পূর্ণাঙ্গ নাটকে ছেলের অংশ তুচ্ছ নয় মনে করে অস্বস্তি বোধ করেন নিভাননী। মুখে প্রকাশ করেন না কিছু। বলেন,—যা তোরা খেল গে যা। ব্যাঙাকে খেলায় নিতে ভুলিস্‌ না অমৃত।

ছেলের সাথী, দাগী চোরের ছেলে, খিদ্‌মৎগার ব্যাঙা নিভাননীর কাছে যেন কনখলের সমপর্যায়ে উঠে গেছে। মায়ের মনের রহস্যই আলাদা।

বৈকালিক বৈঠকের আড্ডাধারী সবাই বাইরের বারান্দায় জমায়েৎ হয়েছেন। বিদ্যা-ভূষণ ম'শায় ফুলো গালে টিকেয় ফুঁ দিচ্ছেন। হরেন চাকী রহমৎবাহিত কোন ম্লেচ্ছ জলখাবারের কথা সলোভে ভাবছেন। দীক্ষা নতুন, তাই ঈপ্সা বলবতী।

বর্মা চুরোট ফুঁক্‌তে ফুঁকতে দু'চার কদম পায়চারী করে বাগচি এসে স্বস্থানে বসেন। নিভাননী পর্দার আড়াল থেকে হরেনবাবুকে ইসারায় ডাকেন। ত্বরিৎ পদে হরেনবাবু উঠে ভেতরে যান। বলেন—কি বলছেন বৌদি?

—ঠাকুরপো, আপনি নাকি প্যারীবাবুর পক্ষে ওকালতী করছেন?

—কে বল্‌লে? ওকালতী নয়, ওকালতী নয়। আমমোক্তার নামা আমায় দেননি প্যারীবাবু। তবে—মানে, আইনসঙ্গত সাক্ষ্যপ্রমাণের রহস্যটুকু ফলাও করে জানিয়ে দিয়েছি কর্তাদের। জীবনের নতুন মার সেদিনকার কান্নাকাটি শুনে গেছি কিনা, মনটা কেমন মুষড়ে ছিল।

এই স্পষ্ট বক্তা কটুভাষী লোকটির সদয় অন্তঃকরণের পরিচয় পেয়ে প্রীত হন নিভাননী। হরেনবাবু বলতে থাকেন,—আপনি ত বুদ্ধিমতী মহিলা, বৌদি, আপনিই বুঝুন। স্বামীর অনিষ্টকারী কোনো কথা ঘরোয়াভাবে স্ত্রী তাঁর কোনো বন্ধুস্থানীয়াকে বললেন। সেই বন্ধু আবার তাঁর স্বামীর কাছে কথাগুলো গল্পচ্ছলে শোনালেন। গল্প কানে গেল এক নাবালক বাচ্চার, এখন এই বাচ্চার শোনা কথার সাক্ষীপ্রমাণ হিসেবে কি দাম,

থাকতে পারে? তেমন জোর মামলা খাড়া হলে উকীল ব্যারিষ্টার শিখিয়ে পড়িয়ে স্ত্রীকে দিয়ে হলপ করে বলিয়ে দেবে যে তিনি আদৌ কিছু বলেননি ওধরনের। ব্যস্। না, না—ওসব ঘরোয়া বৈঠকের গালগল্পে মামলা খাড়া হয় না। আর তা ছাড়া, নাবালকের শোনা কথার দাম দিলে আপনাকে বাগচিকেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। পারবেন সেটা?

—রক্ষে করুন ঠাকুরপো। মাগো, তাই কখনো কেউ পারে? ওসব ভয় নেই ত আর?

—না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও আশঙ্কার গোড়া থেকে সমূলে কেটে দিয়েছি।

নিভাননী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেন—নির্মলার সাথে আর ঝগড়াঝাঁটি করেন না ত?

—রামঃ, আবার। সেই আপনার যাবার দিন থেকেই সাদা নিশান। সন্ধি। তবে লক্ষ্য করছি, আমার যেমন রহমতের রসুই-এর ওপর লালচ বেড়ে উঠ্ছে, ওঁরও তেমনি ঠাকুর পুজো, সাত্ত্বিক রান্নাবান্নার বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। আজ ত সাফ বলেই এসেছি রাত্তিরে আপনার এখানে নেমন্তন্ন। বলে, যেন একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবেই নিভাননীর দিকে তাকান হরেনবাবু।

নিভাননীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন—নেমন্তন্নই ত। আমি তাই আপনি খাবেন বলে আগে থেকেই আয়োজন করেছি। আচ্ছা বসুনগে আড্ডায় গিয়ে, আমি এদিক দেখি। বলে, অসত্যভাষণের গ্লানি কাটাতে বাবুর্চিখানার দিকে পা চালান নিভাননী।

কনখল ছাদে বসে খেলা দেখে। কানের ব্যথাটা বেশ জানান দেয় থেকে থেকে। শীত প্রারম্ভের পাহাড়ী পাখীরা দলে দলে অপেক্ষাকৃত সমতলে মরসুমী অভিযান করে আকাশ ছেয়ে, ঠায় তাকিয়ে দেখতে দেখতে মন কেমন উদাস হয়ে যায়। একটা শঙ্খচিল ঘুর পাক খেয়ে উড়তে উড়তে ওপরে, অনেক ওপরে, মেঘাবরণের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়। পুজোর ছুটিতে দেশের নদীর নীল গেরুয়া দুই ধারা জলের সংমিশ্রণ দেখে এসেছে কনখল। প্রকৃতি বিলাস ও শারীরিক যন্ত্রণা তেমনি ওর অনুভূতির দুই কানা বেয়ে বয়ে যায়। উৎফুল্ল ও বিষাদ একসাথে মিশে নিছক ভাবালুতা থেকে যেন বাঁচায় ওকে, সম্বিৎ সজাগ রাখে।

দূরে রাস্তার বাঁকে হ্যাসেটের অশ্বারোহী মূর্তি দেখা যায়। বোধ হয় ওদের বাড়ীতেই আস্ছেন। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে কনখল ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে বলেন,—হ্যালো ইয়ং ম্যান,—

হারুণ আসবার আগেই ও ঘোড়ার লাগাম ধরে। হ্যাসেট আদর করে ওর পিঠ চাপড়ান। বাগচি এগিয়ে আসেন। বিদ্যাভূষণ, হরেনবাবু নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ান। ছেলের দল খেলা শেষে মাঠের কোণায় জটলা করছিল, এইবার যে যার বাড়ীর দিকে রওনা দেয়। হারুণের হাতে লাগাম ছেড়ে দিয়ে কনখল বাড়ীর ভেতরে যায়।

হ্যাসেট আসন গ্রহণ করে বলেন,—তোমার মনস্কামনা সফল হয়েছে বাগচি। সামনের মাস থেকে সরকারী ইস্তাহার ইত্যাদিতে তোমার নামের আগে মিষ্টার ব্যবহার হবে, হুকুম হয়েছে। কেমন, খুশী ত?

বাগচি মুখ কাঁচুমাচু করেন, অস্পষ্ট সুরে বলেন,—আপনার দয়া। হরেনবাবু

আড়ালে মুখ বেঁকিয়ে হাসেন। বিদ্যাভূষণের মুখভাব নির্লিপ্ত।

হরেনবাবুর মুখভাব হ্যাসেটের চোখ এড়ায় না। ঝানু সিভিলিয়ান, বহুদিন এদেশে আছেন। পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে বেগ পেতে হয় না। বলেন,—ওয়েল, বাগচি, যদ্দিন চাক্‌রী করবে, সাহেবীটাহেবী কোরো, কিন্তু ওই ওপরপাত পর্যন্ত। চালচলনে, বেশ-ভূষায়। মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালীই থেকো হে, সরকারের কাছেও সম্মান পাবে। তোমাদের সুরেনবাবু, রবিবাবু, বঙ্কিমবাবু, বিপিনবাবু, এঁরা যাই বলুন, আর যাই করুন, মনে মনে সমীহ করি এঁদের। যে মাটিতে জন্ম, সেই মাটির রসে পুষ্ট হবে, তবে ত জীবনীশক্তি অটুট থাকবে! কি বলেন হরেনবাবু?

হরেনের বাক্‌রোধ হয়ে আসে। মনে মনে বলেন—সাহেব, তুমি ম্লেচ্ছ ও বিজাতীয়, কিন্তু ইচ্ছে করছে তোমার সবুট শ্রীচরণযুগলে কপাল ঠুকি। মুখে বলেন,—খাঁটি কথা স্যার। আর বাগচির সাধ্য কি, শেকড় কাটা কাঠখোট্টা হবার। বাড়ীতে তুলসীতলা আছে, শালগ্রাম আছেন,—

আবার মনে মনে বলেন হরেনবাবু—আর জীবন্ত লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ আছেন। মুখে আবার বলেন,—বাইরে মডার্ণ বেঙ্গল হলে কি হয়, ভেতরে ঘোর সনাতনী। হাঁচি টিক্‌টিকি, মাকুন্দচোপা,—সব মানেন আমাদের বাগচি।

—হোয়াট—হোয়াট ইজ দ্যাট—

—এই কতকগুলো অশুভ সঙ্কেত স্যার। অমঙ্গলসূচক। শুভকাজে বেরোতে ওগুলোর প্রত্যেকটি বাধাই বাগচি মেনে থাকেন। মনটা ওঁর খাঁটি দেশের রসেই পুষ্ট জানবেন।

ভেতরে নিভাননী মুখে আঁচল চাপেন। বিদ্যাভূষণ ঈষৎ হাসেন। বাগচি দাঁত কিড়মিড় করে হরেনকে চিমটি কাটেন। হ্যাসেট প্রসঙ্গ লঘু করে দেন স্বভাবসিদ্ধ প্রসাদগুণে। বলেন—ওঃ, ইন্‌অস্পিশাস সাইন্‌স্‌—ও সব দেশেই মানা হয়। আমাদের দেশের তেরো নম্বর আর কালো বেড়ালের কথা শুনেছ ত? ভারী অমঙ্গলের ব্যাপার। কত উচ্চশিক্ষিত লোক এখনো মানে। যাক্‌, আরও ভালো খবর আছে। পার্টিশন রদ হয়ে গেল। লর্ড কার্জনের সেট্‌ল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট আন্‌সেট্‌ল্‌ করে দিলে হে তোমাদের সুরেন ব্যানার্জি। জানুয়ারী থেকে আসাম, বাংলা, বেহার, ওড়িষ্যা, আলাদা আলাদা প্রভিন্স হয়ে যাবে। লর্ড কারমাইকেল আস্‌বেন বাংলার প্রথম গভর্ণর হয়ে। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি আমরা—ভারী ভালো লোক। খাঁটি মানুষ।

ওপরওলার সাম্‌নে বাগচি বাক্‌বিস্তার করেন না, কিন্তু হরেন মুখফোঁড় মানুষ। বলেন,—সার্‌, ভালো খবরটা খালি দেশসংক্রান্ত,—না—

—ক্লেভার, ভেরী ক্লেভার। না শুধু দেশ সংক্রান্ত নয়। জানুয়ারী থেকে বাগচি মহকুমা হাকিম হয়ে যাবে উত্তর বাংলার নিশ্চিন্তপুরে। দার্জিলিংয়ের কাছাকাছি জায়গা। স্বাস্থ্যকর নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা।

হরির লুটের বাতাসার মতো ভালো খবরগুলো ছড়িয়ে দিয়ে হ্যাসেট উঠে দাঁড়ান। বাগচিকে বলেন,—ওয়েল, ওয়েল, মাই সন, আই হ্যাভ্‌ ডান মাই বেষ্ট। মেয়ে কোথায়? কনখলকে বলেন—হ্যালো, ইয়ংম্যান, লীড্‌ মি টু ইওর মাদার।

সাহেব উঠে যেতে হরেনবাবু বাগচির করমর্দন করে প্রায় নাচ্‌তে বাকি রাখেন। বিদ্যা-ভূষণ বলেন—অতি সজ্জন ব্যক্তি। এম্‌নি যদি সব ইংরেজ হোতো।

তার্কিক হরেন জো পান। বলেন,—হলে কি হোতো? এ জীবনে স্বদেশী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো না। শাসক শ্রেণী অবিবেচক ও অত্যাচারী না হলে বিরুদ্ধ মত দানা বাঁধতে পেত না। ব্যক্তিগতভাবে হ্যাসেটকে দেবতুল্য মানুষ মনে করি—ইংরেজের প্রতিভূ হিসেবে কার্জন ফুলার কার্লাইল লায়নেরাই কাম্য—এই নিবীর্য দেশে অন্তত কিছুটা প্রাণসঞ্চারের সমিধ জুগিয়েছে।

বাগচি বলেন—থামো হে। হ্যাসেট আসছেন।

হ্যাসেট এসেই হরেনকে বলেন,—যাচ্ছি আমি। আই সে হরেনবাবু, আপনি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর সাক্ষী বিষয়ে যে পয়েণ্টটা সেদিন উল্লেখ করেছিলেন, যদিও সেটা এক্ষেত্রে পুরো প্রযোজ্য নয়, তবুও একেবারে উড়িয়ে দেবারও নয়। জাজ ইমার্সন আর কলকাতার কাউন্সিলর, তাঁরাও একমত। ঠিক্ ওই ধরনের ডমেষ্টিক গসিপ-এর ওপর নির্ভর করে পিয়ারীর বিরুদ্ধে কেস্ দাঁড় করানো যায় না,—হি গোজ্ স্কটফ্রী। তবে ইন্স্যুরেন্সের টাকা কিছু পাবে না, কোম্পানীর লোক এন্কোয়ারী রিপোর্টে মেরে দিয়ে গিয়েছে।

এ সুসংবাদের সম্ভাবন আভাসে ইঙ্গিতে আগেও আলোচিত হয়েছে, তবুও খোদ ডেপুটি কমিশনারের জবানী খবরে প্রত্যেকেই হর্ষ প্রকাশ করেন। হ্যাসেট যাবার মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে থাকেন,—কিন্তু আই ডোণ্ট লাইক পিয়ারী'স্ মেথড্স্। হি ইজ নট এ ষ্ট্রেইট্ ফেলো। আমি বহুদিন এখানে আছি। শিলেটের সবায়েরই নাড়ীনক্ষত্রের খোঁজখবর রাখি। দরগার হাজি, রেভারেণ্ড নিকলসন, পরেশবাবু, গীতা সোসাইটির স্বামীজি, এঁদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধায় আমি আপনাদের থেকে কম নই। কিন্তু বর্তমান সরকারী নীতিতে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটছে, সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমার কার্য-কলাপেও উনিশ বিশ হতে বাধ্য। আশা করি, আপনারা পাব্লিক মেন, এটুকু বুঝবেন।

হরেনবাবু হাত কচ্লে বলেন,—রামরাজত্বে ছিলুম আমরা। আপনার সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সদয় ব্যবহার, প্রতি শিলেটবাসীর বুকে জাজ্বল্যমান হয়ে থাকবে চিরদিন। তা না হলে, স্যার্, আমি প্যারীবাবুর সবচেয়ে বিরোধী, আপনাকে গিয়ে তাঁর জন্যে ধরি?

—নো নো হরেনবাবু, ইউ আর আপরাইট, অনেষ্ট টু দি কোর। লোকচরিত্রে আমার অভিজ্ঞতা কম নয় জানবেন। তবে এডুকেটেড বেঙ্গলের অ্যাজিটেশন—ইট্স্ ইন্ দি উইণ্ড। এ হাওয়ার তোড় ঝড়ে দাঁড়াবে কিনা, দেখবার জন্য আমি বেঁচে থাকব না। যাক্, ইট্স্ নাইদার হিয়ার, নর দেয়ার। অন্দরের দিকে তাকিয়ে নিভাননীকে উদ্দেশ করে বলেন,—নিভ্-এর মতো একটি মেয়ে ছিল আমার। আর্মি অফিসারের সাথে বিয়ে হয়েছিল। নর্থওয়েষ্টে একটা রাইজিংএ মোম্যাদ দস্যুর হাতে দুজনেই প্রাণ দেয়। তাই তো রণছোড় সিং যেদিন বলেছিল কনখলকে স্যাণ্ডহার্ষ্টের জন্যে সুপারিশ করতে, আমার মন সায় দেয়নি।

মোটা বুরুশের মতো ভুরুর তলায় চোখ দুটো বোধ হয় ছলছল করে ওঠে। গলাও যেন ধরে আসে। কিন্তু সাহেবকা বাচ্চা—আধ মিনিটেই স্বাভাবিক হয়ে যান।

—ওয়েল নিভ্, ওয়েল বাগচি—চলি এবার। জানুয়ারী থেকে নিজের এলাকায় গিয়ে রাজত্ব করবে আর কি! কিপ্ এ ক্লিয়ার হেড্—গুড্ বাই।

হারুণ ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে। ঘোড়ায় উঠে ধীর কদমে হ্যাসেট বেরিয়ে যান। মেয়ে জামাইয়ের উল্লেখের সময় সাহেবের গলা ধরে আসা কারোরই নজর এড়ায় নি। বৈঠক আর জমে না। এতগুলো সুখবর তারিয়ে তারিয়ে চাখ্বার মনোভাবও যেন উবে যায়।

এক বোঝা গোঁফ ও কটা চামড়ার তলায় একটি অতি সাধারণ পিতার স্নেহপ্রবণ মনের কাতরতা সবায়েরই মর্মস্পর্শ করে। বাগচি ভাবপ্রবণ মানুষ—চশ্মা মুছবার অছিলায় চোখের ছলছলানি আড়াল করেন।

হঠাৎ প্যারীবাবুর বাড়ীর দিক থেকে কান্নার রোল ওঠে।

২৩

জীবনটাই নাটক। প্যারীবাবুর বিপন্মুক্তির খবর নিয়ে নিভাননী যখন ও বাড়ীর দিকে পা বাড়ান, তখনই কান্নার রোল ওঠে। বাইরে কর্তারা, আশে পাশের বাড়ীর লোকজন, সবাই যখন পৌঁছল, প্যারীবাবু তখন সমস্ত সুসংবাদ দুঃসংবাদের অতীত। তাঁর প্রাণহীন দেহ বিছানায় পড়ে আছে। মাথার কাছে ছেলে জীবন আর পায়ের কাছে ঊষা কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

জীবিত প্যারীবাবু যার কাছে যতো শ্বেষবিদ্রূপের পাত্রই হোন্ না কেন, মৃত্যুর দৌত্য তাঁকে সাময়িক সমবেদনার যোগ্যতা অর্পণ করে। প্রাথমিক ফিস্ফাস্, জিজ্ঞাসাবাদের পর ডাক্তার ডাক্তে যায় একজন। প্রকাশদেরও খবর দেওয়া হয়। প্রচারক পরেশবাবুর নির্দেশে নিভাননী ঊষাকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে যান। হরেনবাবুর স্ত্রী নির্মলাও এসে যান। নির্বাক সান্ত্বনার স্পর্শ ছাড়া আর কি দেবারই বা আছে তাঁদের, ঊষারও অঝোরধারে কেঁদে বুক হালকা করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

মিনিট পনেরোর মধ্যে লোকের ভীড়ে বাড়ী ভর্তি হয়ে যায়। প্রমোদবাবু, সরকারী ছোট ডাক্তার, পরীক্ষা করে বলেন—পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন, তারই জের। আক্রমণ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যেতে হার্টফেল করেছে।

শেষকৃত্যের সামাজিক ফৌজ যেন প্রস্তুতই থাকে। প্রকাশ তাদের দলপতি। পারিবারিক পুরুতঠাকুরের আগমন হয়। যথাচার মাঙ্গলিকাদি সেরে-সুরে তিনি বিদায় নেন। মহিলারা ছাড়া ও বাড়ীতে কেউ আর থাকেন না। বাগচির বারান্দার বৈঠক সেদিন আবার বসে। কিন্তু হাস্যপরিহাস আলাপ-আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে না। সবায়ের মনে একটা যেন থমথমে ভাব। আকস্মিক মৃত্যুর আবির্ভাব আজ প্যারীবাবুকে যেন শ্লেষ ব্যঙ্গের নাগালের বাইরে নিয়ে যায়—বাগচির মনে কবেকার পড়া কবিতার কথাগুলো উঁকিঝুঁকি দেয়, মৃত্যুর প্রসঙ্গে,—

'তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে;
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে?'

বাগচির মনে হয় দিল্লীর দরবারে হাজিরা দেবার উমেদারী করবার একটি লোকের অভাব ঘট্ল। ঠকিয়ে ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা আদায় করবারও। এখন যেখানে লোকটিকে হাজিরা দিতে হবে সেখানে ঠক্বাজী চলবে কিনা জানা নেই বাগচির। প্যারী-চরিত্রের নিন্দনীয় দিকগুলো মনে আসায় দুঃখিত হন বাগচি। মানুষ নিছক শয়তানও নয়, নিষ্কলুষ দেবতাও নয়। ভাবতে চেষ্টা করেন সদ্যমৃতের মধ্যে কোলো প্রশংসনীয় দিক ছিল কিনা।

ছেলের দল, মানে অমৃত, ব্যাঙা, কনখল, গেটের ধারে কামিনীফুলের গাছতলায় বসে জটলা করে। রাস্তার ও-পাশের বাড়ী থেকে বিদ্যাভূষণের ছেলে অমূল্য এসে পাশে বসে। অমূল্য যদিও প্রকাশের দলের একজন বড় তল্পিদার, কিন্তু বামুনের ছেলে হয়ে কায়েতের শ্মশানযাত্রায় যোগ দেয়নি। নিজস্ব মতামত কিছু গড়ে উঠ্তে পায়নি, বাবা পছন্দ করবেন না, তাই। তা না হলে অমূল্যের নিজের যাবার ইচ্ছে ছিল। সমাজ-শাসনের ফাঁস কেটে তরুণ মনগুলো উঁড়ি উঁড়ি করতে সুরু করেছে, কিন্তু ব্যাধের সজাগ পাহারা এড়ানো দুঃসাধ্য।

স্বজনবিয়োগ বিষয়ে ওদের মধ্যে ব্যাঙা ওয়াকিবহাল। কিছুদিন আগেই ওর বাবা মারা গিয়েছে। যদিও হাসপাতালে, তবুও মায়ে ছেলেতে অনেক কেঁদেছে ওয়া। ওই নতুন মাসী সেদিন ব্যাঙার চোখের জল মুছিয়েছেন, জটিলাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। মনে পড়তে ব্যাঙা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে। অন্য ছেলেরা বোকার মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিমর্ষ-ভাবে বসে থাকে। শুধু অমৃত একটু করিৎকর্মা, কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করে বলে,—প্যারীবাবু এবার কোথায় যাবে রে, স্বর্গে, না নরকে?

সদ্য সদ্য মৃত্যুর উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলো অকরুণ মনে হয় কনখলের। গালগল্পের যমরাজা দূত পাঠিয়ে মানুষের আত্মাকে নিয়ে যান। বৈতরণী নদী পার হয়ে দুটো দরওয়াজা। একটা স্বর্গের, একটা নরকের। বেঁচে থাকার সময় যে যেমন ভালো মন্দ কাজ করে তারই বিচার করে খুলে দেওয়া হয় একটা দরওয়াজা। প্যারীবাবুর ভাগ্যে নিশ্চয়,—নাঃ। ভাবনা ভুলতে চায় কনখল। বলে,—তোর বাবা ত বীর ছিল, নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না করে ডাক্তার সাহেবের মেম আর বাচ্চাদুটোকে বাঁচাতে গিয়েছিল, আমাকে ত বাঁচিয়েই ছিল—তোর বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছে।

ব্যাঙা ধরা গলায় বলে, কিন্তু বাবা যে চুরি করত। চুরিকরা ত পাপ,—

—পাপ না ছাই। কাজকর্ম না থাক্‌লে, ঘরে কিছু খাবার না থাক্‌লে চুরি করায় পাপ হয় না। হরেন কাকাদের সাথে বাবা একদিন গল্প করছিলেন, শুনেছি।

অমূল্য গীতা সোসাইটির পান্ডা। বাংলায় গীতার ব্যাখ্যা অনেক শুনেছে। বলে,—ঠিক্‌ই ত। মানুষ মারা ত পাপ?—কিন্তু কেষ্টঠাকুর অর্জুনকে মানুষ মারতে বলেছেন, অবিশ্যি ধর্মযুদ্ধে। প্রাণ বাঁচানো ত ধর্ম, তা'হলে খিদের সাথে যুদ্ধও ধর্মযুদ্ধ। ব্যাঙার বাবা কিচ্ছু পাপ করেনি।

ব্যাঙার বাবার স্বর্গবাস সম্বন্ধে অতঃপর কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না। প্যারী-বাবুর বর্তমান আবাস সম্বন্ধে মত প্রকাশে বিরত থাকে ছেলেরা। অপাপবিদ্ধ মনের সহজাত সৌজন্যবোধ কটুচিন্তা নিবারণে সাহায্য করে।

খিড়কির পাশ দিয়ে নিভাননীকে বাড়ী ফিরতে দেখা যায়। ব্যাঙা আর কনখল বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। অমৃত অমূল্যও উঠে পড়ে। বারান্দায় বড়দের বৈঠক তখনো চলে। প্রচারক পরেশবাবু, আর জাফর ডাক্তারও এসে গেছেন। আয়েষা, বা তার মা, আসেননি। হুট্ করে আয়েষা আজকাল আর কোথাও যাওয়া আসা করে না। বিবি রোজমেরীর স্কুলে যাওয়া শুধু আশ্বাসের আগ্রহে বজায় আছে। ইংরেজী চালে ঘরকন্না চালানো আর সমাজে চলা-ফেরার কায়দা কানুন শেখাচ্ছেন ফ্লোরেন্সবিবি, পাদ্‌রী নিকলসনের প্রৌঢ়া কুমারী বোন। গিন্নিবান্নি অথবা বয়স্কা সহচরী ছাড়া অনাত্মীয়সমাজে আত্মপ্রকাশ নিষিদ্ধ। সাহেব-মেমেরা পদে পদে বাধানিষেধের ধমক থেকে মুক্ত, এই মনে হত কনখলের। কিন্তু ওরে বাবা, পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা নৌকোর পালের মতো ফাঁপা ঘাগরা, পুরো হাত আস্তিনফুলো

আঙরাখা, আর বালিশের কুঁচি দেওয়া থুতনীবাঁধা টুপী পরা ফ্লোরেন্সবিবি যেন একটি মূর্তিমতী হৃৎকম্প। হ্যাসেটের মতো ভারিক্কী সাহেবের একটুও বেচাল হবার সাহস নেই তাঁর সামনে। তার ওপর চোখ দুটো ইঁদুরের চোখের মতো পিট্‌পিটে, ওপর ঠোঁটে পরিষ্কার গোঁফের রেখা। কনখলের মনে হয়, গাঁয়ের সেই রেফের মতো টিকিওয়ালা বিটেল ঘটক পণ্ডিত কোথায় লাগে এর কাছে।

নিজের ঘরে ঢুকে দেখে দুজনের মতো বিছানা পাতা হয়েছে। মায়ের বালিশ চিনতে দেরী হয় না। মনে মনে খুশী হলেও মুখে বলতে চায় না কনখল। গিয়ে মাকে বলে,—এর দরকার কি ছিল মা, আমি কি একা শুতে ভয় পাই?

—ভয় কিসের? কনখল ত মস্ত বীর। যদি আমিই ভয় পাই, তাই আগেভাগে একজন বীরপুরুষের কাছে শোবার ব্যবস্থা করলাম। বলে হাসেন নিভাননী।

মুখের মতো জবাব জোগায় না কনখলের। একটু থতমত খেয়ে বলে—আচ্ছা, মা, প্রকাশদারা ত চাদর মুড়ি দিয়ে জীবনের বাবাকে নিয়ে গেল। তারপর কি করবে?

—নদীর ঘাটে নিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

—একটা মানুষকে পোড়াবে?

—প্রাণ থাকা পর্যন্ত মানুষ, এখন ত ওটা শুধু দেহ, প্রাণহীন দেহ। দেখিসনি, ওই বাদামগাছটা যখন ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেল, ওটাকে কাটিয়ে কুটিয়ে আমরা জ্বালানীকাঠ করলাম। ওটা ত আর গাছ রইল না,—যতক্ষণ শিকড় দিয়ে মাটির রস টানতো, ফুল ফোটাতো, ফল ফলাতো, ততদিন ওটা জীবন্ত একটা গাছ ছিল। কিন্তু ভেঙে পড়ে শুধু কাঠ হয়ে গেল।

তত্ত্বকথা বোঝে না কনখল। কিন্তু উপমার উপযোগিতা অনুধাবন করতে পারে। মানে বোঝার থেকে তুলনার ইঙ্গিত সহজে প্রবেশ করে শিশুমনে। কিন্তু মনের গোপন কুঠ্রীতে একটি তার্কিকও বাস করে। সময়ে অসময়ে সেও মাথা চাড়া দিতে চায়।

—তা যেন হোলো। তবে সাহেবরা আর মুসলমানেরা না পুড়িয়ে কবর দেয় কেন কেউ মরে গেলে?

এইবার জবাব না জোগানোর পালা নিভাননীর। কিন্তু শিশুমনের কৌতূহল সাধ্যমত মেটানো উচিত। তিনি বলেন,—তোরা ত ভূগোল পড়েছিস। এই পৃথিবীর তিন ভাগ জল, একভাগ মাটি। হিন্দুরা নিষ্প্রাণ দেহ পুড়িয়ে, ছাই করে, নদীর জলে মিশিয়ে দেয়। যারা হিন্দু নয়, তারাও ফেরৎ দেয় মৃতদেহ পৃথিবীকে—তবে জলে নয়, মাটিতে পুঁতে। ঐ যে মরা গাছের কথা বলেছি—যদি আমাদের মতো কেটে কুটে ঘরে তোলবার কেউ না থাক্‌ত, তবে ও গাছটাও একদিন মাটিতে মিশে যেত। এই পৃথিবীতে যাদের সৃষ্টি, তারা বেঁচে থেকেও পৃথিবীর, মরে গিয়েও পৃথিবীর।

এ সব কথা দুর্বোধ্য হয়ে আস্‌ছে কনখলের পক্ষে, বোঝেন নিভাননী। কিন্তু নিজের চিন্তাধারার খেই ছাড়তে পারেন না। বলে চলেন, পৃথিবীতে যারা জন্মে,—সব রকমের মানুষ, পশু, পক্ষী, গাছপালা,—সবাই সবায়ের ভালোর জন্যে বেঁচে থাকে। নিজের প্রাণ দিয়ে, দান দিয়ে, কাজ দিয়ে, পৃথিবীকে সুন্দর করে রাখে। প্রাণ শেষ হয়ে গেলে আবার পৃথিবীতে ফিরে যায়—এক হয়ে যায় জল মাটি রোদ হাওয়ার সাথে।

কনখল এত কথার তাৎপর্য বোঝে না। আভাসে শুধু বোঝে, বেঁচে থাকার সাফল্য শুধু প্রাণ দিয়ে, দান দিয়ে, কাজ দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর করা। কিন্তু ঘুম পায় যে। বলে, —মা, খেতে দেবে না?

নিভাননীর সম্বিৎ ফেরে। বলেন,—তাই তো—তোর সাথে গল্প করতে গিয়ে কত রাত হয়ে গেল দ্যাখ্। বাইরের বৈঠক ত এখ্খুনি ভাঙ্বে বলে মনে হয় না। বাবার খেতে আজ দেরী হবে। চল্, তুই আর ব্যাঙা খেয়ে নিবি চল্।

ব্যাঙা, বাপ মরা অবধি এ বাড়ীতেই থাকে। তাকে ডাক দিয়ে, কনখলের হাতধরে নিভাননী, রহমতের রসুইখানার দিকে এগোন।

জয়ন্তী পাহাড়ের হিমেল হাওয়ার হিল্লোল সে রাত্রে সমস্ত শিলেট সহরকে অনড়, অবশ করে বইতে থাকে। শুধু লেপের তপ্ত সুকোমল আলিঙ্গনের মধ্যে একটি ছোট্ট মন স্বপ্নরাজ্যে জাগে। পৃথিবী তো নিজেই কতো সুন্দর, ভাবে সেই মন। তবে কি তাকে আরো সুন্দর, অনেক সুন্দর করতে হবে, প্রাণ দিয়ে, দান দিয়ে, কাজ দিয়ে? বেঁচে থাকলে তাই-ই করতে হবে। আর মরে গেলে? আবার পৃথিবীর বুকেই ফিরে যেতে হবে। যেন একটা গুরুতর সমস্যার সমাধান পেয়ে মন আশ্বস্ত হয়। স্বপ্নরাজ্যে যে সব ঘুমপাড়ানীরা থাকে, তারাই ভার নেয় ছোট্ট মনটাকে ঘুমপাড়াবার। অসাড়ে মায়ের সান্নিধ্য অনুভব করে কনখল; তারপর এক সময় ঘুমে অচৈতন্য হয়ে যায়।

সকালে ঘুম ভেঙে মা'কে দেখতে পায়না কনখল। অনভ্যস্ত ঠেকে না, মা ত রোজ শোয় না তার পাশে। তড়াক করে উঠে জুতোজামা পরতে পরতে রাত্রের কথা মনে হয়। মা নিশ্চয় নতুন মাসীর ওখানে গেছেন। কনখল ঘর-বারান্দায় গিয়ে ব্যাঙাকে উঠিয়ে দেয়, বলে—আস্তাবলে আয়।

কি কুয়াশা! রাতের অন্ধকারের বাসিন্দা হিমেরা যেন আসন্ন সূর্যোদয়ের আশঙ্কায় পালাই পালাই করছে, কিন্তু তাদের ঘন ধূম্রনিশ্বাস তখনো চারদিক অস্বচ্ছ আবরণে ঘিরে রেখেছে। একহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। ওদের গোল্লাছুট খেলার মাঠ যেন একটা ছোটখাটো দীঘি; দুটো একটা লম্বা গাছের ডগা, একটা বকফুলের আর একটা তেজপাতার—মাথা জাগাচ্ছে অথই গাঙে অদৃশ্য নৌকোর মাস্তুলের শীষের মতো। চেনা পথে আস্তাবলে পৌঁছে যায় কনখল। হারুণ আগেই এসে গেছে। কাঞ্চন লেজের বালাম দুলিয়ে ঘাড় কাৎ করে যেন চোখ ঠারে, তারপর ঠোঁট কাঁপিয়ে হাসি হাসি মুখে মৃদু হ্রেষাধ্বনি করে সুপ্রভাত জানায়।

ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে যায়। পূবের দূর বড়ো জঙ্গলটার দৈত্যের মতো বিরাট প্রহরী গাছগুলোর পেছন থেকে টক্‌টকে লালমুখো দুষ্টু ছেলে সূর্যের উঁকি জেগে ওঠে। কি চট্‌পটে ঐ সূর্যটা! উঁকি দিতে না দিতেই গাছের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে একলাফে এগিয়ে যায়। কিন্তু নির্মেঘ নীল আকাশের বিস্তারে পা দিয়ে গতিবেগ শ্লথ করে। যেন দুষ্টু ছেলের মতোই মজা করে বলতে চায়,—আর ধরবি আমায়? ধর না।

পরাস্ত পৃথিবী পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মাখে না। সদ্য নিদ্রোত্থিতের সুপ্রসন্ন নেত্রোন্মীলনে সকৌতুকে নবজাত আলোক শিশুর দিকে চেয়ে থাকে।

কাঞ্চনের দলাইমলাই শেষ হওয়া পর্যন্ত আজ আর অপেক্ষা করে না কনখল। ব্যাঙা আসতেই বলে,—চল, বেড়িয়ে আসি। দু'জনে রওনা দেয় শাহজলালের দর্গা মুখো। রাস্তা নিরালা। এক আধটা বাংলো বাড়ী অনেকটা ঘেরাও জমির মধ্যে জবুথুবু বুড়োর মতো পিঠ কুঁজো করে উবু হয়ে বসে। কোনো কোনো বাড়ীর হাতায় সবে মরসুমী ফুলের প্রথম স্তবক ফুট্‌তে সুরু করেছে। রসুই ঘরের চোঙা দিয়ে উনুনের ধোঁয়া উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে কোথাও। আস্ঠাঘরের ময়দানে নিকারবোকার পরা বুড়ো এণ্টনী সাহেব বিরাটকায় এক

কুকুরের রাশ ধরে বেঁকে পড়ে ছুটছেন। ওঁর নাতনী জুলিবাবাও আর একটা মাঝারী-গোছের সাদার ওপর কালো ফুট্‌ফুট্‌ ছাপ দেওয়া কুকুরের সাথে খেলছে একটা লাল বল ছুঁড়ে দিয়ে দিয়ে। কনখল শুনেছে বুড়োর কুকুরটা গ্রেট ডেন, আর জুলিরটা ডালমেশিয়ান। কুকুর দেখতে ওর বেশ লাগে, কিন্তু পুষবার আগ্রহ এখনো মনে জাগেনি।

দূর থেকে দর্গার মিনার চোখে পড়ে, কিন্তু কনখল জানে এখনো অনেকটা রাস্তা। আজকের বেড়াতে বেরোনো অনির্দেশ লক্ষ্যে। কালকের মৃত্যুর কালো ছায়া ওর মনকে আদৌ অভিভূত করেনি। মা'র সঙ্গে কথা বলে মন আরো পাৎলা হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর শোকের দিক মনে একেবারে রেখাপাত করেনি, তা নয়। নতুন মাসীকে কাঁদতে দেখেছে, জীবনকে কাঁদতে দেখেছে, পাড়ার গিন্নী-বান্নির, এমন-কি মা'র পর্যন্ত চোখে জল দেখেছে। একজন ছিল, সে নেই, এতে কষ্ট কার না হয়? কিন্তু প্যারীবাবু বেঁচে থাকতেও ওদের কাছে আকর্ষণের বস্তু ছিলেন না, মরে গিয়েও অভাববোধের তীব্রতা সঞ্চার করে যাননি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সাথে প্রথম পরিচয় যেন অকরুণ অপরিচয়ের ছদ্মবেশে, দেখা দিয়ে গেল। জাগ্রত-জীবনের বিজয় অভিযানের মন্ত্র কানে দিয়েছেন নিভাননী, শিশুসত্ত্বায় সেই বোধ কাজ করে।

হঠাৎ ব্যাঙা চেঁচিয়ে ওঠে—দ্যাখ দ্যাখ—ছাগলটার বাচ্চা হচ্ছে। কিন্তু ও কি-রে, খুব কষ্ট পাচ্ছে যে।

বাচ্চা অর্ধেক বেরিয়েছে, কিন্তু পুরো বেরিয়ে আসছে না। ছাগল ঘাড় বেঁকিয়ে আধ-বেরোনো বাচ্চাটাকে যেন চাটবার চেষ্টা করছে।

কনখল এ দৃশ্য আগে দেখেনি। ও ভয় পেয়ে যায়। বলে—তবে কি হবে ভাই, বাচ্চাটা কি মরে যাবে?

ব্যাঙা বলে,—দাঁড়া, দেখি। একলাফে ব্যাঙা গিয়ে কোল পেতে বসে বাচ্চার দিকে। ছাগলের পেটে পিঠে হাত বুলোয়। খানিক পরে সুন্দর নধর একটি ধবধবে ছাগলছানা ভুঁয়ে পা দিয়েই থরথর পায়ে নাচ্‌তে কুঁদতে চেষ্টা করে, কিন্তু পড়ে পড়ে যায়। মা-ছাগল বাচ্চার গা চেটে দেয়।

ব্যাঙার জামা কাপড়, গা হাত পা, স্রাবে রক্তে একাকার হয়ে যায়। কনখল বলে,—কি করবি এখন?

—কি আর করব, চল বাড়ী ফিরে যাই।

—ওই বাচ্চাকে একা একা রাস্তার ধারে ফেলে?

—আরে, ওর মা'ই ত রয়েছে। মা থাকতে বাচ্চা কখনো একা হয়?

দু'জনায় বাড়ীর দিকে ফেরে। এবারে হনহন করে চলে। ব্যাঙাকে গিয়ে চট্‌করে ছাপছন্দ হতে হবে। ও-পাশের পেঁপে গাছওয়ালা বাড়ীর দাওয়ায় এক বুড়োকর্তা কলকেয় ফুঁ লাগাচ্ছিলেন, তিনি আপন মনে বিড়বিড় করেন—ভাবার্থ তার এই যে এ সব চ্যাংড়া লজ্জা-হায়ার মাথা খেয়েছে—এই বয়সে প্রসবের মতো একটা দূষ্য ও গোপনীয় ব্যাপারে মাথা গলাতে এসেছে, সমাজে শ্লীলতা ভব্যতা আর কিছু রইল না। অপরাধী দু'জন ততক্ষণ এ সব মন্তব্য শোনার পাল্লার বাইরে।

যেতে যেতে কনখল বলে—বাচ্চা হওয়া আগে কখনো দেখিনি ভাই। কিন্তু মা'টা কি কষ্ট পাচ্ছিল।

ব্যাঙা পোখ্‌পাখালী জীবজন্তুর জগতে বেড়ে ওঠা ছেলে—সৃষ্টি রহস্য নির্দোষভাবে সব জানা ওর। বলে,—আরে সবায়েরই বাচ্চা ঐ ভাবেই হয়, তাই বলে মা কি কষ্টের কথা

মনে রাখে? গরুর বাচ্চা হবার পর যাস্ ত বাচ্চার কাছে—অ্যায়সা শিং বাগিয়ে আসবে তেড়ে গরুটা—পালাতে পথ পাবি না।

ফিরতি পথে প্রচারক পরেশবাবুর সাথে দেখা হয়ে যায়। ব্যাঙার রক্তাক্ত পরিচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওঁর। পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা শুনে গম্ভীর হয়ে যান তিনি। প্রজনন ক্রিয়ার একাংশের সাথে অপরিণতবয়স্কের সাক্ষাৎ পরিচয় যেন তাঁর সমর্থন লাভ করে না। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি পদচালনা করেন। ব্যাঙা বলে—দেখ্‌লি, বুড়ো কেমন গোমড়া মুখো হয়ে গেল সব শুনে? জানিস্, বড়োরা সব আড়াল করতে চায় আমাদের কাছ থেকে।

আড়াল করার কি আছে এতে, মাথায় ঢোকে না কনখলের। পরেশবাবুর স্বভাবসিদ্ধ উদারতার অভাব ওর চোখ এড়ায় না।

সব মা'দেরই ত বাচ্চা হয়—পাখী মা, পশু মা, এমন-কি মানুষ মা'দেরও। তা না হলে ও নিজে হল কি করে? কিন্তু ঐ যে ব্যাঙা বলল, একভাবেই সবাই হয়? তবে কি সেও—ধেৎ! কেমন কান্না কান্না পায় কনখলের। ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না। রহস্য উন্মোচনের অনুসন্ধিৎসা থেকে মনকে সবলে নিবৃত্ত করতে চায়।

বাড়ী ফিরে ব্যাঙা চলে যায় পুকুরঘাটে। তার বিপর্যস্ত বেশবাস, ও গোপন পদ-বিন্যাস, খানা কামরার জানালা দিয়ে নিভাননীর চোখে পড়ে। কনখল এসে অভ্যস্ত চেয়ারে বসে। মা'র দিকে কেন যেন নিঃশঙ্ক সহজ চোখে তাকাতে পারে না। এ বৈলক্ষণ্যও নিভাননীর চোখ এড়ায় না। কিন্তু কিছু বলেন না তিনি। নেহাৎ মামুলী পদ্ধতিমাফিক খাওয়া সেরে কনখল নিজের ঘরে চলে যায়। পড়ার বই খুলে বসে বটে, কিন্তু মন থেকে থেকে বিভ্রান্ত হয়ে নানা দুরধিগম্য রহস্যের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খায়।

বাঁধাধরা ছকে দিনমান কাটে। সন্ধ্যের পর মা'র কোলে মুখ গুঁজে মনোভার লাঘব করে কনখল। নিভাননী চকিত হন, হয়ত চিন্তিতও। কিন্তু কে যেন ভেতর থেকে তাঁকে উত্যক্ত বা সন্ত্রস্ত হওয়া থেকে নিবারণ করে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছেলের মাথার চুলে আঙুল চালান। তারপর আস্তে আস্তে বলেন,—সব জিনিস কি সব বয়সে শিখতে পারা যায়? দেখা যায়, হয়ত কিছু কিছু বোঝাও যায়, কিন্তু জানতে হলে বয়েস হওয়া চাই, বিদ্যেবুদ্ধি বাড়া চাই।

কোল থেকে মুখ তুলে কনখল টল্‌টলে চোখে হরিণবাচ্চার মতো মা'র মুখের দিকে তাকায়। মা তার দিকে চেয়ে নেই। আপন মনেই বলে যান নিভাননী—চোখকান মেলে চললে কত কি নতুন জিনিস চোখে পড়বে। কিছুটা জানা, খানিক আধজানা, আর অনেক অজানা। আমার কংখ্ আমার কাছে জানতে চাইলে আমি সব বুঝিয়ে দেব। যতটা বুদ্ধিতে বেড় খাবে, ততটা।

এর পর সমস্ত প্রসঙ্গটা লঘু করে হেসে বলেন—বাবা কি করে আপিসের কাজ করেন, বললে কি তুই বুঝ্‌তে পারবি? হরেনবাবু মামলা লড়েন আইনের জোরে, সে সব আইনকানুনের মার প্যাঁচ কি তোর মাথায় ঢুকবে? কলের গানে কত মানুষের গলার আওয়াজ শুনি আমরা, কি করে একখানা কালো চাক্‌তির ভেতর সে সব আটকা পড়ে আছে তার কৌশল কি ঝট্ করে বললেই বোঝা যাবে? কতো দেখতে হবে, শুনতে হবে, পড়তে হবে, আর অনেক বড়ো হতে হবে—তবে তো! আচ্ছা, তুই এবার ইস্কুলের পড়াশুনা নিয়ে বোস্—আমি একবার নতুন মাসীর খবরদারি করে আসি।

নিজের ঘরে এসে খাতাপত্তর খুলে বসে কনখল। পড়াশুনায় মন বসে না। আকাশ-

পাতাল ভাবে—দানা বাঁধে না কোনো ভাবনা। মেঝেতে ব্যাঙা খোলা মোমবাতির সামনে বসে পড়ছে, ও পাশে রহমৎ আধভাঁজ করা কম্বলে বসে হাঁটুমুড়ি হয়ে ঝিমোচ্ছে। বাইরের বৈঠকের আলাপচারীর আওয়াজ কানে আসে—শুধু অর্থহীন শব্দ। মন চায় না সে সব কথার মানের পেছনে ছুটতে। কালকের মরণ, আর আজকের একটা জন্ম, মনের ভারসাম্যে দোলা দিয়ে গেছে, মন দুল্ছে বারান্দার দেয়ালঘড়ির ঝুলনচাক্তির মতো এদিক ওদিক, তাকে স্ববশে এনে স্থির করতে পারে না কনখল। ছেঁড়াছুটো টুক্রো ছবির মতো কত কি দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠ্তে থাকে। ক্লান্ত মাথা হাতে ভর দিয়ে চোখ বোজে কনখল, সদ্যজাত ছানাটার যখন গা চাট্ছিল ছাগলটা—কী নিবিড় স্নেহে তার চোখ দুটো অর্ধ-স্তিমিত হয়ে আস্ছিল, শুধু সেই ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে ভেসে ওঠে।

২৪

জিজ্ঞাসা একটা ঘূর্ণির মতো। কী, কেন, তবে, তাহলে? একটার পর একটা পাক খেয়ে ঘোরে মনের মধ্যে; সে আবর্তের যেন কোনো শেষ নেই। অন্তর্লোকে জেগে উঠ্ছে, আর এক কনখল, যে কেবল জিজ্ঞাসার জালে জড়িয়ে পড়ছে। বাইরের কনখল আগের মতোই হাসে, খেলে, খায়-দায়, স্কুলে যায়, কিন্তু থেকে থেকে অন্তর্মুখী হওয়ার বিড়ম্বনা এড়াতে পারে না। এই সদ্য উন্মেষোন্মুখ দ্বৈতসত্ত্বার ঘাতপ্রতিঘাত নিভাননীর সজাগ চোখ এড়ায় না, যতক্ষণ কাছে থাকে, ব্যাকুল অভিনিবেশে ঘিরে রাখেন ওকে। মনকে চিরাচরিত সংস্কার থেকে মুক্ত করতে চান, ছেলের মনে যে আর একটা মানুষ জাগ্ছে তাকে শাসন বন্ধনহীন মুক্ত হাওয়া-বাতাসে বিচরণ করতে দিতে চান। খাওয়া-শোওয়া বেশ-ভূষার কড়াকড়ি শিথিল করেন না আদৌ, কিন্তু শেখবার, জানবার কৌতূহল অবারিত হাতে মেটাতে চান।

ধোঁকা লাগে। সব কি ঐটুকু ছেলেকে খোলাখুলি বলা যায়? তাই যখন কনখল ওঁকে শুধোয়—আচ্ছা মা, শুধু মা'দেরই বাচ্চা হয়, বাবাদের হয় না কেন? হক্চকিয়ে যান নিভাননী। আঁচে বোঝেন, সেই সেদিনকার ছাগলছানার জন্মকথা ছেলেমহলে অনালোচিত থাকেনি। নানান বয়সের, নানান ঘরের ছেলেরা একসাথে ঘোরাফেরা করে। বয়স্ক কারো কাছে কিছু শুনেছে কনখল, কিন্তু বোঝেনি কিছুই। এ প্রশ্ন তার নিষ্পাপ সরল মনের অদম্য জ্ঞানপিপাসা মাত্র। ফুলের রেণুর উদাহরণ, মৌমাছি প্রজাপতির দৌত্য, এই সব মনোরম আখ্যায়িকা ফেঁদে তখনকার মতো প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যান ছেলের মন। কিন্তু বোঝেন, শক্ত পরীক্ষা সাম্‌নে। কোন্ দুর্ভেদ্য বর্মে এ দুর্বার প্রশ্নবাণ ব্যাহত করবেন ভেবে আকুল হন। বাগচি শিক্ষায় আহারে বিহারে বেশভূষায় সংস্কারমুক্ত, হয়ত কিছুটা বা মননেও। কিন্তু সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে এ সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় অপরিণতমস্তিষ্ক অপ্রাপ্ত-বয়স্কের সাথে রাজী হবেন কিনা, সন্দেহ জাগে তাঁর মনে। আধুনিকতার তবকমোড়া বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে একটি সাবেকপন্থী নীতিবিদ বাস করে বাগচির অন্তরে, তার কাছে এ সমস্যার কোন সমাধান পাওয়া যাবে না। নিভাননীর মনশ্চক্ষুতে দেবপ্রতিম হাজী সাহেবের জ্যোতির্ময় মুখ জাগে। তাঁর কাছেই পথনির্দেশ নেবেন তিনি, সেই সত্যসন্ধ ঋষিপ্রতিম জ্ঞানীর কাছ থেকে।

সান্ধ্যনামাজের পর যখন হাজী সাহেব একা পায়চারী করেন চবুতারার ধার দিয়ে

বাঁধানো রাস্তায়, নিভাননী এসে পৌঁছে যান। বাগচি আর কনখল জাফর ডাক্তারের বাড়ী গেছে, উনিও ফিরবেন সেখানে। আশীর্বাদ বর্ষণ করে হাজী সাহেব বলেন,—মা'কে উতলা দেখছি যেন? মন অশান্ত হয়েছে বুঝি?

শোনেন নিভাননীর সমস্যার কথা। কালেজী তক্‌মা না থাক্‌লেও তাঁর নিভা মা সুশিক্ষিতা, জানা ছিল তাঁর। যে প্রশ্নের খোলাখুলি আলোচনা করতে এসেছেন আজ, জানতে পেরে মনে মনে তারিফ করেন। যেন একজন সমবয়সী সতীর্থের সাথে কথা বলছেন, তেমনিভাবে বলেন,—বেশ ত, এ বিষয়ে কি জানতে চাও তুমি?

—যে বিষয় আমাদের দেশে পরমবন্ধুরাও নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা করে না, মা হয়ে আমার ছোট ছেলের সাথে কি বলব আমি তার সম্বন্ধে, এইটুকু বুঝে উঠি না বাবা।

নীরবে পুরো এক চক্কর পাক দেন দু'জনায় চবুতারা ঘিরে। তারপর হাজী সাহেব যেন আপন মনেই বলে যান—মূল দোষ দেশের শিক্ষাপদ্ধতির। বাড়ীর, স্কুলের, সঙ্গী-সাথীর। অনাবিল শিশুমনে প্রথম প্রবৃত্তি জাগে লোভ আর রাগ। খাবার চুরি, ফুল চুরি, ছবি চুরি নিজের অজান্তে করে বসে ছেলেরা। শাস্তি পায়, শিক্ষা পায় না। রাগারাগি মারামারিও ঐ এক ফল। মনের সাহচর্য দিতে কেউ এগিয়ে আসে না। না বাপ-মা, না গুরুমশায়েরা। শাস্তিতে ত শুধু ভেতরে ভেতরে জেদ জমে ওঠে। একটু অনবধান হলেই আবার বিচ্যুতির রাস্তায় পা বাড়ায়। বানের জল যেমন বালির বাঁধ মানে না। তোমার আজকের বিষয় কিন্তু শিশুর বেলায় কোন কুপ্রবৃত্তি সঞ্জাত নয়। নিছক কৌতূহল। গোপন আড়ালের সাথে প্রথম পরিচয়ের দ্বিধা-ভয়-আগ্রহ মেশা। বয়স বাড়ার সাথে এ জিজ্ঞাসা প্রবল প্রবৃত্তির রূপ নেবে, যদি না এখন থেকে ঘোলা মনকে তরল করে দেওয়া যায়। সহজ সরল ভাষায় ওকে খুলে বলতে হবে প্রশ্নের উত্তর—মায়ের আবেগ ভালোবাসা মিশিয়ে নয়, অনাত্মীয় অথচ মঙ্গলকামী গুরুর মতো। পারবে?

—কিন্তু—

—বলছি। শক্ত হতে হবে নিজেকে। দূষ্য জিনিসের কোনো সহজাত আকর্ষণ নেই শিশুমনে। অজ্ঞতায় তার উদ্ভব, পারিপার্শ্বিকে বৃদ্ধি। কুশিক্ষা আর মূঢ় বাধা তাকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় মাত্র। জ্ঞানবিজ্ঞানের আর পাঁচটা কথার মতো স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে হবে। বয়স যত বাড়বে, পরিচয়ের বিস্তারও বাড়বে। কুৎসিত ইঙ্গিতের কিম্বা অশ্লীল দৃষ্টান্তের অপ্রাচুর্য হবে না কোনো দিন। কিন্তু আজকের নির্ভীক শিক্ষা সেদিন বাঁচাবে ওকে সমস্ত কলুষ বোধ থেকে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নিভাননী বলেন,—তাই হবে বাবা। আমার যতটুকু সাধ্য, চেষ্টা করব।

—শুধু চেষ্টা নয়, তুমি সফল হবে। মা, আমি সংসারবিরাগী দেওয়ানা মানুষ। কিন্তু আমি দেখেছি, আশ্চর্য মানুষের মনের পরিণতির ক্রমগুলো। বাল্যে, কৈশোরারম্ভে,—স্বচ্ছ, অনাবিল থাকে মন শীর্ণ ঝরণাধারার জলের মতো। কৈশোর শেষে, যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে প্রবৃত্তির তাড়না অন্ধ করে চৈতন্যকে—ফেনিল কর্দমোচ্ছ্বাসে সব পঙ্কিল করে দেয়। আবার বার্ধক্যে, কতো ঘাত-প্রতিঘাত, বিরহমিলন, কান্নাহাসির অভিজ্ঞতায় থিতিয়ে পড়া পলির ওপর জাগে শান্ত, স্থির, কাকচক্ষু জলরাশি। মন তখন নিস্তরঙ্গ গভীর সমুদ্র। কিন্তু জেনো, অগণিত মানুষের অগণন চিন্তাধারা অগণন কর্মপদ্ধতি। প্রতি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ অগণনরূপে। নিজের বুদ্ধি বিচার দিয়ে নিজের কাজ করে

যাবে, ছেলেও দেখবে নিজের বুদ্ধি, বিচার, স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠবে। নিজেকে চাপাবে না তার ওপর। তোমার ছাঁচে, কি আর কারুরও ছাঁচে তাকে গড়তে চেষ্টা কোরো না, তাকে তার নিজের মতো নিজে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে মাত্র। যে চারাগাছ প্রাচীরের আড়ালে মাথা জাগাচ্ছে, তুমি আড়াল সরিয়ে আলো বাতাস আসবার রাস্তা করে দেবে, মমতা দিয়ে জমিকে সরস করে রাখবে, শিশুচারা আপনা থেকেই বিশাল গাছে পরিণত হবার পথে পা বাড়াবে।

এত দমে এত কথা বলে থামেন হাজী সাহেব। নিভাননীরও বুকের ভার অনেক পাতলা হয়ে যায়। বড়ো রাস্তার মোড়ে বাগচি ও কনখলের দ্রুত পদক্ষেপ নজরে পড়ে। এই দিকেই আসছেন ওঁরা।

হাজী সাহেব বলেন,—একটু আগেই মানুষের মনের ক্রমপরিণতির কথা বলেছি। ছোট ছেলের মন ঝরণাধারার মতো খরস্রোত—থেমে থাকবে না কিছুতেই। আজ এ কৌতূহল, কাল ও জিজ্ঞাসা, ছোটখাটো প্রতিবন্ধকের মতো মাথা জাগাবে। কিন্তু প্রবল জলস্রোতে সব ভেসে যাবে। চলাই তার জীবন, তার চলবার পথ সুগম করে রাখা হিতৈষীর কাজ। তোমার চেয়ে তোমার ছেলের বড় হিতৈষী আর কে আছে, বল ?

বাগচিরা এসে পড়তে ওঁদের প্রসঙ্গ শেষ হয়। যথারীতি অভিবাদন আশীর্বাদের পর আর কিছুক্ষণ পাইচারী করে ওঁরা ঘরে এসে বসেন। হাজী সাহেবের নিজের ঘরের পাশের ঘরটায় নানাবিধ কাঁচের পাত্রে, নানা রকম শুক্‌নো আর চিনিজমানো মেওয়ার সংগ্রহ আছে, জানা আছে কনখলের। ও উস্‌খুস্‌ করে। হাজী সাহেব যেন সর্বজ্ঞ। আভাসেই বুঝে নেন ওর মনের কথা। গম্ভীর গলায় হাঁক দেন—গোলাম রব্বানি,—

কুর্ণিস করে খাস বান্দা এগিয়ে আসতে কনখলকে তার হাতে সঁপে দিয়ে ইঙ্গিতে ইতিকর্তব্য বুঝিয়ে দেন। ওরা চলে যেতে নিভাননী হেসে বলেন,—আপনার সব দিকে নজর। হাজী সাহেব নীরবে হাসেন শুধু। বাগচিকে বলেন,—জাফরের বাড়ীর হাল কি দেখে এলে ?

—লোকে জনে সরগরম। আয়েষার বিয়ের কথা পাকা হতে দেশদেশান্তর থেকে অনেক আত্মীয় কুটুম এসে গেছেন। পাত্তা পাওয়াই শক্ত। বিয়েতে খুব ধুমধাম হবে বলে মনে হয়।

—আহা, তা ত হবেই। জাফরের ঐ একমাত্র সন্তান, আর বরও পেয়েছে তেমনি। খাসা ছেলে আব্বাস সাহেব। বলে চোখ বোজেন হাজী সাহেব। অস্ফুট স্বরে উর্দু কি পারসীতে কি যেন আউড়ে যান, বোধ হয় আশীর্বাণী।

নিভাননী বলেন,—কংখের খুব একা একা লাগবে ও বিয়ে হয়ে চলে গেলে। দুটিতে খুব ভাব হয়েছিল কিনা। আয়েষার ত কনা-গত প্রাণ। সেই জলে ডোবার পর ও যা করেছিল, আমি মা হয়েও তা পারতাম না। আবার ঝগড়া-ঝাঁটিতেও দু'জনে কেউ কারো কম নয়। এখন শ্বশুর ঘর যাবে, তার ওপর বদলীর কাজ, আবার কবে দেখা হবে কে জানে।

হাজী সাহেব বলেন—টান থাকলে দেখা হবেই। কিন্তু কবে, কখন—সে এখন কে বলবে। কনখল নিশ্চয় ভাবছে, আর পাঁচটা জিনিসের মতো বিয়েটাও একটা মজার খেলা। খেলার শেষে ওরা দুটিতে যেমন ছিল তেমনি থাকবে। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলময় হাত সর্বত্র। তিনি যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন।

কনখল ফিরে আসে। আখ্‌রোট, খোবানী, জর্দা আলু, মনাক্কায় দু'পকেট ভর্তি। এসেই বলে—এই পকেটটার সব আয়েষার জন্যে। জানো মা, ওপরের ঘরে কত যে ফল আছে, গুণে শেষ করা যায় না। তাও ত আমি আপেল এই একটা ছাড়া নিইনি। যা বড়ো বড়ো।

হাজী সাহেব হেসে বলেন—বেশ ত। আপেল তোমার মন টেনেছে। ভগবানের কাছে জোর প্রার্থনা লাগাও, দেখবে, দেবদূত গিয়ে বাড়ীতে অনেক রেখে এসেছে। আর কাঠের বাক্সে তুলোয় জড়ানো টস্‌টসে আঙুর।

কনখল পুলকিত হয়ে বলে,—তাহলে ত বেশ হয়। চোখ বুজে সত্যিই প্রার্থনা করে কনখল। হাজী সাহেবের কথা কখনো মিথ্যা হবে না। তারপর বলে—যাবে না মা ও বাড়ীতে? আয়েষাটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। নিজে গিয়ে দেখবে চল। ঘাগরা পেশোয়াজ পরে চোখে সুর্মা এঁকে বেগম সেজে বসে আছে ঘরের কোণায়। আমি গেলাম ত কেবল ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসে। আর ছোট বড় কত যে মেয়ে জুটেছে।

বিদায় নিয়ে বাগচিরা ওঠেন, আবার জাফর ভবনে যাবার অভিলাষী হয়ে। ভগবানের কাছে কনখলের ঐকান্তিক প্রার্থনা পূর্ণ করতে ঝুড়ি মাথায় গোলাম রব্বানী রওয়ানা দেয় চুপিসারে ভিন্‌রাস্তায়।

পুলিশ হাসপাতালের টিলায় পৌঁছে নিভাননী সোজা যান অন্দরে। কুলসম এক-গাল ফুফু চাচী ভাবীর তদ্বিরে ব্যস্ত। গিয়েই বলেন,—কি লো, মেয়ে-বিয়ের উল্লাসে আমাদের ভুলেই রইলি যে একেবারে!

—আর দিদি,—বাড়ী-ভর্তি আত্মীয়কুটুম, সময় পাই না একেবারে।

—তা সত্যি। মেয়ে কোথায় লো, সেও ত ডুমুরের ফুল হয়েছে আজকাল।

কুলসম নিভার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন— এঁরা আসবার পর মেয়ের কড়া আবরু। ঘর থেকে বেরোনো পর্যন্ত বারণ। ওই ফ্লোরেন্স বিবি যখন আসে, তখন খালি তার সাথে বাড়ীর পেছনে একটু বেড়াতে পায়। আমার চাচীশাশুড়ীর ভারী কড়া নজর। অসৈরন হবার জো-টি নেই। আর জানেন ত দিদি, এঁরা সব গাঁয়ের মানুষ. এঁদের কায়দা-কেতাই আলাদা।

নিভাননী বলেন,—তা আর জানিনে। দেখতিস্‌ যদি আমাকে পুজোর সময় গাঁয়ের বাড়ীতে। জামা সেমিজ নেই, একগলা ঘোমটা টেনে কেবল ফাইফরমাস খাটছি বড়-ভাজদের। তা, ঐ কটা দিনই ত, মানিয়ে নিয়েছি কোনো রকমে।

তা মানিয়ে নেওয়া নিভাননীর আসে বটে। যে আধ ঘণ্টা রইলেন ওবাড়ী, তার মধ্যে করিমের মার ঘর গেরস্তালীর খবর থেকে সুরু করে কুলসমের দূর সম্পর্কের ননদ মরিয়মের বে-আক্কেলে খসমের দুস্‌রা সাদীর হদিস্‌ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বার করে নিলেন। তালাক দিলে মরিয়মের বারদিগর নিকা বস্‌বার কোন তক্‌লিফ নেই, এ খবরও অজানা রইল না নিভাননীর। কিন্তু মরদ ভারী মৎলবী, তালাক দিতে নারাজ। মরিয়মের নিজের নামে ছাতকে একটা কমলা বাগানের আধেলা অংশ আছে, মোটা আয়ের সম্পত্তি।

জাফর সাহেবের বুড়ী নানীকে হামালদিস্তায় পান ছেঁচে দিয়ে, খাদিজা আর ফতিমা দুই বোনকে বিবিখোঁপা বেঁধে দিয়ে সব আগন্তুকের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে বাগচিরা যখন ওঠেন, তখন রাত হয়েছে। একপাল মেয়ের মধ্যে কনখল নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। একান্ত-সাথী আয়েষা যেন বেদখল হয়ে গিয়েছে মনে হয় ওর। ইচ্ছে থাকলেও তার কাছে ভেড়ে

না। পোলো ময়দানের ওপর টিলার ধারে একা একা ঘুরে বেড়ায়। রুদ্ধ অভিমানে ঠোঁট ফুলে ফুলে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে উদ্গত অশ্রু থামায়। মনের মধ্যে একটা বাতিল করে আরেকটা, অনেক প্রতিজ্ঞা বুদ্বুদের মতো ওঠে আর মেলায়। সব কটাই আয়েষাকে নিয়ে, কি করে ওকে জব্দ করা যায় সেই মতলবে। যখন বাড়ী ফেরবার ডাক আসে তখন পাকাপাকি মনস্থির প্রায় হয়ে গেছে। আয়েষা এরপর যেচে কথা কইতে এলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে যেন শুনতেই পায়নি এই ভান করে। কিন্তু আড়াল থেকে চুপিসারে দেখতে হবে আয়েষারও ঠোঁট ফুলে উঠ্ছে কিনা।

[ক্রমশঃ]

নৈরাজ্যবাদ

অতীন্দ্রনাথ বসু

১২। আমেরিকা : উনিশ শতক

উনিশ শতকে আমেরিকার যুগল মহাদেশকে ইয়োরোপীয়রা বলত 'নূতন পৃথিবী।' বস্তুত এই নূতন পৃথিবী ছিল 'নূতন ইয়োরোপ'। ইয়োরোপের ভাগ্যান্বেষীরা এসে এখানে বনবাদাড় সাফ করে বসবাস করেছিল। ইয়োরোপের উপছে-পড়া মানুষ ও মনন ঘর বেঁধেছিল পশ্চিম গোলার্ধে। সমুদ্রের ওপার থেকে বীজ এসে পড়ল কুমারী মাটির বুকে। লক লক করে বেড়ে উঠল সবুজ তাজা একটি চারা গাছ।

শুধু রাষ্ট্রবলে নয়, চিন্তায়, মননায়, শিল্প ও সংস্কৃতির উদ্যোগে পশ্চিম গোলার্ধের মধ্যমণি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। তার একটি খণ্ডরাজ্যের নাম ম্যাসাচুসেট্স্ যার বন্দর বস্টনে ১৭৭৩ সালে বিদ্রোহীরা এসে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চা-এর বাক্স তুলে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। আমেরিকা যেমন ছিল নূতন ইয়োরোপ, ম্যাসাচুসেট্স্ তেমন ছিল 'নূতন ইংল্যাণ্ড'—ইংল্যাণ্ডের বেয়াড়া ছেলেদের উপনিবেশ। জন্মদাত্রী মা'র চেয়ে পালিকা মা'র প্রতি টান তাদের বেশী—নূতন মাতৃভূমিতে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলল—আমেরিকার মুক্তি সনদে ঘোষণা করল মানুষের মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্রের বুনিয়াদি নীতি।

আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হল নানাবিধ সমস্যার। যন্ত্রশিল্প ও ধনতন্ত্রের বিকাশ যে সমাজবৈষম্যকে তুলে ধরল জেফারসনের উদার শাসন বিধিতে তার সমাধান পাওয়া গেল না। যুগ বদলাবার সাথে সাথে সাম্য ও স্বাধীনতার রাস্তা নূতন করে খুঁজে বার করতে হয়, পৈত্রিক সনদে তার সন্ধান করা বৃথা। আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের অগ্রজ, ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রের পথিকৃৎ। সে দেশের মনীষা গণতন্ত্রের শাঁস বাদ দিয়ে খোল নিয়ে তুষ্ট থাকতে পারে না।

নৈরাজ্যবাদী ভাবনায় ইয়োরোপের আগে আগে চলেছে আমেরিকা,—আরো ঠিক ঠিক বলতে গেলে ছোট্ট রাজ্য ম্যাসাচুসেট্স্—ওয়ারেন, থোরো ও টাকারের দেশ। ওয়ারেন প্রুদ'র পূর্বসূরী, থোরো টলস্টয়ের। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রামের পথদ্রষ্টা টাকার—যার বাস্তব পরীক্ষা হয়েছে গান্ধীর হাতে। বাকুনিনের বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদও আমেরিকার জমিতে শিকড় গেড়েছে, যার রক্তের ফসল ফলেছিল শিকাগোর হেমার্কেটে। আর শ্রমিকদের সিণ্ডিক্যালিজ্ম্ এখানে রূপ নিয়েছে আই. ডব্লিউ. ডব্লিউর মারফত। নৈরাজ্যবাদের সবকটি ধারাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তায় ও কর্মে প্রবহমান।

১৭৯৯ সালে বস্টনের নিকটে অতি সাধারণ ঘরে যোসিয়া ওয়ারেনের জন্ম হয়। শিক্ষাদীক্ষা যেটুকু হোল তা নিজের চেষ্টায়। বিশ বছর বয়সে তিনি তিনটি বিদ্যেয় পাকা হয়ে উঠলেন—যন্ত্রশিল্প, গানবাজনা ও বেনিয়াবৃত্তি। ছেলেবেলাটা কেমন বেতালা কেটেছে তা এ থেকে বোঝা যায়। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সে তিনি ইংল্যাণ্ডের সমাজবাদী শিল্পপতি রবার্ট ওয়েনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ওয়েন তখন নিউ হারমনিতে একটি কমিউনিস্ট উপনিবেশ গড়বার উদ্যোগ করছেন। ওয়ারেন তাঁর সঙ্গে কাজে নেমে পড়লেন। উপনিবেশটি

বরবাদ হয়ে যাবার পর ওয়ারেন যৌথজীবন যাপনে বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। মজুর কেমন করে তার পরিশ্রমের ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এই ভাবনা তখন তাঁর মাথায় ঘুরছে। ধনতন্ত্র এসে কারিগরের সর্বনাশ করেছে, সেদিনকার স্বাধীন শিল্পী হয়েছে আজ বেতনভোগী মজুর। মুদ্রা রাষ্ট্রের একচেটিয়া, মূলধন ব্যাঙ্কের সিন্ধুকে; শ্রমের বাজারে চলেছে অবাধ প্রতিযোগিতা, আর পুঁজির ওপর অল্পকটি ভাগ্যবন্তের একচেটিয়া অধিকার। কাজেই শ্রমিক মরছে আর পুঁজিবাদী ফাঁপছে। হাতের কাজ আর মাথার কাজে আশমান জমিন ফারাক। যারা খেটে খায় তাদের সব দিক দিয়ে মরণ।

এ নিয়ে লেখা ও বক্তৃতা বহু হয়েছে। প্রতিকারের কাজ বড়-একটা হয়নি। ওয়ারেন রবার্ট ওয়েনের শিষ্য, কথার চেয়ে কাজ বোঝেন ভাল। ১৮২৬ সালে ওহিওর সিন্‌সিনাটিতে তিনি একটি কারখানা ও দোকান খুললেন--যেখানে সময়ের মাপে কাজের দাম স্থির হয়। দক্ষ কারিগর, বুদ্ধিজীবী আর আনাড়ি মজুর সকলের কাজের একদর। ইটখোলার মজুর যদি ডাক্তার ডাকে এবং ডাক্তার যদি এক ঘণ্টা রোগী দেখে তা হ'লে তার ফী হবে এক ঘণ্টা ইটখোলার কাজ। সিন্‌সিনাটির 'সময় ভাণ্ডার' এই নিয়মের ওপর দু বছর চলেছিল। এখানে কোন মুনাফা ধরা হত না। মাল পয়দা করতে যা খরচ তাই তার দাম, অবশ্য কারিগরের শিক্ষার সময় ও ব্যয় তার মধ্যে ধর্তব্য। দোকান চালাবার খরচ বাবদ দামের ওপর শতকরা সাত হারে মাসুল ধরা হত। খরিদ্দার দোকানদারের যতখানি সময় নিত ঘড়ি ধরে সেই সময়টার দামও জিনিসের সঙ্গে যোগ করা হত। কারিগর ও মজুরকে দাম দেওয়া হত শ্রমনোটের মারফত, নগদ টাকায় নয়। অর্থাৎ ছুতোর পাঁচ ঘণ্টা কাজ করে একটা টেবিল তৈরি করলে একটা পাঁচঘণ্টার নোট পেত। এই নোট দিয়ে সে 'সময় ভাণ্ডার' থেকে পাঁচঘণ্টার অনধিক দামের যে কোন জিনিস কিনতে পারত। শ্রমনোটের পরিকল্পনাটা অবশ্য রবার্ট ওয়েনের।

ওয়ারেন দুখানি পুস্তকে তাঁর চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ করেন,--"ইকুইটেব্‌ল্ কমার্স" বা ন্যায্য লেনদেন ব্যবস্থা (১৮৪৬) এবং "ট্রু সিভিলাইজেশন" বা খাঁটি সভ্যতা (১৮৬৩)। তিনি সমাজবাদের রাস্তায় যান নি। তাঁর রাস্তা ব্যক্তিসর্বস্ব নিঃশাসন সমাজের। ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধিকার দিয়ে কয়েকটি নিরাজ যূথসমাজও তিনি গড়েছিলেন—এগুলি বেশ কিছুদিন টিকেও ছিল। অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শাসন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করতে হবে। ব্যক্তি হবে স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্প্রভু—তার ওপর থাকবে শুধু নিজের কর্মফলের শাসন। অপকর্ম করলে তার ফল সে নিজেই ভুগবে, তা নিয়ে অপরের মাথাব্যথা হওয়া উচিত নয়। অবশ্য তা বলে প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা প্রতিভার সৃষ্টির ওপর কেউ জবরদখল করে বসতে পারবে না। ওয়ারেন নিজে সুযোগ পেয়েও জমি কেনা-বেচায় লাভ করেন নি এবং নিজের যান্ত্রিক আবিষ্কারের ওপর কোন স্বত্ব রাখেন নি।

ওয়ারেন ছিলেন যন্ত্রবিদ্ ও বেনিয়া, হেনরি ডেভিড থোরো ছিলেন ভাবুক, কবি। ১৮১৭ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর কংকর্ডে তাঁর জন্ম হয়। হার্ভার্ড থেকে পাস করে বেরিয়ে তিনি কিছুদিন একটি স্কুলে মাস্টারি করেন তারপর রাস্তাঘাট ভদারকের কাজ নেন। ছেলেবেলা থেকে প্রকৃতির রাজ্যের ওপর তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল। আঠাশ বছর বয়সে তিনি লোকালয় ছেড়ে ওয়াল্‌ডেনের অরণ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিল পশু, পাখি, মাছ, রেড ইন্ডিয়ান আর বই ও খাতাকলম। তখন যুক্ত-

রাষ্ট্রে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল। যে সরকারের আশ্রয়ে এই পাপপ্রথা টিকে আছে থোরো পণ করলেন তাকে খাজনা দেবেন না। খাজনা না-দেবার অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেন। একজন বন্ধু খবর পেয়ে তাঁর দেয় টাকা মিটিয়ে দিলেন, ফলে এক-রাত্রের বেশি তাঁকে জেল খাটতে হল না। দু'বছর দু'মাস অরণ্যবাসের পর তিনি ফিরে এসে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। আইন-অমান্য সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ (রেসিস্ট্যান্স টু সিভিল গভর্নমেন্ট, ১৮৪৯) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর বনবাসের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হল "ওয়াল্‌ডেন" বা আরণ্যক জীবন গ্রন্থে, ("ওয়াল্‌ডেন অর লাইফ ইন দি উড্‌স্"—১৮৫৪)।

অনেকের ধারণা থোরোর ধাত ছিল পলায়নপর। তাঁর নিশ্চল প্রকৃতিতে সভ্যতার উদ্দাম গতি সহ্য হত না বলেই তিনি বনবাস নিয়েছিলেন। আসলে থোরো খুঁজছিলেন জীবনের শ্রী ও ছন্দ। মানুষ ত' শুধু সামাজিক জীব নয়, সে প্রাকৃতিক জীবও বটে। ধনিক সভ্যতার দৌলতে মানুষ ও প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে কারখানার কাঁচা মাল। ওয়াল্‌ডেনে থাকতে থোরো নিজের কুটির ও আসবাব নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন, গম সীম ও আলুর চাষ করেছিলেন, জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে এনে নিজে সেঁকে রুটি খেতেন। এতে যে আনন্দ ও প্রাচুর্য তিনি ভোগ করেছেন তা নবাব বাদশার জোটে না। কায়িক শ্রম একটা কর্তব্য। এ শরীর সুস্থ রাখে, মন তাজা করে, মানুষকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে এসে তার জীবনে ছন্দ ও মাধুর্য এনে দেয়। নিজের রুটি রোজগার করবার জন্যে দেহক্ষয় করে খাটবার দরকার হয় না। মাটি অত কৃপণ নয়।

> শুধু নিজের হাতের মেহনতে পাঁচ বছর আমি আমার প্রয়োজন মিটাইয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে বছরে ছয় সপ্তাহ খাটিলেই সব দরকারী খরচ চালানো যায়। সারা শীতকাল এবং গ্রীষ্মেরও অধিকাংশ সময় আমি পড়াশুনার জন্য পাইতাম।......
>
> মোট কথা আমার বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা হইতে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়, বরং একটা মজার খেলা— অবশ্য যদি সরলভাবে ও জ্ঞানীর মত বাঁচিতে হয়। . কপালের ঘাম ফেলিয়া কাহারও জীবিকা সংগ্রহের আবশ্যক নাই, অবশ্য যদি না সে আমার অপেক্ষা অনায়াসে ঘর্মাক্ত হয়।[১]

যান্ত্রিক সভ্যতার উন্মাদ গতি জীবনকে নাশ করে দিল। পরিশ্রমী হলেই হল? পিঁপড়েরা কি কম পরিশ্রম করে? কিসের জন্যে পরিশ্রম তা দেখবার দরকার নেই?

এই যন্ত্রবদ্ধ সমাজ একদল নিষ্কর্মাকে পয়দা করেছে যারা 'জীবন্ত মানুষের গায় জোঁকের মত লেগে থেকে তার জীবনীশক্তি শুষে নেয়।' অপরাধ সৃষ্টি হচ্ছে এই ধন-বৈষম্য থেকে। ওয়াল্‌ডেনে এ-বালাই ছিল না। সেখানে থোরোর ঘরের দরজা দিনরাত খোলা থাকত। ঘর খোলা রেখে তিনি দিনের পর দিন বাইরে ঘুরে এসেছেন অথচ হোমারের একখণ্ড কাব্য ছাড়া আর কিছু তাঁর খোয়া যায় নি।

> আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে সকলে যদি আমি যেমন থাকিতাম সেইরূপ সরল-ভাবে বাস করে তাহা হইলে দেশে চুরি ডাকাতি থাকিবে না। এসব উপদ্রব

১ কটাক্ষ বাইবেলের উক্তির প্রতি। ওয়াল্‌ডেন।

সেই সমাজেই শুধু থাকে যেখানে কেহ পায় প্রয়োজনের অপেক্ষা বেশি, কেহ পায় কম। (ওয়াল্‌ডেন)

মানুষের নৈতিক শোধন শাস্ত্রশাসন দিয়ে হয় না। নীতিজ্ঞানের উৎস বিবেক। যখন অপরের অন্ধ বিশ্বাস ও সামাজিক শাসন স্বাভাবিক ন্যায়বোধের ওপর হাত দেয় তখন ব্যক্তিকে নিজের সততা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

এই সুদৃঢ় প্রতীতিই 'পলায়নপর' দার্শনিককে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে নামিয়েছিল এবং আইন-অমান্য প্রসঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধের রসদ জুগিয়েছিল। যে মানুষকে নিয়ে পশুর মত বেচাকেনা করে তাকে তিনি একটি পয়সা দেবেন না। ১৮৫১ সালে এণ্টনী বার্নস্ নামে একজন পলাতক দাসকে ধরে এনে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর সরকার মালিকের হাতে সমর্পণ করে। থোরো তখন একটি জনসভায় বলেছিলেন,

> ভাল সরকার জীবনকে অধিক মূল্যবান করে, মন্দ সরকার জীবনের মূল্য কমাইয়া দেয়। রেলপথ ইত্যাদি সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সরঞ্জাম কিছুটা কমিলে তাহা বরদাস্ত হয় কারণ তাহা আমাদিগকে একটু সরলভাবে ও স্বল্পব্যয়ে থাকিতে বাধ্য করে মাত্র। আর যদি জীবনের মূল্যই কমিয়া যায়? মানুষ ও প্রকৃতির উপর দাবি আমরা কেমন করিয়া কমাইব, ন্যায়পরতায়, জীবনমূল্যে কেমন করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিব?

আমেরিকান জাতি উৎসন্ন যাক সেও ভাল তবু যে সরকার দাসপ্রথার প্রশ্রয় দিচ্ছে আর মেক্সিকোর ভূমি দখল করবার জন্যে যুদ্ধ করছে তাকে যেন তারা মান্য না করে। হাজার হাজার লোক অন্তরে এর বিরোধী কিন্তু বাইরে নির্বিকার। সকল ক্ষেত্রেই যে অন্যায়কে বাধা দেওয়া সম্ভব তা অবশ্য নয়। 'অন্তত এটা দেখতে হবে যে কাজ আমি দূষণীয় মনে করি তা যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া না হয়।' সরকার যদি আমাকে দিয়ে তা করাতে চায় এবং না-পারলে আমাকে কারারুদ্ধ করে তাহলে কারাগারই আমার উপযুক্ত জায়গা। যিনি আমার হয়ে খাজনা দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে এনেছেন তিনি কর্তব্যের ওপর হৃদয়ের জুলুম খাটিয়েছেন।

অনেকে যুক্তি দেখান যে অন্যায় দূর করতে হলে সংখ্যাগুরুর সমর্থন পাওয়া দরকার; জবরদস্তি বাধা দিতে গেলে অধিকতর অনর্থের সৃষ্টি হবে। তা যদি হয় ত দোষ সরকারের। সরকারই অধিকতর অনর্থের জন্যে দায়ী।

> কেন সরকার প্রতিরোধের সম্ভাবনা দেখিয়া অন্যায়ের সংশোধন করে না? কেন বিবেচনাসম্পন্ন সংখ্যালঘুকে সমর্থন করে না?......কেনই বা সরকার সর্বদা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে, কোপার্নিকাস ও লুথারকে সমাজচ্যুত করে, ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে? (রেসিসটেন্স টু সিভিল গভর্নমেণ্ট)

যাঁরা সংখ্যাগুরুর ভোটে দাসপ্রথা রদ করতে চাচ্ছেন তাঁরা বাস করছেন স্বপ্নরাজ্যে। যেদিন সংখ্যাগুরু স্বেচ্ছায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ভোট দেবে সেদিন রদ করবার মত কোন দাসপ্রথা অবশিষ্ট থাকবে না। ভোটের গুনতিতে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু যখন তারা সকল শক্তি নিয়ে বাধা দেয় তখন তাদের সামলানো সংখ্যাগুরুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সকল ন্যায়বান লোককে জেলে পুরিয়া রাখা কিংবা যুদ্ধ ও দাসপালন বর্জন

> করা এই দুই-এর মধ্যে একটি পথ বাছিয়া লইতে রাষ্ট্র কোন ইতস্তত করিবে না। এ বৎসর যদি এক সহস্র লোক খাজনা দেওয়া বন্ধ করে তাহাতে হিংসা ও রক্তারক্তি হইবে না, বরং দিলেই রাষ্ট্রকে হিংসা ও রক্তপাতে সাহায্য করা হইবে।

এই প্রকার বিপ্লব হবে শান্তিপূর্ণ। 'আর না হয় কিছু রক্ত পড়লই। যখন বিবেক আহত হয় তখন কি একরকম রক্তপাত হয় না?'

থোরোর প্রত্যয় ছিল দৃঢ় যে কোথাও প্রতিরোধ শুরু হওয়া একান্ত দরকার—একজন অন্তত খাঁটি মানুষ এসে রুখে দাঁড়াক। থোরো পেয়েছিলেন মনের মত একজন লোক—যখন হার্পার্সি ফেরিতে ক্যাপ্টেন জন ব্রাউন দাসপ্রথার প্রতিবাদে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন।[২] ১৮৫৯ সালে জন ব্রাউনের প্রাণদণ্ড হল। থোরো জনসভায় এসে শহীদের বন্দনা করলেন।

যে অপরের স্বাধীনতা হরণ করে তার নিজেরও স্বাধীনতা থাকে না। ঘোড়ার মুখে যে লাগাম লাগানো হল তার আর-এক মাথা সওয়ারের গলায় পাক দেয়। শাসন করা মানে স্বাধীনতা হরণ করা ও হারানো। থোরোর মূলমন্ত্র লাওৎসের মত, 'যে সরকার যত কম শাসন করে সে সরকার তত ভাল।' এ থেকে সিদ্ধান্ত হয়, 'যে সরকার আদৌ শাসন করে না সে সরকার সকলের শ্রেষ্ঠ।' কোন ভাল কাজ রাষ্ট্রকে দিয়ে হয় না। একটি মাত্র ভাল কাজ সে পারে,—তা হল কারও ব্যাপারে হাত না দেওয়া। রাষ্ট্র শ্রেয় বুদ্ধি ও সততায় নয়, শ্রেয় পশুবলে। বিবেককে নীচু হতে হবে পশুবলের কাছে?

> আমরা আগে মানুষ তার পরে প্রজা। সত্যের মর্যাদা রক্ষার অভ্যাস যতটা অভিপ্রেয় আইনের মর্যাদারক্ষার অভ্যাস ততটা নয়।

আইন ও ন্যায় এক নয়। আইন মানুষকে একটুও বেশী ন্যায়বান করেনি, বরং আইনের মান রাখতে গিয়ে বহু সৎ লোক অহরহ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছে। আইনের পাকে পড়ে মানুষ হয় যন্ত্র, ফৌজের সিপাইর মত বোধহীন বিবেকহীন কাঠের পুতুল, 'ক্ষমতাপন্ন নীতিহীন ব্যক্তির সেবায় নিযুক্ত চলমান দুর্গ ও অস্ত্রশালা'। যারা বিবেক দিয়ে রাষ্ট্রের সেবা করতে যায় তারা গণ্য হয় রাষ্ট্রের শত্রু বলে।

আইন এবং স্বাধীনতাও দ্বন্দ্বাত্মক। আইন করে মুক্তি দেওয়া এক অদ্ভুত কল্পনা।

> আইন কদাপি মানুষকে মুক্তি দিবে না। মানুষকেই মুক্তি দিতে হইবে আইনকে। যখন সরকার নিয়ম ভঙ্গ করে তখন যাহারা নিয়ম রক্ষা করে তাহারাই নিয়মশৃঙ্খলার ধারক।......যে সত্যকে বুঝিয়াছে সে পৃথিবীর প্রধানতম বিচারকের অপেক্ষা উচ্চস্থান হইতে তাহার হুকুমনামা লাভ করিয়াছে। সেই যথার্থ রায় দিবার অধিকারী, তাহার উপর পড়িয়াছে বিচারকের বিচারের ভার।

স্বৈরতন্ত্র, লোকনিষ্ঠ রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই ধাপে ধাপে রাষ্ট্র ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিপরায়ণতার দিকে। নিশ্চয়ই গণতন্ত্র এই অগ্রগতির শেষ ধাপ নয়। যতদিন না রাষ্ট্র ব্যক্তিকে এক স্বাধীন ও উচ্চতর সত্তা বলে মনে করবে, যে সত্তা থেকে সে পেয়েছে তার

[২] ১৮৫০ সালে পলাতক দাসদের ধরে প্রভুর হাতে সমর্পণ করার আইন পাশ হবার পর ইনি মনস্থ করলেন যে ভার্জিনিয়ার পর্বতে পলাতক দাসদের জন্যে একটি দুর্গ রচনা করবেন। ১৮৫৯ সালের অক্টোবর মাসে হারপার্স ফেরীর সরকারী অস্ত্রাগার লুঠ করে জন কুড়ি অনুচর নিয়ে (এঁদের মধ্যে তাঁর দুই ছেলেও ছিল) তিনি গ্রাম দখল করলেন এবং কয়েকজন মাতব্বরকে ধরে রাখলেন। ওয়াশিংটন থেকে ফৌজ এসে বিদ্রোহীদের দমন করল। ভার্জিনিয়ার আদালতে বিচারের পর ব্রাউনের ফাঁসি হল।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, ততদিন রাষ্ট্র নিজেও মুক্ত ও নির্মল হবে না। এর মানে এই দাঁড়ায় যে মুক্ত রাষ্ট্রে কোন জোরজুলুম নেই। কেউ যদি রাষ্ট্রের তাঁবে থাকতে না চায় তাহলে রাষ্ট্র তার ওপর হামলা করবে না, তার সঙ্গে প্রতিবেশী বন্ধুর মত আচরণ করবে। এই যখন রাষ্ট্রের পরিণতি হবে তখন রাষ্ট্রশাসন পাকা ফলটির মত খসে পড়বে আর রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক উন্নত এক শুচীশুদ্ধ অবস্থায় আমরা উত্তীর্ণ হব।

মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রগুরুদের মধ্যে থোরো অন্যতম। ন্যায়ের দণ্ড শাসনদণ্ডের চেয়ে অনেক উপরে—টলস্টয় ও গান্ধীর এই জীবনসূত্র রচনা করে দিয়েছিলেন কংকর্ডের এই পলায়মান ভাবুক। যে যতবড় জ্ঞানীগুণী হোক না কেন তাকে গায়পায় খাটতে হবে—তার নিজের এবং সমাজের উভয়ের কল্যাণের জন্যে,—একথা বলেছেন অনেকে, কাজে করেছেন যে দু-চারজন সত্যনিষ্ঠ দার্শনিক থোরো তাঁদের মধ্যে প্রথম।

১৮৫৪ সালে ম্যাসাচুসেট্স্-এর বেডফোর্ডের নিকটে দক্ষিণ ডার্টমুথে বেঞ্জামিন আর. টাকারের জন্ম হয়। বস্টনে ছাত্রাবস্থায় তাঁর ওয়ারেনের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তখন থেকে তিনি ব্যক্তিপরায়ণ নৈরাজ্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি ইয়োরোপ ঘুরে এলেন। তাঁর নেশা ছিল সাময়িক পত্র চালানো। বারকয়েক বিফল হয়ে শেষে ১৮৮১ সালে বস্টনে তিনি "লিবার্টি" নামে একটি মাসিক পত্রিকা দাঁড় করালেন। কিছুকাল "লিবার্টাস" নামে আর-একটি জার্মান সংস্করণও বেরুল। ১৮৯২ সালে তিনি নিউইয়র্কে এসে বসলেন এবং "লিবার্টি"-কে সাপ্তাহিকে পরিণত করলেন। কয়েক বছর পরে এটি পাক্ষিক হল। ১৮৯৩ সালে তিনি "লিবার্টি"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন বার করলেন—"ইনস্টেড অফ এ বুক......"। বই-এর দীর্ঘ নামের বাঙলা করলে দাঁড়ায়—'যে ব্যস্ত লোকের বই লিখিবার সময় নাই বইএর বদলে তাহার রচিত দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের টুকরা টুকরা ব্যাখ্যান'।

'পণ্যমূল্যের যথার্থ পরিমাপক শ্রম',—এডেম স্মিথ "ওয়েল্থ্ অফ নেশন্স্"-এ এই যে সূত্রটি দিয়েছিলেন তার ওপরই উঠেছে সমাজবাদের শাস্ত্র। এ থেকে ওয়ারেন, প্রুদোঁ ও মার্ক্স্ স্বতন্ত্রভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন,—শ্রমের ন্যায্য মজুরি তার পয়দা-করা মাল; এটাই একমাত্র ন্যায্য আয়ের পথ (অবশ্য দান, দায়াধিকার ইত্যাদির কথা আলাদা),—অন্য পথে যে যা আয় করে তা শ্রমিকের মজুরির ওপর ভাগ বসানো বই আর কিছু নয়; এই অন্যায় ভাগ বসানো তিন প্রকারে ঘটে থাকে—সুদ, ভাড়া, মুনাফা;—তিনটিই মূলধন খাটিয়ে লাভ করবার রকমফের। মূলধন শ্রমেরই সঞ্চয়—তার লাভ শ্রমিকের প্রাপ্য, ধনিকের নয়। তবু যে ধনিক অন্যায়ভাবে মূলধন থেকে লাভ তোলে, ব্যাঙ্ক সুদ খায়, জমিদার খাজনা নেয়, বেনিয়া মুনাফা রাখে তার কারণ আইনের বলে মূলধন এদের মৌরুসী। শ্রমিককে তার স্বাভাবিক মজুরি দিতে হলে, তার পয়দা মালের ভোগাধিকার দিতে হলে তার একমাত্র উপায় এই মৌরুসী স্বত্ব ভেঙে দেওয়া।

এ পর্যন্ত মোটামুটি তিন সমাজবাদী সমমত। কেমন করে মূলধনে একচেটিয়া স্বত্ব ভাঙতে হবে তাই নিয়ে হল মতভেদ।

মার্ক্স্ চাইলেন ধনিক শ্রেণীর একাধিকার নাশ করে রাষ্ট্রের একাধিকার স্থাপন করতে। রাষ্ট্র হবে একমাত্র মহাজন, কারিগর, চাষী, বেনিয়া—তার সঙ্গে কারও পাল্লা দেওয়া চলবে না। জমি, যন্ত্র, কাঁচামাল, মূলধন ইত্যাদি উৎপাদনের যাবতীয় সরঞ্জাম হবে

সমাজের সম্পত্তি। শুধু উৎপন্ন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য থাকবে ব্যক্তির জন্যে। সমাজ উৎপাদনের উপকরণগুলি হস্তগত করে রাষ্ট্রের মারফত পরিচালনা করবে, শ্রমের পরিমাপে পণ্যের দাম স্থির করবে, সবার জন্যে শ্রমবিভাগ করে দেবে। গোটা জাতি হবে একটা আমলাতন্ত্র। প্রজারা হবে সরকারের আজ্ঞাবাহী আমলা। রাষ্ট্র-সমাজবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে রাষ্ট্রপূজনে।

ওয়ারেন আর প্রুদঁ দেখলেন ধনিক শ্রেণীর মৌরুসী স্বত্ব নির্ভর করছে রাষ্ট্রশক্তির ওপর। রাষ্ট্রশক্তিকে বাড়িয়ে, তার হাতে সার্বভৌম সর্বাধিকার সমর্পণ করে এর প্রতিকার হবে না। এর প্রতিকার রাষ্ট্রকর্তৃত্বের জায়গায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দাঁড় করান, একচেটিয়া অধিকারের জায়গায় অবাধ প্রতিযোগিতা চালু করা। তা হলেই জিনিসের দাম শ্রমের স্তরে এসে ঠেকবে। এখন যে তা হচ্ছে না তার কারণ প্রতিযোগিতা চলছে একতরফে। ধনিকরা এমনভাবে আইন তৈরি করেছে যে শ্রমিকদের কাজে চলেছে অবাধ প্রতিযোগিতা, ফলে শ্রমের দাম নেমেছে অর্ধাশনের স্তরে; ব্যবসাবাণিজ্যেও আছে কিছুটা প্রতিযোগিতা যার ফলে ব্যবসার লাভও কিছুটা সীমিত; আর যে মূলধনের ওপর নির্ভর করছে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা, ব্যবসার লেনদেন তার সরবরাহে বলতে গেলে কোন প্রতিযোগিতাই নেই। কাজেই সুদ ও খাজনার হার সপ্তমে চড়ে আছে। দরকার হল মূলধনকে লাভের জন্যে না-খাটিয়ে জনসাধারণের কাজে নিয়োগ করা। মার্ক্স্ চাইলেন একে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে। ওয়ারেন ও প্রুদঁ চাইলেন একে ভেঙে ছড়িয়ে দিতে।

মৌরুসী স্বত্ব চার প্রকার—টাকা, জমি, শুল্ক ও আবিষ্কার। প্রথমটি প্রধান। টাকা তৈরি করা ও বাজারে ছাড়া সরকার ও ব্যাংকগুলির একচেটে। যদি লগ্নির কারবার সকলের জন্যে মুক্ত করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ মূলধন সকলের আয়ত্ত হয় তাহলে লগ্নি টাকার দাম অর্থাৎ সুদ মূলধন চলাচলে যেটুকু খরচ তাতে এসে নামবে,—শতকরা এক-এর বেশি নয়। তখন ব্যাংক টাকা ধার দেবে না, ব্যাংকের মারফত চলাচল করবে মক্কেলদের টাকা। খাতক নামমাত্র সুদে টাকা পেলে বেশী লোক ব্যবসায়ে নামবে, শ্রমের চাহিদা বাড়বে, মজুরি বাড়বে, মজুর টাকা জমিয়ে যন্ত্র কিংবা জমি কিনবে, শেষে স্বাধীনভাবে শিল্পকর্ম অথবা জমি চাষ করবে। মূলধন শস্তা হলে পয়দা মালও শস্তা হবে। ঘর ভাড়াও কমবে কারণ ১% সুদে মূলধন পেলে ভাড়াটেরা টাকা ধার করে বাড়ি তুলবে, মোটা হারে বাড়িভাড়া দেবে না।

বর্তমানে জমি চাষ না-করেও এবং তাতে বসবাস না-করেও যে অনেকে তার মালিক হয়ে বসে আছে এ শুধু সরকারের ভূমিস্বত্ব আইনের জোরে। যে জমি চাষ করে অথবা জমিতে ঘর তুলে বসবাস করে সে ছাড়া আর কেউ জমির মালিক হতে পারবে না এমন নিয়ম হলে ভাড়া নেওয়া উঠে যাবে। অবশ্য ভাল জমির সুবিধা এবং আয় মন্দ জমির চেয়ে বেশি। কিন্তু জমি ও বাড়ি ভাড়া দিয়ে যে অন্যায় ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে জমির গুণাগুণ থেকে তেমন কোন মারাত্মক বৈষম্যের উদ্ভব হবে না।

তারপর শুল্কের একাধিকার। অল্প খরচে অনুকূল পরিবেশে উৎপন্ন দ্রব্য যারা কিনে পোষণ করতে চায় তাদের ওপর কর বসিয়ে বেশী খরচে প্রতিকূল পরিবেশে উৎপন্ন দ্রব্যকে পোষণ করার যে সরকারী নীতি তার নাম শুল্কের একাধিকার। এই অধিকার সরিয়ে নিলে অর্থাৎ শুল্ক তুলে দিলে পণ্যের দাম কমবে, শ্রমিক শস্তায় জিনিস কিনতে পারলে তার জীবনের মান উন্নত হবে। অবশ্য প্রুদঁ সাবধান করে দিয়েছেন যে টাকার একাধিকার বন্ধ না-করে শুল্কের একাধিকার বন্ধ করলে সর্বনাশ হবে কারণ যে অল্প পরিমাণ টাকা দেশের

বাজারে ঘুরছে তা বিদেশের শস্তা আমদানি মালের পিছনে বিদেশে চলে যাবে, দেশের শুল্ক-রক্ষিত ছোট শিল্পগুলি মারা পড়বে। বিদেশের সংগে অবাধ পণ্যবিনিময়ের আগে দেশে টাকার অবাধ চলাচল আনতে হবে।

আবিষ্কারের ওপর মৌরুসী স্বত্ব প্রকৃতির সার্বজনীন বিত্তের ওপর অবৈধ একাধিকার। প্রকৃতির সম্পদ সকলের ভোগ্য। যখন একজন প্রকৃতির কোন নিয়ম বা সত্যকে আবিষ্কার করে তার ওপর একাধিকার বসায় এবং অন্যকে তার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন তা অসম, অবৈধ। এই অধিকার দূর করলে আবিষ্কর্তাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং নিজের পরিশ্রমের অতিরিক্ত অন্যায় সুবিধা সে ভোগ করতে পারবে না।

এই চারটি একচেটে অধিকার তুলে নিলে ব্যক্তি হবে অবাধ, মুক্ত। মার্ক্‌স্‌ ব্যক্তির হাত থেকে মূলধন নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে দিয়েছেন, ব্যক্তিকে শূন্য করে রাষ্ট্রকে পূর্ণ করেছেন। ওয়ারেন ও প্রুদঁ রাষ্ট্রাশ্রয়ী একাধিকারগুলিকে কেড়ে নিয়ে মূলধন ব্যক্তির হাতে দিয়েছেন, রাষ্ট্রকে শূন্য করে ব্যক্তিকে পূর্ণ করেছেন।

> নৈরাজ্যবাদীরা নির্ভীক জেফারসনীয় গণতান্ত্রিক,* তার বেশী কিছু নয়। তাহাদের বিশ্বাস, 'যে সরকার যত কম শাসন করে সে সরকার তত ভাল' এবং যে সরকার আদৌ শাসন করে না তা সরকারই নয়। (১৪ পৃষ্ঠা)

সরকার মানেই শাসন, নিয়ন্ত্রণ। যে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সে অত্যাচারী, আক্রমণকারী। এ আক্রমণ নানা প্রকারে হতে পারে, যথা ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির আক্রমণ যা চোর গুণ্ডা ইত্যাদি করে থাকে; সমষ্টির ওপর ব্যক্তির আক্রমণ যা স্বৈরাচারী রাজা করে থাকে; ব্যক্তির ওপর সমষ্টির আক্রমণ যা আধুনিক গণতন্ত্র করে থাকে; আর যারা এই নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয় তারা আক্রমণকারী নয়, আত্মরক্ষক। চোরগুণ্ডার আক্রমণ প্রতিহত করা, স্বৈরাচারী শাসনে বাধা দেওয়া, সংখ্যাগুরুর গণতান্ত্রিক আইন অমান্য করা, সব আক্রমণ-বিরোধী আত্মরক্ষামূলক কাজ। ভোটপত্র দিয়ে রাষ্ট্রের দমনপর চরিত্র ঢাকা পড়ে না। কোন পক্ষের জোর বেশি এবং কার কাছে মাথা নোয়াতে হবে সেটা নির্ধারণ করবার জন্যে ভোটপত্র একটা সোজা উপায়।

রাষ্ট্রশাসক তথা স্বাধীনতার শত্রুরা তিন মূর্তিতে দেখা দেয়। প্রথমত, যারা স্বাধীনতাকে প্রগতির লক্ষ্য ও উপায় বলে মানে না, যেমন ক্যাথলিক চার্চ ও রুশ সরকার। দ্বিতীয়ত, যারা নিজেদের স্বার্থে স্বাধীনতার জয়গান গায় কিন্তু অপরকে স্বাধীনতা ভোগ করতে দেয় না, যেমন প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চ এবং ম্যাঞ্চেস্টারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রদায়। তৃতীয়ত, যারা স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলে মেনে নেয় কিন্তু উপায় বলে মানে না এবং আগে স্বাধীনতাকে পদদলিত করে পরে তাকে মাথায় তুলতে চায়, যেমন কার্ল মার্ক্‌স্‌-এর সমাজতন্ত্র। মার্ক্‌স্‌বাদীরা বলে যে প্রলিতারিয় শাসনে রাষ্ট্র ও সমাজ এক হয়ে যাবে সুতরাং স্বাধীনতা খর্ব হবে না। তা বটে, তারা এক হয়ে যাবে ঠিক 'যেমন সিংহ ভেড়ার বাচ্চাটিকে গিলে ফেলবার পর দুটিতে এক হয়ে যায়।'

রাষ্ট্রকে বাতিল করে দিলেই যে আক্রমণ বন্ধ হবে তা নয়। হতে পারে যে কোন কোন লোক প্রতিবেশীর অধিকারের ওপর হামলা করবে। তার প্রতিকারের জন্যে তৈরী হবে আত্মরক্ষণশীল সংস্থার যা রাষ্ট্রের মত বাধ্যতামূলক নয়—যার ভিত্তি সকলের স্বাধীন ইচ্ছা।

* অর্থাৎ জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে ব্যক্তি-অধিকারের মৌলিক নীতির ওপর যে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করেছিলেন তার অনুবর্তী।

এই সংস্থা আক্রমণকারীকে সর্বতোভাবে বাধা দেবে। অনেকের মনে হতে পারে যে গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রই ত স্বেচ্ছামূলক আত্মরক্ষণ সংস্থা। তা নয়। রক্ষণের চেয়ে আক্রমণের দিকে এর নজর বেশি। রক্ষণের নাম করে এ যে সকলকে খাজনা দিতে বাধ্য করে এইটেই একটা আক্রমণ। একজনের হয়ত রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই—তবু তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে, এমন কি তার স্বাধীনতা হরণ করবার জন্যে রাষ্ট্র তার কাছ থেকে কর নিচ্ছে। রক্ষণের কাজ এখন রাষ্ট্রের একচেটে। আত্মরক্ষা সমিতির হাতে এলে রক্ষণের কাজে প্রতিযোগিতা হবে, অন্যান্য পণ্যের মত এরও দাম কমবে, যে যত শস্তায় কাজ দেবে সে তত সমর্থন এবং চাঁদা পাবে।

আক্রমণকারী ব্যক্তিকে তৈরি করে আক্রমণকারী রাষ্ট্র। অপরাধের উৎপত্তি হয় অভাব থেকে। শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্র অভাব সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র উৎসন্ন হলে মূলধনের ওপর মৌরুসী স্বত্ব উঠে যাবে, অভাব দূর হবে, অপরাধবৃত্তি থাকবে না, জেল পুলিশ ও সান্ত্রীর দরকার হবে না।

> রাষ্ট্র আমাদের মুশকিল-আসানের কাজ করে বটে কিন্তু আমাদিগকে হাতকড়া পরাইয়া তাহার দাম আদায় করিয়া লয়। স্বাধীনতার একটা বিকল্প পথ আছে এবং তাহাতে আরো শস্তাদরে মুশকিল-আসান হয়। সমবায় ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিবার বন্দোবস্ত করিয়া ধনের উৎপাদন বাড়াইতে এবং তার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করাইতে পারে......সমবায় বীমা আপদে বিপদে ক্ষতিপূরণ দিয়া আকস্মিক ধনক্ষয়জনিত কষ্টকে সমানভাবে ভাগ করিয়া লাঘব করিতে পারে (১৫৯-১৬০)। আত্মরক্ষা সমিতি আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করিতে, শাস্তি দিতে, আটক রাখিতে, এমনকি মারিয়া ফেলিতেও পারে (৫৫, ৫৬)। সভ্যদের ভিতর হইতে লটারীতে নির্বাচিত জুরী অপরাধের বিচার করিতে পারে—তাহাদের বিচার্য হইবে শুধু ঘটনা নয়, আইনও—আইনের ন্যায্যতা, ঘটনাক্ষেত্রে ইহা প্রযুজ্য কিনা এবং প্রযুজ্য হইলে আইনভঙ্গের জন্য কি পরিমাণ শাস্তি অথবা জরিমানা হইবে। (৩১২)।

স্বেচ্ছাসমিতি গঠিত হবে চুক্তি দ্বারা। কোন এলাকার ওপর এর রাজত্ব থাকবে না, যদিও চুক্তিবন্ধ সভ্যরা জমির মালিক হতে পারে এবং চুক্তির নিয়মে নিজের নিজের জমিতে সুরক্ষিত হতে পারে। আবার তাদের মধ্যবর্তী কোন জমির মালিক সমিতির বাইরে থাকতে পারে এবং সমিতির কোন সভ্য পরে সমিতি ছেড়ে যেতেও পারে। কিন্তু সভ্যদের সম্মতিতে যে নিয়ম ধার্য হয়েছে তা প্রয়োগ করবার অধিকার সমিতির থাকবে। সমিতি সভ্যপদের শর্ত ধার্য করতে পারে—যেমন জুরীতে বসা কিংবা খাজনা দেওয়া। সমিতি চুক্তিভঙ্গ করে সভ্যদের ওপর হামলা করতে গেলেই তার খাজনা বন্ধ হবে, সমিতি ভেঙ্গে যাবে।

আশঙ্কা হতে পারে যে এতে করে ব্যাঙের ছাতার মত স্বেচ্ছাসমিতি গজিয়ে উঠে পরস্পর বিবাদ শুরু করবে। সে ভয় নেই। কারণ এই ব্যবস্থা বাস্তবে চালু হবার আগে মানুষের মনকে স্বাধীনতার জন্যে তৈরি করতে হবে—যাতে তারা তাদের ব্যাপারে বাইরের কোনরকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত না করে। তা হলেই যে সমিতি হবে সবচেয়ে নিরুপদ্রব সেই সমিতি তাদের সমর্থন পাবে এবং ঝগড়াবিবাদের ভয় থাকবে না। অবশ্য কখনই যে ঠোকাঠুকি লাগবে না তা নয়। যেমন 'ক' সমিতির সভ্য 'খ' সমিতির সভ্যের ওপর হামলা করেছে। 'খ' 'ক'-এর সভ্যকে গ্রেপ্তার করতে গেল, 'খ' রুখে দাঁড়াল কারণ তাদের মতে গ্রেপ্তারটা আক্রমণাত্মক।

এ জাতীয় বিবাদেরও সমিতিতে সমিতিতে চুক্তিদ্বারা নিষ্পত্তি হতে পারে,—একটি অন্তর-সমিতি আদালতও স্থাপিত হতে পারে।

> দেশরক্ষা একটা পণ্য, চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মের অনুগত। খোলা বাজারে এই পণ্য বিক্রয় হইবে উৎপাদনমূল্যে। যদি অবাধ প্রতিযোগিতা চলে তাহা হইলে সবচেয়ে শস্তায় সেরা মাল যে দিবে তাহার মালই বিকাইবে। বর্তমানে এই পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় রাষ্ট্রের একচেটিয়া। সকল একচেটিয়া বেনিয়ার মত রাষ্ট্র এই পণ্যের জন্য চড়া দাম আদায় করে, উপরন্তু বাজে মাল দেয়। খাদ্যের একচেটিয়া ব্যবসাদার যেমন পুষ্টির বদলে বিষ দেয়, দেশরক্ষার একচেটিয়া ব্যবসায়ী রাষ্ট্র তেমন রক্ষণের বদলে দেয় আক্রমণ; প্রথমের ক্রেতারা দাম দেয় বিষ খাইয়া, দ্বিতীয়ের ক্রেতারা দাম দেয় দাসত্বের শিকল পরিয়া। একটা ব্যাপারে রাষ্ট্র সকল একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে ছাড়াইয়া যায়। তাহার এই একটা মস্ত সুবিধা যে তাহার পণ্য কেহ নিতে ইচ্ছুক হোক বা না হোক, সে সকলকে ইহা কিনিতে বাধ্য করিতে পারে। সুতরাং যদি একই এলাকায় পাঁচছয়টি রাষ্ট্র তাহাদের বেসাতি লইয়া বসে তবে মনে হয় লোকে ঠিক দামে সবচেয়ে সেরা নিরাপত্তা কিনিতে পারিবে। তাহাদের কাজ যতই ভাল হইবে ততই তাহাদের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে—বহুরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার ফলে কোন রাষ্ট্রই টিকিবে না। (৩৩)

নিরাজ ব্যবস্থায় মৌরুসী স্বত্ব উঠে যাবে কিন্তু বিত্তাধিকার থাকবে। নিজের পরিশ্রমে যে যা অর্জন করেছে, কিংবা জবরদস্তি ও প্রতারণা না-করে অন্যের কাছ থেকে পেয়েছে, কিংবা স্বাধীন চুক্তির বলে যে যাকিছু ভোগদখল করেছে তাতে তার স্বত্ব বর্তাবে। অবশ্যি জমি অথবা এমন কোন জিনিস যা সকলে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করার মত যথেষ্ট মজুত নেই, তার মালিকানা কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যারা সেখানে চাষ করছে বা তা ব্যবহার করছে।

নিরাজ ব্যবস্থায় শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিকার দূর হবে না—ধর্ম, নীতি, সমাজ, পরিবার সর্বত্র শাসন দূর হবে, স্বাধীনতা আসবে। একটি মাত্র নীতিকথা সবাইকে মানতে হবে—'নিজের চরকায় তেল দাও'। জোর করে অন্যেব পাপ দমন করা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

> নৈরাজ্যবাদী মনে করে যে স্বাধীনতা এবং তার প্রসূত সমাজকল্যাণ সকল পাপের ধন্বন্তরী। কিন্তু সে স্বীকার করে মাতাল, জুয়াড়ি, লম্পট ও পতিতার ইচ্ছামত জীবনযাপনের অধিকার, যতদিন না তাহারা সে জীবন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিবে। (১৫)

ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ একটি আইন করে স্থির হয়েছে যে সিফিলিস রোগগ্রস্ত কয়েদী ও অনাথাশ্রমের নিঃস্বদের রোগমুক্ত না হলে ছাড়া হবে না। সিফিলিস রোগ বড়-একটা সারে না সুতরাং তাদের দণ্ড যাবজ্জীবন কারাবাস। 'এখন থেকে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ শুধু বড়লোক ও আইনমান্যকারীরা সিফিলিসসহ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।'

নিরাজ সমাজে সন্তানপালনের দায় পিতামাতার, সমাজের নয়। পিতামাতা নির্বাচন করবে ধাত্রী ও শিক্ষক। পিতামাতার অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে না, তাদের দায়িত্বও অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না। বাপমার বিরুদ্ধে সন্তানের কোন অধিকার নেই। যদি তারা

সন্তানের অযত্ন করে তাতে কারও কিছু বলবার নেই। পরিত্যক্ত অথবা অনাথ শিশুকে পালন করবার বোঝাও সমাজ বইবে না—কেউ স্বেচ্ছায় বইতে চায় ত' আলাদা কথা।

যৌনসম্বন্ধ হবে মুক্ত, উভয়পক্ষের ইচ্ছাধীন। আইনের বিবাহ ও আইনের বিচ্ছেদ সমান অদ্ভুত। প্রত্যেক নরনারী স্বাবলম্বী হবে, প্রত্যেকের নিজের বাড়ি অথবা অন্তত একটি ঘর থাকবে, তাদের প্রেমসম্বন্ধ হবে ব্যক্তিগত রুচি ও আসক্তির মত বৈচিত্র্যশীল। এ থেকে যে সন্তানরা আসবে তারা নাবালক অবস্থায় মা-র হেপাজতে থাকবে, তারপর নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

> পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে অবশ্য পূর্ণ সমতা আসবে না। অনেকে স্বাধীনতার চেয়ে সাম্যকে বেশী পছন্দ করে। আমি তাদের মধ্যে নই। আমি যদি মুক্ত ও সচ্ছল অবস্থায় জীবন কাটাইতে পারি তবে আমার প্রতিবেশীকে সমান মুক্ত কিন্তু বেশী সচ্ছল দেখিয়া আমি কান্নাকাটি করিব না। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সকলকে সচ্ছলতা দিবে, কিন্তু সমান সচ্ছলতা নয়। শাসন সকলকে সমান টাকার থলি দিতে পারে (নাও পারে); কিন্তু যাহা কিছু জীবনকে বাঁচিবার উপযুক্ত করে, সেই ধনে সকলকে সমান নির্ধন করিয়া ছাড়িবে। (৩৩৩)

সমাজবাদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের কোন বিবাদ নেই, কোন অটুট সম্পর্কও নেই। সমাজবাদ রাষ্ট্রায়ত্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এটি একটি চৌর্যবিরোধী আন্দোলন,—শ্রমিকের শ্রমফল চুরি বন্ধ করার আন্দোলন। এ আন্দোলন চায় বিত্তবানের একাধিকার ও বিশেষ সুবিধা দূর করে সকলকে যার যার ন্যায্য পাওনা দিতে। নৈরাজ্যবাদ চায় সকলকে পরিপূর্ণ মুক্তি দিতে এই শর্তে যে কেউ অপরের স্বাধীনতায় হাত দেবে না। সমাজবাদের লড়াই শোষণের বিরুদ্ধে, নৈরাজ্যবাদের লড়াই শাসনের বিরুদ্ধে। যেহেতু শোষণ নির্ভর করে শাসনের ওপর, ধনিক শোষণ চালায় সরকারী আইনের জোরে, এবং যেহেতু রাষ্ট্রশাসন বরবাদ হলে ধনিকশোষণও বরবাদ হবে, সেহেতু নৈরাজ্যবাদী বস্তুত সমাজবাদীও বটে।

শুধু শাসনের অবসান হলেই নিরাজ সমাজ আসবে না। যারা স্বাধীনতা চায়, তাকে যত্ন করে রাখতে পারে, কেবল তাদের জন্যেই নিরাজ সমাজ। বর্বরযুগে যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল তার দাম তারা বুঝত না, তাই তারা তা হারিয়েছে। সেই অন্ধযুগের সমাজ নৈরাজ্যের আদর্শ নয়।

শিকাগো হেমার্কেটের শহীদরা তাদের আদর্শের জন্যে জীবন দিয়েছে,—তারা নমস্য। কিন্তু তারা ব্যক্তিনিষ্ঠ নৈরাজ্যবাদের পূজারী নয়। প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে তারা এক সর্ব-নিয়ন্তা শ্রমিকতন্ত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যেখানে সবাইকে উৎপাদন ও পণ্যবিনিময় করতে হবে নির্ধারিত ব্যবস্থায়, যে ব্যবস্থা আনবার জন্যে সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে এবং যারা নিজের খুশিমত উৎপাদন ও বিনিময় করতে চায় তাদের দমন করতে হবে। সশস্ত্র বিপ্লবে পরাজয় অবধারিত, তারপর শতাব্দব্যাপী শাসন ও উৎপীড়ন; আর সফল হলেও তার পরিণতি হবে স্বৈরশাসন, স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার পথ ধীর, অবিরাম এবং সুনিশ্চিত—তিলে তিলে সরকারের এলাকায় জবরদখল করা, সরকারের একচেটে ব্যবসায়ে নিজেদের অধিকার ঘোষণা করা, এই হল বাস্তব পন্থা।

নৈরাজ্যবাদীরা বৈষ্ণব নয়, নীতিবাগীশ অহিংসও নয়। হিংসা যেখানে কার্যকরী সেখানে হিংসা চাই। যখন কথা বলবার অধিকার থাকবে না, যখন সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হবে, তখন অবশ্যই বোমা ও ডাইনামাইট দরকার হবে। কারণ তখন কোন শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম

সম্ভব হবে না। অন্যথায় সন্ত্রাসনীতি হবে আত্মঘাতী। ষড়যন্ত্র, রক্তারক্তি, জিঘাংসা ইত্যাদি যে ক্লেদগ্লানি নিয়ে আসবে তা থেকে সমাজকে বাঁচানো যাবে না।

মুক্তসমাজে পেশছবার দুটি উপায় আছে—একটি মিলনাত্মক আর একটি বিরোধাত্মক। মিলনাত্মক কাজ হল ব্যয়ের সমান মূল্য ধরে উৎপাদন ও বিতরণ চালাবার সমিতি গড়া, সমবায় ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ও বীমা সমিতি গঠন করা, ইত্যাদি। এর দৃষ্টান্ত ওয়ারেনের 'সময়ভাণ্ডার', প্রুদ'র 'বিনিময় ব্যাঙ্ক'।

বিরোধাত্মক উপায় হল—খাজনা দেওয়া বন্ধ করা, আইন অমান্য করা, সরকারী কর্ম-চারীদের একঘরে করা, পুলিশ ও সেনার জুলুমকে শান্তিপূর্ণভাবে বাধা দেওয়া এবং দলে দলে জেলে যাওয়া। খাজনাবন্ধ হল মোক্ষম অস্ত্র। সরকার যদি অনাদায়ী খাজনা মাপ করে দেয় তা হলে খাজনা না-দেনেওলাদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে; আর যদি জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করতে যায় তবে তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়বে। যদি এক-পঞ্চমাংশ লোক খাজনা বন্ধ করে তবে বাকি চার-পঞ্চমাংশের খাজনায় খেলাপীদের খাজনা আদায়ের খরচ উঠবে না। নিরুপদ্রব প্রতিরোধে কেমন কাজ হয় তা দেখিয়েছে আয়র্ল্যাণ্ডের ল্যাণ্ড লীগ। ইংল্যাণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে পার্নেল আইরিশ চাষীদের নিয়ে এই কৌশলে লড়াই করেছিলেন। এ ব্যর্থ হবার কারণ আইরিশ নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—চাষীদের কর-মুক্তি তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। তাই রাজনৈতিক সুবিধার লোভে তাঁরা যুদ্ধ সম্বরণ করলেন।

> আজকালকার সামরিক শৃঙ্খলার দিনে এই একমাত্র প্রতিরোধ যাহাতে কোন কাজ হইতে পারে। সভ্যজগতের যাবতীয় স্বেচ্ছাচারী শাসক বরং সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের অবতারণা করিবে কিন্তু তাহাকে অমান্য করিতে বদ্ধপরিকর একদল প্রজার সম্মুখীন হইতে চাহিবে না। সশস্ত্র বিদ্রোহ অনায়াসে দমন করা যায়। কিন্তু যে নিরুপদ্রব লোকেরা রাস্তায় জড় হয় না পর্যন্ত, কেবল ঘরে বসিয়া আপন আপন অধিকার রক্ষা করে তাহাদের উপর গুলি চালাইবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোন সেনাবাহিনীর নাই। (৪১৩)

ক্ষমতা বেঁচে থাকে পরের স্বত্ব গ্রাস করে। শিকার যখন নিজের স্বত্ব আগলে দাঁড়ায় তখন ক্ষমতার মৃত্যু অবধারিত। মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে, ভোট দিয়ে, কিংবা গুলি করে ক্ষমতাকে বধ করা যায় না, বধ করবার একমাত্র উপায় অনাহার। খাদ্য না জুটলেই সে মরবে। সরকারকে খাজনা না দিয়ে স্বেচ্ছাসমিতিকে চাঁদা দাও। সরকারী মুদ্রা না ছুঁয়ে নিজের মুদ্রায় বেচাকেনা কর, নিজেরা সমিতি গড়ে ব্যাঙ্ক বীমা খোল, সরকার আপনিই খতম হবে।

টাকারের নৈরাজ্যবাদ প্রুদঁ ও স্টার্নারের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। প্রুদঁ থেকে তিনি নিয়েছেন স্বাধীন সমিতি দ্বারা লোককর্ম পরিচালনার পদ্ধতি, স্টার্নারের কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিবাদ।

> নৈরাজ্যবাদীরা শুধু প্রয়োজনসর্বস্ব নয়, তাহারা পুরামাত্রায় আত্মম্ভরীও বটে। মৌলিক অধিকারের মাত্রা জোর। যে কোন ব্যক্তি, তাহার নাম বিল সাইক্‌স্‌ কিংবা আলেকজাণ্ডার রোমানফ যাই হোক না কেন, কিংবা একদল লোক তাহারা চীনের ডাকাত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যাই হোক না কেন, যদি তাহাদের অপরকে বধ করিবার বা বশ করিবার, কিংবা সারা দুনিয়াটা দখল করিবার শক্তি থাকে তবে সে অধিকারও তাহাদের আছে। সমাজের ব্যক্তিকে দাস বানাইবার অধিকার এবং ব্যক্তির সমাজকে দাস বানাইবার অধিকার সমান নয় তার কারণ

তাহাদের শক্তি সমান নয়। (২৪)

টাকারের দুর্বলতা এইখানে। প্রয়োজন বোধ ও অহঙ্কার রাষ্ট্রের বিকল্প জনশক্তি গড়ে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একচেটে অধিকার তুলে দিয়ে সকলকে জমিজমা ও মূলধন খাটাবার অধিকার দিলেই আর্থিক বৈষম্য মিটে যাবে এ কল্পনা অবাস্তব। সরকার ও ধনতন্ত্রের এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে সমদর্শী অর্থসংগঠন গড়ে তোলা যে সম্ভব নয়, ওয়েনের নিউ লানার্কের কারখানা, ওয়ারেনের সময় ভান্ডার ও প্রুদ'র বিনিময় ব্যাংক তার প্রমাণ। টাকারের সার্থক অবদান নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কৌশল। তাঁর এই অবদান টলস্টয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে। গান্ধীর হাতে এ কৌশল পরীক্ষিত হয়েছে। এজন্যে নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয়।

শতাব্দীর অষ্টম দশকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে পটপরিবর্তন হচ্ছিল। ধনতন্ত্রের বিস্তারের সংগে সংগে এগিয়ে আসছিল শ্রমিক আন্দোলন। বাঘের পিছনে ফেউর মত ধনতন্ত্রের পিছনে ছোটে বাজারমন্দা ও আর্থিক সংকট, তার ঘা এসে পড়ে শ্রমিকদের ওপর, তাদের বিক্ষোভ বেড়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর একটা মোটা অংশ ছিল বিদেশী—বিশেষ করে জার্মান। এরা ছিল বনেদি আমেরিকানদের চেয়ে উগ্র। দুই শ্রেণীর দুটি সংস্থা ছিল—নরমদের সোস্যালিস্ট লেবার পার্টি, গরমদের রিভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি। শেষেরটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮১ সালে। এর নেতা ছিলেন এলবার্ট পারসনস ও অগাস্ট স্পাইস। এ'রা শিকাগোতে এক সম্মেলন করে প্রস্তাব নিলেন যে শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে এবং তাদের অধিকারের ওপর হামলা হলে তারা বন্দুক চালাতে কসুর করবে না। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপাকের চাপে দলে দলে শ্রমিক নরম দল ছেড়ে এসে গরম দলে ভিড়তে লাগল।

এমন সময়ে আসরে একটি ব্যক্তির আবির্ভাব হল যাঁর মাথায় রামরাজ্যের কল্পনা ও প্রতিশোধের উত্তেজনা একসংগে দানা বেধেছিল। 'নূতন পৃথিবী'তে ইনিই হলেন বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের প্রবর্তক, জোহান মোস্ট, জাতিতে জার্মান। ১৮৪৬ সালে অগ্‌স্‌বার্গে তাঁর জন্ম হয়। অতি দুঃখের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এবং অস্ত্রোপচারে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে যায়। বই বাঁধাইর কাজ শিখে তিনি পাঁচ বছর মধ্য ইয়োরোপে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু যেখানেই যান সংগে সংগে ফেরে বিকৃত চেহারার অভিশাপ। মানবজাতির ওপর বিদ্বেষে মন ভরে গেল। তা সত্ত্বেও রয়ে গেল অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা। সামান্য শিক্ষায় যতদূর সম্ভব তিনি পড়াশুনা করলেন এবং কার্ল-মার্ক্‌স্‌এর শ্রমিক আন্তর্জাতিকে যোগ দিলেন। শীঘ্রই আন্দোলনকারী হিসেবে তাঁর খ্যাতিলাভ হল এবং কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করে তিনি নেতৃত্বের পর্যায়ে উঠলেন।

১৮৭৯ সালে মোস্ট জার্মানী থেকে পালিয়ে এলেন লণ্ডনে। সেখান থেকে "ফ্রাইহাইট" (স্বাধীনতা) নামে একটি পত্রিকা বের করে তিনি গোপনে জার্মানীতে প্রচার করতে লাগলেন। এর সুর ছিল অত্যন্ত চড়া এবং হিংসাত্মক। এই সুর ছিল জার্মান দলের নীতিবিরুদ্ধ, ফলে তিনি আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত হলেন। আর একবার জেল খেটে মোস্ট এলেন নিউ ইয়র্কে (১৮৮২) এবং বিপ্লবী সমাজবাদী দলে ভিড়ে পড়লেন। এরা তাঁর মত নৈরাজ্যবাদী ছিল না। তবে এরাও ছিল তাঁর মত ভোটতন্ত্রে অবিশ্বাসী ও হিংসায় আস্থাবান। ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসে পিট্‌স্‌বার্গে উভয় পক্ষ একসংগে সম্মেলন

করে একটি শ্রমিক ফেডারেশন গঠন করল। ফেডারেশন শ্রমিকদের আহ্বান করল অস্ত্র ধারণ করতে। কারণ, 'কেবল মজুরির লড়াই দিয়ে কিস্তিমাত করা যাবে না, সুতরাং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলিতারিয়দের সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ নিতে বাধ্য।'

সংগঠন বাড়তে লাগল দ্রুত। দু' বৎসরের মধ্যে এর সভ্য হল সাত আট হাজার। এদের অধিকাংশ জার্মান, বেশ কিছু অন্যান্য ইয়োরোপীয়, অল্প কিছু আমেরিকান। ফ্রাইহাইট ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—এখন নিউ ইয়র্ক থেকে বেরুতে লাগল। এ ছাড়া "আরবাইটার সাইটুং" বা শ্রমিক সমাচার নামে একটি জার্মান দৈনিক এবং এলবার্ট পার্সনস-এর সম্পাদনায় "এলার্ম" নামে একটি ইংরাজী দৈনিক শিকাগো থেকে বেরুতে লাগল। ফ্রাইহাইটে মোস্ট খোলাখুলিভাবে সন্ত্রাসনীতি সমর্থন করতে লাগলেন। কেমন করে বোমা তৈরি করতে হয় এবং শ্রেণীযুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে হয় তার পাঠও এতে থাকত। এরপর তিনি "রিভালিউশিয়নের ক্রিগস্‌ভিসেনশাফ্‌ট্‌" (বিপ্লবী সমরবিজ্ঞান) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এতে শুধু বিস্ফোরক বস্তু ব্যবহারের নির্দেশ ছিল না, কেমন করে এগুলো সংগ্রহ করতে হবে, কেমন করে টাকা জোগাড় হবে—চুরি জোচ্চুরি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়, অদৃশ্য কালি প্রস্তুত করা, বড়লোকদের ভোজসভায় খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়া, আগুন লাগাবার জন্যে প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থের ব্যবহার, ইত্যাদি বহু তথ্যের ফিরিস্তি ছিল। শেষের প্রক্রিয়ায় নিজেদের দোকান ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে মোস্টের অনেক শিষ্য অগ্নিবীমা কোম্পানীর টাকা মারতে লাগল। এ ছাড়া অন্যান্য চোর গুণ্ডারাও মোস্টের সমরবিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছিল। মোস্ট এদের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। সহিংস ও গর্হিত কর্মের স্তুতিতে তিনি গুরু বাকুনিনকে ছাড়িয়ে গেলেন।

১৮৮৬ সালে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম থেকে এল আট ঘণ্টা কাজের দাবি। অতলান্ত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সারা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ধর্মঘটে মেতে উঠল। উত্তেজনা চণ্ড মূর্তি ধরল শিকাগো শহরে। ম্যাককর্মিক শস্যকাটার কারখানায় মজুরদের দশ ঘণ্টা খাটানো হচ্ছে শুনে পয়লা মে একদল ধর্মঘটী সেখানে হামলা করল। পুলিশ গুলি চালিয়ে তাদের হটিয়ে দিল। একজন শ্রমিক প্রাণ হারাল। চৌঠা মে র‍্যানডল্‌ফ্‌ স্ট্রীটে হে-মার্কেট স্কোয়ারে জমল প্রতিবাদ সভা—বক্তৃতায় আগুন ছুটল। কিছুক্ষণ পরে এল পুলিশবাহিনী, আদেশ হল সভা ভাঙতে হবে। জবাবে একটি বোমা এসে পড়ল তাদের মধ্যে। পুলিশের একজন এবং জনতার কয়েকজন ধরাশায়ী হল। তখন দুপক্ষই রিভলভার টেনে বের করল, গুলিবৃষ্টি হল এক পশলা। পুলিশের পক্ষে মরল সাতজন, আহত হল জনা পঁচিশ। অপর পক্ষে হতাহতের সংখ্যা জানা যায় না, অনুমান জন পঞ্চাশ।

কে যে প্রথম বোমাটা ফেলেছিল তা আজও কেউ জানে না। অথচ হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সভার বক্তারা, তার মধ্যে এলবার্ট পার্সনস ও অগাস্ট স্পাইস। এঁদের নিয়ে সাতজন আসামীর হল প্রাণদণ্ড, একজনের পনের বছরের কারাদণ্ড। মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করে তাঁবেদার জুরী বসিয়ে অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেল। রাষ্ট্র ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে আসামীদের মতবাদ হল অপরাধ প্রতিষ্ঠার মস্ত বড় নজির। একজন তার জবানীতে বলেছিল,

> আমি এদেশে পনের বৎসর বাস করিয়াছি এবং এখানকার ভোটপ্রথা এবং প্রশাসনিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, দেখিয়াছি যে শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কোন নীতির বালাই নাই। ধনী ও দরিদ্র সমান অধিকারসম্পন্ন বলিয়া আমার যেটুকু বিশ্বাস ছিল আমার এদেশের অভিজ্ঞতা তাহা মুছিয়া দিয়াছে। আমরা পুলিশ

ও সিপাহীদের কীর্তিকলাপ আমার মনে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে এই অবস্থা আর বেশীদিন চলিতে পারে না।

এই জাতীয় নির্ভীক্ স্বীকারোক্তি এবং নৈরাজ্যবাদী পত্রিকার বিস্ফোরকশাস্ত্র হত্যার অপরাধ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হল। সুপ্রীম কোর্টের আপীলে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রইল। ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর সাতজনের ফাঁসি হল। সাত বৎসর পরে যখন বাতাস ঠাণ্ডা হয়েছে তখন তদন্ত করে জানা গেল যে ঐ আটজনের একজনও হত্যার অপরাধে দণ্ডনীয় ছিল না।

সে যাহোক, শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে পয়লা মে'র স্মৃতি রক্ত ও আগুন দিয়ে চিহ্নিত হয়ে রইল।

এর পর থেকে ইয়োরোপের মত আমেরিকাতেও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন হিংসা ও সন্ত্রাসের কুটিল আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। ১৮৯২ সালে পেনসিলভেনিয়ার হোমস্টেডে কার্নেগী ইস্পাত কোম্পানীর কারখানায় শ্রমিক ও সান্ত্রীদের মধ্যে একটা লড়াই হয়ে গেল। দুপক্ষেই যখন বেশ কিছু হতাহত হয়েছে তখন এল জঙ্গী পুলিশ, শ্রমিকরা যুদ্ধে পরাস্ত হল। কিন্তু তার আগে আলেকজাণ্ডার বার্কম্যান নামে একজন তরুণ এনার্কিস্ট জেনারেল ম্যানেজার হেনরি ফ্রিক-এর অফিসে ঢুকে তাঁকে গুলি করলেন। ফ্রিক সেরে উঠলেন। বার্কম্যানের ষোল বছর কারাদণ্ড হল।

১৯০১ সালে রাষ্ট্রপতি উইলিয়ম ম্যাকিনলে লেয়ন চলগশ নামে একজন পোল আমেরিকানের হাতে নিহত হলেন। চলগশ নৈরাজ্যবাদী সাহিত্য ও ডাইনামাইট শাস্ত্র থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। কিন্তু নৈরাজ্যবাদী চক্রের মাতব্বররা তাকে পাত্তা দিত না। তার সততার ওপরেও কটাক্ষ করা হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে নিজের সততা ও যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যেই সে বেচারা প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার পরীক্ষায় নেমেছিল।

আমেরিকায় নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের তখন শেষ দশা। মোস্টের তখন বয়স হয়েছে, রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তিনি বার্কম্যানের কাজের স্তুতি করলেন না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শিষ্যা এম্মা গোল্ডম্যান গুরুকে ত্যাগ করলেন। দলে ভাঙ্গন ধরল। এদিকে তখন সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এর আসর পড়ছে—আই. ডব্লিউ. ডব্লিউ গড়ে উঠছে, তাতে তৈরী হচ্ছে স্বর্গরাজ্যের যাত্রাপথ আর সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে পাইকারি প্রতিহিংসার বন্দোবস্ত। শহীদ হয়ে কল্পনার আত্মতুষ্টি লাভের চেয়ে ধনিককে ধনেপ্রাণে মারবার এই নতুন কল অনেক শ্রেয়। আমেরিকার শ্রমিক ঝুঁকল এই নতুন রাস্তায়।

কুশাঙ্কুর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দুই প্রৌঢ় বন্ধু সুখ দুঃখের গল্প করছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না। অন্দরের দরজায় নীল রঙের পুরু পর্দা ঝুলছিল। বাইরের দরজাতেও অমরেশ সেন খিল তুলে দিয়ে এসেছিলেন। রেডিওতে একটু আগে যে রাগ সংগীতের রেকর্ড বাজছিল তাও তিনি উঠে গিয়ে বন্ধ করে এলেন। অতিথি সতীকান্ত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'ওকি করছ। ভিতর থেকে কেউ হয়তো শুনছিলেন—।' অমরেশ বললেন, 'আরে না না। অনেক সময় কেউ না শুনলেও ওটা বাজে। দোকানের রেডিওর মত ওটা সহজে বন্ধ হতে চায় না।'

গালে কপালে কয়েকটি কুঞ্চিত রেখায়, গলার স্বরে অমরেশের বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল। সতীকান্ত বন্ধুর এই রূঢ়তাটুকু লক্ষ্য করলেন। ভাবলেন এই বোধ হয় প্রৌঢ় বয়সের ধর্ম। কথায় বার্তায় চালচলনে সহজেই অসহিষ্ণুতা বেরিয়ে পড়ে। নিজের অজ্ঞাতে শরীরে মনে কর্কশতা এসে স্থায়ী আসন পাতলে মাথার চুল কটা হয়, দাড়ি কড়া হয়, পাক ধরে আর হৃদয়ও শক্ত হয়ে ওঠে। অমনিতে অমরেশ সেন ভালোই আছে। ওকালতিতে পসার বেড়েছে। চেহারায় স্বাস্থ্য আর স্বচ্ছলতার ছাপ ফুটে উঠেছে। পঞ্চাশ পার হয়ে গেলেও তা ধরবার জো নেই। কিন্তু চাল চলনে ধরা পড়ে যৌবন বিগত। সেই কলেজ আমলের বন্ধুকে উত্তীর্ণ পঞ্চাশ প্রৌঢ়ের মধ্যে দেখতে পাওয়ার আশা করাই বৃথা। বরং বন্ধুর মুখে ইচ্ছা করলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পারেন সতীকান্ত সান্যাল। অমরেশের সমবয়সী হলেও মাথা জোড়া টাকের জন্যে তাঁকে আরও বয়স্ক দেখায়। তাঁর চেহারায় রুক্ষতা জীর্ণতার ছাপ বরং বেশি করেই পড়েছে। পড়া স্বাভাবিক। অমরেশের মত তাঁর আর্থিক সাফল্য হয়নি। বীমা অফিসের কেরানী। কিছুকাল আগে প্রমোশনের ফলে অফিসারের মর্যাদা জুটেছে। এদিকে অবসর নেওয়ার সময়ও তো হয়ে এল।

সতীকান্ত কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন নীল পর্দা একটু সরিয়ে একখানি কোমল কচি মুখ উঁকি দিয়েছে।

তিনি কিছু বলবার আগেই অমরেশ তাকে কাছে ডাকলেন, 'কে? ঝণ্টু মহারাজ? এসো এসো। আরে লজ্জা কি এসোই না।'

তাঁর গলার স্বরে শুধু অভয় নয় রীতিমত প্রশ্রয় ফুটে উঠল।

সতীকান্ত দেখলেন ছেলেটি এবার তাঁর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে অমরেশের কাছে গিয়ে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। আট ন বছর হবে বয়স। গায়ের রঙ ফুটফুটে ফরসা। পরণে নীল রঙের হাফ প্যাণ্ট, গায়ে সবুজ জাম্পার। মাথায় তামাটে চুল কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। ছেলেটি অমরেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন ফিসফিস করে বলল।

অমরেশ অক্ষমতার ভান করে বললেন, 'অত পারব না। গরীব মানুষ। ট্যাক্সটা একটু কমটম করে ধার্য কর ঝণ্টু। আচ্ছা আচ্ছা। আর মুখ ভার করতে হবে না। দিচ্ছি।'

পকেট থেকে একখানি সিকি বার করে অমরেশ ওর হাতে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওকে যেতে দিলেন না। ঝণ্টুর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর কোমল গালে গাল ঘষতে লাগলেন। সতীকান্তের মনে হল স্নেহের তীব্রতায় দাঁতে ও

দাঁত ঘষলেন। কয়েক হাত দূরে উল্টো দিকের চেয়ারে বসে তিনি তাঁর বন্ধুর কাণ্ড দেখতে লাগলেন। এই মুহূর্তে বাৎসল্যের বন্যায় একেবারে ভেঙে গেছেন অমরেশ। তাঁর সমবয়সী আর একজন পুরুষ যে এ ঘরে উপস্থিত রয়েছেন সে কথা তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। সতীকান্ত লক্ষ্য করলেন অমরেশের রেখা সঙ্কুল প্রৌঢ় মুখের কাঠিন্য আর নেই, তার বদলে এক স্নেহকোমল আর্দ্রতা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য লোকের চোখে এই একান্ত ব্যক্তিগত স্নেহের মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশ যে একটু বিসদৃশ লাগতে পারে সে খেয়াল পর্যন্ত নেই অমরেশের।

তাঁর আদর কতক্ষণ চলত বলা যায় না, কিন্তু ছেলেটিই নিমেষের মধ্যে বিব্রত আর পীড়িত হয়ে উঠল। 'উঃ জ্যেঠামুনি, ছাড়ো ছাড়ো। তোমার দাড়ি কী কড়া। আমার গাল জ্বলে গেল।'

অপ্রতিভ অমরেশ তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিলেন। ছেলেটি যেন একই সঙ্গে স্নেহের বন্ধন আর বন্ধন মুক্তির আনন্দ অনুভব করে দুই প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদু হাসল। তারপর এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার অমরেশের লজ্জিত হবার পালা। তিনি হঠাৎ কী বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

সতীকান্ত বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'কে ওটি!' অমরেশ বললেন, 'আমার ভাইপো। বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে।'

সতীকান্ত বললেন, 'তাই বুঝি সবচেয়ে আদরের। ও তোমার খুব বাধ্য দেখছি।'

অমরেশ বললেন, 'আসলে আমিই খুব বাধ্য।'

তারপর অস্বস্তিটুকু কাটাবার জন্যে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও ধরাও। আসলে আমিই বাধ্য। আমিই আবদ্ধ। দেখ স্নেহ ভালবাসার যারা শুধু প্যাসিভ অবজেক্ট তারাই সুখী। যে অ্যাকটিভ পার্টনার তারই দুঃখের শেষ নেই, বন্ধনের শেষ নেই।'

সতীকান্ত কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন।

অমরেশ বললেন, 'ও আমাকে আরো ছোটবেলা থেকে জ্যেঠামুনি বলে ডাকে। আসল কথাটা মনি। আর সবাই ওর এই উচ্চারণের ভুলটা শুধরে দেয়। কিন্তু আমি শোধরাতে চাইনে। ওর মুখের ওই মুনি কথাটুকুই আমার দুই কানে অমৃত ঢেলে দেয়। আসলে আমরা কেউ মুনি ঋষি নই। কিন্তু কেউ বললে বড় ভালো লাগে, কেউ উপাধি দিলে বড় ভালো লাগে। আমরা যা নই তাই হতে ভালবাসি। কে জানে কোন কোন মুহূর্তে কি মুহূর্তেরও এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশে তা হয়েও যাই।'

সতীকান্ত এবারও কোন মন্তব্য করলেন না। শুধু বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাঁর দেওয়া সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু উত্তরের প্রয়োজন নেই, মন্তব্যেরও দরকার নেই। নিজের ঝোঁকেই অমরেশ বলে যেতে লাগলেন, 'একদিন হয়তো ওর এই উচ্চারণের ভুল ও শুধরে নেবে। ও যত বড় হবে, নিজেকে তত দূরে সরিয়ে নেবে। যেমন আমার ছেলেমেয়েরা নিয়েছে। তারা এখন ঢের বড় হয়ে গেছে। তাদের আমি আর কাছে পাইনে। হাতের কাছে নয়, বুকের কাছে নয়, মনে হয় মনের কাছেও না।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে একটু হাসলেন অমরেশ, 'এ ব্যাপারে আমার একটা থিয়োরী আছে জানো?'

সতীকান্ত এবার একটু কৌতূহল দেখিয়ে বললেন, 'কী থিয়োরী?'

অমরেশ বললেন, 'স্নেহই বলো, ভালবাসাই বলো দেহ ছাড়া কিছুই টেঁকে না। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই দেহের স্বাদ আমরা পাই, দেহের স্বাদ আমরা নিই। দৃষ্টিতে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, বচনে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে কিসে পাই জানো? ত্বকে। স্পর্শন, আলিঙ্গন, চুম্বন সব এই ত্বকের কাজ। ভাই বলো, বন্ধু বলো, ছেলে বলো বেশি বয়সে এসে তারা আমাদের এই ত্বককে আর স্পর্শ করে না। এক বিজয়ার দিন ছাড়া বয়স্ক আত্মীয় বন্ধু আত্মজ—কাকেই বা আমি আমার আলিঙ্গনের মধ্যে পাই? পেতে লজ্জা পাই, তারাও লজ্জা পায়। কিন্তু যদি এই লজ্জা বোধ না থাকত, যদি সংস্কারের বাধা না থাকত তবে হয়তো আমি তাদের বেশি করে পেতাম, বেশি করে দিতে পারতাম। বেশি বয়সে আমাদের আবেগ যে শুকিয়ে আসে তার কারণ আমরা ত্বকের ব্যবহার ভুলে যাই, ত্বকের ব্যবহারে লজ্জা পাই।'

সতীকান্ত একবার সামনের দিকে তাকালেন। কাঁচের আলমারিগুলিতে বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে লেগেছে। সোনার জলে নাম লেখা বাঁধানো আইনের বইগুলি তার মধ্যে ঝকঝক করছে। এই আইনজীবী শক্ত কাঠখোট্টা বিষয়ী বন্ধুর মুখে বহুকাল তিনি এমন আবেগ উষ্ণ কথা শুনতে পাননি, এমন অকপট স্বীকৃতি শোনেন নি, এমন অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন নি। যে বন্ধুত্ব ক্ষীণ হতে হতে সাধারণ সৌজন্য আর মামুলী পরিচয়ের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল সেই হৃত সৌহৃদ্যকে তিনি যেন নতুন করে ফিরে পেলেন। এই শীতের অপরাহ্ণে কিসের এক প্রবল প্রচণ্ড উত্তাপ বরফ গলাতে লাগল। হৃদয়ের আগল খুলে দিয়ে সতীকান্ত বলতে লাগলেন, 'তোমার পরম সৌভাগ্য অমরেশ, তোমার ছেলে-মেয়েরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়েছে, আর বড় হয়ে দূরে সরে যেতে পেরেছে। তোমার স্নেহের আলিঙ্গনে তারা বন্ধ থাকেনি এ তোমার পরম সৌভাগ্য। আমার দুঃখ দুর্ভোগ তোমাকে ভোগ করতে হয়নি। বয়স হলেও বড় না হবার যে কী বিড়ম্বনা—।'

অমরেশ বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ভালোকথা তোমার ছেলেটি কেমন আছে সতী? গোড়ার দিকে একটু অ্যাবনর্মালিটি ছিল। এখন ভালো হয়ে গেছে বলেই তো শুনেছি। কে যেন বলছিল তোমার ছেলে আজকাল—।'

সতীকান্ত বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকের কাছেই আমি তাই বলি। বলি ভালো হয়ে গেছে। নিজের লজ্জা আর দুঃখের কথা অন্যকে মিছামিছি জানিয়ে লাভ কি বলো।'

অমরেশ একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'আমাকেও তো তুমি কিছু জানাও নি। যখনই কিছু জিজ্ঞেস করেছি তুমি এড়িয়ে গেছ। আমি আর জোর করিনি। তুমি যখন বলতে চাও না, তুমি যখন চেপে যেতেই চাও—'

সতীকান্ত বললেন, 'যে দুঃখের কোন প্রতিকার নেই অমরেশ তার কথা বেশি বলে কী হবে। আজ বলছি শোন। আজ সেই পুরোন দুঃখের সঙ্গে নতুন এক দুর্ভোগ এসে জুটেছে। কিন্তু পুরোন কথাই আগে বলি। তুমি তো সব জানো না। অবশ্য আমি যে তোমার তুলনায় একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলাম তা তুমি জানো। আগে থেকে আমাদের জানাশোনাও হয়েছিল। প্রথম তিন বছরের মধ্যে আমাদের কোন ছেলে-পুলে হয়নি। আমি আমার স্ত্রীকে বলতাম, 'ধরো যদি আমাদের ছেলেপুলে কিছু নাই হয়।'

অসীমা বলত, 'বেশ হবে।' আমরা যা খুসি তাই করব, যেখানে খুসি যাব, হাতে

পায়ের কোন বন্ধন থাকবে না।'

কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর ওর শরীরেই শুধু পরিবর্তন এল না হাবভাব ধরণ-ধারণ সবই বদলে গেল। তখন বুঝতে পারলাম এর আগে ও যা সব বলত তা শুধু মুখেরই কথা। ও যেন শুধু এরই প্রতীক্ষা করছিল, সন্তান ছাড়া ওর আর যেন কিছু প্রত্যাশা করবার নেই। আমরা তখন গড়পারের একটা বাড়িতে থাকি। বাড়ি বলতে হবে বলেই তাকে বাড়ি বললাম। শুধু পুরোন নয় একেবারে জরাজীর্ণ। কোন শ্রীছাঁদও ছিল না। আমাদের একতলার দুখানি ঘরে ভালো করে আলো বাতাস ঢুকত না। অসীমা যখন এ বাড়িতে প্রথম আসে সে কোন আপত্তি করেনি। সে আমার ক্ষমতার কথা জানে। সে আমার শক্তির সামান্যতাকেই স্বীকার করে নিয়েই স্বয়ম্বরা হয়েছে। অসীমা বলেছিল, 'এই আমার ঢের। এই আমার রাজপ্রাসাদ।'

রাজপ্রাসাদ না হোক মাথা গুঁজবার একটা আস্তানা তো মিলেছে। এতদিন আমরা দেখা করেছি পার্কে রেস্টুরেন্টে ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে। আমাদের স্থায়ী কোন ঠিকানা ছিল না। আমি থাকতাম একটা শস্তা মেসে। আর ও থাকত ওর দূর সম্পর্কের মামা বাড়িতে। তের চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই সেই আশ্রয় ছাড়বার জন্যে ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

আমাদের ভাঙা ঘরকেই অসীমা মনের মত করে সাজিয়েছিল। ওর ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়েছিল এই বাসা যেন আমাদের অল্পদিনের ভাড়াটে বাসা নয়, এখানে আমরা যেন সারা জীবনের মত বসবাস করবার জন্যেই এসেছি। কিন্তু এখন থেকে ও অন্য সুর ধরল। কেবলই বলতে লাগল, 'বাসাটা কিন্তু এবার তোমার বদলাতে হবে।' আমি হেসে বলতাম, 'কেন তোমার রাজ অতিথির বুঝি এ প্রাসাদ পছন্দ হবে না?'

অসীমা লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে বলত, 'আহা।'

তারপর মুখ তুলে বলত, 'হবেই তো না। এই স্যাঁৎসেতে ঘর, আলো নেই বাতাস নেই। এখানে সে এসে কেন থাকবে শুনি।'

আমি বলতাম, 'তাই তো। দেখি চৌরঙ্গীতে তার জন্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে পারি কিনা।'

অ্যাডভানসড স্টেজে এসে অসীমার শরীরটা খারাপ যেতে লাগল। প্রায়ই শুয়ে থাকে, মাথা তুলতে পারে না। পেটে যন্ত্রণাও আছে। আমি ডাক্তার দেখালাম। তিনি বললেন, 'কোন ভয় নেই। প্রথম প্রথম এরকম অনেকেরই হয়।'

অসীমা ওর মামা বাড়িতে যেতে চাইল না। ওর তবু দূর সম্পর্কের এক মামা আছে। দূর দিগন্তেও আমি কোন আত্মীয়স্বজনকে দেখলাম না যেখানে ওকে নিয়ে তুলতে পারি। তাই সেই বাসাতেই আমার সাধ্যমত ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলাম। ঠিকে ঝি ছিল, তার বদলে রাত দিনের লোক রাখলাম। শুধু অফিসের আয়ে সব খরচ কুলোয় না। টুইশনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলাম।

হাসপাতালে যাওয়ার আগে অসীমা ঘর দোর আসবাব পত্রের দিকে পরম মমতাভরা চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে আমাকে আস্তে আস্তে বলল, 'ধরো আমি যদি মরে যাই?'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'কী যে বলো। যারা এজন্যে হাসপাতালে যায় তারা বুঝি মরে? না কি আর একটি জীবন নিয়ে ফিরে আসে?'

অসীমা বলল, 'সবাই তো আর তা আসে না। ধরো এমন সঙ্কট যদি আসে দুজনের

বাঁচবার আর কোন সম্ভাবনা নেই, ডাক্তার তোমাকে এসে বললেন, 'যে কোন একটিকে আপনি রাখতে পারেন। হয় মূল না হয় ফুল। আপনি কী রাখবেন বলুন।' আমি তোমাকে বলে যাই তখন কিন্তু তুমি ফুলই রেখো। আমি সেই ফুলের মধ্যেই বেঁচে থাকব। তার মধ্যেই তুমি আমাকে পাবে।'

এসব প্রিমনিশন অসীমার কেন এসেছিল জানিনে। হাসপাতালে কোন অঘটন ঘটল না। তবে ঈজি ডেলিভারি হল না। ডাক্তারকে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য নিতে হল। আমি অবশ্য মূল আর ফুল বলা যায় লতা আর ফুল দুইই জীবন্ত পেলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ডাক্তার জানিয়ে দিলেন লতা আর দ্বিতীয়বার পুষ্পিতা হবে না। সেই ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিয়েই ডাক্তার ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। একথা অবশ্য অসীমা অনেক পরে জেনেছিল।

মেয়ে নয় ছেলেই হয়েছে। সে ছেলে স্বাস্থ্যবান সুন্দর। রোগাটে হয়নি, ওজনে কম হয়নি। মাকে কষ্ট দিয়ে এসেছে বলে শিশুর মুখে কোন কুণ্ঠা সংকোচের ছাপ নেই। ডাক্তার আমাদের হাসিমুখে বিদায় দিলেন। আমিও স্ত্রী পুত্র নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরলাম। কয়েক মাস পরে বাড়িও বদলালাম। চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাট অবশ্য নয়, সিমলা স্ট্রীটে দোতলার ওপরে দুখানা ভালো ঘর দেখে আমরা উঠে গেলাম। পুব দক্ষিণে দুটি করে জানলা আছে। আলো হাওয়ার কোন অভাব নেই। স্ত্রীকে বললাম, 'দেখতো রাজপুত্রের উপযুক্ত প্রাসাদ হয়েছে কিনা।'

অসীমা বলল, 'প্রাসাদ তো হল। কিন্তু তুমি চালাবে কী করে। এত খরচ বাড়িয়ে ফেললে। সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি বদলাবার কী দরকার ছিল।'

দোলনায় ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে আমি বলি, 'দরকার ছিল বই কি।'

ছোট একটি সংসার তো নয় এক সাম্রাজ্য। আমি আমার সমস্ত শক্তি সেই সাম্রাজ্য রক্ষায় নিয়োগ করলাম। পার্টটাইম চাকরি, টুইশন, মাঝে মাঝে কাগজে আর্টিকেল লেখা—উপার্জনের কোন পথই বাকি রাখলাম না। এই বৃহৎ বিশাল পৃথিবীতে আমরা আর কীই বা পারি। একটি ছোট্ট সংসারকে যদি সুন্দর সার্থক করে গড়ে তুলতে পারি তাই যথেষ্ট। আমার দেশকে সমাজকে একটি সুস্থ সবল, সুশিক্ষিত নাগরিক যদি আমি দিয়ে যেতে পারি সেই আমার শ্রেষ্ঠ দান। অন্যের ক্ষতি না করে কোন অসৎপথে না গিয়ে কোন ছলনা বঞ্চনার আশ্রয় না নিয়ে তুমি যদি একটি সৎ সমর্থ উত্তর পুরুষ রেখে যেতে পার সে তোমার কম পৌরুষের কথা নয়।

পরিশ্রমে আমি ক্লান্ত হইনে। কারণ আমার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য স্থির আছে। যত শ্রান্ত হয়েই আমি ঘরে ফিরি বাচ্চুকে দেখলে আমার যেন কোন আর অবসাদ থাকে না। বহুকাল আমি খেলাধুলো ভুলে গিয়েছিলাম। আমি নতুন খেলার উৎসাহ আর বস্তু পেয়ে গেছি। আমি ওকে নিয়ে খেলি, আদর করি, কথা শেখাই। অসীমা অভিমানের ভান করে বলে, 'আমার চেয়ে ছেলেই তোমার বেশি আপন হল দেখছি। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। এখন আর আমাকে দিয়ে তোমার দরকার নেই।'

বাচ্চু বড় হয়ে উঠতে লাগল। বাড়ির আর সব ভাড়াটের ঘরেও ওর খুব আদর। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু এমন লাভলি চাইল্ড আর কারো ঘরে নেই।

হঠাৎ অসীমা একদিন আমাকে বলল, 'আচ্ছা, আমাদের বাচ্চুর কী হল বল দেখি।'

'কী হল।'

'ওর বয়সী সব ছেলেমেয়ে হাঁটছে, সারা বাড়ি ভরে ঘুরঘুর করছে, কিন্তু ও হাঁটতেও

পারছে না, কথাও বলতে পারছে না।'

আমি বললাম, 'বোধ হয় একটু দেরিতে হবে। ওর বাবা হাঁটতে শিখেছিল চার বছরে। আর ওর মার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শেখেনি।'

অসীমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঠাট্টা তামাসা রাখো। চলো ওকে আমরা ভালো কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। রকম সকম আমার যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমাদের কপালে কী আছে কে জানে।'

গেলাম ওকে নিয়ে স্পেশালিস্টের কাছে। তিনি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে ভরসা দিয়ে বললেন, 'না, আপনার ছেলে খোঁড়া হবে না। বোবাও হবে না। দেখছেন না ও সব শুনতে পাচ্ছে। কালা নয়।'

পাঁচ বছর বয়সে বাচ্চু হাঁটতেও পারল, কথা বলতেও পারল। ওকে আমরা কাছাকাছি ভালো একটা স্কুল দেখে ভর্তি করে দিলাম। ফার্স্ট সেকেন্ড না হলেও ও মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেই ক্লাস টু পর্যন্ত উঠল। তারপর আর পারল না। দু দুবার ফেল করল। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বোকা, জড়বুদ্ধি ছেলে। লজ্জায় দুঃখে আর বাঁচিনে। হেডমাস্টার বললেন, 'আসলে ওর কোন দোষ নেই। ও বুদ্ধিতেই বেড় পায় না। আপনারা ওকে স্পেশালিস্ট দেখান। মনে হয় গোড়া থেকে ভালো করে চিকিৎসা করলে সেরে যাবে।'

ছুটে গেলাম আর এক স্পেশালিস্টের কাছে। তিনি বাচ্চুর মার সামনে কিছু বললেন না। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ একেবারে কনজেনিটাল ডেফিসিয়েনসি। জন্মগত। ব্রেণের গ্রোথ একেবারে চেকড হয়ে গেছে। আর বাড়বে না। যদি বা বাড়ে খুবই আস্তে আস্তে বাড়বে।'

অসীমাকে আমি তখন আর কিছু বললাম না। কিন্তু পরে সবই খুলে বললাম। সুখের আশায় এক সঙ্গে ঘর বেঁধেছি। দুঃখ দুর্ভোগও একসঙ্গেই ভুগব। লুকিয়ে লাভ কি।

ওর চিকিৎসার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। সঞ্চয় তো কিছু ছিল না। ধার দেনা করতে লাগলাম। স্ত্রীকে দুচারখানা গয়না যা দিয়েছিলাম গেল। ঘরে দুটি একটি দামি আসবাবপত্র যা ছিল, রইল না। তবু যা চাইলাম তা আর হল কই। যে যাঁর নাম করল তাঁর কাছেই গেলাম। স্পেশালিস্ট, ফিজিওলজিস্ট, সাইকোলজিস্ট সকলের কাছে ছুটো-ছুটি করলাম। নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা হল, শয়ে শয়ে টাকা ব্যয় হল; কিন্তু আর কিছুই হল না। ডাক্তাররা আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'ও ঠিক ইডিয়ট নয়, তবে—।'

তবে যে কী তার অনেক বৈজ্ঞানিক টার্ম আছে, ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু কোন প্রতিষেধক নেই। এই জড়বুদ্ধি ছেলেটির জড়তা যে কবে ঘুচবে কিসে ঘুচবে তা তাঁরা বলতে পারলেন না। আমরা বুঝতে পারলাম কোনদিনই ঘুচবে না।

আশ্চর্য, অসীমা এই দুর্ভাগ্যকে সহজেই মেনে নিল। ছেলের আদর যত্ন যেমন করত তেমনি করতে লাগল। যেন তার ছেলে আরো পাঁচজনের ছেলের মতই সুস্থ, স্বাভাবিক, আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা। কিন্তু আমি তা পারলাম না। দুর্বল সন্তানের ওপর মায়ের নাকি সবচেয়ে বেশি স্নেহ থাকে কিন্তু বাপের তেমন অবিমিশ্র স্নেহ

থাকতে পারে না। ছেলের দৌর্বল্যের মধ্যে বাপ নিজের বিকৃত প্রতিকৃতিকে দেখে, নিজের পঙ্গুতা অক্ষমতা ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়।

আমি যে আমার ছেলেকে মারধোর করি তা নয়, কোনদিনই করি নি। কিন্তু তেমন মমতাও বোধ করি নি। বরং এক নির্মম ঔদাসীন্য আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অসীমা ওকে যেমন শাসন করে তেমনি আদরও করে, জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। উনিশ উৎরে বিশে পা দিয়েছে বাচ্চু। বয়সে সে যুবক, আকৃতিতেও তো তাই। গোঁফ দাড়ি গজিয়ে গেছে। তবু ওর মা ওকে শিশুর মতই আদর করে। ওর মনের বয়স সাত আট বছরের বেশি বাড়েনি। ওর খেলাধুলো চালচলন সব বালকের মত। সাত আট বছরের ছেলেমেয়েরাই ওর সঙ্গী, তাদের সঙ্গে ও পুতুল খেলে, ছুটোছুটি করে। পড়াশুনোও ওই বয়সী ছেলেদের মত। অনেকদিন আগেই আমি ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি, প্রাইভেট টিউটরও ছাড়িয়ে দিয়েছি। কী হবে আর অর্থব্যয় করে।

কিন্তু আমি দূরে সরে থাকতে চাইলে কী হবে বাচ্চু আমাকে দূরে থাকতে দেয় না। আমাকে দেখলেই আমার গায়ের ওপর ও ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে, তুমি যেমন তোমার ভাইপোর গালে গাল ঘষছিলে, তেমনি ওর দাড়িওয়ালা গাল আমার গালের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে আদর করে। অবশ্য কচি দাড়ি তবু দাড়িই তো। আমার সর্বাঙ্গ অস্বস্তিতে ভরে যায়। ঘৃণা, লজ্জা, অসহায়তার মধ্যে আমি যেন তলিয়ে যেতে থাকি। আমি ওকে দুহাতে দূরে সরিয়ে দিই। আমি ওর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে যতদূর পারি চলে যাই। তুমি ত্বকের ব্যবহারের কথা বলছিলে অমরেশ। শুধু ত্বকের কোন দাম নেই। যেমন শুধু দৃষ্টি মানে শূন্য দৃষ্টি, সুধাভরা দৃষ্টি নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনঃপূত করা চাই তবেই সব জীবন্ত হয়; নইলে মৃত। শুধু ত্বকের সঙ্গে ত্বকের মিলনে আমরা কী পাই। প্রায় কিছুই নয়। সেই সাময়িক সংলগ্নতার স্বাদ কি আমরা জীবন ভরে মনে রাখতে পারি? তাও না। তবু তুমি যা বলেছ এই ত্বকের জন্যেই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আমরা সবাই মাংসাশী। কাঁচা মাংস, নিত্য নতুন মাংস আমাদের লুব্ধ করে; পৃথিবী আমাদের চোখের সামনে নতুন মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়ায়। এই জন্যেই কি পৃথিবীর নাম মেদিনী? সে মনোময়ী নয়, শুধু মেদময়ী?

অসীমার গুণ আছে, মনের বলও আছে। জড়বুদ্ধি ছেলের শোকে সে নিজে জড় হয়ে বসে রইল না। শুধু ঘর সংসারের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখল না। নিজের চেষ্টায় ঘরে বসে বসে পড়াশুনো করে ও ম্যাট্রিকুলেশন, আই.এ. তারপর বি.এ. পাশ করল। নিজেই চেষ্টা চরিত্র করে পাড়ার হাই স্কুলে একটি টিচারিও নিল। যারা জড়বুদ্ধি নয়, সুস্থ-স্বাভাবিক তীক্ষ্ণধী, সেই সব মেয়েকে পড়িয়ে ওর আনন্দ। নিজের কাজে খানিকটা সুখ্যাতিও অসীমা পেল।

আর আমি কী করলাম জানো? অফিসের চাকরি ছাড়া আমার একমাত্র কাজ হল জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে পড়াশুনো, তথ্য সংগ্রহ। কোথায় কোন বইতে ওদের সম্বন্ধে কী লেখা আছে, কোন সাহেব কী অভিমত দিয়েছেন আমি তাই পড়ি তাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করি। একবার একটি বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়লাম এসব ছেলেমেয়েকে ওখানকার এক গভর্ণর পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও নাকি করেছিলেন। কারণ যারা যোগ্য, সুস্থ সবল পৃথিবীতে শুধু তাদেরই জায়গা থাকা উচিত। যারা জড় বংশ জড়িয়ে তারা শুধু জড়তারই বিস্তার করবে।

অসীমাকে একথা বলায় সে আমার হাত থেকে ম্যাগাজিনটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগ করে বলল, 'ছি ছি ছি, তুমি কি বাপ না জহ্লাদ?' আমি বললাম, 'আমার ওপর কেন রাগ করছ? আমি তো আর ওকথা বলিনি। যিনি বলেছেন, সেই গভর্ণরকে তুমি ফাঁসী দাও।' অসীমা তারপর দুদিন আমার সঙ্গে কোন কথাই বলল না।

আমি যে সত্যিই জহ্লাদ নই ছেলের জন্যে খেলনা এনে দিয়ে, খাবার এনে দিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আমি তার প্রমাণ দিলাম।

পাড়াপড়শীদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের ছেলেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হল, স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে গেল আর আমি যুবকবেশী এক শিশুকে আঁকড়ে রইলাম।

দেখ, আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা বই লিখতে জানিনে, ছবি আঁকতে জানিনে, কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিনে, মরবার পর যা আমাদের চিহ্ন ধরে রাখবে অন্তত কিছুদিনের জন্যে কিছু লোকের মনে রাখলেও রাখবে। আমরা বাঁচতে পারি শুধু আমাদের সন্তানের মধ্যে। সেই সন্তান যত কৃতী হয়, সার্থক হয় আমাদের মনুমেণ্ট গগনস্পর্শী হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় আত্মপ্রসাদ এই স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আমার বেলায় অন্যরকম হল। সন্তান আমাদের স্মৃতিসৌধ নয়, শুধু কবরের গহ্বর।

বাচ্চু বুদ্ধিতেই জড়, কিন্তু বস্তুর মত জড়পিণ্ড নয়। ওর মন আছে, হৃদয় আছে। প্রাণোচ্ছল, চঞ্চল বালক। ও যদি আকারে না বাড়ত তা হলে হয়তো ওকে আমি ভালবাসতে পারতাম। আমি না বাসলেও ও কিন্তু ভালবাসে। প্রচণ্ড আবেগ দিয়েই ভালবাসে। ওর মাকে ভালবাসে, আমাকে ভালবাসে, আমার বয়সী যাদের ও কাকা বলে ডাকে তাদের পরম আত্মীয় বলে মনে করে। বুদ্ধির সঙ্গে কোথায় যেন আবেগের বিরোধিতা আছে। যেখানে আবেগের আধিক্য সেখানেই বুদ্ধির ক্ষীণতা। ওর বুদ্ধি নেই বলেই বোধ হয় আবেগের পাত্র এমন কানায় কানায় ভরা।

কিছুদিন আগে একটি ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম এই ধরনের ছেলেদের সেক্স্ ইমপালস বাড়ছে কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক সময় যৌনবোধ যদি স্বাভাবিকভাবে আসে তাতে সুফল ফলতে পারে।

আমি আমার স্ত্রীর কাছে বাচ্চুর যৌনচেতনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

অসীমা তো লজ্জায় লাল। ওতো জানে না যা দোষ তাও কখনো কখনো গুণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে নিরাশ করল। বাচ্চুর ওসব কিছু হয় না। আসলে মনের যৌবনই যৌবন। সেই মনোরাজ্যে ও বালক মাত্র। সেখানে ও আজও যুবরাজ নয়। তবু আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলাম।

সেদিন বছরের শেষ বলে আমি ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে বাড়ি বসে আছি। অসীমা গেছে স্কুলে। আর বাচ্চু ঘরের মধ্যে বসে পীজবোর্ড দিয়ে এক ঘর বানাচ্ছে। শিশুর খেলাঘর।

হঠাৎ একটি মেয়ে এসে ঢুকল। বয়স আর কত হবে! আঠের কি উনিশ। আমি ওকে চিনি। আমাদের পাশের বাড়ির সনতবাবুর ছোট শালী রেবা। দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

রেবা আমাদের দেখে ঘরে ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একখানা গল্পের বই নিতে এসেছিলাম। মাসীমা কোথায়?'

অসীমাকে ও মাসীমা বলে ডাকে।

আমি বললাম, 'সে তো স্কুলে গেছে। এসো, ভিতরে এসো।'

রেবা ঘরে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে এক বৃহৎ শিশুর খেলা দেখতে লাগল। মেঝেয় বসে বাচ্চু পীজবোর্ড দিয়ে নতুন ঘর বাঁধছে।

আমি ওকে সচেতন করবার জন্যে বললাম, 'বাচ্চু কে এসেছে দেখতো।'

বাচ্চু মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাল। তারপরে আমার দিকে চেয়ে একটু ফিক করে হেসে বলল, 'জানি। নতুন মা।' তারপর ফের সে তার ঘর তৈরী খেলায় মন দিল।

মুহূর্তের জন্যে সেই অষ্টাদশী তন্বী, রূপবতী মেয়েটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। তার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। নারীর এই লজ্জায় এই শোভন যৌবনশ্রী আমি যেন এই প্রথম দেখলাম। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হল বাচ্চুর মত আমারও গ্রোথ বন্ধ হয়ে গেছে। বয়সে আমি বাহান্ন বছরের প্রৌঢ়; মন আমার বাইশ বছরের আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনার মধ্যে সীমাবন্ধ হয়ে রয়েছে।

রেবা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলতে হয় ছুটে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমার তো পালাবার জায়গা নেই। পলাতকাকে ধরাই আমার একমাত্র কাজ। রেবা দুদিন বাদেই তার দিদির বাড়ি থেকে চলে গেছে। আর আমি মনে মনে আজও সেই শরীরিনী হরিণীর পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি।' সতীকান্তবাবু থামলেন।

ঘরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল।

অমরেশ আলো জ্বাললেন না, কোন কথা বললেন না। নিঃশব্দে বন্ধুর হাতে শুধু আর একটি সিগারেট গুঁজে দিলেন।

উপন্যাসের কথা

হরপ্রসাদ মিত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।' তাঁর সে-লেখাটি "লেখকের কথা" নামে একখানি বইয়ের মধ্যে (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) ছাপা হয়েছে। নিজের বক্তব্য আরো পরিস্ফুট করে তিনি বলেছিলেন,—'খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে, লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিতটা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতায়। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসেরই চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে।'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ঐ একই কথা। তবে, তিনি তাঁর কথা তাঁর নিজের মতন করেই বলেছেন। তিনিও অভিজ্ঞতার ওপরেই জোর দিয়ে থাকেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অভিজ্ঞতার মানুষ বলতে আপত্তি হবার কথা নয়। "দেবযান"-এর মতন অলৌকিক কাহিনীর ভূমিকা হিসেবে, জীবের মরণোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে তিনি "শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ," "ভগবদ্‌গীতা," শ্রীঅরবিন্দের "দি লাইফ ডিভাইন" এবং বার্গস'র বচন উল্লেখ করে মরণের পরবর্তী অভিজ্ঞতার ওপরেই জোর দিয়ে গেছেন। অন্যের কাছে সে-সব প্রসঙ্গ যতোই 'আষাঢ়ে গল্প' মনে হোক্ না কেন, "দেবযান"-এর লেখকের কাছে যতীন এবং পুষ্পের পারত্রিক আলাপ-আলোচনা এবং সে-জগতের যাবতীয় আচরণের উল্লেখ যে সত্যিই অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল, তাতে সন্দেহ হবার কথা নয়।

তবে, আসল কথা বোধ হয় এই যে, জগতের যে-কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আর লেখকের অভিজ্ঞতা ঠিক এক জিনিস নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে জীবন সম্বন্ধে মানুষ যে-যে বোধ বা ধারণা বা সুখ-দুঃখের যে-যে অনুভূতি পেয়ে থাকে, সাহিত্যে সেই সব অনুভূতিই নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি ক'রে আমাদের মনে চমক লাগিয়ে দেয়। বনফুল-এর ক্ষেত্রে এই অনুভূতি যে-পরিমাণে মৌলিক এবং বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটাতে পেরেছে, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে হয়তো সে-পরিমাণে নয়! তারাশঙ্কর তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই বাস্তবানুগামী,—মাঝে-মাঝে ভাবালুতাময়, উচ্ছ্বাসপ্রবণ! বনফুল সেই একই কারণে—অর্থাৎ তাঁর অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যবশেই অধিকাংশক্ষেত্রেই চমকপ্রদ,—ঠিক রোমাঞ্চকর না হলেও উত্তেজনাজনক—এবং বাস্তব-অতিশায়ী! আসল কথা, এ'দের অনুভূতি ঠিক এক ধরনের নয়। কোনো একজনের অভিজ্ঞতাই আর-একজনের অনুভূতির নকল হতে পারে না। তের শ' তেষট্টি সালে প্রথম প্রকাশিত—এবং ঐ বছরেই গ্রন্থাকারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতভাবে পুনঃপ্রকাশিত বনফুলের "ভুবন সোম" বইখানিতে অনিলবাবু বা সখীচাঁদ বা ভুবন সোম, এ'রা কেউ-ই অবাস্তব নন,—কিন্তু সেখানে এ'রা—এবং এ'রা ছাড়া ভুট্টা, ভাগিয়া, চতুর্ভুজ গোপ,—তার মেয়ে বিদিয়া ইত্যাদি সকলে মিলে যে ভ্রমণ-কাহিনীটি সুরসাল করে তুলেছেন, সে-কাহিনী কেমন যেন স্বপ্নের মতন সুন্দর এবং অবিশ্বাস্য মনে হয়! তার আগের বছর,—তের শ' বাষট্টিতে বনফুলের "নিরঞ্জনা" বেরিয়েছিল। সে অবিশ্যি আনাতোল ফ্রাঁসের *Thais* অবলম্বনে লেখা। কিন্তু ২৪-৯-৫৫

তারিখে ভাগলপুরে বসে, ছোটো একটি 'নিবেদন'-এর মধ্যে,—বনফুল তাঁর সেই বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'ইহা ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নহে, দেশ কাল পাত্র পাত্রী আমাদের দেশের অনুরূপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।' অর্থাৎ—উপন্যাসে লেখকের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা এবং নিজের দেশ-কাল সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ সজাগ ভাবটা আমাদের পরিচিত ব্যাপার। উপন্যাসে রিয়্যালিজ্‌ম্‌ রক্ষা করবার দায়িত্ব যে আবশ্যিক বলেই গণ্য, সে-কথা সমালোচক-সমাজেও বহুশ্রুত ব্যাপার। ইংরেজিতে গত শতকের আগের শতকে ডিফো, রিচার্ডসন এবং ফীল্ডিং-এর কলমে প্রথম যখন উপন্যাস দেখা দেয়, তখন থেকেই এই 'বাস্তবতার' আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজ লেখকদের সচেতন থাকতে দেখা গেছে। ফ্রান্সে রিয়্যালিজ্‌মের চর্চা হয়েছিল বিশেষ-ভাবে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডুরাণ্টির (Duranty) সম্পাদনায় সেখানে *Realisme* নামে এক পত্রিকা ছাপা হয়। কোনো কোনো আলোচকের মতে পশ্চিমে দর্শনের ক্ষেত্রে আধুনিক 'রিয়্যালিজ্‌ম্‌'-এর সূচনা ধরা হয় ডেকার্টে এবং লক্‌-এর আমল থেকে। আঠারোর শতকের মাঝামাঝি সময়ে, টমাস রীড্‌-ই নাকি সাহিত্যে 'বাস্তব' আদর্শের কথা প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন। বহির্জগৎ যে মায়া নয়, মোহ নয়,—তা' যে সত্য,—এবং ইন্দ্রিয়গোচর এই বহির্জগতের ধারণা যে সত্যেরই প্রতিফলন বা প্রক্ষেপ, সে-সব তর্ক-বিতর্কের উল্লেখ কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কাজে লাগবে না। উপন্যাসে জগৎ-সম্বন্ধে লেখকদের ব্যক্তিগত ধারণা প্রকাশের সুযোগ ঘটেছে, এই কথাটাই আসল কথা। এবং 'বাস্তবতা'র নামে আমাদের লেখকরা এই সব সম্বন্ধে তাঁদের নিজের নিজের রুচি-অরুচির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন, নিঃসন্দেহে এইটুকুই কেবল ধর্তব্য!

কিন্তু মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ কি কি? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার মধ্যে সে-কথার কোনো উল্লেখ নেই। তিনি শুধু এই বলে তাঁর সে-প্রবন্ধটি শেষ করেছিলেন যে—'উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক ও প্রসারিত—অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশ সমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান বস্তুবাদী কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ়ভাবে দখল করছে।'

সম্প্রতি ভারত-সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত *Cultural Forum* পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৫৯) মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ সম্বন্ধে ডঃ হুমায়ুন কবির, মঞ্জেরি এস্‌. ঈশ্বরন্‌, অধ্যাপক তারকনাথ সেন, মুরিয়েল ওয়াসি এবং আর. ই. ক্যাভেলিরো—এই পাঁচজন আলোচকের মন্তব্য ছাপা হয়েছে। সকলেই জানেন যে, আমাদের সামাজিক অবস্থানক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবোধের ঘাত-প্রতিঘাত থেকেই সাহিত্যে উপন্যাস দেখা দিয়েছে। আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের সূত্রপাত, সম্প্রসারণ এবং পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গেই উপন্যাসের পরিণতির ইতিহাস জড়িত। পাঠকসমাজে গল্পের চাহিদা হোলো চিরন্তন এবং সর্বকালীন ব্যাপার। কিন্তু গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য যে ঠিক কোথায়, অথবা কোন্‌ বিন্দুতে, সে-বিষয়ে কবির সাহেবের নিজের মত এই যে, গল্প হোলো জীবনের মোটামুটি স্থিতিধর্মী রূপায়ণ, আর, উপন্যাস নিঃসন্দেহে তার চলচ্চিত্র। কিন্তু শুধু চলৎ-লক্ষণই নয়,—উপন্যাসে এই গতিধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সামগ্রিক ধারণাটাও থাকা দরকার। আবার এও স্বীকার্য যে, কেবল ঘটনাস্রোতের বর্ণনাকেই যথার্থ চলৎ-ধর্মবোধের উদাহরণ বলা ঠিক নয়! চরিত্রের

বিকাশ ঘটিয়ে তোলার মধ্যেই মানব-জীবনের যথার্থ গতিরূপের উপলব্ধি ফুটতে পারে। কবির সাহেব সে-কথাও বলেছেন। সময়ের ধারাবোধ এড়িয়ে বা সেদিকে পূর্ণ অবহিত না থেকেও ছোটো-গল্প লেখা যেতে পারে, কিন্তু কালস্রোতের নিত্য নতুন তরঙ্গের উদ্ভব এবং বিলয় সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক কখনোই উদাসীন থাকতে পারেন না। উপন্যাসের এই সব লক্ষণ বিচারের কথা থেকেই তিনি উপন্যাসের সঙ্গে মহাকাব্যের তুলনা সম্বন্ধে তাঁর নিজের আরো একটি কথা বলতে পেরেছেন। উপন্যাস আমাদের আধুনিক মহাকাব্য তো বটেই। মহাকাব্যের মতনই ধীরে ধীরে এবং সমগ্রভাবে জীবনবীক্ষার প্রয়াস দেখা যায় উপন্যাসে। কিন্তু মহাকাব্য প্রধানতঃ কেবল বীরত্বের দিকেই সজাগ, বীরের সম্বন্ধেই আগ্রহী। অপর পক্ষে, উপন্যাসে আমাদের এই মনুষ্য-জীবনের উত্থানভূমি এবং নিম্নতল—তার উচ্চশীর্ষ এবং গভীর গুহা-গহ্বর সব-কিছুই গৃহীত হয়। কিছুই উপেক্ষিত হয় না,—কিছুই সরিয়ে রাখা হয় না। এদিক থেকে দেখলে মহাকাব্যের তুলনায় উপন্যাসের বিস্তার যে আরো বেশি, সে-কথা বলতেই হয়। আবার গতি এবং আয়তনের বিষয়েও বলবার কথা আছে। গতি তো আদ্যন্ত সমান নাও হতে পারে, আয়তনের ব্যাপ্তির মধ্যেও তো বিভিন্ন অংশের আঁটসাঁট সংহতি না থাকতেও পারে! ঔপন্যাসিককে তাই তাঁর রচনার সর্বাংশের মধ্যে আবশ্যিক অন্বয়ের কথা ভাবতে হয়। উপন্যাসের শিল্পরূপ এবং গঠনকলা এই অন্বয়চিন্তাতেই আশ্রিত। ঔপন্যাসিক তাঁর অভিজ্ঞতার মালমশলার ওপরেই তাঁর রচনার গঠন এবং অন্বয়ের ধ্যানটিকে রূপ দিয়ে থাকেন। এবং কোনো উপন্যাস সত্যিই মহৎ হোলো কি হোলো না, সে-বিষয়ে বিচার করতে হলে পাঠক দেখেন লেখকের উদ্দেশ্যটা কী ছিল এবং তা কতোদূর-ই বা ফুটেছে, অথবা, যে মাল-মশলা তাঁর সেই বিশেষ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রকৃতিটা কী রকম।[১] সমস্ত শিল্পীই রচনার মধ্যে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত হতে দিয়ে থাকেন। এই ব্যক্তিত্বই এক-এক উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা দেয়। তবে উদ্দেশ্য যদি খুবই স্পষ্ট, খুবই দৃশ্য—অর্থাৎ খুবই সোজাসুজি চোখে পড়বার মতন ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহলে শিল্পীর সৃষ্টি আশানুরূপ সার্থক হয়েছে বলা চলে না। সে বরং প্রচার বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের জীবন-সত্যের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্যের সামগ্রিক ধারণাটাই, তাঁর মতে, উপন্যাসের আসল কথা। শিল্পরূপের অল্প-বিস্তর ত্রুটি ঘটলেও তা উপেক্ষা করা যেতে পারে,—যদি, এই সামগ্রিক ধারণার দিক থেকে কোনো ত্রুটি না ঘটে। ডস্টয়েভস্‌কির উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই তো রূপগঠনে শৈথিল্য ঘটেছে,—কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিবিড় উপলব্ধির গুণেই সে-সব লেখা সমাদৃত হতে বাধেনি। অন্যদিকে, টলস্টয়ের "যুদ্ধ ও শান্তি"র মধ্যে যে ঐশ্বরিক অনাসক্ত দৃষ্টি এবং যে শুচি-শান্ত উপলব্ধি দেখা গেছে, সে কি কখনো ভোলা যায়? ভিক্টর হুগো বা বালজাকের মধ্যে চরিত্র রূপায়ণে হয়তো কিছু কিছু দুর্বলতার নমুনা আছে, কিন্তু যে পরম হৃদয়াবেগ দিয়ে,—যে গভীর সততা রক্ষা করে, তাঁরা এই মানব-জীবনের বিচিত্রতা উপলব্ধি করেছেন, তাকে কি তুচ্ছ বলা চলে? ডঃ কবির এই সূত্রেই রবীন্দ্র-নাথের "গোরা"-র নাম করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় সাহিত্যে একমাত্র "গোরা"-ই

[১] ডঃ কবির বলেছেন: 'The novelist imposes form and structure on the mass of experiences that come to him and where the form and the content fuse into a unity we have a great work of art. It reflects reality as refracted through the novelist's personality and this is what has led people to judge the greatness of a novel either by reference to the inner purpose of the novelist or the nature of the content on which he has worked.'

বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যের মান অনুসারে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিহিত হতে পারে। এবং "গোরা"-র এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি যে সত্যিই সেখানকার চরিত্র-রূপায়ণের দক্ষতায় এবং তার আয়তনের বিশালতাতে আশ্রিত, তিনি সে-কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আরো সাম্প্রতিক উপন্যাসের কথায় এগিয়ে এসে তিনি বরিস পাস্তারনেকের "ডক্টর জিভাগোর"-র কথা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিশেষ একটি মানুষ তার দুর্বোধ্য, জটিল, নির্মম এবং বিস্তৃত পারিপার্শ্বিকতার জালে জড়িয়ে পড়ে, প্রতিবেশের চাপে কতো যে কষ্ট পেতে পারে, এ-উপন্যাসে ব্যক্তিমনের সেই গভীর দুঃখানুভূতিই প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, সমগ্রতার দিকে এখানে ততোটা নজর নেই, যতোটা আছে পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমনের প্রতিক্রিয়ার দিকে। "ডক্টর জিভাগো"-কে তাই তিনি 'কবির লেখা উপন্যাস'—পর্যায়ে ফেলেছেন। তাতে আশ্চর্য কিছু কিছু প্রস্তরচিত্রের মনোহর বর্ণাঢ্যতাই যেন ফুটেছে। সেই রম্যতা কিন্তু সমগ্রতা নয়। সমগ্রতা আসলে একরকম মানসিক ক্ষমতা। বহু বস্তুর সমাবেশকেই সমগ্রতা বলে না।

শ্রী মঞ্জেরি ঈশ্বরন্ আবার, অভিধান খুলে 'নভেল' কথাটির মানে দেখিয়ে দিয়ে তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি নানাবিধ সংজ্ঞা এবং বর্ণনা তুলে তুলে উপন্যাসের বহুবিধ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ইংরেজিতে ড্যানিয়েল ডিফো থেকে শুরু করে জেম্‌স্ জয়েস অবধি সুবিপুল যে উপন্যাস-প্রবাহ বয়ে এসেছে, সেই ধারার বিচিত্রতা মানতেই হয়! ই. এম্. ফর্স্টার খুবই সোজাসুজিভাবে উপন্যাসে গল্পরসের আবশ্যিকতার কথা বলেছেন। অধিকাংশ সাম্প্রতিক উপন্যাসে সাম্প্রতিক ব্যাপারেরই বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে। ফলে, সে-সব ক্ষেত্রে চিরকালের কথা সত্যিই চাপা পড়ে যায়! এবং মানব-জীবনের চিরন্তন সত্য যেখানে অনুপস্থিত, সে-রকম উপন্যাস আর যাই হোক, কালজয়ী যে নয়, তাতে সন্দেহ কিসের? ঈশ্বরন্ মনে করেন যে, উপন্যাসে কোনো-রকম বলপ্রয়োগই ভালো নয়,—যৌন-প্রসঙ্গ, কাঁদুনে কায়দা, মনস্তত্ত্বকণ্টকিত রীতি এ-সবের কিছুই বাঞ্ছিত নয়! তবে হ্যাঁ, সাধারণ পাঠকের কাছে উপন্যাস যে কতকটা শিক্ষাপ্রদ জিনিস, তাতেও সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসিদ্ধ শিল্পী বেন এ্যামস্ উইলিয়াম্‌স্-এর লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে ঈশ্বরন্ এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, উপন্যাস মাত্রেই কিছুটা ইতিহাস হতে বাধ্য। পরিশেষে তিনিও সেই বরিস পাস্তারনেকের প্রসঙ্গে এসেছেন। ইতিহাসের স্বরূপ কী? "ডক্টর জিভাগো" বইখানিতে একজন সেই প্রশ্নই তুলেছেন বটে। কিন্তু প্রশ্নটা যতো স্পষ্ট, উত্তরটা ঠিক ততো নয়। ঈশ্বরন্ বলেছেন, যে-কোনো যুগের কথাই ভাবা যাক না কেন, সে-যুগের উপন্যাসে সেই বিশেষ যুগের মানব-চৈতন্যের সর্বাধিক স্ফূর্তির কথাটাই ধরা পড়ে থাকে!

অতঃপর অধ্যাপক তারকনাথ সেনের কথা। আদিতেই তিনি উপন্যাস-পাত্রটির ধারণ-ক্ষমতার কথা বলেছেন। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালের সবটাই অথবা যে-কোনোটাই ঔপন্যাসিকের অবলম্বন হতে বাধা নেই। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি সব পক্ষই জায়গা পেতে পারেন উপন্যাসে। সাহিত্যের প্রকার হিসেবে এতোবড়ো পাত্র বুঝি আর কোথাও নেই। মহাকাব্যের প্রসার,—নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত এবং উদ্বেগ,—গীতিকবিতার আবেগের টান—এবং তথ্যভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধের মননগুণ, উপন্যাসে সবই যেন জায়গা পেতে পারে। মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই কী যে আশ্চর্য গৌরব এবং মহিমা,—কী আশ্চর্য তার উৎসাহে বা আগ্রহগুণ,—মানুষ কী যে এক প্রহেলিকা—উপন্যাসে তার এই সত্যস্বরূপের সর্ববৈচিত্র্যেরই

অভিব্যক্তি সম্ভব এবং সাধ্য। ইংরেজি সাহিত্যের কথা-সূত্রে তারকনাথ সেন একথাও বলেছেন যে, এলিজাবেথের যুগে ইংরেজ তার নাটকে এই রকম বৃহৎ পাত্র-ধর্ম বা আধারগুণ ফোটাতে পেরেছিল। কিন্তু একালে একমাত্র উপন্যাসই সে-কাজ করতে পারে।

বৃহৎ পরিসীমা, বৃহৎ পরিসর,—ব্যাপ্তি এবং সমগ্রতা,—তাঁর মতে, এই সব গুণই হোলো মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ।[২] এই সমগ্রতা-বোধ যেখানে নেই, সেখানে সত্যিকার মহৎ উপন্যাস দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। টুর্গেনিভের *A Lear of the Steppes*ও উপন্যাস নয়, কনরাডের "টাইফুন"ও উপন্যাস নয়। অর্থাৎ সত্যিকার মহৎ উপন্যাস কেবল তিনিই লিখতে পারেন যাঁর মনের ধারণাশক্তিতে অথবা কল্পনার ব্যাপ্তিতে কোথাও কোনো সংকোচ ঘটেনি!

কিন্তু সে-রকম মন কি চাইলেই পাওয়া যায়? সার্থক বড়ো উপন্যাস লেখবার আস্বা অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু স্বল্পশক্তি, সাধারণ লেখক যখন এ-রকম অসাধারণ কিছু একটা করে তুলতে উদ্যোগী হন, তখন তাঁর অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ায় হাস্যকর। অধ্যাপক সেনের কথায়— 'Attempting to write a great novel without a great mind to inspire and organise the attempt can only result in an unsynthesised *pot-pourri,* and the novelist who makes the attempt looks like a man to whom you have given a great bag to fill with things of value and who brings it back half empty or filled with gimcrack.'

সুঠাম গল্পের জোরে,—কিংবা নতুন তথ্যের সমারোহে,—কিংবা রীতির নতুন নতুন কায়দায়—এ সবের কোনো কিছুতেই একখানা মহৎ উপন্যাস লিখে ফেলা সম্ভব নয়। অধ্যাপক সেন তো 'চৈতন্যস্রোত' উদ্ঘাটনের আধুনিক 'ফ্যাশান' সম্বন্ধে খুবই সন্দেহবাদী! কারণ, তাঁর মতে, মানুষের মনের ধারা যে বড়োই স্বেচ্ছাবিচরণে অভ্যস্ত। তবে, লেখক তাঁর নিজের অভিপ্রায়ের খাতে ফেলে সে-ধারাকে একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে চালাতে পারেন বটে। এবং যা ছিল আদিঅন্তবর্জিত নিরন্তর 'স্রোত', লেখকের উদ্দেশ্যবোধের চাপে পড়ে সেটা অচিরেই এক কৃত্রিম 'খাল' হয়ে দেখা দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়! অধ্যাপক সেন তাই বলেছেন, উপন্যাস আর যাই হোক, সেটাকে কোনোমতেই একটা খাল মাত্র বলা চলে না।

গ্রীসে আলেকজাণ্ডারের বিচিত্র বিজয়-অভিযানের অব্যবহিত পরবর্তী যে 'হেলেনিস্টিক' আমল গেছে,—সে-পর্বে যেমন 'এপিক' আর 'ট্র্যাজেডি'র অবসান ঘটে 'এপিলিয়ন' এবং 'প্যাস্টোরাল ইডিল,'—'এপিগ্রাম' এবং 'এলিজি'র প্রাচুর্য শুরু হয়েছিল,—তাঁর মতে, আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই ভাবই দেখা যাচ্ছে। ক্যালিমেকাসের Aitia থেকে অ্যাপলোর পরামর্শ স্মরণ করেছেন তিনি—বলেছেন—'Keep your muse thin'—'Mela biblion mela kakon'—'বড়ো বই মানে বড়ো বোঝা'!—

এ যুগে বৃহদায়তন উপন্যাস অচল। তবু যে গল্‌স্‌ওয়ার্দির "দি ফরসাইট সাগা" বা রোমাঁ রোঁলার "জাঁ ক্রিস্তফ্" বা জুলে রোমাঁর "মেন অব গুড উইল"-এর মতন অতিকায় কিছু কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে, তা থেকে উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরো কিছু চিন্তারই সুযোগ পাওয়া যায়।

[২] অধ্যাপক সেন বলেছেন: 'Range, breadth and sweep, amplitude and spaciousness, totality of appeal—these, then, are essential to the making of a great novel.'

অধ্যাপক সেন বলেছেন, ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের আমল তো আগেই শেষ হয়েছে। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের যুগই হয়তো ভবিষ্যতে আরো কিছুকাল চলবে। হয়তো ব্যক্তিজীবন থেকে ক্রমশঃ সামগ্রিক জাতি-জীবনের দিকেই ভবিষ্যতের উপন্যাস আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে। হয়তো এক লেখকের রচনার পরিবর্তে উপন্যাস হয়ে উঠবে বহু লেখকের সমবায়-অনুশীলনের বিষয়! একথা বলবার সময়ে তিনি বিশেষভাবে যদি কোনো দেশের কথা ভেবে থাকেন, তাহলে সে হোলো রুশদেশ। কিন্তু সে দেশেও এ রকম রচনা এখনো সত্যিই সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের দিকে চোখ ফিরিয়ে তিনি অতঃপর উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের পনেরোই অগাস্টের আগেকার শতকার্ধের কথা ভেবেছেন। আমাদের সেই অর্ধ-শতকের জাতীয় সংগ্রাম কি সত্যিই একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের বিষয় হতে পারে না?

তাঁর এই প্রশ্নের কথা ভাবতে ভাবতেই তারাশঙ্করের "কালিন্দী", "পঞ্চগ্রাম", "মন্বন্তর", "সন্দীপন পাঠশালা" ইত্যাদি বইয়ের কথা মনে পড়তে পারে। "কালিন্দী" প্রভৃতি বইয়ের পেছনে ঐ ধরনের একটা সংকল্প যে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু সংকল্পে যে কাজ হয় না! মহৎ উপন্যাসের জন্যে যা উপযুক্ত, বিধাতার দেওয়া সে-রকম ধারণাশক্তি বাংলা উপন্যাসে সত্যিই আজও চোখে পড়ে না। আমাদের ভালো উপন্যাস আছে বটে, কিন্তু সত্যিকার মহৎ উপন্যাস কোথায়?

ভবিষ্যতের উপন্যাস সম্বন্ধে অধ্যাপক সেন পরিশেষে এইচ্. জি. ওয়েল্‌স্-এর "দি ওয়ার্লড্ অব উইলিয়ম ক্লিসোল্‌ডে"র নাম করেছেন। সে বইখানিকে তিনি উচ্চ উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত বলেননি বটে, কিন্তু 'আইডিয়া'র উপন্যাস বলতে যা বুঝিয়ে থাকে,—ক্লিসোল্‌ড্ যে সেই জাতের বই—এবং ভবিষ্যতে সেই জাতের উপন্যাসই যে আরো ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হতে পারে, এই রকম এক সম্ভাবনার কথা তিনি বেশ আবেগের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীযুক্তা মুরিয়েল ওয়াসি তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মহৎ উপন্যাসের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে পুনরায় সেই সামগ্রিক ধারণা বা কল্পনাশক্তির কথাই তুলেছেন। তিনিও সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যের কথায় "ডক্টর জিভাগো"র নাম করেছেন। আর, শ্রীযুক্ত ক্যাভেলিরো সে-বইয়ের নাম করেছেন বটে, তবে সেই সঙ্গে এই মন্তব্য যোগ করতে ভোলেন নি যে, সাম্প্রতিক কোনো রচনাকে 'শ্রেষ্ঠ' বলে ফেলাটা হঠকারিতা বলেই গণ্য; কারণ, কোনো বই সত্যিই মহতী সৃষ্টি হয়েছে কি না, সে-বিচার তো বহুকালব্যাপী এক সামাজিক বিচার! উত্তরকালে সে-রচনা সম্বন্ধে পাঠকরা কী ভাববেন, কী বলবেন, সে-সব কথা কি এই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে চূড়ান্তভাবে বলে ফেলা যায়?

উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লেখক এবং পাঠকদের মধ্যে সমুচিত ভাবনা যে দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে, সাধারণ পাঠক এবং সাধারণ লেখকের কথা আলাদা। তাঁরা মোটামুটি প্রথার ধারক, প্রথারই বাহক। সব দেশে, সব কালে এই প্রথানুগামিতাই জনসাধারণের স্বভাব। এবং এই ব্যাপক জনস্বভাব থেকেই লোকচক্ষুর অগোচরে শিল্পের নতুন নতুন রূপান্তর ঘটতে থাকে। সেই সূত্র ধরেই এসব কথা বলা গেল।

মহৎ উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে কথা উঠলে শেষ পর্যন্ত জীবন-সমালোচনার শিল্প-গুণের তারতম্যের কথাই ভাবতে হয়। এবং উপন্যাসে জীবন-প্রক্ষেপের বিশ্লেষণে এগিয়ে

গেলে ঘুরে ফিরে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাই দেখা দেয়। মনে পড়ে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠা বা বাস্তবচর্চার ঝোঁক খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তখনকার লেখকদের মধ্যে Champfleury-র নাম খুবই পরিচিত। তাঁর আয়ুষ্কাল গেছে ১৮২০ থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *Realisme* -এর মধ্যে তৎকালীন বস্তুবাদী ভাবাদর্শের প্রতিভূ হিসেবে তাঁর আনুগত্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। গুস্তাভ ফ্লবেয়ার (১৮২১-৮০) ছিলেন তাঁরই সমকালীন লেখক। ফ্লবেয়ারের জন্মস্থান Rouen। প্যারিতে তিনি আইন-শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর লেখক-জীবনের সূচনা ঘটে। দেশের নানা জায়গাতে তো বটেই,—ফ্রান্সের বাইরেও নানা অঞ্চলে তিনি ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "মাদাম বোভারী" প্রকাশিত হয়। এই "মাদাম বোভারী"র জন্যে তাঁকে কিছু আইনের তাড়না এবং আদালতের যন্ত্রণা ভোগ করতে হলেও পরিশেষে তিনি কিন্তু সসম্মানে মুক্তি পেয়েছিলেন। ইতিহাসে ফ্লবেয়ারকে বাস্তবপন্থী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ স্মরণযোগ্য ব্যক্তি বলেই দেখানো হয়ে থাকে। তবে, তাঁর প্রথম দিকের লেখাতে রোমাণ্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের মোটেই যে অভাব ছিল না, কেউ কেউ সে-প্রসঙ্গও মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি বুদ্ধি খাঁটিয়ে বস্তুবাদী সাহিত্যচর্চায় হাত দিয়েছিলেন,—স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুধর্ম তাঁর নাকি স্বভাব নয়—এরকম কথাও বলা হয়ে থাকে। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা-সূত্রে ক্যাজামিয়াঁ তো ফ্লবেয়ারকে মহান লেখক বলতেও আপত্তি করেননি। তিনি কিন্তু আরো এক কথা বলেছেন। ফলের গাছে পাকা ফলের সহজ সৌন্দর্য যেমন সহজেই আমাদের চোখের তৃপ্তি ঘটিয়ে থাকে, সেরকম সহজ পরিণতির চিহ্ন ফ্লবেয়ারের কোনো লেখাতেই নেই। বহু আয়াসে-প্রযত্নে তিনি যে তাঁর লেখার মধ্যে বিশেষ একরকম পরিণতি ঘটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন,—তাঁকে যে অসংখ্য কাটাকুটির যন্ত্রণা উজিয়ে এক-একখানি উপন্যাসের চূড়ান্ত পরিমার্জনে পৌঁছুতে হয়েছে,—তার নজীর দেখতে হলে তাঁরই নানান চিঠিপত্র খুঁজে দেখা দরকার।

কিন্তু, জীবনের নানা খণ্ড-ঘটনার হুবহু বিবরণ তুলে ধরাটাই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কাজ নয়। তাই যদি হোতো, তাহলে এডমণ্ড (১৮২২-১৮৯৬) আর জুলে (১৮৩০-১৮৭০) এই দুই গনকোর্ট্ সহোদরের কলম থেকেই জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্ম সম্ভব হোতো। তাঁরা কিছু পরিমাণে ব্যালজাক-এর এবং কিছু পরিমাণে ফ্লবেয়ার-এর অনুসরণ করেছিলেন। শোনা যায়, এমিল জোলা নিজে এবং তাঁরই সঙ্গে, তখনকার প্রাকৃতবাদী (naturalist) লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই তাঁদের পথ ধরেই তাঁদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন! সেকালের জীবন-পরিবেশের খুঁটিনাটি নানা তথ্য,—বহু ছবি, দলিল, চিঠিপত্র, আসবাবপত্রের নমুনা ইত্যাদি সেকালের নানা উপকরণ তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের অঙ্গীভূত হতে দিয়েছিলেন। এই ভ্রাতৃযুগলের প্রশংসা করে ক্যাজামিয়াঁ জানিয়েছেন যে, কেবল তথ্য-সংগ্রহের বিপুলতাই এঁদের সামর্থ্যের বিশেষত্ব নয়,—যথার্থ শিল্পীর চোখ ছিল এঁদের। শুধু যে Fontainebleau প্রদেশের আরণ্যসৌন্দর্য বর্ণনাতেই এঁদের মনোযোগ ছিল, তাও নয়। প্যারি নগরীর আশপাশের মফস্বল অঞ্চলও এঁরা বর্ণনা করে গেছেন। সেকালের পক্ষে এ মৌলিকতাও তুচ্ছ নয়।

এই গনকোর্ট-ভ্রাতৃযুগলের যখন বাল্যদশা, সেইসময়ে আলফাঁস দোদের (১৮৪০-১৮৯৭) জন্ম হয়। ফরাসী ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর সামর্থ্যের কথা সুপরিচিত। ছোটগল্প

এবং উপন্যাস, উভয়ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত। অকৃত্রিম মমতা আর কৌতুক-বোধের সমন্বয়ে তাঁর বাস্তব-দৃষ্টিতে বিশেষ যে গুণটি বর্তেছিল, তারই ফলে, তাঁর লেখাতে ইংরেজ পাঠক-সমাজের চোখে বিশেষভাবে বাঞ্ছিত এবং বিশেষ সমাদরণীয় দুর্লভ 'হিউমার'-এর আভাস দেখা গেছে। ডিকেন্সের সঙ্গে সেইদিক থেকেই তাঁর সমধর্মিতার কথা ভাবা হয়।

দোদের সঙ্গে একই বছরে জন্মেছিলেন এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)। ফরাসী সাহিত্যে প্রাকৃতবাদ বা 'ন্যাচারালিজম্'-এর তখন প্রবল জোয়ারের কাল। জোলার লেখাতে সেই বস্তুবাদ এবং প্রাকৃতবাদের প্রভাব পড়েছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কথা ভাবতে গেলে—রুশ-ফরাসী-ইংরেজি-জার্মান যে-কোনো সাহিত্য-রাষ্ট্রের কথাই ভাবা যাক না কেন, জগতের বাস্তব সত্য আর লেখকদের কল্পনার সৃষ্টি, এই দুইয়ের আনুপাতিক সম্পর্কের কথাটাই বার বার মনে আসে। যিনি যে-ভাবেই কল্পনার কাজ দেখান না কেন,—চরিত্র, ঘটনা, গঠন, সংলাপ ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণের সমাবেশে আমাদের এই দুর্বোধ্য জীবন-রহস্যের বিস্তার এবং গভীরতা,—দুটি দিকই ফুটিয়ে তোলা দরকার। তবে, সে-কাজ কোন্ উপায়ে, কী কৌশলে যে সাধ্য, সে-কথা কে বলবে? শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচারবুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোনও নির্দেশই পাবার যো নেই।' অর্থাৎ ঐ পর্যন্ত পাঠকের সীমা! মানিকবাবু যে তাঁর পূর্বোক্ত লেখাটিতে 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন'-এর কথা তুলেছিলেন, সে তো খুবই সংগত কথা। তবে, 'বিজ্ঞান' কথাটার দিকে সমুচিতভাবেই লেখকদের চৈতন্য জাগা দরকার। তের শ' বত্রিশ সালের পৌষের "সবুজপত্রে" সেকালের 'সমসাময়িক সাহিত্য' আলোচনা-প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছিলেন, 'সমাজের নূতন নূতন সমস্যা, মানবপ্রাণের নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ও কর্তব্যের আলোচনা যে সুকুমার সাহিত্য হইতে নির্বাসিত করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এই সকল বস্তু বা উপকরণ সাহিত্যের রূপে ও রসে রূপান্তরিত ও রসায়িত করিয়া ধরিবার জন্য থাকা চাই একটা যাদুবিদ্যা, একটা মোহিনী শক্তি।...আমাদের দেশে এই দিক দিয়া যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয় শরৎচন্দ্র।' নলিনীকান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তৃত অর্থেই সুকুমার সাহিত্যের কথা ভেবেছিলেন। তিনি শিল্পী আর সংস্কারক, এই দুই পৃথক ভূমিকার কথা ধরে, আলোচনা করতে করতে প্রসঙ্গতঃ দেশী-বিদেশী কয়েকজন লেখকের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীকুমারবাবু প্রধানতঃ উপন্যাসের কথাসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই 'মোহিনী শক্তি'র অভাবের ইশারা করেছেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে ১৩৫৪-র আষাঢ় মাসে ছাপা "বাংলা উপন্যাস" বই-খানিতে তিনি বাংলা উপন্যাসের আদিকাল থেকে শুরু করে বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার এবং শরৎচন্দ্রের কথা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে ব'লে, পরিশেষে মাত্র বারো পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক ও পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারা বর্ণনা

করেছেন। এই আধুনিকতর উপন্যাস-ক্ষেত্রকে তিনি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে পূর্ববর্তী ধারাকে সমুদ্রপ্রবেশোন্মুখ নদী বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, আমাদের উপন্যাসে বিষয়-নির্বাচন, আলোচনা-পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রাক্তন আদর্শ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সাম্প্রতিকতর বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা তারই মধ্যে নানান্ বৈচিত্র্য ঘটিয়েছেন। এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের বহুতর বিচিত্রতার কথা মনে রেখে তিনি নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে কয়েকটি আধুনিক প্রবণতার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। একালের এইসব বিশেষত্বের মধ্যে একটি হোলো 'নিষিদ্ধ ও সমাজ বিগর্হিত প্রেম'-এর দিকে লেখকদের নজর। আগের আমলেও বাংলা উপন্যাসের অন্যতম প্রসঙ্গ হিসেবে এদিকটি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু হাল আমলের লেখকদের কলমে এই প্রসঙ্গই কেমন যেন অন্য মনোভঙ্গির তাড়নায় অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে। শ্রীকুমারবাবু এই কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের কথায়—'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাঙালী-সমাজে অবাঞ্ছিত প্রেমের বিরলত্ব সম্বন্ধে সচেতন আছেন বলিয়াই ইহার আবির্ভাবের পটভূমিকা রচনার দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন—ইহাকে হয় আদর্শলোকের উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্র করিয়াছেন না হয় যে বিপুল, অসংবরণীয় উচ্ছ্বাস ও প্রতিবেশ-বৈশিষ্ট্য হইতে ইহার উদ্ভব তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বারা ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়াছেন। ইহার অবৈধ প্রেমের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার পিছনে আছে উচ্চতর নীতিবোধের সমর্থন, বিদ্রোহের ঝাঁজ, বঞ্চিতের প্রতি ন্যায়-বিচারমূলক সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগের অনুপম রসমাধুর্য।' অপর পক্ষে হাল আমলের বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এই একই বিষয়ে বিপরীত মনোভাব দেখা গেছে। আবার, তাঁরই কথায়—'প্রথমতঃ ইহারা এইরূপ অবৈধ প্রেমের উদ্ভবকে বাঙালী-সমাজের একটি অতি সুলভ স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব রূপে গ্রহণ করিয়া ইহার সম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা কেমন করিয়া প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে জন্মিল, কি বিপুল হৃদয়াবেগের দোলায় আন্দোলিত হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিল তাহার কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ইঁহাদের উপন্যাসে মিলে না।' শ্রীকুমারবাবু এই প্রসঙ্গটি আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। এঁদের সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গ-নির্বাচনের ব্যাপারে যেমন, এঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গির ব্যাধিত (morbid) অবস্থা সম্বন্ধেও তেমনি,—শ্রীকুমারবাবু খুবই স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। সেটুকুও স্মরণীয়: 'অবিমিশ্র বাস্তববাদই ইঁহাদের প্রধান ধর্ম ও ইঁহাদের অনুসৃত প্রণালীর চূড়ান্ত সমর্থন এইরূপ দাবি ইঁহাদের তরফে করা হয়। কিন্তু আলোচনার মধ্যে যে সবসময় নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবানুসরণের পরিচয় মেলে তাহা মনে হয় না।...কোনো কোনো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ঔপন্যাসিকের প্রথম বয়সের রচনা পড়িলে মনে হয় যে নিছক কুৎসিৎ-প্রীতিই তাঁহাদের বিষয়-নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার ইঁহাদেরই পরবর্তী রচনায় বাস্তবানুগত্য অন্য দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—কর্দমের হোলি খেলার পরিবর্তে কাব্যপ্লাবনের জোয়ার আসিয়া বাস্তবতার ভিত্তি মূল পর্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে ও অতীন্দ্রিয় রহস্যের আভাস পারিজাতকুসুমসুরভির ন্যায় বাস্তব পরিবেশকে পরিব্যাপ্ত ও আচ্ছন্ন করিয়াছে।' উপন্যাস-লেখকের পক্ষে একথা যতই অপ্রীতিকর হোক্, সত্যের খাতিরে সমালোচকের এ মন্তব্য নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য।

এ-কালের বাংলা উপন্যাসের মধ্যে কোনো মহিমা বা কোনো প্রশংসনীয় শক্তির পরিচয় নেই—এ-রকম কথা কোনো সৎ-পাঠকেরই অভিপ্রেত নয়। উনিশ শ' তিরিশ থেকে উনিশ শ' ষাটের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের কথা বাদ দিলেও—অজস্র ভালো

উপন্যাস যে বেরিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এ'রা প্রত্যেকেই আমাদের স্মরণীয় উপন্যাস-শিল্পী। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ যে কতকটা প্রতিবেশ-নিরপেক্ষভাবে 'ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে দোলায়িত হৃদয়বৃত্তির ইতিহাস' লিখে গেছেন,—এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে 'সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে হৃদয়াবেগের স্বাধীনতার বিদ্রোহ' উচ্চারিত হয়েছিল, শ্রীকুমারবাবুর সে-বিশ্লেষণেই বা সন্দেহ কিসের? আর, শতাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী—আমাদের এই সাম্প্রতিকতম বর্তমানে, 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা' যে 'আজ সর্বগ্রাসী অভিভবে জীবনকে বজ্রমুষ্টিতে' চেপে ধরেছে, সে-কথাও সন্দেহাতীত। ফলে, তাঁরই কথায়—'আধুনিক ঔপন্যাসিক জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অন্তর্জীর্ণতার জন্যই কোনো সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসরণে অক্ষম। হৃদয়াবেগের মধ্যে যাহা তীক্ষ্ণতম অনুভূতি সেই প্রেমও আজ নানা জটিল সমস্যাজালে সমাচ্ছন্ন।'

এই শেষ মন্তব্য বিশেষভাবে সাম্প্রতিকতম বর্তমানের প্রসঙ্গেই বিবেচ্য। এতে আমাদের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষভাবে একজনকে ভালো বা অন্যজনকে মন্দ বলবার চেষ্টা নেই। বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিক প্রাচুর্য যে সৎ পাঠকের কাছে মোটেই উল্লাসের বিষয় নয়, সেই গূঢ় এবং গুরু কথাটাই এইসূত্রে স্বীকার্য। শিক্ষিত-অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী,—কল-কারখানার শ্রমিক,—কৃষিজীবী গ্রামবাসী,—যাযাবর, সাঁওতাল, বেদে, সাপুড়ে ইত্যাদি—যে-কোনো শ্রেণীর কথাই আসুক না কেন,—জীবনের বিস্ময় এবং বাস্তব-জগতের সম্ভাব্যতা কিছুতেই যেন আর মিশতে চাইছে না। শ্রীকুমারবাবু আরো লিখেছেন, 'অতি-আধুনিক উপন্যাসে হাস্যরসিকতার একান্ত অভাব'।

আধুনিক সাহিত্য

কবি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে এপর্যন্ত অন্ততঃ আটখানি বই দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে; তার বেশির ভাগ তাঁর জীবন কথা; তবে তাঁর সাহিত্যেরও নির্ভরযোগ্য পরিচয় দেবার চেষ্টা কেউ কেউ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ভিন্ন একালের আর কোনো সাহিত্যিক সম্বন্ধে এতগুলো বই বোধহয় লেখা হয়নি। নজরুল তাঁর কালে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন একালে তার ধারণা করাও কঠিন। তেমন উদ্দাম জনপ্রিয়তা যে কিছু-দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হবার পথে দাঁড়াবে এই স্বাভাবিক। নজরুলের জনপ্রিয়তাও লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বাহ্যতঃ হ্রাস পেলেও তাঁর প্রতি তাঁর স্বদেশবাসীর অন্তরের প্রেমপ্রীতি আজো যে কম নয় তাঁর সম্বন্ধে পর পর এতগুলো বই সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

তাঁর সম্বন্ধে যেসব বই লেখা হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য সম্পদ আছে। এর থেকে বোঝা যায় মানুষের চিত্তকে সহজে স্পর্শ করবার শক্তি তাঁর চরিত্রে ও সৃষ্টিতে প্রচুর ছিল। তবে এই সব বইয়ের মধ্যে দুখানিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছে—মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখিত নজরুল সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিকথা আর ডক্টর সুশীল-কুমার গুপ্ত লিখিত "নজরুল-চরিতমানস"।

গুপ্ত মহাশয় তাঁর বইখানিতে নজরুল-প্রতিভাকে দেখতে চেষ্টা করেছেন বৃহত্তর দেশ ও কালের পটে সাজিয়ে। বলা বাহুল্য এটি সার্থক পথে পদচারণা। কিন্তু এপথে বিপদও আছে—পশ্চাৎপট যদি অনাবশ্যকভাবে বিস্তৃত হয় তবে তা মূল ছবিটিকে ফুটিয়ে তুলতে তেমন সাহায্য নাও করতে পারে। এক্ষেত্রে তেমন ব্যাপার কিছু ঘটেছে। নজরুলের বিশেষ যোগ তাঁর কালের বাংলা সাহিত্য আর বাংলার ও ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে—সেই সঙ্গে সমসাময়িক কালের বৃহত্তর জগতের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও তাঁর কিছু যোগ ছিল। দূর কালের সাহিত্য, যেমন বৈষ্ণবসাহিত্য ও সুফীসাহিত্য, তারও সঙ্গে তাঁর কিছু যোগ ঘটেছিল; কিন্তু সে-যোগ ইতিহাস-সচেতন আদৌ নয়, বলা যেতে পারে সে-যোগ মরমী। গুপ্ত মহাশয় নজরুল-প্রতিভার এই বিশেষরূপের দিকে পুরোপুরি নজর রাখেননি বলে তাঁর ছবি মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়েছে, তাঁর বাণীও প্রয়োজনীয় তীক্ষ্ণতা লাভ করতে পারেনি। সাহিত্যে পরিমিতি খুব বড় ব্যাপার—শুধু রস-সাহিত্যে নয় আলোচনা-সাহিত্যেও।

কিন্তু এটি মোটের উপর এই বইয়ের অপ্রধান দিক, এর প্রধান দিক হচ্ছে নজরুলের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সৃষ্টির ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দান। সে কাজটি লেখক যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে নিষ্পন্ন করতে চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্য যা লাভ করেছেন তা প্রশংসার্হ। এসব ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলোচকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে তিনি পশ্চাৎপদ হননি, আর যোগ্যভাবে তা স্বীকারও করেছেন।

নজরুল মানুষটির প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধা, তাঁর সৃষ্টির মূল্য সম্বন্ধে অনেকখানি সন্দেহহীনতা লেখককে প্রেরণা দিয়েছে এই অপেক্ষাকৃত জটিল কাজটি হাতে নিতে। কারো

কারো এমন ধারণা আছে যে অনুরাগ সমালোচকের জন্য গুণ নয় বরং দোষ, কেননা, সেই অনুরাগ তাঁর বিচারে বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। কথাটা ভাববার মতো। অনুরাগ যে সময় সময় এমন অনর্থ না ঘটায় তা নয়। তবু এইটি এক বড় সত্য যে অনুরাগবিহীন হয়ে কেউ কখনো সমালোচনার ক্ষেত্রে সফল হতে পারে না। সমালোচকের মধ্যে একই সঙ্গে চাই অনুরাগ আর বিচারবোধ এই প্রায় পরস্পরবিরোধী গুণ। গুপ্ত মহাশয়ের মধ্যে অনুরাগের সম্বল যে আছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারের দিকটাও তাঁতে লক্ষণীয়—নজরুলের সাহিত্য-কৃতি সম্বন্ধে একালে যাঁরা খুব উৎসাহী নন এমন সব সমালোচকের মত উদ্ধৃত করে অনেকখানি পক্ষপাতহীন হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তিনি চেষ্টা করেছেন, আর মতবাদের অন্ধতার দিকেও তাঁর গতি নয়। এই সব গুণে বইখানি নজরুল সম্বন্ধে অনেকটা নির্ভরযোগ্য বিবরণ হয়েছে।

কিন্তু বিচারের দুর্বলতাও কখনো কখনো তাঁতে লক্ষণীয় হয়েছে সমালোচনা-শাস্ত্রের একটি বড় ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি যে তেমন সজাগ থাকেননি সেজন্য। সেই ত্রুটিটি হচ্ছে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে দেখার দিকে উক্ত শাস্ত্রের বেশি ঝোঁক। অবশ্য প্রয়োজনের খাতিরে একাজটি কখনো কখনো করতে হয়; কিন্তু সব সময় এ-চেতনা থাকা চাই যে এই বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজানো কাজটি দুদণ্ডের খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়। কোনো মানুষকেই যেমন সোজাসুজি পাপী বা পুণ্যাত্মা বলা যায় না তেমনি কোনো সাহিত্য-কারকে সোজাসুজি realist বা idealist, দেহবাদী বা অতীন্দ্রিয়পন্থী এসব বলা যায় না—যাঁরা বলেন তাঁরা নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনেন অর্থাৎ অসার্থকতার পথে পা বাড়ান। গুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী কবিদের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তেমনি বিপদ ডেকে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বিশেষিত করেছেন অধ্যাত্মবাদী অতীন্দ্রিয়-পন্থী এইসব বিশেষণ দিয়ে আর তাঁর পরবর্তী সত্যেন দত্ত, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল ও নজরুলকে ফেলেছেন তাঁর বিরুদ্ধ দলে—এঁদের বিশেষিত করেছেন দেহবাদী বাস্তব-বাদী এইসব বিশেষণ দিয়ে যদিও গুপ্ত মহাশয়ের অজানা থাকবার কথা নয় যে রবীন্দ্রনাথ বারবার নানা ভঙ্গিতে বলেছেন, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার', বাংলার পল্লীর অপূর্ব ছবি এঁকেছেন তাঁর গল্পগুচ্ছে, আর তাঁর ধর্ম-সাধনায় মানুষ ঈশ্বরেরই মতো মর্যাদা পেয়েছে। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের চিন্তা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু স্বতন্ত্র পথ নিয়েছিল, তাই তাঁদের রবীন্দ্র-চিন্তার বিরুদ্ধবাদী ভাবা যেতেও পারে, কিন্তু সত্যেন দত্ত ও নজরুল এমন দাবি আভাসে ইঙ্গিতেও জানাননি, বরং যে মানবিকতা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা বড় সুর তাই ধ্বনিত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে, আর নজরুলের সাম্যবাদ যে মূলত উদার মানবিকতা, তাঁর ঈশ্বরদ্রোহ যে এক ধরনের অভিমান, সে কথা গুপ্ত মহাশয় নিজেও মাঝে মাঝে বলেছেন আর তাঁর বইতে উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর এই বিখ্যাত উক্তিটি :

দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি।
একা তুমি জানিতে হে, কবি মহাঋষি
তোমারি বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু।

এরপর তাঁকে রবীন্দ্রনাথের বিরোধীদলের একজন কবি রূপে দাঁড় করানোর সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। বলা বাহুল্য মিল বা আত্মিক যোগ থাকার অর্থ একাকার হওয়া

কদাচ নয়। সত্যকার প্রতিভা যেখানে আছে সেখানে প্রকাশ কিছু স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হবেই। আর একালের অর্থাৎ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে এই বড় কথাটা ভোলা উচিত নয় যে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু লেখা বাদ দিলে আমাদের একালের সাহিত্য রোমান্টিক ভিন্ন আর কিছু হয়নি—রবীন্দ্রনাথ যতখানি রোমান্টিক তার চাইতে অনেক বেশি রোমান্টিক (গ্যেটের ভাষায় রুগ্‌ণ) এই সাহিত্য।

একালের অনেক সমালোচকের মতো গুপ্ত মহাশয়ও এবিষয়ে সচেতন যে প্রকাশের ত্রুটি নজরুলের রচনায় বেশ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও নজরুল-সাহিত্যের শাশ্বত মূল্য অল্প নয় এই তিনি ভেবেছেন, কেননা, নজরুল জনজাগরণের কবি আর সেই জনজাগরণ উত্তরোত্তর বাড়বে বৈ কমবে না। কিন্তু ব্যাপারটি আরো জটিল। উৎকৃষ্ট প্রাণোদ্দীপক চিন্তার মূল্য যে সাহিত্যে কম তা নয়, কিন্তু সাহিত্যরূপে সার্থক হতে হলে সেই চিন্তার উৎকৃষ্ট রূপ পাওয়া চাই। নজরুলের উৎকৃষ্ট চিন্তা (ধরুন 'সাম্যবাদী'তে তাঁর যে সব চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে সে সব) কি উৎকৃষ্ট রূপ পেয়েছে? পায়নি এই কথাই বলতে হবে, কেননা, আবেগ এসব কবিতার মধ্যে অনেকখানি তরল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই সব কথা ভেবেই এক সময় আমি বলেছিলাম, নজরুল কবি যত বড় তার চাইতে অনেক বেশি তিনি যুগ-মানব। কিন্তু পরে আমার সেই মত বদ্‌লে' আমি স্বীকার করি যে কবিরূপেও নজরুল বড়—অবশ্য তাঁর সার্থক কবিতার বা রচনার পরিমাণ অত্যন্ত কম। কিন্তু যত কমই হোক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর বাণী যখন কখনো কখনো লাভ করেছে তখন তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদাই দিতে হবে।

গুপ্ত মহাশয় নজরুলের গানকে মনে করেছেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। আমরাও তাঁর গানের উচ্চ মূল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। তবে তাঁর তেমন গানের সংখ্যা কম। আর তাঁর কিছু কবিতাও যে উচ্চ মর্যাদার সে কথা আমরা বলেছি।

কিন্তু নজরুলের গানগুলো তো হারিয়ে যাবার পথে দাঁড়িয়েছে। সেগুলো খুব কম গাওয়া হয়—তার ফলে গানগুলোর সুর যে অল্পদিনেই হারিয়ে যাবে সে সম্ভাবনা যথেষ্ট। নজরুলের এই মূল্যবান সৃষ্টির সংরক্ষণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ত্যাগ করবার দিন আমাদের শিক্ষিত সমাজের এসেছে।

গুপ্ত মহাশয়কে তাঁর এই বইখানির জন্য পুনরায় সাধুবাদ জানাই। আশা করি অচিরে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং তখন এর সমৃদ্ধতর রূপ আমরা দেখতে পাব।*

কাজী আব্দুল ওদুদ

* নজরুল চরিতমানস—ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত। ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০৲ টাকা।

সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য—শ্রীসজনীকান্ত দাস। শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন। কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [প্রথম খণ্ড]—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ন বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ। কলিকাতা-৯। মূল্য বারো টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ—শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থ-ভবন। কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রসঙ্গে এবং তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার গুরুত্বের কথা ভোলবার নয়। সজনীকান্তের নিজের কথাতেই এই বিষয়টির প্রধান দিকটি আলোকিত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিজ্ঞানধর্মী আধুনিক কালে, যুক্তির সাহায্যে সর্ববিধ সংস্কার-মুক্তির প্রয়াসের মধ্যে। কোনও সংকটকালের পথনির্দেশক অর্থাৎ ধর্ম-প্রবর্তকরূপেও তিনি আসেননি। তিনি এসেছিলেন কবি হিসেবে, সাহিত্যশিল্পী হিসেবে, সংগীতস্রষ্টা হিসেবে। কিন্তু এই কবি-কর্মের মধ্যেই তিনি মানুষের চিত্তকে এমন ভাবে অধিকার করেছিলেন যে, এই সংশয়শাসিত যুগেই তিনি অনুরূপ বিপর্যয় ঘটিয়ে গেছেন; ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, শিক্ষা, সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার—সমস্ত কিছু প্রভাবান্বিত হয়েছে তাঁর সংস্পর্শে।...তিনি শুধু যুগপ্রবর্তক মাত্র রইলেন না, সমস্ত যুগটাই তাঁতে বিধৃত হয়ে রইল।'

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী সামনের পঁচিশে বৈশাখে। এ সময়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা বই বেরুবে। শ্রীসজনীকান্ত দাস বাংলা সাহিত্যের নানা আধুনিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তাঁর এ বইখানি সেই মহোৎসবের মরশুমী অর্ঘ্য তো বটেই,—তা ছাড়া আরো কিছু। সজনীকান্ত তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন 'আমরা মনে মনে তাঁহার বাণী-মূর্তি ধ্যান করি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহাই হইতেছে সকলের বড় খবর।' এবং তিনি আরো বলেছেন,—রবীন্দ্রনাথ যেহেতু গ্রামোফোন ফোটোগ্রাফি রেডিও সিনেমার যুগে বাস করে গেছেন,—আধুনিক যুগের এইসব সুযোগ-দুর্যোগের ফলে তাঁর বাণীমূর্তি ব্যতীত তাঁর সম্বন্ধে লৌকিক অন্যান্য নানান তথ্য টুকরো টুকরোভাবে পুঞ্জিত হয়ে আছে। লেখক এই দু'দিকেই দৃষ্টি রেখে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন এবং এ-বইয়ে সেগুলি এক-সঙ্গে ছেপে দিয়েছেন। 'রবীন্দ্র জীবনীর নূতন উপকরণ' অধ্যায়টি এবং বইয়ের শেষ অধ্যায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' রবীন্দ্র-চর্চার সুবিপুল আয়োজনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ', 'শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ', 'কর্মী রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলির তুলনায় 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ', 'রবির পূর্ণ উদয়' এবং 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি'—এই তিনটি লেখা তথ্যের দিক থেকে বেশি সমৃদ্ধ। 'রবি-রশ্মি' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-আদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য বিচিত্র কথার অতি সুন্দর সংকলন। তাছাড়া 'রবির পূর্ণ উদয়' নিবন্ধটিতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর *Sophia* পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধব

উপাধ্যায়ের 'The World Poet of Bengal' প্রবন্ধটি এবং ১৩০৭ সালে ৩০এ চৈত্র তারিখে লেখা চন্দ্রনাথ বসুর একখানি চিঠি দেখা গেল। এ তথ্যগুলি পরিচিত তথ্য বটে, তবু এখানে এ-সবের উল্লেখ খুবই সংগত এবং বিশেষ স্মরণীয়।

'রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুমুখী প্রকাশ' নামে লেখাটি সত্যিকার সৎ পাঠকের রচনা। সজনীকান্ত তাঁর স্বভাববশেই একাধারে অভিনিবেশশীল পাঠক এবং অপ্রিয়ভাষী সমালোচক বলে পরিচিত। তাঁর এই বইখানিতে তিনি কিন্তু তাঁর স্বভাবের এই দ্বিতীয় 'ভাব'টি সম্পূর্ণ উহ্য বা স্থগিত রেখেছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নামে এ বই উৎসর্গ করা হয়েছে। আড়াইশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই বইখানি সব দিক দিয়ে চমৎকার। আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে বৃহৎ বিস্তার এবং বিপুল গভীরতা একসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্ব বলতে যা বোঝায়, সেটা দেখতে হলে খুঁটিয়ে সর্বাঙ্গও দেখতে হয়, আবার পূর্ণ রবীন্দ্র-সত্তাকেও দেখতে হয়। একই প্রয়াসে এই দু'কাজ সাধিত করা সহজ নয়। সজনীবাবু তা করেননি। তবে, তাঁর ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে এই বলে খেদ প্রকাশ করেছেন যে, বাঙালী রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পদকে সম্যক মর্যাদা দিতে আজও শেখেনি! তাঁর এই বইখানি সেদিকে বাঙালী পাঠককে একটু নাড়া দেবে। 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' অধ্যায়ে ১২৯২ সালের চৈত্রের 'বালক' (১৮৮৬ মার্চ) পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'অবসাদ' কবিতাটি এ-বইয়ে পুরোপুরি ছেপে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা সম্বন্ধে উৎসাহী গবেষকের তিনি খুবই সাহায্য করেছেন। তবে, ঐ কবিতার তারিখ হিসেবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই দিনটি কেন যে অগ্রাহ্য হবে, সে-বিষয়ে তাঁর যুক্তি উপযুক্ত রকম অকাট্য বলে মনে হোলো না। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাতেই লিখেছিলেন :

পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মের অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথের এই অঙ্গীকারের এবং তাঁর জীবনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিপুলতার স্বাদ আছে সজনীকান্তের এই বইখানিতে।

রামগতি ন্যায়রত্ন বা হারানচন্দ্র রক্ষিত যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছিলেন, তখন থেকে আজকের আমল পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার সংখ্যা কিছু কম নয়। আজকাল ইস্কুল-কলেজে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেহেতু পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, সেজন্যে এ বিষয়ে নানা বই যে লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও আরো অনেক হবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে অজস্র বইয়ের মধ্যে এ-বিষয়ে স্মরণীয়তম লেখা বোধ হয়, আদিতে দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—এবং তারপরে, একাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস"। দীনেশচন্দ্রের বইখানির প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুকুমারবাবুর বইয়ের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনলিপি ছাপা হয়েছে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকখানি ছোটো-বড়ো বই বেরিয়েছে। তারপর ১৯৫৯-এ অধ্যাপক অসিতকুমারের 'বাংলা সাহিত্যের ইতি-বৃত্ত' গ্রন্থমালার এই প্রথম খণ্ড ছাপা হয়েছে।

বৃহদায়তন এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঞ্চল বা বিশেষ

বিশেষ প্রসঙ্গের দিকে নজর রেখে কেউ কেউ এ-দিকে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বইও লিখেছেন—যেমন, ইংরেজিতে লেখা প্রিয়রঞ্জন সেনের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা, অথবা, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গঠন পর্বের ওপর বিশেষ নজর রেখে লেখা সজনীকান্ত দাসের বাংলা বইখানি। কয়েকজন অধ্যাপক ইংরেজিতেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন। সুকুমারবাবুর লেখা অনেকগুলি বইয়ের কথা মনে পড়ে।

অসিতকুমার তাঁর এই বইখানির নিবেদনে বলেছেন—'এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বসূরিগণ যে-সমস্ত গবেষণা করিয়াছেন, আমি তাহা হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানসের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।' তাঁর বইয়ের এই প্রথম খণ্ডে খৃীষ্টাব্দের দশম শতক থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতক অবধি—অর্থাৎ চর্যাপদ থেকে মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছরের বাংলা সাহিত্য-প্রবাহ—এবং সেই সঙ্গে, এই সময়-সীমানার মধ্যে বাংলা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-পরিবেশের প্রাসঙ্গিক ঘটনাধারা,—আর, তৃতীয়তঃ প্রত্যেক পর্বের বাংলা সাহিত্য-সংবাদের পাশাপাশি য়ুরোপীয় সাহিত্যের তৎকালীন পরিচিতি এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে এক-একটি পর্বের বাংলা সাহিত্যের তুলনা গ্রন্থভুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। আজকাল তুলনাভিত্তিক সাহিত্য অধ্যয়ন-অধ্যাপনার রেওয়াজ হয়েছে। সেদিক থেকে এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই লেখকের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। অবিশ্যি এরকম তুলনার চেষ্টা সকলের পক্ষে সব ক্ষেত্রে সংগত হয় না। তবে এই বইখানিতে মাত্র দুটি পর্বের সীমা ধরে নিয়ে—প্রথম পর্বে দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত, আর দ্বিতীয় পর্বে ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে পঞ্চদশের শেষ—১৪৯৩ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত—মোট এই দুটি সময়-বিভাগের মধ্যেই তুলনার কাজটুকু করা হয়েছে। অন্যান্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে তাঁর মতামত অন্যান্য সাহিত্য-ঐতিহাসিকের বই থেকে নেওয়া। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক খবরাখবর প্রধানতঃ 'পূর্বসূরিগণের' গবেষণালব্ধ। অসিতকুমার নিজে পরিশ্রম করে তথ্যগুলি সাজিয়ে দিয়েছেন। এবং এই বিন্যাসভঙ্গিটি তাঁর নিজস্ব।

বাংলায় দীনেশচন্দ্র এবং সুকুমার সেন এই দুই প্রসিদ্ধ সাহিত্য-ইতিহাসপ্রণেতাই দীর্ঘকালের অধ্যয়ন, সংগ্রহ এবং ভূয়োদর্শিতার অধিকারে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, অধ্যাপক, সমালোচক, গবেষক সকলেরই সমাদর লাভ করেছেন। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের যোগ্য অনুসরণকারী,—সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র ছাত্রপাঠ্য বই হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু এ বইখানি সে জাতের নয়। অধ্যাপকের তথ্য-সতর্কতার সঙ্গে সৎ-পাঠকের আস্বাদন-সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া গেল এর নানান অংশে। দেহোল্লাস বর্ণনায় ভর্তৃহরি বা অমরুকবির সঙ্গে বিদ্যাপতির পার্থক্যের আলোচনায় (পৃঃ ৪১৬-৪১৭), শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যপরিচয় অংশে (পৃঃ ৩৩৩-৩৪৭), কৃত্তিবাসের কবিত্ব প্রসঙ্গে (পৃঃ ৫৫০-৫৬০) এবং আরো কয়েকটি জায়গায় তাঁর সতর্কতা খুবই প্রশংসনীয়। তবে 'চর্যায় কাব্যরস' কথাটাই কেমন যেন হাস্যরসের ইশারা! কোনো রকম উগ্র পক্ষপাতিত্ব না করেও, চর্যাপদে যে কবিত্ব খুবই বিরল, সে-কথা বলতে আপত্তি কিসের?

কিন্তু এ-রকম দুয়েকটি ব্যাপার এ-আলোচনা সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক মন্তব্য মাত্র। অসিতকুমার খুবই বড়ো কাজে হাত দিয়েছেন। প্রশংসাই তাঁর প্রাপ্য। পরের খণ্ডগুলির জন্যে প্রতীক্ষা জেগে থাকবে পাঠকদের মনে মনে।

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একখানি চিঠি থেকেই প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া গেছে। সতেরোর শতকে একাধিক আহোম-রাজের লেখা আরো কয়েকখানি চিঠি পাওয়া যায়। কিছু কিছু দলিলপত্রও রয়েছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন যে সতেরোর শতকের অনেক আগেই 'বাংলা সাধু-ভাষার সার্বভৌমিক রূপ ভূমিষ্ঠ' হয়েছিল! ঐ শতকেরই শেষদিকে—১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একখানি বাংলা চুক্তিপত্রের নমুনা আছে ব্রিটিশ মিউজিয়মে—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তার প্রতিলিপিও ছাপা হয়ে গেছে। আঠারোর শতকের দলিল-পত্রের মধ্যে কোচবিহারের মহারাজের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সন্ধিপত্রখানি মূল্যবান। "কোচবিহারের ইতিহাস" [প্রথম খণ্ড] যাঁদের দেখবার সুযোগ হয়েছে, তাঁরা সে-দলিলও দেখেছেন। সতেরো-আঠারো শতকে বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে কেউ কেউ গদ্যে-পদ্যে সাধনা-সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর লিখে গেছেন। সেগুলি 'কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে নকল-করা এই রকম এক রচনাতেই যথার্থ সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম নমুনা পাওয়া যায় বলে সুকুমারবাবুর বিশ্বাস। সতেরোর শেষে, আঠারোর শতকের প্রথমে—নেপালে লেখা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস প্রসঙ্গে এক নাট্যরচনার মধ্যে সাধু বাংলা গদ্যের নমুনা বিদ্যমান। এ-ছাড়া সে-সময়ের অন্যান্য কিছু কিছু লেখাতেও—যেমন, ভাষাপরিচ্ছেদের খণ্ডিত অনুবাদে, কোনো কোনো বৈদ্যক পুঁথিতে, বিক্রমাদিত্য-বেতাল কাহিনীতে বাংলা গদ্যের উদাহরণ আছে। সতেরোর শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভূষণার এক জমিদার-পুত্রকে মগ দস্যুরা ধরে নিয়ে যায়। এক পোর্তুগীজ পাদ্রি তাকে উদ্ধার করে রোম্যান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তার নাম রাখেন দোম্ আন্তোনিও। এই দোম্ আন্তোনিও নিজেও পাদ্রী হয়েছিলেন। "ব্রাহ্মণ রোম্যান ক্যাথলিক সংবাদ" নামে তিনি যে প্রশ্নোত্তর-পর্যায়ের বই লিখেছিলেন, আঠারোর শতকের প্রথম দিকেই পাদ্রী মানোএল-দ্য আস্সুম্প্সাম্ পোর্তুগীজ ভাষায় তার অনুবাদ করেন। দোম্ আন্তোনিওর ভাষা আঞ্চলিক নয়, সেটা ছিল 'সর্ববঙ্গীয় সাধুভাষা'। অবিশ্যি তাতে পূর্ববাংলার কথ্য ভাষার ছাপ থেকে গেছে। সেই অনুবাদক মানোএলই ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে বাস করবার সময়ে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে "কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ" লিখেছিলেন। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্বন শহরে রোম্যান হরপে সে বই ছাপা হয়েছিল। সেই আরবী-ফারসী শব্দ-কণ্টকিত, ব্যাকরণের নানা ত্রুটিময়, ভাওয়ালের উপভাষা-খচিত বইখানিই আমাদের প্রথম ছাপা বাংলা বই!

তারপর, উনিশ শতকের আদিপর্বে ইংরেজ-আমলেই প্রথম বাংলা গদ্য-চর্চা শুরু হয়। তার আগেই ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোম্পানিরই অন্যতম কর্মচারী ন্যাথেনিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড একখানি বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি থেকে সে-বই ছাপা হয় এবং তাতেই প্রথম বাংলা হরপ ব্যবহৃত হয়। সেই হ্যালহেড-উইলকিন্স-জোন্সের আমল থেকে শুরু করে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ আর শ্রীরামপুর খ্রীষ্টীয় মিশনের কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ড এবং তাঁদের অনুকূল-প্রতিকূল বাঙালী গদ্য-লেখকদের উদ্যমের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ বাংলা গদ্য নেমে এসেছে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগরে,—অক্ষয় দত্ত-বিদ্যাসাগরের গদ্য-রচনার পাশাপাশি বয়ে গেছে প্যারীচাঁদ মিত্র আর কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য-ধারা,—বঙ্কিমচন্দ্র নানা রকম গদ্য লিখেছেন,—বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথ,—রবীন্দ্রনাথের সমকালে অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং নবীনতর অন্যান্যেরা!

অধ্যাপক সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যে গদ্য" বইখানি এই সুদীর্ঘ তথ্যবহুল ধারা সম্বন্ধে আকর-গ্রন্থ। তিনিই শ্যামলকুমারের এ-আলোচনার 'পরিচিতি' লিখে দিয়েছেন। বাংলা গদ্যের গঠন-বিশ্লেষণের এবং গদ্য-বাহিত সাহিত্যের সঙ্গে গদ্য-বাহনের যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক কাজের সূচনা ঘটেছিল দীনেশচন্দ্রের বাংলা গদ্য-শৈলী সম্পর্কিত ইংরেজি বইখানিতে। অধ্যাপক শ্যামলকুমার সেই ধারার নবীনতম আলোচক। তিনি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আয়োজনের মধ্যে বাংলা গদ্যের চিত্তাকর্ষক ইতিহাস সাজাবার চেষ্টা করেছেন।

হরপ্রসাদ মিত্র

রমেশ রচনাবলী—যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। মূল্য নয় টাকা।
রমেশচন্দ্র দত্ত প্রবন্ধ সংকলন—নিখিল সেন সম্পাদিত। এভারেস্ট বুক হাউস। মূল্য পাঁচ টাকা।
বঙ্গ সাহিত্য সম্ভার—প্রতিভাকান্ত মৈত্র সম্পাদিত। দি বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য ছয় টাকা।

পিছনের দিকে ফিরে তাকানো যে কোন কোন ক্ষেত্রে লাভজনক হতে পারে শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্য-পাঠক তাই গম্যমান সাহিত্যের সঙ্গেই দূর-পুরাতন বা নিকট-পুরাতন সাহিত্যেও সমান উৎসাহী। এবং তাঁর-ই অনির্বাণ উৎসাহের ফলে বিস্মৃতি সাহিত্যের মূল্যবান কর্মকৃতিকে কখনো সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ফেলতে পারে না।

এই ধরনের পাঠক অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও বর্তমান। প্রমাণ যোগেশ-চন্দ্র বাগল, নিখিল সেন, প্রতিভাকান্ত মৈত্র। তাঁরা সম্প্রতি বিগত দিনের বাংলা সাহিত্যের পুনরুদ্ধার-কর্মে যে সনিষ্ঠ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহেই প্রশংসাযোগ্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ইতি-মধ্যেই গবেষক ও সাহিত্যসন্ধিৎসুমহলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর রচনাবলী স্বয়ংমূল্যে প্রতিষ্ঠিত। সম্পাদনা-কর্মেও তাঁর দক্ষতা অবিসংবাদী। ইতিপূর্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক রচনাবলীর একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ উপহার দিয়েছেন বাঙালী পাঠকসমাজকে, সম্প্রতি রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসসংগ্রহ—বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার, এবং সমাজ—সম্পাদনা করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা হিসাবে রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তাঁর প্রথম চারটি উপন্যাসও জনপ্রিয়, অন্তত এক সময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু সামাজিক উপন্যাসেও যে তিনি উল্লেখ্যরকমের মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ সংসার, সমাজ এবং "সংসার"-এর পরিবর্তিত রূপ সংসার-কথা। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"-য় রমেশচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত বাগল তাঁর ভূমিকায় ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র সম্পর্কে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সেই আলোচনাটি, বলতে গেলে, প্রায় পূর্ণতঃই উদ্ধৃত করেছেন। এর ফলে "রমেশ-রচনাবলী"-র পাঠক উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে, তবে ভূমিকাকারের কাছে পাঠকের রমেশ-সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণী আলোচনার প্রত্যাশা অপূর্ণ রয়ে গেছে। রমেশ সাহিত্য সম্পর্কে শ্রীবাগলের যে দু-একটি প্রাসঙ্গিক পংক্তি আছে তা মূলতঃ ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বা উক্তির-ই প্রতিধ্বনি। তবে তাঁর ভূমিকা যে রমেশচন্দ্রের জীবন-কথা ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কীয় তথ্যসম্ভারে ঐশ্বর্যবান তা অবশ্যস্বীকার্য।

রমেশচন্দ্র শুধুমাত্র উপন্যাসরচনার মধ্যেই যে তাঁর সাহিত্যচর্চা সীমাবন্ধ রাখেননি, এ তথ্য শিক্ষিত ও গবেষকসমাজের অজ্ঞাত না হলেও বৃহত্তর পাঠক-সমাজের বোধ করি তেমন ঘনিষ্ঠভাবে এতদিন জানা ছিল না। এতদিন, কিন্তু এখন নয়, কারণ সম্প্রতি নিখিল সেন পুরোনো সাময়িক পত্রিকার ফাইল থেকে মনস্বী রমেশচন্দ্রের মূল্যবান বাংলা প্রবন্ধ-গুলি উদ্ধার করে সমালোচ্য "রমেশচন্দ্র দত্ত—প্রবন্ধ সংকলন" নামে প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য-ইতিহাস ও অর্থনীতি-বিষয়ক মোট চোদ্দটি প্রবন্ধের সমবায়ে প্রকাশিত এই সংকলন-গ্রন্থে যে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী, গভীর পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণীক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তা এ কালীন বাংলা সাহিত্যেও দুর্লভ। সাহিত্যে কেন, সামগ্রিকভাবেই বলা যায়, রমেশচন্দ্রের মতো মননশীল ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভা বর্তমানে বিরলদৃষ্ট। রমেশচন্দ্রের চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতার উদাহরণ 'উন্নতির যুগ', যথার্থ ইতিহাসবোধের প্রতিফলন হিসাবেও যা অভিনন্দনযোগ্য। 'সোমনাথের মন্দিরের ধ্বংস বা পলাশীর যুদ্ধের কথাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে না' (পৃ. ৫২) বা 'অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাস তুলনা করিয়া পাঠ করিলে আমরা জগতের ইতিহাস বুঝিতে পারি, এবং ঘটনাবলীর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও নিয়মগুলি স্থির করিতে পারি' (পৃ. ৪০) ইত্যাকার মন্তব্যগুলি আজ থেকে ৬৮।৬৯ বছর আগে এমন একজনের লেখা যিনি পেশাগতভাবে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন না অথচ এখনও পর্যন্ত এমন কি কোন সুপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসগ্রন্থের নাম করতে পারি যা রমেশচন্দ্রের উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্য দু'টিকে সার্থক করে তুলতে পেরেছে? কিংবা তাঁর কীর্তিস্তম্ভ-প্রতিম "দি ইকনমিক হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া"-র মতো ক'খানা বই বেরিয়েছে? ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশেষত আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার দিকে ক'জন পন্ডিত মনঃসংযোগ করেছেন? বর্তমান সংকলনে 'বৃটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি', 'ভারতীয় দুর্ভিক্ষ' ইত্যাদি অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্রের বাংলা রচনাবলীর কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শন। তেমনি উল্লেখ করা যায়, 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' বা 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-এর মতো সাহিত্য-প্রবন্ধের, যেখানে পাঠক একজন যথার্থ সাহিত্যরসজ্ঞ ও সাহিত্যকারের সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিংবা উল্লেখ করা যায় 'ঋগ্বেদের দেবগণ' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ যেখানে সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র পুরাতাত্ত্বিক রমেশচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন। এই সংকলনে গ্রথিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে যে সাধারণ মন্তব্য করা যায় তা শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ভূমিকাতে বলেছেন : 'সকল সময়েই রমেশচন্দ্রের রচনার মধ্যে দুটী লক্ষণ খুবই পরিস্ফুট। প্রথমটি হল তাঁর মোহমুক্ত বিচারশীল মন। দ্বিতীয়টি হল, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীসিংহের ভূমিকাটি সুলিখিত। 'নিবেদন' অংশে সম্পাদক নিখিল সেন রমেশচন্দ্রের সাহিত্যজীবন ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা তথ্যনিষ্ঠ ও সুখপাঠ্য। 'আপন কথা' অধ্যায়ে রমেশচন্দ্রের জীবন ও রমেশ রচনাবলীর একটি তালিকা

সন্নিবেশিত হওয়াতে বইটির মূল্য বেড়েছে। এক কথায়, রমেশচন্দ্রের মতো একজন মননশীল প্রবন্ধকারকে বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য নিখিল সেন সাহিত্যসন্ধিৎসু বাঙালি পাঠকদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

নিখিল সেনের মতো আরও একজন বাঙালি পাঠকের ধন্যবাদভাজন। তিনি অধ্যাপক ও গবেষক শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্র। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুনরুদ্ধারের দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা "বঙ্গসাহিত্য সম্ভার" (প্রথম খণ্ড)। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি', ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতা, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এবং ভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'—এই সমস্ত গদ্য-ও-পদ্যকর্মের গ্রন্থনায় "বঙ্গসাহিত্য সম্ভার"-এর আত্মপ্রকাশ। যদিও এই সমস্ত রচনার অধিকাংশেই সাহিত্যিক মূল্য বলতে গেলে বিশেষ কিছুই নেই, তবু সাহিত্যের ঐতিহাসিক, শিক্ষিত সাহিত্যপাঠক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এদের মূল্য কম নয়। যেমন বাংলা গদ্যের সূচনা-পর্বের নমুনা হিসাবে 'রাজাবলি'র বা 'নববাবু-বিলাস'-এর গদ্যের উল্লেখ করা যায় এবং এই নমুনা সাহিত্যগবেষক শুধু নয়, সাধারণ সাহিত্যরসিকের কাছেও আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে। কিংবা উনিশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপাদান লাভেচ্ছু ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীকে পাঠ করতে হবে ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'বিধবা-বিবাহ', 'ছদ্ম মিশনারী' বা 'কৌলীন্য' প্রভৃতি সমাজবিষয়ক কবিতা। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই সব লেখার প্রধান মূল্য সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক, পুনরুক্তির সুরে বলি, সাহিত্যিক মূল্য এদের খুবই কম, নেই বললেই চলে। এবং লেখক হিসাবে ভবানীচরণ ও ঈশ্বর গুপ্ত একই শ্রেণীর, মনোভঙ্গীতে উভয়ের সাধর্ম্য লক্ষণীয়রকমের। শ্রীযুক্ত মৈত্র ভবানীচরণ সম্পর্কে বলেছেন : 'রুচি, আদর্শ, যুক্তির নিয়ম বারে বারে লঙ্ঘিত হয় বিশেষ ক'রে রক্ষণশীলদের দ্বারা : অপরিচিত প্রথাকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব যেহেতু তাঁদের থাকে না, সেই হেতু লঘুব্যঙ্গের অস্ত্রক্ষেপ তাঁদের সহজ আয়ত্তে থাকে। ভবানীচরণ এই ব্যঙ্গরসের শিল্পী' (পৃ. ॥৶) এবং ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'সমাজ-সংস্কারের বা ধর্মমতের ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল, ভবানীচরণেরই উত্তর সাধক।' শ্রীমৈত্রের এই উক্তি দুটি যথার্থভাবে সত্য। কিন্তু তিনি যে-ভাবে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে 'জীবনে জাগ্রত আধুনিকতার নানা লক্ষণ' দেখেছেন, আমি সে-ভাবে গুপ্ত কবিকে বিচার করতে অপারগ। ঈশ্বর গুপ্ত মৌলত প্রাচীনলগ্ন, নবীনের বিরোধী, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোক-স্পর্শ-বঞ্চিত। রেনেশাঁসের সার্থক প্রতিভূ বঙ্কিম-মধুসূদনের জগত থেকে তিনি বহু দূরে অবস্থান করতেন। গুপ্ত কবি সম্পর্কে এই স্বয়ংপ্রভ মূল্যায়নের ভিত্তিতে বলা যায়, তাঁর মধ্যে আবিষ্কৃত আধুনিকতার লক্ষণগুলি তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জৈব সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। মৈত্র মহাশয়ের আর-একটি উক্তি (ভবানীচরণ আদির রচনার) 'ব্যঙ্গরস উনিশ শতকে বাঙালীর নবজাগরণ-যুগে সাহিত্যের প্রায় প্রধান রসরূপে কাজ করেছে' গ্রহণ করতে বাধে। নবজাগরণ-যুগের দুই স্তম্ভপ্রতিম সাহিত্যিক বঙ্কিম বা মধুসূদনের সাহিত্য সম্পর্কে এই ধরনের সাধারণ মন্তব্য কতখানি প্রযোজ্য? বঙ্কিমী ব্যঙ্গরসের নিদর্শন "কমলাকান্তের দপ্তর"কে কোনভাবেই তৎকালীন কোন ব্যঙ্গরচনার সঙ্গে তুলনা করা যায় না, "কমলাকান্তের দপ্তর" বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয়-রকমের অনন্য সৃষ্টিসমূহের অন্যতম। মধুসূদনের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" বা "একেই কি বলে সভ্যতা"'র ব্যঙ্গরসও ভবানীচরণ-আদির ব্যঙ্গরচনা থেকে গুণগতভাবে পৃথক, যদিও

মধুসূদনের সৃষ্টি হিসাবে এরা কিছুটা বিবর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বা মধুসূদনের কাব্যকর্ম—নবজাগরণের যুগের প্রতিনিধি-সৃষ্টি—এদের মধ্যে 'ব্যঙ্গরস কি প্রধান রসরূপে কাজ করেছে' বলা যায়?

শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্রের ভূমিকাটি সুলিখিত বলেই তাঁর দু-একটি অভিমত নিয়ে এত কথা বললাম। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যকে বিচার করার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে, উনিশ শতকের বাঙালী মানসতাকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের প্রয়াস তাঁর ভূমিকায় পরিকীর্ণ।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

শেষ গ্রীষ্ম— বরিস পাস্তারনেক। অনুবাদ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কবি হিসেবে বরিস পাস্তারনেক আমাদের দেশে অনাবিষ্কৃত ছিলেন না, তাঁর দু'একটি কবিতার বাংলা অনুবাদও চোখে পড়েছে মনে হয়। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগ্রন্থ "ডাক্তার জিভাগো" সম্মান ও অসম্মানের সাদাকালো রেখায় তাঁকে সহসা যেমন বিচিত্র এবং দ্রষ্টব্য করে তুলেছে, তা আমাদের তো বটেই পাস্তারনেকেরও অকল্পনীয় ছিল। "ডাক্তার জিভাগো"-কে এ যুগের মহত্তম উপন্যাস বলা হ'য়েছে। উপন্যাস তখনই মহত্তম হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, যখন তা কোনো সমাজের এক বিশেষ কালের যন্ত্রণা ও আশাআকাঙ্ক্ষার আলেখ্য চরিত্রসৃষ্টির মারফৎ জীবন্ত করে তোলে। এর ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বালজাক ও টলস্টয়। এবং এই মানদণ্ডে "ডাক্তার জিভাগো" খণ্ডিত ও একপেশে মনে হলে দোষ দেওয়া চলে না। অন্য পক্ষে, একজন দিশেহারা আত্মানুসন্ধানীর ব্যক্তিগত সংগ্রামের দলিল হিসাবে তার যে কিছুটা মূল্য আছে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

আসলে পাস্তারনেক ছিলেন একজন কবি, যিনি কবিতার প্রক্ষেপ হিসেবে উপন্যাস রচনা করেছেন এবং কবিতা দিয়েই তার উপসংহার টেনেছেন। তাঁর উপন্যাস তাই যতোটা আবেগসমৃদ্ধ, ততোটা তথ্যানুগ নয়। আমাদেরও সেইভাবে আলোচনায় নামলে লেখকের প্রতি সুবিচার করা হত। দুর্ভাগ্য এই যে, রাজনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই এ ক্ষেত্রে শিল্প সাহিত্যের জগতেও অনুপ্রবেশ করেছে, এবং সমালোচকদের মাথা-গরম করে তুলেছে।

"শেষ গ্রীষ্ম" পাস্তারনেকের প্রথম উপন্যাস। এও কবির রচনা—আত্মজৈবনিক, স্বপ্ন নির্ভর। উপন্যাসের সংহতি এখানে অস্পষ্ট, বক্তব্য ভাসাভাসা, চরিত্রপাত্র মোটা দাগে আঁকা। কিন্তু এর ঐশ্বর্য হল লেখকের আত্মপ্রকাশের আকুতি এবং কাব্যময়তা। লেখক নিজেই তাঁর নায়কের লেখার জবানীতে বলেছেন—'এক বৈঠকে সমস্ত রাত জেগে জীবনে প্রথম বা দ্বিতীয়বার যে মানুষ দেখে এ তারই প্রথম খসড়া।...এই সব প্রথম সন্ধ্যা-কালীন উচ্ছ্বাসে অগঠিত, অস্পষ্ট ও জীবন্ত রেখাহীন ভাব ছাড়া আর কিছুই বিশেষ দানা বাঁধে না; আর এসব লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, অভিজ্ঞতার থেকেই স্বাভাবিক-ভাবে সে-ভাব জন্ম নেয়।' তাঁর নিজের রচনার বিষয়েই এই মন্তব্য মোটামুটি সত্য।

কিন্তু আগেই বলেছি, কাব্য আছে এই রচনায়। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে সেই কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও গভীরতা অনুমান করা যাবে।

...'ঘোড়া চিঁহিহি করছে, কুকুর ঘেউ ঘেউ। হঠাৎ-থামা কর্কশ আওয়াজটা সুতোয় বাঁধা ছোট এক টুকরো টিনের পাতের মত কাঁপছে হাওয়ায়।'
—২৬ পৃষ্ঠা

'রাস্তার আলো আর কুয়াশা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে পাশব হাই তুলছে। চারদিকে আগুনের কণা ছিটিয়ে দিন তার কাজে নামল।' —৬২ পৃষ্ঠা

'লোকজন নেই রাস্তায় আর তার শূন্যতা যেন স্তব্ধতার চিৎকার তুলেছে।'
—৬৫ পৃষ্ঠা

'দিন এখনো পুরোপুরি জাগেনি আর মড়ার মুখের দাড়িতে রুটির গুঁড়োর মতন গুমোটের জট পপলার গাছের পাতার মর্মরে ঝুলছে এখনো।' —৬৫ পৃষ্ঠা

'জানলার সার্সিগুলো যেন শীতের বন্দী স্রোত, বিশাল বাতাস যেন বলিষ্ঠ বাহু আর বার্চগুলো যেন জানলা বরাবর হেঁটে এসেছে, খড়কুটো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, জানলায়, জলের ফোয়ারায়, আর বাজনার শব্দ যেন ধনুকের মতন একবার ডাইনে, আরেকবার বাঁয়ে হেলছে আর দুলছে আর আমাদের কাছে আনছে আরো প্রতিশ্রুতির আভাস।' —৮৯ পৃষ্ঠা

অচিন্ত্যকুমার খ্যাতিমান লেখক। তাঁর নিজের ভাষা বলিষ্ঠ, অনুবাদের ভাষাও বেশ আঁটসাট, কিন্তু মাঝে মাঝে একটু বেশি প্যাঁচালো বলে মনে হল। তাঁর মতো ভাষাশিল্পী কি আরেকটু সহজ করতে পারতেন না? তাছাড়া ৫৩ পৃষ্ঠায় তিনি যে অনুবাদে লিখেছেন, 'সুম্যান ও চোপিন বাজাচ্ছে' তার শেষোক্ত নাম কি 'শোপ্যাঁ' নয়? বিদেশী নামের উচ্চারণ-বিভ্রাট সকলেরই নিয়তি, কিন্তু এ নাম তো ভিড়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয়!

মণীন্দ্র রায়

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা-৯। মূল্য আট টাকা।

ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস গবেষক ও যশঃপ্রার্থী লেখকদের প্রিয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই বিষয়ের উপর অনেকগুলি বই বেরিয়েছে; তাছাড়া সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় নবজাগরণ সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রায়ই চোখে পড়ে। রচনার সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর বিন্যাসে বৈচিত্র্যের অভাবটা সুস্পষ্ট। একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি এবং নতুন ব্যাখ্যার অভাব সাধারণ পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের উপর লেখা নতুন কোনো বই হাতে এলে প্রথমেই আশঙ্কা হয় এখানেও পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। সাধারণ পাঠকের কথা না হয় বাদ দিলাম। অধ্যাপক সুকুমার সেনও আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সম্বন্ধে 'বিন্দুমাত্র নতুন কথা বলবার নেই।'

নতুন কথা না থাকতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিকোণ অভিনব হলে পুরনো কথাও নতুন হয়। সাহিত্যে নতুন মূল্যে বড় নয়; নতুন করে বলাটাই অভিনন্দিত হয়। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচিত হলে পুরনো তথ্যও মন আকৃষ্ট করতে পারে। নবজাগরণের একটি

সামগ্রিক ইতিহাস রচনার প্রস্তাবও ভবিষ্যৎ গবেষকরা ভেবে দেখতে পারেন। সামগ্রিক ইতিহাস এখন পর্যন্ত একটিও রচিত হয়নি। শিল্প-কলা ও আর্থনীতিক অবস্থার কথা অধিকাংশ বই থেকেই বাদ পড়েছে।

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের গ্রন্থের নামকরণ থেকে মনে হতে পারে যে তিনি সমকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আধুনিক যুগের সূচনা থেকে বিহারীলাল পর্যন্ত সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বাংলার নবজাগরণ এ বইয়েরও বিষয়-বস্তু। রামমোহন বাংলা দেশের চিন্তাক্ষেত্রে যে ভাববিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন তার আলোচনা দিয়ে বই আরম্ভ হয়েছে। অধ্যাপক নাথ বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনকে প্রধান আলোচ্য বিষয় করেছেন। কাব্যে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন ও বিহারীলালের দান, নাটকে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের নতুন ধারার প্রবর্তন; উপন্যাসে প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনব সৃষ্টি; গদ্য সাহিত্যের ক্রমোন্নতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির দান লেখকের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পুস্তকের 'কথারম্ভ' অধ্যায়ে লেখক নবজাগরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পুস্তক রচনা করেছেন এই ভূমিকা থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। আধুনিকতার সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্ণয়, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, আধুনিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পটভূমিকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক নাথ অনেক বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বাংলার গৌরবময় যুগের সাহিত্যকৃতির সমীক্ষা পাঠকদের নিকট উপস্থিত করেছেন। সাধারণ পাঠক ও ছাত্রদের নিকট বইটি—নবজাগরণের ভূমিকা হিসাবে সমাদৃত হবে বলে আশা করি। লেখকের পরিবেশিত তথ্য ও মন্তব্য সর্বত্র প্রশ্নাতীত নয়। সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আলোচনায় প্রয়োজনীয় তারিখের পঞ্জীটি সন্নিবেশিত করায় গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপকণ্ঠে— গজেন্দ্রকুমার মিত্র। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা ১২। মূল্য নয় টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। প্রথম পক্ষ উপন্যাসে সূক্ষ্ম কারুকর্ম, আঙ্গিকের নূতনতর ব্যবহারে বিশ্বাসী। সম্ভবত তাঁদের মতে উপন্যাস প্রদীপের আলোর সঙ্গে তুলনীয়। একটি বিশেষ স্থান এবং বিশেষ কালকে সেই আলোর বৃত্তে সুন্দর করে পরিস্ফুট করাই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা যেন সমাজের বিরাট এক তৈল-চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে। এক একটি অংশে তাঁরা আলো তুলে ধরেন। এই আলোক সম্পাত কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও ম্লান। এবং তা থেকেই আমরা অনুধাবন করতে পারি, চিত্রের কোন্ অংশ গুরুত্ব অর্জন করেছে। এইদিক থেকে তাঁরা অপূর্ব মানসিক সংযমের

পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বুঝি মনে করেন যে, যদি কয়েকটি পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে মনের ভাষাকে আঁকা যায়; বিরাট এক প্রেক্ষিতের আভাস দেওয়া যায়, তবে আর প্রয়োজন কি অনেক রঙ, অনেক তেলের ব্যবহার করে! বস্তুত এই গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ পাঠকের বুদ্ধি ও সহানুভূতির ওপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল।

অন্যদিকে অত্যন্ত পরিমিত পটভূমির বিশদ চিত্র রচনায় অন্যপক্ষ সচেষ্ট। সামান্য অথবা অসামান্য, সকল ঘটনায় তাঁদের সমান আকর্ষণ। তাঁরা একটির পর একটি চিত্র গ্রহণ করেন। নির্বাচিত ঘটনার চিত্র রচনা করেন না। ফলে উপন্যাসে যে-কারুকর্ম একটি প্রধান উপাদান, এমন বোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। আর সেই সঙ্গে মনে হয়, তাঁদের বুঝি কোনো বিশেষ বক্তব্য নেই। গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই শেষোক্ত গোষ্ঠীর সমগোত্রীয়।

"উপকণ্ঠে" কলিকাতার নিকটবর্তী একটি গ্রামের অনেকগুলি চরিত্র নিয়ে রচিত। এই গ্রামে দরিদ্র আছে, আছে মানুষের আচার ব্যবহারে শালীনতা অথবা শোভনতার অভাব। আর সেই সঙ্গে এই চরিত্রগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সর্বান্তিক হীন স্বার্থপরতা। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে শুধুই মনে হয়েছে, মানুষ একটি বিশেষ জীব, যে স্বার্থের বাহিরে অন্য কোথাও বিচরণ করে না। গজেনবাবুর এই প্রত্যয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় অসাধ্য। কারণ তিনি এমন সময়ের ঘটনা নির্বাচন করেছেন যেখানে পৌঁছুবার পথ অনধিগম্য। আমাদের অভিজ্ঞতায় সে-কাল অন্ধকার এবং বিবর্ণ। তাঁর উপন্যাসের কাল 'রাজার' কলকাতা আগমনের কিছু আগে থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ ও আর পরবর্তী কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র সমাবেশের প্রধান কারণ হল, মিল ও অমিলের সংঘাতে মূল চরিত্রের বিশ্লেষণ ও পরিণতি ঘটানো। চরিত্রগুলির মধ্যে সেই কারণেই বুঝি একটি যোগসূত্র রয়েছে। তারা যেন একটি মালার অনেক রঙের অনেক ফুল। তাদের সুরু প্রথম ফুল থেকে। এবং তাদের শেষও তার কাছেই এসে।

আলোচ্য উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের উপস্থিতি ঘটেছে, অথচ কোনো প্রধান চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না। আমি জানি না, গজেনবাবু কলিন উইলসনের মত নায়কের মৃত্যুতে বিশ্বাসী কিনা। বিশ্বাসী হলেও যে কালের কথা তিনি লিখেছেন, সে-কালে অন্তত নায়কের স্থান ছিল। (কলিন উইলসনের মতে আমাদের আধুনিক জীবনে নায়কের অস্তিত্ব সংশয়ের বিষয়)। অন্য চরিত্রগুলিও স্বাশ্রয়ী নয়। তাদের উপস্থিতির প্রয়োজন নির্ণয় করা কঠিন। নরেন, হেম, শরত, উমা, নলিনী, রতন, শ্যামা, কমলা, অভয়পদ, অম্বিকাপদ—বিভিন্ন নামের এতগুলি চরিত্র। এদের সমাবেশ যে-কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তা' অত্যন্ত অস্পষ্ট থেকে গেছে। বিরাট কালের ব্যবধানে এই চরিত্রগুলির কোনো পরিণতি ঘটেনি। তারা যেন সংবেদন শূন্য। মনে হয়, এদের সকলের মনের কোঠায় গজেনবাবু চাবি দিয়ে রেখেছেন। যুদ্ধ, কলকাতার উপকণ্ঠে কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা, অনেক নতুন লোকের আগমন—কিছুই ঐ গ্রামের মানুষের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। কারখানার চিমনী থেকে নির্গত ধোঁয়া, ছায়া অথবা মেঘ কিছুরই ইসারা দিতে পারেনি।

গজেনবাবু আমাদের অনেককাল আগে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। প্রায় এই শতকের প্রথম দশকে। তবু, তদানীন্তন জীবন সম্পর্কে, অনেক মানুষের সমাবেশ সত্ত্বেও, কিছুই জানতে পারিনি। অথচ এমন আশাই করেছিলাম, চারশো বাহাত্তর পৃষ্ঠার এই বৃহৎ কলেবরের উপন্যাসে কোনো ধারণা, হয়ত কোনো জীবনবোধের পরিচয় পাব।

এ-কালে আধুনিক উপন্যাস লেখকগণ আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন, শিল্প কর্মে সূক্ষ্মতা অর্জনে প্রয়াসী। সময়ের ব্যবহার তাঁদের প্রচিন্তায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। স্থান যদিও সীমাবদ্ধ, কিন্তু কাল অনন্ত বিস্তৃত। উপন্যাসে ঘটনার নির্বাচন সেই কারণেই প্রয়োজন। তা' না হলে সময়ের ওপর লেখকের আর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। গজেন-বাবু এই সমস্ত আবশ্যিক উপদানগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছেন। ফলে উপন্যাসটি বিশ্লিষ্ট ও সঙ্গতিহীন মনে হয়। ঘটনা এবং চরিত্রগুলি যেন কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়নি। ফলে আমরা আর আলোর বৃত্তে পেঁছুতে পারিনি।

এখন পুরনো পাত্রে আর পুরনো মদ পরিবেশন করা সম্ভব নয়। মানুষের জীবন এক জটিল যন্ত্রণায় বিক্ষত। তার প্রকাশভঙ্গীতে নূতন পথ নিতে বাধ্য। উপন্যাসের এই দিক পরিবর্তনের কালে গজেনবাবুর মত প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছ থেকেই তো আমরা আশা করব, এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করব তিনি এই নূতন পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করবেন। আমাদের অকারণে আর পেছনে ঠেলে নিয়ে যাবেন না। আর যদিও যান, আমাদের অভিজ্ঞতার দিগন্ত যেন নূতন রঙে নূতন বোধের আলোয় উদ্ভাসিত করে দেন।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

বাঙলার কাব্য

হুমায়ুন কবির

সাহিত্যের যে-শাখাটির জন্য বাংলাদেশের গৌরব নিঃসন্দিগ্ধ ও তর্কাতীত, সেই কাব্য-সাহিত্যের কোন সুলিখিত ইতিহাস দীর্ঘদিন ছিল না। কবি ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবির প্রথম এই দুরূহ, কিন্তু অবশ্যকর্তব্য, সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করে বাঙালি পাঠককে ঋণী করেছেন।

চর্যাপদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের রচনাবলি—হাজার বছরের বাংলা কবিতার আলোচনায় বর্তমান গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। নীরস তথ্যসম্ভারে আকর্ষণ ভারাক্রান্ত না করে লেখক বাংলার কাব্যসাহিত্যের যে সামগ্রিক রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাঁর বিশ্লেষণী ও বিদগ্ধ লেখনীর মাধ্যমে একালীন সমালোচনা-সাহিত্যে তা দ্বিতীয়রহিত বলা চলে। সমাজ-মানসের পটভূমিকায় বাংলা কবিতার আলোচনার দুর্লভ প্রয়াসরূপেও বর্তমান গ্রন্থ একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। গবেষক ছাত্র-ছাত্রী এবং বাংলা-কাব্যসন্ধিৎসুদের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ "বাংলার কাব্য"। মূল্য তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

চতুরঙ্গ

৫৪, গণেশচন্দ্র এভেনু্য

কলিকাতা-১৩

১৮৬৭

খ্রিষ্টাব্দ

হইতে

ভারতের সেবায়

নিয়োজিত

পরিকল্পনার চক্রে
জাতির ভবিষ্যৎ
আজ চিহ্নিত;
বাস্তবিকই এই
একটি
জাতির
রাশিচক্র
পূর্ব রেলওয়ে
medium

বিক্রম ৫.৭৫
শৌর ৫.৭৫
আসুন ... বসন্ত মেলায়
বসন্তের পথে শুরু
পায়ে হাওয়া খেলিয়ে চলা।
শীতকালে যেমন আঁটসাট,
এখন তা আর সইবে না। এখন আরাম
খোলামেলায়। চলাফেরায়
যেমন চপ্পল। বাটার চপ্পলের
বৈশিষ্ট্য অনেক।
নকশায় অসীম বৈচিত্র্য, তেমনি
মনোহর বিবিধ উপাদানে।
প্রসিদ্ধ সুঠাম গঠনে।
কান্তা ৬.২৫
সুচেতা ৪.৫০
Bata

যে কোন
উৎসবের দিনে
শোভন উপহার
ডানলপিলো
তোশক
বালিশ
কুশন
ট্র্যাভেলিং কিট্
DPC-113 A BEN

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

৪নং ফর্ম

[রুল ৮]

১। প্রকাশস্থান: ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩

২। প্রকাশের সময় : প্রতি তিন মাসে

৩। মুদ্রাকর : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩

৪। প্রকাশক : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩
জাতীয়তা : ভারতীয়

৫। সম্পাদক : হুমায়ুন কবির
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩

৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা : শ্রীমতী শান্তি কবির, জয়তী লায়লা কবির, ২ ইয়র্ক প্লেস, নয়াদিল্লী; ডঃ পি. কে. কবির, আতাউর রহমান, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩

আমি, আতাউর রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ৩০ মার্চ, ১৯৬১ — আতাউর রহমান, প্রকাশক

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

WBG/88

নীল দিগন্তে তরঙ্গায়িত পাহাড়,
উপত্যকার প্রান্তে প্রকৃতির
আরণ্য সৌন্দর্য, হুড্রু নির্ঝর
ও মনোরম আবহাওয়ার
জন্যই রাঁচীর খ্যাতি।

রাঁচী হোটেল

আর দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে
হোটেলের চমৎকার
আহার্য ও স্বাচ্ছন্দ্য রাঁচীকে
কম খ্যাতিমান করেনি।

চমৎকার আহার্য ও আবাসিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হোটেল

সোনা-রং বালুরাশি, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ,
অনন্যা বেলাভূমি, আর
মহিমান্বিত মন্দির এ সবই
তো পুরীর আকর্ষণ।

পুরী হোটেল

কিন্তু পুরীতে দক্ষিণ-পূর্ব
রেলওয়ে হোটেলে থাকার
মতো মনোরম বোধহয়
আর কিছু নেই।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

পরিবারের
সকলের পক্ষেই ভালো

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

CMC-12 BEN.

গ

ছায়াবাণী পরিবেশনা
রবীন্দ্রনাথের
৩-টি
অসামান্য
কাহিনীর
একত্রিত
চিত্ররূপ
সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসনস্-এর
তিন কন্যা
পোস্টমাস্টার • মণিহারা • সমাপ্তি
ভূমিকায়
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় • কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
অনিল চট্টোপাধ্যায় • অপর্ণা দাশগুপ্ত
কণিকা মজুমদার • চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়
নৃপতি চট্টোপাধ্যায় • সীতা মুখোপাধ্যায়
কুমার রায় • গীতা দে
প্রযোজনা, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়
সমারোহে প্রদর্শিত হচ্ছে
রূপবাণী * অরুণা * ভারতী
এবং শহরতলীর সর্বত্র!
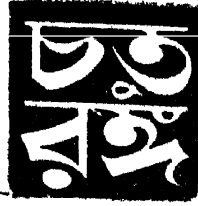
রবীন্দ্রনাথ

হুমায়ুন কবির

ইংরাজি ১৯৬১ সন রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকীর সাল। ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে তাঁদের সকলেরই বিশিষ্ট স্থান। দেশপ্রেম, জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতার আদর্শকে তাঁরা প্রত্যেকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মর্যাদায় তাঁরা সকলেই প্রগাঢ় বিশ্বাসী, সকলেই বলেছেন যে উদার মানবধর্মের প্রচারই বিশ্বজগতে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় দান। এত প্রতিভাশালী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভায় চন্দ্রতারকাপুঞ্জের মধ্যে ভাস্করের মতন ভাস্বর ও দীপ্যমান।

১

বাঙলা ১২৬৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ তারিখে দেশ ও কালের মণিকাঞ্চন যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। কলিকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের নতুন জাগরণের প্রাণকেন্দ্র। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাঙলা দেশেই ইংরেজ প্রভাব সেদিন ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং সেই নতুন জীবনে আহ্বানে দেশবিদেশের কেবলমাত্র বণিক সৈনিক ব্যবসায়ী ভাগ্যান্বেষীই বাঙলাদেশে আসেনি, শিক্ষক ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারকেরাও সেদিন কলকাতায় এসে জমেছিলেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, পর্তুগালের সুধী-সাহিত্যিক তো এসেছেনই—এমনকি সুদূর রাশিয়ার এক নাট্যকারও সেদিন কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে নিজের নাম রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন স্থান বলেই ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, তাঁর জন্মকালে তাঁর জন্মনগরীতে সেই মিলন বাস্তব রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

শুধু দেশ বলে নয়, কালের হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের জন্ম প্রাচ্যপ্রতীচ্য সভ্যতার মিলনের মাহেন্দ্রক্ষণে হয়েছিল। পশ্চিমের আকর্ষণে ভারতীয় জীবনের মন্থর ধারায় সেদিন নতুন জোয়ার এসেছে—সমস্ত দেশে নবজীবনের চেতনা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে

সুরু করেছে। প্রথম আবির্ভাবের ক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার দীপ্তিতে অনেকেরই চোখ ঝলসে গিয়েছিল, সেদিনকার নবশিক্ষিত মহল বহু ক্ষেত্রে পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণকেই সভ্যতার উৎকর্ষ মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের যখন জন্ম, ততদিনে প্রথম দর্শনের মোহ কেটে এসেছে। গভীরতর পরিচয়ের ফলে প্রতীচ্যের দোষগুণ সম্বন্ধে ভারতীয় মনে চেতনা দেখা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ফিরে আসতে সুরু করেছে। প্রতীচ্যের জন্য অল্প অনুরাগ তখন আর নেই, কিন্তু প্রতীচ্য আদর্শের শক্তি ও বেগ তখনো পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী।

রবীন্দ্রনাথের পরিবারের ইতিহাসও তাঁর প্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করেছে। রবীন্দ্র-নাথের পূর্বেও অন্তত তিন পুরুষ ধরে অসাধারণ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাবে ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠায় সেদিন ঠাকুর পরিবার ভারতীয় সমাজে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মোগল আমলে যে সৌভাগ্যের সুরু হয়, কোম্পানির আমলে তা প্রায় ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিপুল বিত্ত এবং রাজদরবারে এত মর্যাদা সত্ত্বেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষেরা সেদিনকার গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজে সমুচিত স্থান পাননি। পীরালী ব্রাহ্মণের অপবাদে অনেকেই তাঁদের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলত, বিবাহাদি ব্যাপারে তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজে সেদিন অপাংক্তেয়। ঠাকুরগোষ্ঠীর যাঁরা নেতৃবৃন্দ, তাঁরা কিন্তু এ অপমানে দমেননি। নিজেদের ঐশ্বর্য এবং প্রতিভার শক্তিতে তাঁরা সমাজের অবহেলাকে অগ্রাহ্য করেছেন, বরং সমাজের এ অনাদরের ফলে সংস্কার ও আচারের অনেক অন্ধ বন্ধন তাঁরা সহজেই লঙ্ঘন করতে শিখেছেন।

তখনকার ব্রাহ্মণসমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার বর্জন করলেও ঠাকুরগোষ্ঠী কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যকে কোনদিনই অস্বীকার করেনি। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ রাজা রামমোহনের বন্ধু এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ, কিন্তু ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কোনদিন শিথিল হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মানুরাগ সর্বজনবিদিত। উপনিষদের শ্লোক এবং হাফিজের দেওয়ান আবৃত্তি করেই তাঁর দিন সুরু হ'ত, চরিত্রবলের মাহাত্ম্যে দেশের লোক ভালোবেসে তাঁকে মহর্ষি আখ্যা দিয়েছিল। যে পরিবারে একদিকে প্রাচ্য আদর্শের প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে প্রতীচ্যের নবজীবনের স্বীকৃতি—এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ যে আজীবন বিশ্বমানবের সাধনায় ব্রতী হবেন, তাতে আশ্চর্য কি?

২

সাহিত্যিক হিসাবেই বাইরের পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি, এবং অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান অনস্বী-কার্য। তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা হাজারেরো বেশী, গানের সংখ্যাও দুই হাজারের বেশী ছাড়া কম হবে না। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্যকাব্য ও নাটক এবং বিবিধ ধরনের প্রবন্ধ একত্রিত করে তাঁর রচনা পাঁচশো পৃষ্ঠার আটাশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তবু অনেক অপ্রচলিত ও অপ্রকাশিত রচনা এখনো এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র সংখ্যা ও আয়তনের বিচারে পৃথিবীর খুব কম সাহিত্যিক নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে এতখানি সমৃদ্ধ করেছেন। দান্তে সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁর একক চেষ্টায় ইতালির একটি প্রাদেশিক

ভাষা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও বলা চলে যে তাঁর একক সাধনায় ভারতবর্ষের একটি আঞ্চলিক ভাষা আজ সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

কেবলমাত্র পরিমাণ দিয়ে বিচার করলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অমর্যাদা হবে,—গুণের বিচারে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের তুলনা মেলা কঠিন। গীতিকাব্য ও গানে বিশ্ব-সাহিত্যে তিনি অতুলনীয়, একথা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। ক্বচিৎ কোন কবির গীতিকাব্যে হয়তো তাঁর গীতিকবিতা ও গানের যে উৎকর্ষ, তার সমধর্মের পরিচয় মিলবে, কিন্তু গীতি-ধর্মের শ্রেষ্ঠতর বিকাশ বোধ হয় কোন দেশে কোন যুগে কোন কবির রচনাতেই মিলবে না। ছোট গল্পের রচয়িতা হিসাবেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তিন চারজন কথাকারদের মধ্যেই তাঁর আসন। নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক হিসাবেও ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের তুলনা বিরল, বিশ্বসাহিত্যেও তাঁর বিশিষ্ট স্থান। সমালোচনা-সাহিত্যে ভারতীয় ভাষাগুলি তত সমৃদ্ধ নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আলোচনা সমস্ত প্রাদেশিক ও দেশজ সংকীর্ণতা লঙ্ঘন করে বিশ্বসমালোচনা সাহিত্যে সমান আসন দাবী করে। দেশী এবং বিদেশী যে সব সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর রুচি ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাঁদের সাহিত্য বিচারেও রবীন্দ্র-নাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও উদার সহৃদয়তার পরিচয় মেলে। এত বহুমুখী সাহিত্যিক প্রতিভার যিনি অধিকারী, তাঁর রচনা যে পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়ে দেশবিদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর মনোরঞ্জন করবে, সুখের দিনে মুখের হাসি উজ্জ্বলতর করে তুলবে, গভীর দুঃখের দিনে স্নিগ্ধ সান্ত্বনা এনে দেবে, তাতে বিচিত্র কি?

সাহিত্যজগতের সকল অঙ্গনেই রবীন্দ্রনাথের সমান অধিকার কিন্তু সাহিত্যের সর্বমুখী প্রকাশেও তাঁর প্রতিভা ও উদ্যম নিঃশেষ হয়নি। সঙ্গীতের জগতেও তাঁর কীর্তি অনন্যসাধারণ। কেবল গান রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, স্বরচিত গানে তিনি সুর দিয়েছেন এবং কথা ও সুরের সঙ্গতিতে যে বিশিষ্ট গীতি-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন তা বিস্ময়কর। কৈশোর জীবনে ধ্রুপদী রীতি নিয়ে তিনি সঙ্গীত রচনা সুরু করেছিলেন কিন্তু প্রথম যৌবনেই ইয়োরোপীয় সুর-সঙ্গতি তাঁকে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়। বিদেশী এবং দেশজ সঙ্গীত ও গানের নানান উপাদান আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করলেন, তার বিকাশে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। দুই হাজারেরও বেশী গানে মানবমনের আনন্দ ও বেদনার ব্যাকুলতা, প্রকৃতির লীলার অগণিত ও বিচিত্র প্রকাশ যে ভাবে কথায় ও রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে, বোধ হয় পৃথিবীর সঙ্গীতের ইতিহাসে তার তুলনা মিলবে না।

সাহিত্য ও সঙ্গীতের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের আজন্ম অধিকার, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে সাধারণ মানুষ যখন সংসার কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার কথা ভাবে, সেই সময়ে রূপকলার জগতে তাঁর নতুন অভিযান সুরু হ'ল। কবিতার কাটাকুটির মক্স থেকে যে ছবি আঁকার সুরু, সত্তর বৎসর বয়সে সেই প্রচেষ্টাই রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকলার মায়াবী জগতে পৌঁছে দিল। তাঁর কাব্যরচনার ধারা তখনো অব্যাহত, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর প্রয়োজনের দাবী মেটাতে তাঁর অক্লান্ত কর্মশক্তি বহু ব্যাপৃত, কিন্তু তা সত্ত্বেও দশ বারো বছরের মধ্যে প্রায় তিন হাজার ছবি আঁকা সহজ কথা নয়। তিনি মামুলী প্রথায় চিত্রাঙ্কন শেখেননি, নিজের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যকে উদ্ঘাটন করবার জন্যই তাঁর চিত্র সাধনা। তাই ব্যক্তি ও সমাজের অচেতন ও অবচেতন মানসের পরিচয় রবীন্দ্রচিত্রাবলীতে মেলে। অনেকে

বলেন যে প্রচলিত ভারতীয় চিত্রপদ্ধতিকে অস্বীকার করেই রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে সুরু করেছিলেন কিন্তু প্রতিভার সহজ পটুত্ব এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে তাঁকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির অন্যতম পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাঁর চিত্র রচনায় একদিকে যেমন লোক-কলার সহজ ও আড়ম্বরহীন প্রকাশের পরিচয় মেলে, অন্যদিকে আধুনিকতম শিল্পীদের পরীক্ষা ও প্রচেষ্টার নতুন নতুন শৈলীও সে রচনায় ঠিক সমান পরিস্ফুট। বহু বিদগ্ধ সমালোচকের মতে কল্পনার ঐশ্বর্য ও সৃজনী শক্তির প্রাচুর্যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের চিত্রকরদের মধ্যে অগ্রণী।

সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও বিপুল দানের কথা স্মরণ করলে মানতেই হবে যে তাঁর মতন পূর্ণাঙ্গ শিল্পী পৃথিবীতে বোধ হয় আর কখনো দেখা যায়নি। লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির সঙ্গে কেউ কেউ তাঁর তুলনা করেন। কেউ বলেন যে দান্তে বা গ্যেটের তিনি সমধর্মী কিন্তু শিল্প-সাহিত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার যে প্রসার, বোধ হয় কোন একক ব্যক্তির মধ্যে পূর্বে তা দেখা দেয়নি।

শিল্পের সমস্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করেও কিন্তু মানুষের কল্যাণে তাঁর সাধনা সমাপ্ত হয়নি। কেবল ভারতবর্ষ বলে নয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য শিক্ষা ও ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজচিন্তা, অর্থনৈতিক সংগঠন এবং পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের সাধনায় তাঁর গদ্য পদ্য রচনা অনুপ্রাণিত। প্রবন্ধ ও আলোচনা সাহিত্যে তাঁর গভীর চিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভা এই সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে স্বীকার করে মানবতার নতুন আদর্শের পত্র নির্দেশ করেই, রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হননি,—সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি। শৈশবে বুদ্ধি আবেগ ও চিত্তের যে বিকাশ, ব্যক্তি ও জাতির ভবিষ্যত তারই উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে নিরানন্দ ও সংকীর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি শিশুর চিত্তকে পীড়া দেয়। তাই আনন্দ ও মুক্তির ভিত্তিতে তিনি শিক্ষার নতুন আদর্শ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে সেই আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির উদার পরিবেশে বন্ধন মুক্তির মধ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও উৎসুক শিক্ষার্থীর পরস্পরের সাহচর্যে তরুণ মন সঙ্গতি ও সমন্বয়ের আদর্শে গড়ে উঠুক—এই ছিল তাঁর শিক্ষার আদর্শ। পরে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করে তিনি সেই আদর্শ ও পদ্ধতিকে বিশ্বজনীন রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। আজ থেকে ষাট বছরেরও পূর্বে তিনি বোলপুরে শিক্ষা নিয়ে যে পরীক্ষা সুরু করেছিলেন, ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠনের সাধনায় তার প্রভাবের পরিচয় পদে পদে মেলে। শুধু ভারতবর্ষে বলে নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষাবিদই আজ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও পদ্ধতির অনুরাগী।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক আজও গ্রামবাসী কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামগুলি বহুক্ষেত্রে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গ্রামে ফিরে যাও বললেই যে মানুষ গ্রামে ফিরবে না এ কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই তাঁর লক্ষ্য ছিল যে গ্রামবাসীদের নিজের চেষ্টায় ও উদ্যোগে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় গ্রামজীবনের পুনর্গঠন করতে হবে, এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যে গ্রাম ও সহরের বিরাট পার্থক্য কমে যাবে, মানুষ গ্রামে থেকে বর্তমান কালের সুখ-সুবিধা ও আরাম পেতে পারবে। গ্রামের পুনরুজ্জীবনের যে সাধনা তিনি শ্রীনিকেতনে সুরু করেছিলেন, সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ সেই পথেই চলবার চেষ্টা করছে। রবীন্দ্রনাথের সব কথা আমরা

গ্রহণ করিনি এবং যেখানেই তাঁর নির্দেশিত পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছি, সেখানেই সঙ্কট ও ভ্রান্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, জাতীয় জীবনে ক্ষতির সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৩

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ এবং সর্বদেশের সর্বজাতির সর্বধর্মের মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছিলেন। স্নেহে প্রেমে করুণ, দোষে-গুণে, ত্রুটি-দুর্বলতায়, প্রিয় রক্তমাংসের মানুষকেই তিনি ভালবেসেছিলেন, মানব প্রেমের নামে নিজের কল্পনায় অশরীরি আদর্শকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার খাতিরে বাস্তব জগতের বাস্তব মানুষের অবহেলা করেননি। সাধারণ মানুষও বহুক্ষেত্রে নিজেকে মানববন্ধু বলে ভাবে, বলে যে সকল মানুষকেই সে ভালবাসে, কিন্তু অমিত্রের কথা ছেড়ে দিলেও বন্ধুর দোষ-ত্রুটিকেও সে সহজে ক্ষমা করতে চায় না, ক্ষমা করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে সকল মানুষের মধ্যেই দোষত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই দোষত্রুটি অপূর্ণতার মধ্যেও মানুষ পূর্ণতার সাধনায় আত্মদান করে বলেই মানবজীবনের এত মর্যাদা। মানুষকে এত ভালবেসেছিলেন বলে ব্যক্তি মাত্রই তাঁর প্রিয়। তিনি কোন দিনই দেশ বা সমাজ, শ্রেণী বা ধর্মের নামে মানুষের ব্যক্তিত্ব লোপের সমর্থন করেননি, বলেছেন যে সামষ্টিক স্বার্থে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করলে সমষ্টিরও তাতে লাভ হয় না, লোকসানই হয়।

ব্যক্তিত্বের বিকাশেই সমাজের বিকাশ, এবং স্নেহ প্রেম ও সহযোগের মাধ্যমেই ব্যক্তি সার্থক। মানবধর্মের গভীর বিশ্বাস ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ আজীবন হিংসা ও বিদ্বেষ বর্জনের সাধনা করেছেন। তাঁর যৌবনে ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম দানা বাঁধতে সুরু করে। প্রথম থেকেই তিনি সেই স্বাধীনতার সংগ্রামে কায়মনোবাক্যে আত্মদান করেছিলেন। রাজ্যসরকারের কাছে ভিক্ষা বৃত্তি করাই তখনো রাজনৈতিক কর্মপন্থা বলে গণ্য হত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই দিনেই 'আবেদন আর নিবেদনের থালা বয়ে বয়ে নত শির' হবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানেই দেশাত্মার বিদ্রোহে মূর্ত হয়ে উঠে, তিনিই প্রথম সবাইকে একলা চলার পথে আহবান করেন। জালিয়নওয়ালাবাগে শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদও তাঁরই কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয়,—ভয়নিরুদ্ধ গণবাণীকে তিনিই সাহস ও মর্যাদার ভঙ্গীতে দেশের অন্তরে স্থাপন করেন।

প্রতীচ্যের শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সংঘাতে ভারতবর্ষে যে নবজীবনের অঙ্কুর দেখা দিল, দেশের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মবিশ্বাসকে রূপান্তর করে অল্পদিনের মধ্যেই তা ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ নিল। রবীন্দ্রনাথ সেই বিদ্রোহ স্পৃহাকে ভাষা দিয়েছেন, বলেছেন যে সংগঠনমূলক কার্যক্রমের মধ্যে সক্রিয়রূপে তাকে প্রকাশ করতে হবে। জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হয়েও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনদিন ইংরেজের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করেননি। সংঘর্ষ ও সংঘাতের দিনে তিনি ইংরেজের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রাণ ইংরেজের মহত্ত্ব স্বীকার করেছেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মুহূর্তেও ইংরেজের রাষ্ট্রিক আদর্শ এবং মানব প্রেমিক ইংরেজ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কোনদিন স্বদেশিকতাকে স্বাজাত্য-অভিমানে রূপান্তরিত হতে দেননি। বার বার বলেছেন যে সকল মানুষের মিলন-স্থান হিসাবেই ভারতবর্ষের মর্যাদা, তাই ভারতবর্ষ যদি সংকীর্ণতার গণ্ডী তৈরী করে নিজের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে, তবে ভারতবর্ষ স্বধর্মচ্যুত হবে। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কারে যা কিছু হীন, যা কিছু গ্লানিকর, তাকে বর্জন করেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর সেবা করতে পারবে। জাত্যাভিমানের মোহে অন্ধ হয়ে যেদিন আমরা মানুষের অপমান করেছি, সেদিন আমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যই টেনে এনেছি, রবীন্দ্রনাথ রুদ্র কণ্ঠে বলেছেন যে প্রয়োজন হলে চিতাভস্মে সকলের সঙ্গে সমান হয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষের যে ঐশ্বর্য, তাকে স্বীকার করেই ভারতবর্ষের সার্থকতা, তাই রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন যে এদেশে ভাষার বৈচিত্র্য, ধর্মের বৈচিত্র্য, আবরণের বৈচিত্র্যকে সহজ মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, কারু ভাষা, আচার বা বিশ্বাস সকলের উপর প্রয়োগ করতে চাইলে তার ফল ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। ভারতবর্ষে মহামানবের সাগর-তীরে দাঁড়িয়ে তাই তিনি পূর্ব-পশ্চিমকে মিলন-যজ্ঞে আহ্বান করেছেন।

অত্যাচার ও অন্যায়কে রবীন্দ্রনাথ কোন দিনই সহ্য করেননি, তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু সেই প্রতিবাদের মুহূর্তেও কোন দিন ব্যাপকভাবে কোন দেশ বা জাতির নিন্দা করেননি। যাঁদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের সঙ্গে মতভেদও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে কিন্তু সবলে ব্যক্ত করেছেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল কিন্তু যখনই তিনি মনে করেছেন যে গান্ধীজীর নির্দেশে দেশের অকল্যাণ হবে, তিনি মুক্ত কণ্ঠে তখন তাঁর সমালোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও ইয়োরোপের স্বাজাত্যভিমান ও পরদেশ শোষণ মনোভাবের তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। এশিয়ার নবজাগরণে জাপানের যে গভীর দান, চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্মরণ করেছেন, কিন্তু যেদিন জাপান চীন দখল করবার চেষ্টা করল, সেদিন জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তিনি মার্জনা করেননি। দর্শনে সঙ্গীতে সাহিত্যে জার্মানী সমস্ত পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছে তিনি সে কথা সানন্দে স্বীকার করেছেন কিন্তু হিটলারের আমলে জার্মানীতে মানবতার যে অপমান, তাকে তিনি ক্ষমা করেননি। চীন দেশকেও তিনি ভালবাসতেন, বহু শতাব্দী ধরে চীনদেশের মানুষ যে অপমান সহ্য করেছে, তার জন্য তাঁর গভীর সমবেদনা ছিল, কিন্তু নবশক্তির দম্ভে সাম্প্রতিক চীন যেভাবে তিব্বতের বৈশিষ্ট্য লোপের চেষ্টা করেছে, যেভাবে ভারতবাসীর বন্ধুত্বের অপমান করে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে, জীবিত থাকলে তিনি তেমনি সজোরে তারও প্রতিবাদ করতেন। স্বদেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে, বিদেশের সঙ্গে ব্যবহারে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে হবে—এই ছিল চিরদিন রবীন্দ্রনাথের বাণী।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনে মিথ্যা ভাবনা, মিথ্যা ভাষণ এবং মিথ্যা কর্মপন্থার স্থান ছিল না। সকল কপটতা ও হিংসার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ তাঁর কণ্ঠে সর্বদাই ধ্বনিত হয়েছে। পৃথিবীর যেখানেই যখন মানবতার অপমান, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের বাণী মানবাত্মার জয় ঘোষণা করেছে। প্রেম সর্বদাই মানুষকে মেলায়, হিংসাকে জয় করে সমস্ত বাধা-বিভেদ দূর করে দেয়, ব্যক্তির মনে এবং সমাজের আচরণে শান্তির বার্তা এনে দেয়, তাই প্রেমের নামে যারা বিদ্বেষ ছড়ায়, শান্তির অজুহাতে সংঘর্ষ প্রচার করে, রবীন্দ্রনাথ কোন দিন তাদের ক্ষমা করেননি।

রবীন্দ্রনাথ সর্ব মানবের একাত্মবোধে আজীবন বিশ্বাসী। বিভিন্ন দেশের স্বকীয়তাকে স্বীকার করেও তিনি উগ্র স্বাজাত্যবোধের সংকট সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, পৃথিবীকে বার বার সচেতন করেছেন। পুরাকালের বহু বিভক্ত পৃথিবী আজ একত্রিত, বিজ্ঞান ও শিল্প-বিপ্লবের ফলে মানুষ আজ স্বতন্ত্রভাবে বাঁচতে পারে না—সকলের সঙ্গে মিলে সবাইকে মিলিয়েই আজ মানুষের কল্যাণ। বর্তমানের পরিস্থিতিতে স্বাতন্ত্র্যবোধ যদি অতিরিক্ত প্রবল হয়ে ওঠে, তবে সংঘাতের মধ্যে সমস্ত মানুষের অকল্যাণ এবং ধ্বংস অনিবার্য,—বর্তমান শতাব্দীর সুরু থেকে বার বার এ সতর্ক বাণী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হয়। প্রাচ্যের সনাতন ঐতিহ্যকে তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, ভারতবর্ষের আদিম ও মধ্যযুগের সংস্কৃতি তাঁর চিত্ত ও মনকে ঐশ্বর্যবান করেছে, আধুনিক যুগে প্রতীচ্য জগতের সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবতার বাণীও তাঁর হৃদয়ে গভীর প্রতিধ্বনি তুলেছে। তাই ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতাকে তিনি সমগ্র বিশ্বের সমস্ত জনগণের মনের অধিনায়ক বলে জেনেছেন, বলেছেন যে যুগ যুগ ধরে মানবযাত্রী ইতিহাসের পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথে বিশ্বমানবতার অভিযানে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব-পশ্চিমকে প্রেমহারে একসূত্রে গ্রথিত করে যে মহামানব বিশ্ববিধাতার বন্দনা করবে, সেই মহামানবের আবির্ভাবের জন্য আজ সমস্ত পৃথিবী উৎসুক। রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় সেই মহামানবের আবির্ভাবের সম্ভাবনার ইঙ্গিত মেলে বলেই আজ তাঁর জন্ম-শত-বার্ষিকীর দিনে জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্রনির্বিশেষে সকল ভাষাভাষী সকল পথের সকল মতের সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাঁর অভিনন্দনের আয়োজনে উদগ্রীব।
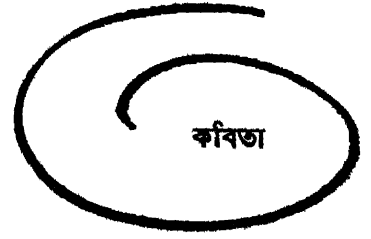
বিস্মরণ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যতক্ষণ আলো আছে বাগানের ফুলগুলি দেখ।
গোলাপ, আনত যূথী, রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ, অথবা রঙ্গন
সব একাকার এক চরিত্রবিহীন, ব্যর্থ, সূর্য নিভে গেলে।
এমনকি যে তুমি আজ, এখন অদৃশ্য কোন পিপাসার টানে
আর নও শারীরিক, কয়েকটি উদ্যত রেখা, তপ্ত সমাহার;
যেন ভুল করে দেহ, অকস্মাৎ হয়েছিলে রক্ত মাংসে লীন।
ওঠেনা চোখের স্পর্ধা চিবুকের চিত্র থেকে ততদূর নীলিমার অবাধ অবধি,
হে প্রেম অব্যক্ত জ্বালা! অন্ধকারে বর্ণ নেই, স্পর্শের অতীত কোন আবিষ্কার নেই
কেন লেগে আছো তবু বক্ষমূলে, ললাটপ্রদেশে!
আমার সর্বাঙ্গ ভেঙে শব্দের বাগান
জাগায় সূর্যাস্ত শোক; লাল লাল ভেসে যায় পশ্চিমে পৃথিবী।

যতক্ষণ আলো আছে ফুলগুলি যেন ফুলগুলি
মাটির গভীরে যত শব্দের নতুন অনুপম
ধ্বনিগুলি স্পষ্ট করে অন্তহীন তৃষ্ণার উদ্যমে।
যে সব প্রাচীন শব্দ বহুব্যবহার ভারে অবনত ঝরে
তারা কেন ফুটেছিল, একদা মিশর গ্রীস সভ্যতার ঋণে
ধারাবাহিকতা কিংবা যথার্থ ধ্যানের ধৈর্যে মহীয়ান স্থিত?
আমার অতন্দ্র প্রশ্নে তারা কেউ ঘুম ভেঙে আজ আর জেগে উঠবেনা।

শুধু কোনদিন যদি নিরুদ্দেশ গন্ধ ফেরে অন্ধকার ঘরে
যদি দৃশ্য বর্ণহীন অমোঘ আচ্ছন্ন স্নায়ু আরেক উদ্ধার

খুঁজে পায়, বুকে যার জন্মের প্রথম পুণ্য নিরবধি লেখা।
তবে ভারশূন্য আমি তুহিন প্রত্যন্ত দেশে শেষ পরিণামে
তোমাকে বিদায় দিতে হে আমার সর্বস্ব সাধনা ভালোবাসা

ভুলে যাবো একদিন কবিতা কি অসম্ভব শীর্ষ ছুঁয়েছিল॥

কারাগারের ভিতরে জ্যোৎস্না

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঐ তোমার প্রেমিক যায় শৃঙ্খলিত, ধূসর নেত্রপাতে,
নিয়তিহীন জনস্রোত বেলাশেষের বিষণ্ণ নির্বাণ
প্রতি বুকের রন্ধ্রে লুকোয়, শৃঙ্খলিত হাতে
ঐ তোমার প্রেমিক যায়, জ্যোতির্ভ্রষ্ট, তবুও অম্লান।

কারও চোখ চেয়ে দেখেনা, মুখের রেখায় বিশেষ্য চিহ্নিত
শহর ভাঙা মানুষ ছুটছে শহরতলীর মায়ার সন্নিধানে
টুক্‌রো গৃহস্থালী কিনছে, লোকাল ট্রেনে আসন পেয়ে প্রীত,
বিপুল অন্ধকারের ট্রেন কোথায় যাবে ওরা কি জানে, সুনিশ্চিত জানে?

ধূলোয় রুক্ষ, মলিন চুল, তবুও যেন শরীর খানি জ্বলে
ভিড়ের মধ্যে ঐ যুবার, প্রতিটি নিঃশ্বাসে
একা আত্ম সম্মোহিত যেন কঠিন মৃত্যু-কৌতূহলে—
নির্বিহঙ্গ আকাশ থেকে বারংবার দৃষ্টি ফিরে আসে।

কেমন তোমার তীব্র তৃষ্ণা, হে রমণী, তাকাও দূর থেকে
তৃষ্ণা, একি তৃষ্ণা, এযে সর্বঅঙ্গে দারুণ অহংকার
চক্ষু জ্বলে ওষ্ঠ জ্বলে, উরস, স্তনকোরক ওঠে ডেকে
জঙ্ঘা থেকে উষ্ণ বাষ্প ঢাকে শরীর, জ্বলন্ত অঙ্গার।

পাথরে গড়া জেলখানার অন্ধকারে নীরবে শুয়ে আছে
এ পৃথিবীর শেষ প্রেমিক, ললাটে কিছু স্বেদ, স্বপ্ন-কণা,
প্রহর ভাঙা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার খোলা বুকের কাছে
শব্দ বাজে শৃঙ্খলের হাওয়ায় ভাসে জ্যোৎস্নার মূর্ছনা।

চিন্তার বিপক্ষে

শিবশম্ভু পাল

আমার সম্মুখে তুমি পরিণত দীর্ঘ ঋজু গাছ
ঊর্মিমালা স্তব্ধ হয়ে লেগে আছে শাখায় শাখায়,
তারা বুঝি ফুলদল, অভিনব দৃশ্যে চেয়ে যায়
নীলিমা, আমার দৃষ্টি : তুমি নম্র ছায়াঘন গাছ
অলজ্জ কামের পার্শ্বে হিল্লোলিত উপবনচারী;
হাতের কাছেই পাব রাশি রাশি সান্ধ্য যুঁই, বেল,
গভীর রাত্রির গন্ধ বায়ুভূত, হৃদয় উদ্বেল;
সারা রক্ত উচ্ছৃঙ্খল, বলে ওঠে, আমি যে তোমারি।

যাব না যাব না বৃথা খরস্রোতা নদীর ভিতর
সেখানে কুটিল দ্বিধা ক্লান্ত করে নৌকা, ভোলে দিক।
প্রেম, মৃত্যু, দেহ, মায়া থরে থরে সাজায় প্রান্তিক,
কোথাও আনে না নদী তটভূমি, মুগ্ধতার ঘর।
অবাধ্য কেন যে রক্ত, আকণ্ঠ তবুও কেন মন
সেখানে মন্দ্রিত নিত্য আমাদের প্রথম দর্শন॥

বাস্তব

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

এ কেমন দুর্বোধ্য আয়না
কিছু বোঝায় না চেনায় না,
কোন মুখ যথেষ্ট চায় না,
এ কেমন অদৃশ্য সম্বন্ধ ?
এ কেমন মৃত্যু না, ঘুম-ও না,
এ কেমন ধায় না, ছায় না,
এ কেমন উদাস আয়না,
এ কেমন অবিচ্ছিন্ন বন্ধ ?

অভিভূত হাতছানি, আরো
ঘনীভূত ডাক, ছানি গাঢ়
হৃদ্‌স্পন্দনের বাণী তারো,
অথচ সে সমান বিদেশী।
এ কেমন দুর্বোধ্য আয়না
দৃষ্টি যার নাগাল পায় না,
কিন্তু কুয়াশায় পালায় না
অপ্রতীয়মান প্রতিবেশী।

বিশ্বমানবের দায়

লর্ড ক্লেমেণ্ট আর. এটলী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল তখনও নেভেনি। সেই সময়ে সানফ্রানসিসকোতে বিশ্ব-শান্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে রাজনীতিকদের একটি সম্মেলন ডাকা হয়। ১৯৪৫-এর বসন্তকালে সার অ্যান্টনি ইডেন ও রক্ষণশীল শ্রমিক ও উদারপন্থীদলের অন্যান্য সহযোগীদের সঙ্গে সে সম্মেলনে যোগ দিই। সম্মেলনটিকে নিখিল বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব মূলক বলা যায় না, কারণ তখনকার শত্রুপক্ষের কাউকে তাতে ডাকা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া অধিকাংশ প্রতিনিধিরাই ছিলেন ইওরোপীয় কর্তৃত্বাধীন দেশগুলির। স্বাভাবিকভাবেই তিনটি সবচেয়ে প্রবল সামরিক শক্তিই ছিলেন এ সম্মেলনে প্রধান-- আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও বৃটিশ কমনওয়েলথ। এই তিনটি মহাশক্তিকে স্থায়ীভাবে সংঘবদ্ধ করতে পারলেই পরবর্তী মহাযুদ্ধের আশঙ্কা দূর হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে মনে হয়েছিল।

এই নতুন বিশ্বসংঘ স্থাপনার পন্থা নির্ণয়ে লীগ অফ নেশন্‌সের ইতিহাস আমরা সামনে পেয়েছিলাম—কোথায় কোথায় তা সার্থক আর কোথায় ব্যর্থ হয়েছে তারই ইতিহাস। আমরা সকলেই বোধ হয় বুঝেছিলাম যে লীগ অফ্ নেশন্‌সের ব্যর্থতার কারণ তার কাজ করবার মত যথেষ্ট কর্তৃত্বের অভাব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অনেকের মনে হয়েছিল যে অভাব ছিল শুধু কাজ করার কর্তৃত্বের নয় ইচ্ছারও। সম্মেলনে কিছুক্ষণ এমন মনে হয়েছিল যে শুধু আমাদের আলোচনাই নয় শান্তি ফিরে আসবার পর এই তিনটি মহাশক্তির সমস্ত প্রয়াসও বুঝি সার্থক হতে চলেছে। আমার মনে আছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর ভ্যান্ডেনবার্গ ও সোভিয়েট রাশিয়ার মিঃ মলোটভের মাঝখানে বসে কতবার সানন্দে আমি তাঁদের সঙ্গে কত ব্যাপারে সায় দিয়ে আমার মতের মিল জানিয়েছি।

কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তীকালে সে স্বপ্ন অচিরে বিলীন হয়ে গেল। সায় দেবার বদলে রুশ-রা 'ভেটো' দিয়ে না বলবার অধিকারেই ক্রমাগত ব্যবহার করতে লাগল। এই নাকচ করবার অধিকার নেহাৎ কদাচিৎ ব্যবহৃত হবে বলে আমরা আশা করেছিলাম। আমাদের সে আশা দেখা গেল ভিত্তিহীন। যুদ্ধ নিবারণের জন্যেই নিরাপত্তা পরিষদের পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু এ পরিষদের সভ্যেরা প্রতিষ্ঠানটিকে ঝগড়ার হাট করে তুললেন।

ইউ. এন. ও পূর্ববর্তী লীগ অফ নেশন্‌স-এর মত বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাফল্যলাভ করেছে কিন্তু যা তার পরম উদ্দেশ্য সেই ন্যায় নীতির শাসন প্রবর্তনের ব্যাপারে সে ব্যর্থ। খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিংবা শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রচেষ্টায় ইউ. এন. ওর সংগঠনগুলি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে যাঁরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেন তাঁরা সম্মানার্হ, কিন্তু এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে যুক্তরাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্যসিদ্ধি সুদূরপরাহত।

হেগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে কয়েকটি বিবাদ মীমাংসার জন্য তোলা হয়েছে। নিকট প্রাচ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপে কলহ হানাহানি বেশী দূর ছড়াতে পারেনি এবং বর্তমানে কঙ্গোকে চরম অরাজকতা থেকে রক্ষা করবার অনিশ্চিৎ চেষ্টায় রাষ্ট্রপুঞ্জের ছোট বড় সদস্য-

শক্তি থেকে সংগৃহীত সেনাবাহিনী নিযুক্ত।

নিরাপত্তা পরিষদে নেহাৎ দৈবাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ান কিছুকালের জন্যে অনুপস্থিত না থাকলে কোরিয়ায় আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়ার অভিযানে রাষ্ট্রপুঞ্জ অগ্রসর হতে পারত না এ কথা সত্য। লীগ অফ নেশন্স এ ধরনের কাজ কখনও অন্ততঃ করেনি। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা যে বাড়ছে বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশের প্রতিনিধি যে তাতে যোগ দিচ্ছে এটাও আমাদের আনন্দের বিষয়। তবে লীগ অফ নেশন্স থেকে যেমন আমেরিকা বাদ ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জেও তেমনি ষাট কোটি মানুষের দেশ কম্যুনিষ্ট চীন অনুপস্থিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক কেউ বোধহয় বলবে না। সমস্ত পৃথিবীর ওপর গত মহাযুদ্ধের চেয়েও সর্বনাশা আর এক ভাবী যুদ্ধের বিভীষিকা খাঁড়ার মত ঝুলছে। দায়িত্বজ্ঞান যাঁদের আছে সে রকম রাজনীতিকরাও সেই সম্ভাবনার কথাই নিশ্চয় ভাবছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ভবিষ্যৎই আমার আলোচ্য। ত্রিকালদর্শীর মত আলোচনা করছি না কারণ সে রকম কোন অহঙ্কার আমার নেই। একদিন দায়িত্বের কাজ আমার স্কন্ধে ছিল। তাই অবসর নেওয়া রাজনীতিক হিসেবেই আমি আলোচনা করব।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ত্রুটি কোথায় এবং ঠিক কি উপায়ে তা শোধরানো যায় তা আমি দেখাতে চাই। তার আগে আজকের বিশ্বপরিস্থিতির কয়েকটি বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। সানফ্রানসিস্কোয় আমাদের প্রথম সম্মেলনের সময় যেগুলি ছিল না। তখন এইগুলির কথা জানা থাকলে রাষ্ট্রপুঞ্জ গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়ত অন্য আকার নিত।

প্রথম বিশেষত্ব হল যুদ্ধবিদ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রগতি। ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে পরমাণবিক কি হাইড্রোজেন বোমা অজ্ঞাত ছিল। আমার নিজের দেশের বিরুদ্ধে হাউই বারুদ চালিত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছিল বটে কিন্তু এই উপায়ে বৃটেন ও ইওরোপের মাঝখানকার কুড়ি মাইল ব্যবধান মাত্র নয় অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগর বা সমগ্র ইওরোপ মহাদেশ অতিক্রম করে সাংঘাতিক মারণাস্ত্র পাঠান যে যেতে পারে তা কল্পনাও করা যায়নি। এ সব বিষয়ে গবেষণা যাঁরা করছিলেন সেই বৈজ্ঞানিকেরা তখন যুদ্ধে পরমাণবিক বোমা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হলে সমস্ত পৃথিবীই বিষাক্ত হয়ে সভ্যতা ধ্বংস পেতে যে পারে তা ভেবেছিলেন কিনা জানিনা। অন্ততঃ নতুন যুগের পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা এ কথা চিন্তা করতে পারেননি। বিশ্ব-পরিস্থিতির এইটেই সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। এ ছাড়া আরও অবশ্য আছে। তখন আমরা বিজ্ঞানে পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রগুলির প্রাধান্য ধরেই নিয়েছিলাম। এদিকে রাশিয়ার বিরাট উন্নতি আমরা অনুমান করতে পারিনি। চীনও যে প্রধান শক্তিদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে তাও তখন কল্পনার অতীত ছিল। রাষ্ট্রপতি রুশভেল্ট অবশ্য চীনকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন দেবার জন্যে জোর করেছিলেন, তবে চীনকে আমেরিকার তাঁবেদার হিসেবেই তিনি ধরেছিলেন মনে হয়। জাতীয় আত্মসচেতনতা প্রথমে, এশিয়ায় ও পরে আফ্রিকায় এত প্রবল হয়ে উঠবে তাও তিনি ভাবতে পারেননি। সোভিয়েট রাশিয়ায় নতুন সাম্রাজ্যবাদও তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল।

পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি যেমন আছে ঠিক তেমনি বরাবর থাকবে এই বিশ্বাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ আমরা তৈরী করেছিলাম। নীতির শাসন সারা বিশ্বে যাতে সফল হয় সেই জন্যে তারা শুধু স্বেচ্ছায় পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এই আমাদের উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক কলহের বিচার বিশ্ববিচারালয়ে করাবার প্রস্তাবে সেদিন ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে ছাড়া কাউকে রাজি করান যেত না। নিজেদের শক্তিতে যারা আস্থাবান তারা

বিশ্বকে নিরস্ত্র করায় কোন সত্যকার চেষ্টায় বাধাই দিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তখনও অনেকে অপসারণ নীতির পক্ষে। সোভিয়েট রাশিয়া বা বৃটেনও এ প্রস্তাবে রাজী হত না। সোভিয়েট রাশিয়া হত না কারণ রাষ্ট্র হিসাবে তার একটি ব্রত আছে বলে সে মনে করে আর পাশ্চাত্ত্য জগৎ সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সন্দিহান। বৃটেন হত না কারণ গোলমেলে কোন সম্পর্কে না বাড়াবার নীতিই সে বহুকাল অনুসরণ করে আসছে। যদিও বিশ্বসংকটের সময়ে এ নীতি পরিহার করতে হয়। বিদেশী শৃঙ্খল থেকে যে সব নবীন রাষ্ট্র সদ্যমুক্ত হতে চলেছে তারাও নবার্জিত বা প্রত্যাশিত স্বাধীনতার এক কণাও ছেড়ে দিতে দ্বিধা করত। বেলজিয়াম হল্যান্ড নরওয়ের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও সুইসদের মত শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রেরা এই আশাই করেছে যে নিরপেক্ষতার জোরে তারা যুদ্ধ থেকে রেহাই পাবে।

স্যানফ্রানসিস্‌কোতে আমরা প্রাক্‌ আণবিক শক্তিসাম্যের যুগে ছিলাম। আজকের দিনেও অনেকে মনে মনে সেই যুগেই আছেন!

আজকের জগৎ উদ্বিগ্ন শান্তির মধ্যে বাস করছে। তার কারণ বিশ্বধ্বংসযজ্ঞের পরিণাম সম্বন্ধে বিভীষিকা। এদিকে ছোটখাট যুদ্ধের আগুন এখানে ওখানে জ্বলছে, অস্ত্রশস্ত্রের পাহাড়ও জমে উঠেছে নিরাপত্তার নিষ্ফল আশায়। সহৃদয় সজ্জনেরা অবশ্য ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জকে সার্থক করে তুলতে চাইছেন যদিও প্রতিদিন তার কাঠামোর গলদ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

সমস্ত পৃথিবী আজ যেন কাঠ আর অনুরূপ দাহ্য পদার্থে তৈরী এক শহর। নাগরিকেরা আগুন লাগার ভয় সম্বন্ধে সচেতন, সারাক্ষণ তাই নিয়ে আলোচনাও চলছে, কিন্তু পৌরসভা উত্তাপ ও আলোর ব্যবস্থা সংযত করবার মত আইন চালু করতে সাহস পাচ্ছে না। প্রত্যেক নাগরিক তার নিজের পদ্ধতিই চালাতে বদ্ধপরিকর আগুন জ্বালান সম্বন্ধে কোন নিয়মকানুন মানতে রাজি নয়। দমকলের ব্যবস্থা করতেও তাদের আপত্তি। তাদের আশা এই যে আগুন লাগলে সাংঘাতিক কিছু হবার আগে পাড়াপড়শিরাই তা নেভাবে।

আজকের দিনের বিশ্বপরিস্থিতির কথা মনে রেখে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভবিষ্যৎ আমাদের তাই ভাবতে হবে।

প্রথমে আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে আজ সমগ্র বিশ্ব যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তা অভূতপূর্ব। সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। অন্ততঃ মানবজাতির সেই অংশ বিপন্ন, সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তা যাদের সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে অতীতের সেই মহা তুষার যুগে মানবজাতি যে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি তার কারণ সে যুগের কিছু নরনারী নতুন পরিবেশ ও অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল। যারা তা পারেনি তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সেদিনের সে দুর্ঘটনা ছিল প্রাকৃতিক। আজ মানবজাতি স্বখাত সলিলেই ডুবতে চলেছে। প্রথম দুর্ঘটনা রোধ করবার কোন উপায় ছিল না। দ্বিতীয়টি রোধ করবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্তাধীন। বিশ্বযুদ্ধ অমোঘ ব্যাপার নয়। মানুষের নির্বুদ্ধিতার ফলে তা ঘটতে পারে, কিন্তু ঘটলে বিপন্ন হব আমরা সবাই। হাইড্রোজেন বোমার কাছে শাদা কি তামাটে শান্তিবাদী কি যুদ্ধোন্মাদ নিরপেক্ষ কি সংগ্রামী সব সমান।

তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা আমাদের সকলের কাছে মূল্যবান। জীবনের যাত্রাপথে পা বাড়াবার সঙ্গে প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর দুনিয়ায় কি করব শুধু নয়, কিছু

করবার মত দুনিয়াই থাকবে কিনা, এই প্রশ্নও নিজেদের করা উচিত।

দ্বিতীয় জরুরী কথা হল এই যে মানুষের ইতিহাসে সমস্ত পৃথিবী এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত কখনও হয়নি। ওয়েন্ডেল উইলকি যুদ্ধের সময় এক অখণ্ড পৃথিবীর কথা বলেছিলেন। সেই ভেদাভেদহীন এক পৃথিবীই আজ সত্য হয়েছে।

আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন তার বিরাট নৌবলের জোরে দ্বীপরাষ্ট্র হিসাবে বৃটেনের পক্ষে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌশক্তি যখন আমাদের ছিল তখন আমরা নিরাপদ ছিলাম। বিরাট মহাসমুদ্রের ব্যবধান দুদিকে থাকার দরুণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আক্রান্ত হবার বিপদ তখন ছিল না তাই কোন দলে যোগ না দিয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অন্য বহু রাষ্ট্রেরও নিরাপত্তার কমবেশী সুবিধা ছিল। সুইজারল্যান্ডের ভরসা ছিল পর্বত-প্রাচীরই তার বিরুদ্ধে আক্রমণ ঠেকাবে। বৃটিশ নৌবলের পাহারায় ভারতবর্ষ পশ্চিম ও উত্তরের পর্বতশ্রেণী আর পূর্বের বিশাল নদীগুলির দরুণ নিরাপদ বোধ করতে পারত। বহু দশক ধরে যে সব ইওরোপীয় রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা রক্ষা করেছে তাদের কথার ওপর নির্ভর করে বেলজিয়ামের পক্ষে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল।

এই অবস্থায় রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতার ধারণা যুক্তিসঙ্গতই ছিল।

কিন্তু মানুষের আকাশ-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বদলে গেল। যে সীমান্ত অলঙ্ঘনীয় ছিল তা এখন অতিক্রম করা সম্ভব হল। আক্রমণ ঠেকাবার পুরাতন পদ্ধতি হল অচল।

প্রথম মহাযুদ্ধেই তা বোঝা গেছল কিন্তু এ সত্য যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। ফ্রান্স দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ম্যাজিনো লাইন গড়ে তুলল। অবস্থা বদলে যাওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার তখনও জাতীয় আত্মরক্ষার দিক দিয়েই চিন্তা করছে।

স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যাপারটা অলীক কল্পনা হয়ে দাঁড়াল কিন্তু মানুষের স্বভাব অলীক কল্পনা আঁকড়ে থাকা।

দুই মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের স্পষ্ট ইঙ্গিত সত্ত্বেও সানফ্রানসিস্‌কোতে রাজনীতিকরা অলীক কল্পনাই আঁকড়ে ছিলেন। তাঁরা এমনও ভাবছিলেন শুধু স্বেচ্ছাদানের ভিত্তিতে গড়ে তোলা একটি প্রতিষ্ঠান ওপরে থাকলেই সশস্ত্র স্বতন্ত্র ক'টি রাজ্য দিয়ে পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ করে তোলা যাবে,—সে প্রতিষ্ঠানটিতে অধিকাংশের সিদ্ধান্ত একজনের নাকচ করে দেবার অধিকার সত্ত্বেও।

ভবিষ্যত তা'হলে কি হবে?

যে কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে একদল সংস্কার চাইলে আরেক দল তার বিরোধিতা করবেই। বিরোধিতা যারা করবে তারা সত্যের সম্মুখীন হতে চায় না। কেউ বলে,—আমাদের দিন এমনি করেই কেটে যাবে। অন্যেরা বলে,—অত তাড়া কিসের? প্রতিষ্ঠান তো নতুন। সময়ে নিজে নিজেই হয়ত বদলাবে।

আমার মনে আছে দুই মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে লীগ অফ নেশন্‌সকে সত্য ও সার্থক করে তোলবার প্রস্তাবে একটু ধৈর্য ধরবার কথাই কতবার শুনতে হয়েছে। শুনেছি,—এ সংস্থার বয়স তো নেহাৎ অল্প। এরই মধ্যে আক্রমণ রোধ করবার মত সবল হবার আশা করা তাই উচিত নয়। অপেক্ষা কর আরেকটু।

কিন্তু অন্যায় আক্রমণের পর অন্যায় আক্রমণের দৃষ্টান্ত যত বাড়তে লাগল লীগ অফ

নেশন্‌সও তত সবল হওয়ার বদলে দুর্বল হয়েই, যে বিপদ ঠেকাতে তার সৃষ্টি সেই বিপদের মাঝেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অপেক্ষা করলে অবস্থার উন্নতি হবে এই আশাবাদী ধারণা উনবিংশ শতাব্দী থেকে পাওয়া। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠলে বুড়োরা বলতেন মনে আছে যে,—ধীরে চলো। তাড়া কোরো না। সময়ই সমস্যা মেটাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল কিছু করা একান্ত দরকার। দেরী করলে সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠবে। ধীরে চলবার সুলভ আশাবাদে আমার আস্থা ছিল না। জীবনে একটা জোয়ারের দিন আসে, সেই জোয়ারের সুযোগই নিতে হয়। আমি রাষ্ট্রপুঞ্জের ভবিষ্যতের পথ যা দেখতে পাচ্ছি তা দুই—হয় এখুনি শক্ত হয়ে দুঃসাহসিক কিছু করা নয় গা ভাসিয়ে দেওয়া। অগ্রসর যদি না হতে পারে তা'হলে পেছুতে হবে। আর একবার পিছিয়ে গেলে ক্রমশঃ তার ক্ষমতা লোপ পাবে। আজই হোক কালই হোক আগেকার লীগ অফ নেশন্‌সের মতই কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ পারবে না। প্রধান শক্তিদের একজন হয়ত সরে' দাঁড়াবে আর যে সভ্যতাকে রক্ষা করবার জন্যে তার সৃষ্টি, সেই সভ্যতার সঙ্গেই রাষ্ট্রপুঞ্জ বিলুপ্ত হবে।

আমার মতে রাষ্ট্রপুঞ্জকে পৃথিবীতে নীতির শাসন অব্যাহত রাখার একটি শক্তি করে তোলা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এ কাজের প্রথম ধাপ হল বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণাই বিসর্জন দেওয়া। কাদের নিয়ে গঠিত হবে বা গঠনতন্ত্র কি হবে তা নির্ণয়ের আগে এই ধারণার পরিবর্তনই একান্ত প্রয়োজন।

সনাতনী ও জাতীয়তাবাদীরা বলবেন,—"কি ভয়ানক কথা! আমরা বৃটিশ কি মার্কিন কি ফ্রেঞ্চরা বিদেশীর শাসন মেনে নেব বলতে চাও। এশিয়া ও আফ্রিকায় আমরা সবে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা কি সেই স্বাধীনতার অংশ আবার বিলিয়ে দেব?"

আমার জবাব—হ্যাঁ তাই দিতে হবে। গণতন্ত্রের রাজ্যে আমি ও প্রত্যেক নাগরিক সারাজীবন ধরে যা করি, আমার রাষ্ট্রকেও তাই করতে প্রস্তুত হতে হবে,—অর্থাৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে থাকবার জন্যে যা খুশি করবার অবাধ স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হবে। আমি যদি যতখানি সম্ভব মানুষের সংস্পর্শহীন সুদূর জনশূন্য কোন জায়গায় গিয়ে থাকি তাহলে হয়ত যা খুশি করতে পারি, কিন্তু দিল্লী কি বোম্বে লণ্ডন কি নিউইয়র্কে থাকলে আইন-কানুন আমাকে মানতেই হবে। অস্ত্র নিয়ে বেড়াবার ও শত্রুদের আক্রমণ করবার অধিকার সেখানে আমার নেই। স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে আরো বহু শাসন আমি সেখানে মেনে চলি, আমার প্রতিবেশীদেরও তাই করতে হয়। তবে প্রতিবেশীর হুকুমেও আমি চলি না, যে সর্বময় কর্তৃত্ব আমি নিজেই অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছি তাই আমি মেনে চলি।

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ সমাজে বাস করবার জন্যে আমায় এ দাম দিতে হয়। আমার স্বাধীনতা বাস্তব প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ। সমস্ত সমাজের স্বার্থে যেটুকু দরকার সেইটুকুর বেশী স্বাধীনতা আমি ছাড়ি না। আমার পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার আমার থাকে।

সমাজে যেমন, বহু জাতির সম্মেলনেও তেমনি, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা শাসনে রাখা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়া আর সশস্ত্র বাহিনী রক্ষা করা চলবে না।

ইউ. এন. ও-র সদস্য হিসাবে আমরা প্রথমটিতে ইতিমধ্যেই রাজী হয়েছি, নিরস্ত্রী-

করণের নীতিও আমাদের সকলের মনঃপূত, যদিও সে নীতি কাজে অনুসরণ করার ব্যাপারেই যত গণ্ডগোল।

নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে বহু সম্মিলনের আলোচনা আমি সাগ্রহে লক্ষ্য করে আসছি। আন্তরিকভাবে কয়েকজন একটা মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করছেন দেখেছি। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। কেন? কারণ নীতির শাসন মানতে বাধ্য করার শক্তি যে-পৃথিবীতে নেই সেখানে তাঁরা কাউকে নিরাপত্তা বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারেননি।

বৃটেনে বহু শতাব্দী আগেই ব্যক্তিগতভাবে সৈন্যবাহিনী রাখা বা যুদ্ধকরা রদ হয়েছে। যারা প্রবল তারা এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্য দাঁড়িয়েছে। সাধারণ নাগরিকের সেখানে অস্ত্র নিয়ে বেড়াবার অধিকার নেই, আইনও সে নিজের হাতে নিতে পারে না। আমাদের বিচারালয় আছে ঝগড়া মারামারির বদলি হিসেবে নয়। মারামারি করবার অধিকার ছাড়া মীমাংসার সুযোগ দেওয়ার জন্যে। আমাদের পুলিশ বাহিনী আছে শান্তিরক্ষা ও আইন যাতে পালিত হয় তা দেখবার জন্যে। আমরা যে আইন তৈরী করি তা মানতে সকলে বাধ্য। সেই সঙ্গে যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত সে ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ যাতে না করতে পারে সে বিষয়ে আমরা সাবধান।

রাষ্ট্রপুঞ্জের এ রকম কোন ক্ষমতা নেই। আমার বক্তব্য এই যে প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নিজের শাসনের জন্যে যে পথে চলে রাষ্ট্রপুঞ্জকেও সেই পথে অগ্রসর হতে হবে। আর কিছু না হোক অন্ততঃ শান্তিরক্ষার অধিকার, উপায় ও ক্ষমতা রাষ্ট্রপুঞ্জের থাকা দরকার। আদিম অনেক সমাজ অনেক সময়ে এর বেশী কিছু তাদের শাসনকর্তাদের দেয়নি।

হেগ বিচারালয় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেখানে বিচারের জন্যে যাওয়া না যাওয়া স্বেচ্ছাধীন। রাষ্ট্রপুঞ্জের রক্ষাবাহিনী ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। নিরস্ত্রীকরণের অনেক পরিকল্পনাও হয়েছে, কিন্তু কাজ কিছু হয়নি সত্যকার কর্তৃত্বের অভাবে। কেন এ অভাব? কারণ বর্তমান রাষ্ট্রপুঞ্জ ঠিকমত গঠিতই হয়নি।

কোনো কোনো মহাশক্তিকে অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন রাষ্ট্র কতখানি শক্তিমান বা লোকসংখ্যা তার কত ওপর তার ভোটের ক্ষমতা নির্ভর করে না। সদস্য হওয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন। ৬০ কোটি যার জনসংখ্যা সেই কমিউনিস্ট চীনের মত প্রবল শক্তিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের বাইরে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্বব্যাপী হওয়া তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কমিউনিষ্ট চীনকে বাদ দিয়ে রাখার কোন মানে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপুঞ্জের গঠনতন্ত্র আরো যুক্তিসম্মত হওয়া উচিত, রাষ্ট্রপুঞ্জকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অবশ্য নতুন করে গঠন করা যায় কিন্তু তাও বাস্তবসম্মত হবে বলে আমার মনে হয় না। যা বাস্তব সত্য তা আমাদের স্বীকার করতে হবে। তার একটি হল এই যে দুই বিভিন্ন মতবাদের দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ সত্যিই বর্তমান। দ্বিতীয়টি হল এই যে জন পিছু একটি ভোটের ব্যবস্থা হলে সম্মেলন অসম্ভব রকমের বিরাট হয়ে উঠবে আর তাতে ছোট গোষ্ঠীর বলতে গেলে মতামতের কোন দামই থাকবে না। এমন একটি ব্যবস্থা করা যায় যাতে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই মতামতের মূল্য থাকবে অথচ কম্যুনিষ্ট গণতান্ত্রিক এশীয় ইওরোপীয় বা মার্কিন কোন রাষ্ট্রীয় দলেরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকবে না। মিঃ ক্লার্ক ও মিঃ সন নামে দুজন কৃতী মার্কিন আইনবিদ সত্যিই এ রকম একটি সম্ভাব্য ব্যবস্থা ছকে ফেলেছেন। এ ব্যবস্থায় জনসংখ্যার অনুপাতে রাষ্ট্রগুলি সাজান হবে। ধরা যাক, চীন রাশিয়া ভারত ও আমেরিকা প্রথম শ্রেণীর বড় রাষ্ট্র হিসাবে প্রত্যেকে ৩০টি ভোটের অধিকারী হবে। তারপর

বৃটেন ব্রেজিল ফ্রান্স জার্মানী ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান পাবে ১৫টি করে। এই ভাবে কমতে কমতে ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রও একটি ভোটের অধিকারী হবে। এ ব্যবস্থায় জন-সংখ্যার অনুপাতে সব চেয়ে বড় বড় রাষ্ট্রগুলি অবশ্য যথাযোগ্য ভোটাধিকার পাবে না, এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির ভোট সংখ্যাও তুলনায় বেশী হবে, তবু যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রাধান্যের রেষারেষিতে পৃথিবীর শান্তি আজ বিপন্ন তাদের গোষ্ঠীর বাইরে যারা থাকবে তাদের মতামতের দাম বাড়বে।

এই রাষ্ট্রসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন অনুসারে শান্তিরক্ষার জন্যে বিধান প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। বিচারালয় স্থাপনার অধিকার, আন্তর্জাতিক রক্ষীবাহিনী প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা ও আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যেটুকু মাত্র প্রয়োজন ঠিক ততটুকু বাদে জাতীয় অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ রদ করার কর্তৃত্ব এ সভার থাকবে। সম্ভাব্য যে কোনো গোলযোগ নিবারণের দায়িত্ব নেবার মত যথেষ্ট শক্তি রক্ষীবাহিনীর থাকবে। বাহিনীর প্রত্যেকের আনুগত্য থাকবে শুধু রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি। সব দেশে নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণভাবে সাধিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন করার ব্যবস্থাও রাষ্ট্রপুঞ্জকে করতে হবে।

সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসা হবে। তবে এ বিচারালয়ের কোন সদস্য-দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার থাকবে না। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যাঁরা কখনো জড়িত হয়েছেন তাঁরা জানেন এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেক রাষ্ট্রের বিবাদে অচল ও নিরর্থক রণকৌশলের প্রশ্ন কতখানি গোল বাধায়। একবার নিরস্ত্রীকরণ সফল হলে এ সব বিবাদের বেশীর ভাগই মিটে যাবে। যে প্রস্তাবগুলি পেশ করলাম রাষ্ট্রপুঞ্জকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সেগুলি ন্যূনতম প্রয়োজন। আমার মতে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির নিরাপদে নিজস্ব জীবনধারা অনুসরণের জন্যে এই যৎসামান্য ভিত্তিটুকু অপরিহার্য।

কেউ হয়ত বলবেন এ সব অবাস্তব অলীক কল্পনা, দুনিয়ার সত্যকার অবস্থার সঙ্গে যার কোন সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তেমন একজন গঠনতন্ত্র-বিলাসী পুঁথিসার পণ্ডিতের স্বপ্ন।

জবাবে বলতে চাই যে আমি অলীক কল্পনা বিলাসী নই, অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিক। এবং একটি প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে আমায় দারুণ সংকটের দিনে কঠিন বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সব নীতির কথা বলেছি সেগুলির স্বীকৃতি ও প্রয়োগ কোন না কোন ভাবে না হলে আমাদের সভ্যতা ধ্বংস পাবে।

জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এ সব নীতি গৃহীত হবার আশা কি? যাদের তারা শত্রু বলে মনে করে তেমন সব রাষ্ট্র যে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ, সে প্রতিষ্ঠানের কোন কর্তৃত্ব কম্যুনিষ্ট দেশগুলি মানবে কি? কম্যুনিষ্ট চীন ও রাশিয়া যে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের ভাগ পাবে সে প্রতিষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিতে কি চাইবে?

আমার বক্তব্য হল এই যে গরজ বড় বালাই আর যে বিপদ সকলের তার ঠেলায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। রাশিয়ার স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রকে ঘৃণা করলেও প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশরা কাইজারকে পরাজিত করবার জন্যে রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের বিশ্বজয় নিবারণ করবার জন্যে আমেরিকাকে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার সাহায্য নিতে হয়েছিল। সুতরাং বিলুপ্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার দাম হিসাবে,

মতে যাদের সঙ্গে মেলে না তাদের সঙ্গে কাজ আমাদের করতে হবে। স্বৈরতান্ত্রিক দেশে মন যাদের ওপর বিন্যিষ্ট তাদের হুকুম সাধারণ মানুষকে মেনে নিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন হয়ে যাবার পর চিন্তার পদ্ধতি যাদের ভিন্ন তাদের শাসনও আমরা মেনে নিই। শ্রমিকদল যে সব আইন প্রণয়ন করেছিল বৃটেনের রক্ষণশীল টোরি দল তা মেনে নিয়েছে। আজকের শ্রমিকদল রক্ষণশীলদের শাসন-কর্তৃত্ব স্বীকার করছে। তাছাড়া এ দাবী আমরা করিনা বা করতেও পারি না যে নিজেদের আমরা যেমন ভাবি দেশের সবাই সে রকম সৎ হবে।

যে পরিকল্পনার কথা বললাম, কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার তা গ্রহণ করবার সম্ভাবনা কতটুকু? তাদের ধারণায় যা ধনতান্ত্রিক জগৎ তা ধ্বংস করাই তাদের পণ নয় কি? ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগে হলে বলতাম আশা নেই বললেই হয়। কিন্তু সময় বদলাচ্ছে। রাশিয়ার নেতাদের বাস্তববোধ আছে। তারা জানে যে আরেক বিশ্বযুদ্ধে ধনতন্ত্র যদি ধ্বংস হয় কম্যুনিজম্‌ও রক্ষা পাবে না। একেবারে নতুন করে আরম্ভের কল্পনা, আগে হয়ত কারো কারো ভালো লেগেছে, কিন্তু এখন লাগে না। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে ধারণাই আমাদের হোক্‌—আমার চেয়ে তার প্রতি বিরাগ বোধহয় কারো নেই—এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে বস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে রাশিয়া ও চীন উভয়েই যথেষ্ট উন্নতি করেছে। যুদ্ধ বাধলে তাদের বেশী কিছু লোকসানের ভয় নেই। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে নিজের গুণেই কম্যুনিজ্‌মের জয় হবে। শুধু যুদ্ধের দ্বারাই কম্যুনিজ্‌ম্‌ বিজয়ী হবে এ পুরাণো মত মিঃ ক্রুশ্চেফ্‌ ত্যাগ করেছেন। সহাবস্থান সম্ভব বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। যদিও আপাততঃ সাম্রাজ্যবাদের দিকে জাতীয় আন্দোলনের স্বাভাবিক সর্বনাশা ঝোঁক চীনের নায়কদের পেয়ে বসেছে মনে হচ্ছে তবু এ ঝোঁক বাড়বে বলে মনে হয় না। হৃদয়ের পরিবর্তনের ওপর ভরসা করে এ কথা বলছি না, বলছি নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি সজাগ হওয়ার আশায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একবার ভুল করে চিয়াং কাইশেক্‌কে সমর্থন করে আর তাদের নীতি বদলাতে নারাজ, তবু শেষ পর্যন্ত সুবুদ্ধিই জিতবে।

পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় বাধা হল অনড়তা আর অচল ধারণার প্রতি আসক্তি।

মানবজাতির যে অংশ গত কয়েক শতাব্দীতে প্রাধান্য দেখিয়েছে তারা যে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রময় মহাদেশের অধিবাসী এটা ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা মাত্র। আমরা তাই স্বাভাবিক বলে মনে করি।

আমার মার্কিন বন্ধুদের কতবার আমি বুঝিয়েছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট এলাকা যে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এটাও ইতিহাসের দুর্ঘটনা। তৃতীয় জর্জ আর তাঁর মন্ত্রীরা অমন নির্বোধ না হলে মার্কিন উপনিবেশগুলি কখনোই হয়ত মিলিত হত না, পৃথকভাবে গড়ে উঠে তারা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মতই কলহপরায়ণ হয়ে উঠত। ইতিহাসের খামখেয়ালেই বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষকে অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য সচেতন পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে দেয়নি।

বস্তুতঃ বর্তমান পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্র নেই বললেই হয় যা অন্যের সঙ্গে কোন না দায়ে জড়িত নয়। বৃটেনের বাধ্যবাধকতা আছে 'ন্যাটো' আর 'সিয়াটোর' কাছে, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্র ইওরোপের সাধারণ বাণিজ্য সংস্থাভুক্ত। সত্যি কথা বলতে গেলে নীতির দিক দিয়ে এ সব সন্ধির সর্ত মানা আর পুনর্গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্তৃত্ব স্বীকারের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

কম্যুনিষ্ট বা গণতান্ত্রিক যে রাষ্ট্রের অধিবাসীই হোক আমার নিশ্চিৎ বিশ্বাস যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যুদ্ধকে ডরায় এবং এ ভয় দূর হবার জন্যে অনেক কিছু ত্যাগ

করতে প্রস্তুত। এই সার্বজনীন বাসনা কি করে সফল করা যায় তাই হল সমস্যা। এর প্রেরণা কি করে পাওয়া যায়? আমি বিস্তর দেশ ভ্রমণ করেছি এবং অনেক নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করে দেখেছি। কোথাও বিরুদ্ধতা আমি পাইনি, পেয়েছি শুধু প্রথম পা বাড়াবার অনিচ্ছা।

যদি কোন দেশের প্রতিনিধি,—নির্দলীয় দেশের প্রতিনিধি হলেই ভালো হয়,—রাষ্ট্রপুঞ্জে এ বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করেন, একটা সূত্রপাত হতে পারে বলে মনে করি।

আন্তর্জাতিক রক্ষীবাহিনী গঠন একটা বাঞ্ছনীয় প্রয়াস সন্দেহ নেই। দুই মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে স্যার উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে একমত হয়ে এ প্রয়াস সমর্থন করেছিলাম মনে আছে। কারণ এ সব ব্যাপার দলীয় বিরোধের ঊর্ধ্বে। বিভিন্ন জাতীয় সামরিক বাহিনী থেকে সংগৃহীত সৈনিকদের দিয়ে রক্ষীদল গঠন করার বিড়ম্বনা যে কত কঙ্গোতেই তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুধু রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুগত একটি সত্যকার রক্ষীবাহিনী যদি থাকত, তা'হলে কঙ্গোর এই পরিস্থিতির উদ্ভব হত না বলে মনে করি। কিন্তু সানফ্রানসিস্কোর পরিকল্পনা অনুযায়ী এ রকম বাহিনী গঠিত হলেও তা পরিচালনার প্রশ্ন থেকে যেত। নিরাপত্তা পরিষদের ওপর সে ভার দেওয়া যেত বলে মনে হয় না। তার প্রথম কারণ, তার সভ্য হওয়ার অধিকার সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ ভেটো-র ক্ষমতার দরুণ তার ব্যর্থতার সম্ভাবনা।

তাই রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্কার করবার উদ্যোগ করা আমি একান্ত প্রয়োজন মনে করি। যে পর্যন্ত তা না হয় সে পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনগুলির অরণ্যে রোদন সার হবে। কারণ নিরস্ত্রীকরণ সফল করতে হলে তাতে যে সব রাষ্ট্রের সায় আছে সেগুলি পরিদর্শনের কর্তৃত্ব কোথাও থাকা দরকার। সে কর্তৃত্ব এখনো কোথাও নেই।

এ বিষয়ে বিলম্ব করা আর চলে না। একটা উদ্বিগ্ন শান্তি এখন বিরাজ করছে বটে, কিন্তু যে কোনো ঘটনায় বিবাদ বাধতে কতক্ষণ; বার্লিন অবরোধ ও কোরিয়ার যুদ্ধের সময় আমার নিজেরই দারুণ দুর্ভাবনায় দিন কেটেছে।

শেষ একটা কথা। প্রশ্ন হতে পারে,—রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্কৃত ও সার্থক যদি করতে হয় তা'হলে বর্তমানে যা যেমন আছে তারই ভিত্তিতে করতে হবে না কি? উৎপীড়নকেই তাতে কায়েমী করা হবে নাকি? হাঙ্গেরীয় পোল ও চেকদের ওপর উৎপীড়ন, তিব্বতীদের ওপর চীনাদের অত্যাচার?

আমার জবাব হল এই,—হ্যাঁ, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সাহায্যে এ অন্যায়ের প্রতিকার হবে এ মত কেউ সমর্থন করে কি? এ ঝুঁকি নিতে কেউ প্রস্তুত? সামরিক সুবিধার প্রশ্ন যদি না থাকে, এ সব নিপীড়িতের মুক্তি পাবার সুযোগ অনেক বেশী দেখা দেবে।

ইওরোপের ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ শেষ হয়েছিল ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে, নেপোলিয়নের সময়ের যুদ্ধবিগ্রহ ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে। দুই ক্ষেত্রেই অনেক অন্যায় অবিচারকে স্থায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যা দূর করতে অনেক দিন লেগেছে। আজকের দিনে যে সব অন্যায় বর্তমান তার প্রতিকার করতে অনেক দিন নিশ্চয় লাগবে, কিন্তু আরেকটি যুদ্ধের চেয়ে এসব অন্যায় এখন টিকে থাকাও বুঝি বাঞ্ছনীয়।

আমি বৃদ্ধ হয়েছি। যৌবনে অনেক আশায় যে জন্যে যুঝেছি সেই সব বিরাট পরিবর্তনের বহু স্বপ্ন সত্যিই সফল হতে আমি দেখেছি। আমার নিজের দেশেই জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য আমার চোখের সামনে দূর হয়েছে। একটি সাম্রাজ্যকে দেখেছি রাষ্ট্র-

সমবায়ে রূপান্তরিত হতে। পৃথিবীতে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত ও যুদ্ধ চিরদিনের মত নিষিদ্ধ,—এ দেখা হয়ত জীবনে আমার হয়ে উঠবে না, কিন্তু সামর্থ্য যতদিন আছে ততদিন সেই দিনটি এগিয়ে আনার জন্যে যথাসাধ্য আমি করব, কবি টেনিসন দিব্য দৃষ্টিতে যার বিষয়ে লিখেছেন—'যুদ্ধের দামামা যখন আর বাজবে না আর বিশ্বসঙ্গের মহামানব সভায় যুদ্ধের পতাকাগুলি উড়বে।'*

অনুবাদ : **প্রেমেন্দ্র মিত্র**

---

* আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা।

বাঘ

বিমল কর

শচী ভেলভেট পোকার টিপ পরতে খুব ভালবাসত। কিছু টিপ তার বাক্সে জমানো ছিল, বাকি কুলুঙ্গিতে। প্রায় দিনই সন্ধ্যেবেলায় ফিকে করে আলতা পরত শচী। তার আলতার বাটি কখনও শুকোত না।

শচীর মাথায় অফুরন্ত চুল, মুঠো করে ধরা যায় না। ঘন গভীর কালো। এই চুলের রাশি নিঃশেষিত ঢেউয়ের মতন তার কাঁধের তট থেকে শান্ত অবনত প্রসারিত হয়ে পিঠ, পিঠের পর জানু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অথচ শচী চুলের যত্ন করত না।

শচী তার মুখেরও যত্ন করত না। রোগা নরম ছাঁচের মুখ, একটু তোলা কপাল, পাতলা সরু সরু গাল শচীর। গালের ঢল চিবুকের কাছে কচি আমপাতার মতন বেঁকে আছে। ওর চোখের ভুরু হাল্কা, পালকের কলমের মতন টানা; চোখ দুটি কোমল গাঢ়। শচীর নাক একটু বেশি লম্বা, ঠোঁট পাতলা।

যত্ন করলে শচীর মুখের লাবণ্য বাড়ত। শচী যত্ন করত না। তার উজ্জ্বল শ্যাম রঙ ধুলো পড়ে পড়ে যেন ম্লান হয়ে এসেছিল।

শরীরের ওপর আরও অযত্ন ছিল শচীর। শীর্ণ গড়নেও তার সুষমা ছিল; শচী নজর করে খুব কমই দেখেছে। সাদামাটা আধময়লা শাড়ি ঢিলে-ঢালা জামা গায়ে তার সকাল সন্ধ্যে কেটে যেত। সন্ধ্যের পর কুয়োতলায় গা ধুয়ে একটু ছিমছাম হত। আলনা থেকে কোঁচানো শাড়িটা টেনে নিয়ে পরত, মোটামুটি একটা জামা গায়ে দিত। বসে বসে চুল বাঁধবে পরিপাটি করে সে-ধৈর্য ছিল না শচীর; কোনো রকমে একটা বিনুনি সারত, কিম্বা এলো খোঁপা করে ফাঁস দিয়ে নিত। তারপর লণ্ঠনের আলোয় বসে বসে আলতা পরত, টিপ পরত।

এই সময়, সন্ধ্যে পেরিয়ে যখন রাত, ঘন গাছপালা শালবন অরণ্য-উপকণ্ঠ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, তিরিশ মাইল দূর থেকে স্টেশন যাবার শেষ বাসটা যেন সারাদিন খেটে চাপা আক্রোশে গর্জন করতে করতে এসে হাজির হত। তার দু-চোখের অন্ধকারভেদী শ্বেত আলো শচীদের বাড়ির সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত এই বর্জিত লোকালয় দেখত। তারপর সহসা অন্ধকার। এঞ্জিনের শব্দ আর শোনা যেত না। কয়েকটি যাত্রীর গলার স্বর, সুধীর ড্রাইভারের হাঁকাহাঁকি, দু-একটা মালপত্র ওঠানোর বিক্ষিপ্ত শব্দের সঙ্গে অচিন্ত্যর জোরালো হাসি মেশানো থাকত। কোনো কোনো দিন পেট্রলের গন্ধ বাতাসে মাখামাখি হত। নানকু মাঝে মাঝে ছুটে আসত কুয়োতলায় বালতি হাতে, ছড় ছড় করে বালতির জল কুয়োয় ফেলতে ফেলতে জল তুলত, আবার ছুটত বানোয়ারীলালের বিশাল বাসটাকে জল খাওয়াতে।

বড় অধৈর্য রাত আটটার এই শেষ বাসটা। পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি থাকবে না কিছুতেই। শান্ত নিস্তব্ধ তরুলতার তন্দ্রা, এই নির্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমির বিভোর ভাব খণ্ডিত করে আবার চলে যাবে।

শচী মাটির বারান্দায় এসে দাঁড়াত প্রায়ই। জোড়া জামতলায় বাসটা দাঁড়িয়ে থাকত। শচী অন্ধকারে কিছু দেখতে পেত না, অনুভব করতে পারত। বাস কোম্পানির অফিসে বাতি জ্বলছে, হ্যাজাক বাতি, বাস থেকে কারা যেন নেমে একটু পায়চারি করে নিচ্ছে, আলোর

বিন্দুর মতন বিড়ি-সিগারেটের স্ফুলিঙ্গ চোখে পড়ে, ঈষৎ গুঞ্জন, সামান্য কিছু শব্দ, অন্ধকারের বিশাল চাঁদোয়ার তলায় এই ক্ষীণ চাঞ্চল্যটুকু স্বপ্নের মত মনে হয় শচীর।

বাসটা আবার যখন দীর্ঘ তরবারির মতন তার দু-চোখের ধারালো আলো জেবলে এই অন্ধকার এবং বনস্পতির ব্যূহ থেকে অক্লেশে চলে যায় শচী ধুলোর গন্ধ অনুভব করে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারা দেখে আকাশের।

অচিন্ত্য আর বসে থাকে না, বাসায় ফেরে। নানকু অফিস বন্ধ করছে। মতিয়া মালঘর সামলাচ্ছে।

বাসা থেকে অফিস বড়জোর তিরিশ পা। অচিন্ত্যর পায়ের শব্দ পেতে পেতে হঠাৎ মানুষটাকে যেন চোখের সামনে দৈত্যের মতন হাজির দেখতে পায় শচী।

—আজ হাতোয়ায় একটা বাঘ বেরিয়েছে, শচী। কালেক্টার সাহেব কাল ঠিক ছুটবে।

শচী স্বামীর দিকে তাকায়। অন্ধকারে অচিন্ত্যকে ঘন ছায়ার মতন দেখাচ্ছে। বিশাল পুরুষ। হাফ হাতা শার্টটা খুলে ফেলে হাতে ঝুলিয়ে রেখেছে। গায়ে গেঞ্জি। শচীর মনে হয়, গেঞ্জি না থাকলে স্বামীকে হয়ত সে অন্ধকারে দেখতেই পেত না।

—বাঘটা বেশ বড়। অচিন্ত্য যেন নিজেই বাঘটা দেখেছে, তার ধারণা বেশ বড় বাঘ, শচীর কি মনে হয় জানতে চাইছে এমনভাবে বলল,—এ বাঘ কোন দিক থেকে আসতে পারে বল ত?

শচী বাঘ দেখেনি, সার্কাসের বাঘও নয়, ছবি দেখেছে বইয়ে। এখানে সব সময় বাতাস বয়, বাতাস বইছিল, পাতায় শব্দ, খড়কুটো ধুলো বারান্দায় জমা হচ্ছে, শচী স্বামীর পায়ের দিকে তাকাল। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু মনে মনে শচী দেখতে পেল, সবল শক্ত লোমশ দুটি পা, পায়ে চটি, মালকোঁচামারা ধুতি। গোড়ালির কাছে আধ-বিঘতটাক যে কাটা দাগটা আছে শচী তাও চোখ বন্ধ করেই দেখতে পাবে।

—গত বছরে বকোদরে যে-বাঘটা এসেছিল, সেটা ছোট ছিল। এক্কেবারে বাচ্চা। অচিন্ত্য বলল। —এবারে অত বড় বাঘ কোথ থেকে এল, আমি ভেবেই পাচ্ছি না।

—বন থেকে। শচী জোড়া জামতলার দিকে তাকাল।

অচিন্ত্য স্ত্রীর ঠাণ্ডা শান্ত গলার স্বর শুনে এমন ভাব করল যেন শচীর চেয়ে বাজে জবাব আর কেউ কখনও দিতে পারেনি। হেসে ফেলল। —বন থেকেই বাঘ বেরোয়। খুব বললে তুমি।

শচী নীরব।

বাস কোম্পানির অফিসে তালা পড়েছে। বাতি নিবে গেছে। মালঘর বন্ধ করে মতিয়া তার হাতের ছোট লণ্ঠনটা দোলাতে দোলাতে ওর ডেরার দিকে চলে যাচ্ছে। মতিয়া তার ছাড়া গলায় দেহাতী গান গাইছে।

—দত্তদা কাল পরশু এলে বাঘের খবরটা জানা যাবে। অচিন্ত্য বলল। বলে ঘরে চলে গেল।

শচী দাঁড়িয়ে থাকল। ইচ্ছে করলে সে সামনে ঘুরে বেড়াতে পারত, মাটি ঘাস ধুলো খড় কুটোয় তার পায়ের পাতা আরাম পেত। এই বারান্দায় একটা তক্তপোশ পাতা আছে, বারো মাস পাতা থাকে, শচী তক্তপোশে বসতে পারত পা ছড়িয়ে। বেড়াতে বা বসতে ইচ্ছে করল না শচীর।

অচিন্ত্য গেঞ্জি খুলে রেখে এখন সোজা কুয়োতলায়। সাবান গামছা নিয়ে স্নান করতে

বসেছে। নিজেই বালতি বালতি জল ওঠাবে, স্নান করবে।

শচী এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার সামনে নির্মল অন্ধকার। এই অন্ধকারে বাসের রাস্তা, বনের পথ অবলুপ্ত। মধ্য রাতের এক একটি দণ্ড যেমন দৈবাৎ শচীকে চকিত করে, মনে হয় সময় তাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে, তেমনি এই অন্ধকারে কখনও কখনও শচীর মনে হয়, তাকে বুঝি কেউ তার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করে নেবে।

অচিন্ত্য স্নান করছে। শচী শুনতে পাচ্ছে। তার স্বামী শরীর শীতল করছে। এই শীতলতার মধ্যে ও-মানুষ কি ভাবছে শচী জানে, বাঘের কথা ভাবছে। অচিন্ত্য সব সময় বাঘের কথা ভাবে।

শচী বাঘ দেখেনি, বাঘের কথা ভাবতেও পারে না।

দমকা হাওয়া এ-পাশ দিয়ে চলে গেল। ঘরের পলকা দরজার কব্জায় শব্দ হল একটু। একটা বুঝি কুটো এসে পড়েছিল চোখে। শচী চোখ রগড়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে নেবার সময় ভেলভেট পোকার টিপে আঙুল রাখল। যেন টিপটা সে অনুভব করল।

খেতে বসে অচিন্ত্য বলল,—এমন চাকরি, দু'দিন কোথাও যাবার উপায় নেই।

ভেতরের বারান্দায় কাঠের মস্ত পিঁড়ি পেতে স্বামীকে আসন করে দিয়েছে শচী। লণ্ঠনটা একটু উঁচু করে রাখা। মাটিতে পা গুটিয়ে হাঁটু ভেঙে পাশ করে বসেছে শচী।

—এর চেয়ে তখন যদি শেল কোম্পানির চাকরিটা নিতুম, ভাল হত। অচিন্ত্য রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল। —ও দিকটা আরও ভাল ছিল। কাছেই মাকড়ার জঙ্গল, দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে। অচিন্ত্য যেন মনে মনে জঙ্গল দেখে নিল। —শেল কোম্পানির সেই চাকরিতে ঝামেলাও ছিল না এত।

শচী স্বামীকে দেখছিল। দেহাতী তাঁতের মোটা থানের লুঙ্গি পরেছে, গা খালি। বুকটা শাল গাছের শক্ত গুঁড়ির মতন। ঘন কালির রঙ। অজস্র লোম। সুগঠিত সমর্থ এই বুক দেখলে শচীর মনে হয় মানুষটা এক সময় যেন বনে বনে কাঠ কেটে বেড়াত। হাত বুক এমনকি কাঁধের দু'পাশে যে পিণ্ডাকার কঠিন মাংস—কাঠুরের মতন কুড়ুল না ধরলে তা যেন হয় না।

অচিন্ত্য প্রায় আধখানা রুটি একসঙ্গে ছিঁড়ে তরকারি মাখিয়ে মুখে পুরে দিল। শচী দেখছিল।

বারান্দাটা খুব বড় নয়, তবু লণ্ঠনের আলো এই ঘনীভূত অন্ধকারে প্রদীপের মতন জ্বলছিল। অচিন্ত্যর ডান দিকে বারান্দার প্রান্ত ঘেঁষে খরগোশের শূন্য খাঁচাটা দেখা যায় না। জলতক্তার চারটে পায়া ভাসা ভাসা নজরে পড়ে। বাঁ দিকে অচিন্ত্যদের শোবার ঘর। জাম কাঠের কালো পাল্লাদুটো ছায়ার মতন দেখাচ্ছে। উঠোনে একরাশ কাঁচা কাঠ—সারাদিন রোদে শুকোয়—এখন কেমন শুকনো গন্ধ। উঠোন, কুয়োতলা—ও-পাশটা ঘুটঘুট করছে। পেঁপে এবং কলাগাছের ঝোপ থেকে ঝিঁঝি ডাকছিল।

—তোমার দিদির কাছে গিয়ে দিন কয়েক থাকবে নাকি? অচিন্ত্য স্ত্রীর দিকে তাকাল।

—কেন? শচী ছোট করে বলল।

—এই এমনি। অনেক দিন ত যাওনি। কটা দিন টাউনে কাটিয়ে এলে...। অচিন্ত্য ডালের বাটি তুলে নিয়ে চুমুক দিল।

শচী স্বামীর মুখ দেখছিল। যার বুক হাত কাঁধ এক কাঠুরের মতন, তার মুখ এমন

হওয়া উচিত না। গাল সামান্য ভাঙা হলেও মুখ বেশ গোল। কপাল ছোট, নাক একটু বসা, পুরু ঠোঁট। দু'চোখ ভরা দৃষ্টি। শচীর নিজেরই কতবার মনে হয়েছে, মানুষটার মুখ ছেলেমানুষের মতন, খানিক বোকা খানিক চঞ্চল।

অচিন্ত্য বেশ শব্দ করে খায়। অধৈর্যের মতন, দ্রুত গ্রাসে। ও ডিমের তরকারি টেনে নিল।

—আমি দিদির কাছে গেলে তুমি কি করবে? শচী হাতের ভর তুলে সোজা হয়ে বসতে বসতে বলল।

—দত্তদার সঙ্গে ক'দিন ঘুরে বেড়াব।

—এখানকার কাজ সামলাবে কে—?

—আমিই। অচিন্ত্য আধখানা ডিম রুটির টুকরোর সঙ্গে মেখে গালে পুরে দিল। দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল। নিতান্ত মুখ জোড়া তাই কথা বলতে পারছে না, কিন্তু তার হাব-ভাব বোঝাচ্ছিল, একটা ব্যবস্থা সে করেছে।

শচী অ্যালুমিনিয়ামের ছোট ডেকচি থেকে আরও দু'খানা রুটি তুলে স্বামীর পাতে দিল।

—একটা মতলব ঠিক করে ফেলেছি—মুখ ফাঁকা হলে অচিন্ত্য বলল,—লাস্ট বাসে দত্তদার সঙ্গে চলে যাব, সকালের বাসেই আবার ফিরব।

—কোথায় যাবে? শচী অন্যমনস্ক স্বরে শুধলো। সে জানত অচিন্ত্য কোথায় যাবার কথা বলছে।

—হাতোয়ায়। অচিন্ত্য এক চুমুকে আধ গ্লাস জল শেষ করে গলা যেন পরিষ্কার করে নিল। —তোমার এই লাস্ট ডাউন-বাসটা নিয়েই যা ঝামেলা। বেফায়দা মাঝে মাঝে রাত করে ফেলে, নয়ত তেজরা থেকে আমরা চৌধুরী কোম্পানীর মাল-লরিতে হাতোয়া চলে যেতে পারতাম।

শচী স্বামীর উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখছিল। জীবনে যেন আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই মানুষটার, শুধু একবার একটি বাঘ দেখতে চায়, গুলি করে মারতে চায় নিজের হাতে।

লণ্ঠনের আলোর দিকে তাকিয়ে শচী আস্তে আস্তে বলল,—হাতোয়ায় শিকার করতে যাবে?

—বাঘ শিকার—! অচিন্ত্য বাঘ শব্দটার ওপর প্রচণ্ড ঝোঁক দিল, যেন শচী বারান্তরে আর ভুল না করে।

শচী চুপ করে থাকল। হাতোয়ার জঙ্গলের পাশ দিয়ে অনেকবার সে যাওয়া আসা করেছে। ওই জঙ্গলের কোথায় যেন খুব পুরোনো একটা হরগৌরীর মন্দির আছে। ভাঙা মন্দির। শচী মন্দিরটার কথা এতবার শুনেছে যে হাতোয়ার জঙ্গলের ওপর দিয়ে যতবার বাসটা গেছে, সে বৃক্ষলতাদির বিশাল যবনিকার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আশা করেছে ফাঁক ফোকর দিয়ে মন্দিরটা হয়ত চোখে পড়ে যাবে। কিন্তু কোনোদিন পড়েনি। শচী এখন হাতোয়ার মন্দিরের কথা দু'মুহূর্ত ভাবল, তারপর বাঘের কথা। মনে হল, বাঘটা যেন মন্দিরের পাশ থেকে তার মনে লাফিয়ে পড়ল।

অচিন্ত্যর খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। শেষ গ্রাস মুখে রেখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। গ্রাস শেষ হলে অনেকটা জল খেল। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল অচিন্ত্য, আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল,—দত্তদা হয়ত কাল ন'টার বাসে এসে হাজির হবে।

শচী মাথা তুলল না। শূন্য আসনের দিকে চেয়ে বসে থাকল।

সকালে সূর্যোদয়ের পর শচী রান্নাঘরের দরজা খুলে দিয়ে বাসি চোখে উনুন ধরাবার সময় রোজ পায়রা জোড়ার কথা ভাবে। মতিয়া তাকে একজোড়া পায়রা এনে দিয়েছিল। সাদা পায়রা। খুব তাড়াতাড়ি ওরা শচীর পোষ মেনে গিয়েছিল। শচী ভোরে উঠে কাঠ-কুটো টেনে উনুন ধরাবার সময় পায়রা জোড়া ভেতরের বারান্দা আর উঠোনে সারাক্ষণ ঝটপট করে উড়ে বেড়াত। উনুন ধরানো হয়ে গেলে শচী উঠোনে এসে একমুঠো দানা ছড়িয়ে দিলে ওরা বসে বসে খুঁটত আর শচী কুয়োতলায় ফাঁকায় দাঁড়িয়ে মুখ হাত-পা ধুতো, বাসি শাড়ি জামা ছাড়ত, কাচত, দড়িতে শুকোতে দিত। দানা খোঁটা শেষ করে পায়রা জোড়া এক সময় উড়ে যেত।

এই জোড়া পায়রার একটা দত্তবাবু, অন্যটা অচিন্ত্য মেরেছে। একদিন হাসাহাসি গল্প করতে করতে কি কথায় যেন বাজি ধরে দত্তবাবুর ছররা-বন্দুকে ওরা দু'জনে একে একে উড়ন্ত পায়রা জোড়া মেরে ফেলল।

শচীর সেদিন মনে হয়েছিল, একদিন বাজি ধরে হয়ত ওরা তাকেও মেরে ফেলতে পারে।

এই নিষ্ঠুর কাজ করার পর দত্তবাবু এবং অচিন্ত্য দু'জনেই ভীষণ লজ্জায় এবং অনুতাপে পড়েছিল। দত্তবাবু দু'জোড়া পায়রা এনে দিতে চেয়েছিলেন, অচিন্ত্য স্ত্রীর হাত ধরে ফেলে অনেক অনুনয় করেছে। শচী অবশ্য আর পায়রা আনতে, আনাতে বা পুষতে সম্মত হয়নি।

কিন্তু সকাল বেলায় উনুন ধরাতে বসলে রোজই শচী যেন কানে সেই চঞ্চল বশীভূত দুটি পায়রার পাখা ঝাপটানির শব্দ শোনে। এবং কাঠ-কুটোর ধোঁয়ায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসার আগেই ফাঁকা উঠোনে নেমে এসে দুমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। যেন শ্বাস স্বাভাবিক করে নেয়।

আজ শচী উনুন ধরিয়ে উঠোনে নেমে আসতেই অচিন্ত্যকে দেখতে পেল। দু'হাত মাথার ওপর উঠিয়ে গা ভাঙছিল অচিন্ত্য, হাই তুলছিল।

এত সকাল সকাল অচিন্ত্য বড় একটা ওঠে না। শচী মাজন নিতে, সকালের শাড়ি সেমিজ জামা আনতে ঘরে চলে গেল।

কুয়োতলায় অচিন্ত্য জল তুলে দিয়েছে। শচী মুখ হাত পা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিল।

ও-পাশে একটু সব্জি বাগানের মতন। অচিন্ত্য কোদাল হাতে বাগানের মাটি ঠিক করে দিচ্ছে, ঝরা মরা পাতা আলাদা করে জড় করছে, হয়ত নিজের হাতে কয়েক বালতি জলও দিয়ে যাবে।

শচী বাসি কাপড় জামা ছেড়ে কেচে নিল। শুকনো কাপড়-চোপড় গায়ে জড়িয়ে কাচা বস্ত্রগুলো যখন উঠোনের দড়িতে টাঙিয়ে দিচ্ছে, অচিন্ত্য বলল,—তোমার এই ফুলের গাছটা বাড়েও না, ফুলও ফোটে না। খুব একটা গাছ পুঁতেছ।

সেমিজ এবং জামা টাঙিয়ে শচী শাড়িটা দড়িতে মেলে দিচ্ছিল। গাছটা তার নজরে পড়ছিল না।

—এটা কি ফুলের গাছ, শচী?

—বুনো ফুল, নাম জানি না।

—ফুল দেখেছ তুমি? কেমন দেখতে?

—লাল, ছোট ছোট। আমরা ছেলেবেলায় লাল তিল বলতাম। শচী শাড়ি মেলে উন্মুক্ত উঠোনে এসে দাঁড়াল।

—লাল, ছোট ছোট...অচিন্ত্য হাসল,—তোমার ওই টিপের মতন নাকি ?

শচী স্বামীকে দেখছিল। খালি গা, হাতে কোদাল। সেই বুক, হাত, কাঁধ। শচীর মনে হল, লাল তিলের গাছ ইচ্ছে করলেই ও-মানুষ কুপিয়ে শেকড়সুদ্ধু উঠিয়ে ফেলে দিতে পারে।

একটা টিয়াপাখি এ-সময় পেঁপে গাছের ঝোপ থেকে নেমে এসে কুয়োতলার বালতিতে বসে ডাকছিল।

অচিন্ত্য চা খেয়ে তার অফিসে চলে গেছে। স্টেশন থেকে প্রথম বাসটা এসেছিল, যথারীতি দাঁড়িয়ে শহরের দিকে চলে গেছে কখন, এতক্ষণে শহরে পেঁছোয় পেঁছোয়। শহরের বাসটার আসার সময় হল। বেলা দশটার গাড়ি ধরায় স্টেশনে। দত্তবাবু স্টেশনের বাসে আসেননি, হয়ত শহরের বাসে এসে হাজির হবেন। কোন দিক থেকে তিনি আসবেন, কখন আসবেন কেউ জানে না।

অচিন্ত্যর জল খাবার তৈরি হয়ে পড়ে আছে। ডাউন বাস না গেলে আজ আর সে আসছে না। রান্নাঘরের কয়েকটা কাজ সেরে শচী এবার ঘরের কাজে হাত দেবে ভাবছিল। দুটো ঘর, এই বারান্দা পরিষ্কার করার সময় ঝাঁটায় হাত দিলে তখন আর অন্য কাজে হাত দেওয়া যায় না। নানকু বাইরের বারান্দাটা বিকেলে ঝাঁট দিয়ে দেয়।

শচী ঘরে বিছানা তুলছে, খোলা জানলা দিয়ে অচিন্ত্যর অফিস চোখে পড়ছে। জানলার গা ধরে কুলগাছের ছায়া, তারপর রোদ, রোদের মধ্যে ধুলোভরা করবী গাছের ঝোপ তপ্ত হয়ে উঠেছে, কয়েক পা মলিন ঘাস, তারপর অফিস। অফিসের মালঘরটা এখান থেকে চোখে পড়ছিল শচীর। ইট-সিমেন্টের গাঁথনি, মাথায় ঢেউখেলানো টিন। মালঘরের বারান্দার কাছে কয়েক বস্তা আলু নামানো। স্টেশনের বাসে চালান যাবে।

বিছানা তুলতে তুলতে শচী আচমকা প্রথম ডাউন বাসের হর্ণের শব্দ শুনতে পেল। গাছ লতা-পাতার মৌনতা সচকিত করে দূরান্ত থেকে হর্ণের শব্দটা ভেসে আসছে, একটানা তীক্ষ্ণ জোরালো যান্ত্রিক শব্দ। বাসটা তার আবির্ভাব ঘোষণা করতে করতে এইভাবে আসবে। শচী কল্পনা করতে পারল ধুলোর ঝড় উঠিয়ে বাসটা পিচের রাস্তা ফেলে কাঁচা শড়ক দিয়ে আসছে।

এখানে গাছের শাখায় ক'টা কাক কিছু চড়ুই এবং ময়না ঈষৎ ডাকাডাকি করে চুপ করে গেল।

বাসটা এল। জোড়া জামতলায় দাঁড়াল। শচীর বিছানা তোলা প্রায় শেষ। পুবের জানলায় এসে দাঁড়াল ও। বাসটা পুরোপুরি দেখা যায়, সামনের সবটুকু। ড্রাইভারের দরজা খুলে বিজন ড্রাইভার নেমে এসেছে। খাকি ফুলপ্যান্ট, গায়ে আঁট গেঞ্জি হলুদ রঙের, চোখে রঙীন চশমা। চশমাটা খুলে বিজন ড্রাইভার একবার এদিকে তাকাল। তারপর রুমাল বের করে মুখ-গলা মুছতে মুছতে অফিসের দিকে চলে গেল।

সকালের ডাউন বাসে বেশ ভিড় হয়। আজ অতটা ছিল না। শচী দত্তবাবুকে দেখল না। ড্রাইভারের পিছন দিকে সেকেন্ড ক্লাসের দরজা খুলে অন্য লোকজন নামল।

শচী আগে অনুভব করেনি, এখন বাসের লোকজন দেখতে দেখতে অনুভব করল,

তার মনে খুব চাপা এক উৎকণ্ঠা ছিল। দত্তবাবু আসেননি, শচী আপাতত স্বস্তি অনুভব করছে।

এটা বিয়ের মাস নয়। সবে ফাল্গুন গিয়েছে। সেকেন্ড ক্লাসের দরজা খুলে এক যুগল নেমে আমের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সকৌতুকে এই পান্থশালা দেখছিল। ফাল্গুনের সদ্য স্বাদ যেন আমতলায় দেখতে পেল শচী। মেয়েটির হাতের শাঁখা এবং সিঁথির ঘন সিঁদুর লক্ষ্য করা না গেলেও শচী ওর সর্বাঙ্গে একটি মধুর বর্ণ দেখতে পাচ্ছিল। ছেলেটি আঙুল দিয়ে মহুয়ার গাছ দেখাচ্ছে। মেয়েটি দেখছে।

আরও ক'জন নেমেছে। মাড়োয়ারী দুই বাবু। তারা অন্যদিকে আড়ালে হেঁটে যাচ্ছিল গল্প করতে করতে। খাকি হাফপ্যান্ট, সাদা শার্ট পরা এক ভদ্রলোক সিগারেট খাচ্ছেন। ক'জন দেহাতী বাস অফিস থেকে জল খেয়ে এল। ধোপাটা পাঁটরি নিয়ে নামেনি, শচীদের জামা-কাপড় তার মাথার গামছায় জড়িয়ে বাসার দিকে আসছে। এ-বেলা কাপড় দিয়ে গেল, ও-বেলা ফিরতি পথে নিয়ে যাবে।

মতিয়া আর বাসের কুলি মিলে আলুর বস্তা বাসের মাথায় চাপাচ্ছিল। শচী আমতলার দিকে আরও কয়েক পলক তাকিয়ে ধোপার কাছ থেকে কাপড় নিতে বারান্দায় চলে গেল।

ডাউন বাস চলে গেল, আবার সব শান্ত। জোড়া জামতলা ফাঁকা, অফিস ঘরের সামনে ধুলোয় ভরা পথ এবং মলিন ঘাস চৈত্রের রোদে তেতে উঠছে। লতাগুল্মে হালকা ছায়া। দূরান্তে বনরেখা, ডালের ক্ষেত, আলুর চাষ। শচী তার দৃষ্টির মধ্যে এত কিছু দেখতে পায় না, অনুমান করে নেয়।

অচিন্ত্য জলখাবার খেয়ে আরও এক দফা চা হাতে নিয়ে অফিসে চলে গেল। দত্তদা না আসায় খুব অধৈর্য। আজ আবার বারোটার আপ্ বাসে পেট্রলের টিন, মোবিল, ব্যাটারী—টুকটাক আরও কি সব আসবে কোম্পানির। পুরোনো মালপত্র পাঠিয়ে দিতে হবে শহরে। অচিন্ত্য গজরাচ্ছিল। বাস সার্ভিসের কাজে বড় ঝামেলা।

শচী একা হাতে এই ছোট সংসারের দু'কূল সামলে যাচ্ছে। রান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, এটা ওটা কাচা, বাসনপত্র ধোয়া। মাঝে মাঝে নানকু এসে জলটা তুলে দেয়, কাঠটা চিরে দেয়।

বাড়িতে ঘড়ি নেই শচীর। বাসের আসা যাওয়া নিয়ে তার সময় মাপা। বারোটার বাস চলে গেল। শচীর আবার সেই উৎকণ্ঠা, দত্তবাবু বুঝি এসে পড়লেন। না, এলেন না। প্রখর রৌদ্রে চৈত্রের মধ্যাহ্ন দাহ্য বস্তুর মতন জ্বলছিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে মাটিতে খালি গায়ে শুয়ে অচিন্ত্য ছটফট করছিল। গরমে না বাঘের চিন্তায় কে জানে। শচী ভিজে চুল এলিয়ে জানলার পাশ ঘেঁষে বসেছিল। বাইরে লু বইছে, ঘাস মাটি পুড়ছে, গাছপাতার নরম ডাল কাঁপিয়ে চৈত্র দুপুরে কে যেন তার দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

অথচ বনবৃক্ষের কোন নিবিড় ছায়ায় বসে ঘুঘু ডাকছিল। শচী উত্তরের জানলার আধখানা পাট খুলে দিয়েছে। এদিকে কাঁঠালগাছের ঘন ছায়া নেমে আছে বেলা থেকেই। বাতাস গরম বলে পুরো জানলা খুলতে পারে নি। তবু এই অল্প উন্মুক্ত বাতায়ন ঘরের দুঃসহ গরম সামান্য লাঘব করছিল।

অচিন্ত্য হাত পাখা টেনে নিয়ে নিজের মুখ গলা বুকের ওপর খানিক বাতাস করল।

—দত্তদা বোধ হয় কোথাও গেছে, শচী। অচিন্ত্য চোখ না খুলেই বলল।

শচী জবাব দিল না। মানুষটা বাঘের কথাই ভাবছে। সারাদিন শুধু ওই এক ভাবনা।

—পশুপতিকে বলেছি, দেখা হলে খবরটা দিয়ে দিতে। অচিন্ত্য পাখার বাঁট দিয়ে পিঠ চুলকে নিল।

বাইরে ছোট মতন একটা ঘূর্ণি মাতামাতি করছিল। যেন উড়তে উড়তে এই ছায়াতলে ছুটে এসে থতমত খেয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, এবং শুকনো কটা পাতা শূন্যে উড়ছিল। শচী অন্যমনস্ক চোখে দৃশ্যটা দেখছিল।

দুপুর কাটল। বিকেল এল, গড়াল; অপরাহ্নের কোনো অদৃশ্য আঁচলে দগ্ধ দিনান্তের শেষ রক্ততাটুকুও মুছে গেল। অবশেষে বনজ গন্ধ, শীতল বাতাস, সন্ধ্যা ছায়া এবং পত্র মর্মর এই পান্থশালা প্রীতিকর করে তুলল। আকাশে তারা উঠে গেছে তখন।

দত্তবাবু এলেন না। আরও দু দফা বাস এসেছে গেছে। আর মাত্র একটি আপ্ বাস যাবে, রাত আটটার শেষ ডাউন বাসটা আসবে।

শচী কুয়োতলায় গা ধুতে গিয়ে সন্ধ্যার আকাশতলে তার মৃত পায়রা দুটির কথা ভাবছিল।

দত্তবাবু এলেন না। অচিন্ত্য প্রত্যহ প্রতিটি বাসে তাঁকে আশা করেছে। প্রথম প্রথম অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করত, পরে ক্রমশ বিরক্ত বিতৃষ্ণ হয়ে উঠছিল।

শচী আর উৎকণ্ঠা অনুভব করত না। প্রায় সপ্তাহ কাটতে চলল, উনি আর আসবেন না।

শেষ পর্যন্ত রবিবারে হাট বাজারের দিন রাত আটটার ডাউন বাস বিদায় করে দিয়ে অচিন্ত্য বাসায় এসে বলল,—শচী, সেই বাঘটা পালিয়ে গেছে। অচিন্ত্যর গলার স্বর খুব হতাশ।

শচী আজ বাইরের বারান্দায় তক্তপোশের ওপর মাদুর পেতে বসে ছিল।

অচিন্ত্য গায়ের শার্ট গেঞ্জি খুলে তক্তপোশের একপাশে ফেলে রাখল।

—পশুপতি বলছিল, বাঘটা ভুল করে এ-জঙ্গলে এসে পড়েছিল, পালিয়েছে বেটা। অচিন্ত্য তক্তপোশের এক পাশে বসে শরীরের ক্লান্তি কাটাচ্ছিল।

শচী স্বামীকে দেখছিল। আজ অতটা অন্ধকার নয়। আকাশে ভাঙা চাঁদ উঠেছে। তারা এবং চাঁদের আলোয় এই বন্য প্রান্তর ঈষৎ স্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

বাঘেদের নানা রকম অদ্ভুত স্বভাব থাকে। অচিন্ত্য যেন স্ত্রীকে বাঘের গল্প শোনাচ্ছে,—অসম্ভব চালাক।

শচী পা গুটিয়ে নিয়ে বসল। বাস কোম্পানির অফিস মালঘর বন্ধ হয়ে গেছে। আশে পাশে কোথাও রাত পাখি ডাকছিল। মন্দ বাতাস বইছে। শিশুগাছের মাথা ডিঙিয়ে আকাশের ভাঙা চাঁদ দেখা যাচ্ছিল।

—বিপদের গন্ধ পেলে আর সে-মুখো হবে না। অচিন্ত্য বলল, বলে একটু থেমে আবার বলল,—এমন চালাক জন্তু আর নেই।

শচী স্বামীর মুখ লক্ষ্য করল একটু।—তুমি ত কখনও বাঘ শিকার করনি, কি করে

জানলে ?

—এ-সব জানতে আর কষ্ট কি। শুনেছি..... শিকারের বইয়ে পড়েছি। অচিন্ত্য হালকা গলায় বলল, বলে শার্ট টেনে নিয়ে পকেট হাতড়ে বিড়ির কৌটো বের করল। —এত রকমের শিকার আছে, কিন্তু বাঘ শিকারের আলাদা খাতির। কেন বল ত..? অচিন্ত্য বিড়ি না ধরিয়ে একটা কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে নিল।

শচী কিছু বলল না। স্বামীর উলটো দিকে গুটোনো পা আবার একটু ছড়িয়ে দিয়ে বসল।

—পশুদের মধ্যে বাঘ সব চেয়ে বলবান, হিংস্র, আবার তেমনি হুঁশিয়ার। অচিন্ত্য যেন শচীকে উৎসুক শ্রোতা পেয়েছে এমন ভাবে বলল, বলার সময় বই থেকে শব্দ খুঁজে নিচ্ছে যেন।—বাঘ মারার আলাদা ইজ্জত।

—তোমার দত্তদা কটা শিকার করেছে? শচী আচমকা বলল; বাঘ শব্দটা সে উচ্চারণ করল না।

—গোটা তিনেক। অচিন্ত্য জবাব দিল। গলা ভর্তি করে ধোঁয়া টেনে গিলে ফেলল, তারপর খানিকটা ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে বের করে বলল,—প্রায় পনের বচ্ছর দত্তদা ফরেস্টে কাজ করছে, এত দিনে মাত্র তিনটে মারতে পেরেছে। তাহলে বোঝ একটা বাঘ শিকার কী জিনিস।

শচী সিগারেটের মুখের ফুলকি দেখছিল। তার মনে হল, এই ফুলকি আরও বড় হলে বোধ হয় বাঘের চোখের মতন দেখাত।

—আমার কপালে আর সুযোগই জুটছে না। অচিন্ত্য যেন বেশ ক্ষুব্ধ, হতাশ।

সিগারেটটা সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল অচিন্ত্য। শার্ট গেঞ্জি তুলে নিয়ে চলে গেল ভেতরে।

শচী চুপ করে বসে থাকল। সামনে চাঁদের আলোয় জবা গাছটা তার নিজেরই ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল। কয়েকটা কলাফুলের ঝোপ। কোথাও একটি ফুল নেই। তারপর বিবর্ণ ঘাস, লালচে মাটি; চন্দ্রালোকে ঘাস মাটি সামান্য যেন আর্দ্র দেখাচ্ছে। আয়নার কাচের মতন এই জ্যোৎস্না যেন বনবৃক্ষ ও লতাগুল্মকে সস্নেহে তোষণ করছিল।

অচিন্ত্য কুয়োতলায় গিয়েছে। স্নান করছে। শচী জলের শব্দ পাচ্ছিল।

চাঁদের আলো ক্রমশ তক্তপোশের ধারে এসে পড়ছিল। আরও কিছু পরে আধখানা তক্তপোশ জুড়ে বসবে। শচী আস্তে আস্তে চাঁদের আলোর দিকে তার পা ছড়িয়ে দিল। ফিকে আলতার রঙ নজরে পড়ছিল ওর। পায়ের পাতা, গোড়ালি, আঙুল আলতার রঙে রঞ্জিত হলেও কেমন খয়েরী ম্লান দেখাচ্ছিল। শচী কিছুক্ষণ এই ম্লান মোটা রেখার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর সহসা তার মনে হল অচিন্ত্য স্নান করে আবার বাইরে এসে বসবে। শচী পা গুটিয়ে নিল।

অচিন্ত্য আজ ঘরে শুতে চাইল না। খুব গুমোট ভেতরে। শচী জানত, অত গুমোট থাকার কথা নয়। আরও কিছুদিন পরে তাদের বাইরেই শুতে হবে। গত বছরও শুয়েছে। এ-বছরে যেন একটু আগে ভাগে বাইরে আসতে হল।

বাইরের তক্তপোশে অল্প করে বিছানা করল শচী। মাদুরের ওপর আর তোশক পাতল না, সাদা চাদর বিছিয়ে দিল। বালিশ রাখল। এক কুঁজো জল, গ্লাশ। মশারি

টাঙিয়ে দিল। ভেতরের ঘর দোর বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়াল।

অচিন্ত্য সামনে মাঠের মতন জায়গাটুকুতে পায়চারি করছিল। খালি গা।

ধবল জ্যোৎস্না। বাতাস চঞ্চল হয়ে বইছিল। পাতার শব্দ নিস্তব্ধতাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

—শচী—অচিন্ত্য ডাকল।

শচী মশারির পাশ গুঁজে দিচ্ছিল।

—এদিকে এস, একটু বেড়াই। সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। অচিন্ত্য শচীর দিকে মুখ করে তৃপ্ত গলায় ডাকছিল।

শচী বাইরে মাঠে গিয়ে দাঁড়াল।

—এই জায়গাটা দিনে অসহ্য, রাত্রে কিন্তু বেশ লাগে। অচিন্ত্য বলল।

স্বামীর সঙ্গে হাঁটছিল শচী। ওরা জোড়া জামতলার দিকে যাচ্ছিল।

—এদিকে একদিন একটা বাঘ ছিটকে চলে আসে না? অচিন্ত্য দূরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল।

—মারবে? শচী অন্যমনস্ক।

—বলতে! অচিন্ত্য সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ দিল না।—আমি ছাড়ব না।

খালি পায়ে পা পা করে হাঁটছিল শচী। তারা ক্রমশ জোড়া জামতলা পাশে রেখে আমতলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। শচীর সেই ছেলেটি এবং মেয়েটির কথা অকস্মাৎ মনে পড়ল। মাত্র ক'দিন আগে ওরা ওই আমতলায় ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়েছিল।

—তুমি কি বাঘ ছাড়া কিছু ভাব না? শচী আচমকা বলল।

—আর কি ভাবব? অচিন্ত্য স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরাল।

—জগতে আর ভাবনা নেই? শচী চাপা গলায় বলল।

—থাকবে না কেন। কত আছে—। আমি ভাবি না। অচিন্ত্য সরল গলায় বলল,—আমার কাছে একটা বাঘ অনেক—

—কীর্তি? শচী যেন এই প্রথম স্বামীকে উপহাস করতে চাইল।

—কীর্তি ফির্তি জানি না। অচিন্ত্য বেপরোয়া গলায় বলল,—একটা মানে হয়। লোকে তবু বলবে। নয়ত কিসের এই বনজঙ্গলে পড়ে থাকা।

শচীর খুব ইচ্ছে হয়েছিল ওই আমতলায় গিয়ে একটু দাঁড়ায়। ইচ্ছেটা হঠাৎ মরে গেল।

তক্তপোশের মাথার দিকে চাঁদের আলো সরে এসেছিল। এখন মাঝ রাত। শচী ঘুমের ঘোরে কিসের অস্বস্তিতে সামান্য ছটফট করল, মুখে বিড়বিড় করে কি বলল। তার হাত অচিন্ত্যর গায়ে পড়েছে। অবলম্বনের মতন কি যেন প্রাণপণে ধরবার চেষ্টা করে ভীতার্ত অস্ফুট শব্দ করল। শচী জেগে উঠল। চোখের পাতা এবং মশারির ঘর থেকে তার দুঃস্বপ্ন চকিতে বাইরে পালিয়ে গেল।

ঘোর কাটার পর কিছুক্ষণ শচী সজ্ঞানে চেয়ে থাকল। সে অরণ্য এবং বাঘের স্বপ্ন দেখছিল। অচিন্ত্য একটা বাঘকে গুলি করে মেরেছে। আহত মুমূর্ষু বাঘটা শচীর দিকে পাক খেতে খেতে এগিয়ে আসছিল। ছোট ছোট ঝোপ কাঁপছিল, ঘাস রগড়ে যাচ্ছিল, মাটি ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল। ভয়ে শচীর সমস্ত শরীর নিশ্চল নিঃসাড়। বাঘটা অনেকখানি

শরীর টেনে টেনে এল, তারপর আর পারল না। মরে গেল। অচিন্ত্য উল্লাসে চিৎকার করে কি যেন বলল, শচী ঠিক শুনতে পেল না। তবে তার মনে হল, এতদিনে তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে বলে অচিন্ত্য বিরাট আনন্দে ফেটে পড়েছে। তার উল্লাস এবং আনন্দ বিজয়ী দেবতার মতন দেখাচ্ছিল।

ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসল শচী। অচিন্ত্য অঘোর ঘুমে। চাঁদের পূর্ণ আলোয় সাদা জালের মশারি আরও শ্বেত। বাতাসের তরঙ্গে কাঁপছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। এত নিস্তব্ধ যে শচীর মনে হল, বিশ্বচরাচর মৃত। অচিন্ত্যর নিশ্বাসের মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ও।

অনেকক্ষণ বিমূঢ় অসম্বৃত হয়ে শচী বসে থাকল, এবং স্বামীর গভীর নিশ্বাসের শব্দ শুনল। মশারির ভেতর থেকে বনচিত্র দেখা যাচ্ছিল না। নিরাকার অস্পষ্ট একটি পটছায়ার মতন সামনে বনবৃক্ষসারি দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যহের সেই জোড়া জামতলাও শচী দেখতে পাচ্ছিল না।

একবার মনে হল, মশারি তুলে শচী বাইরে চলে যায়, মাঠে হেঁটে হেঁটে কোথাও গিয়ে দাঁড়ায়। এই জ্যোৎস্না বৃক্ষ নিস্তব্ধতা তার সর্বসত্তা শোষণ করে নিক।

শচী উঠল না। অযথা মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে লাভ নেই। বনোয়ারীলালের বাসের মতন তাকে কেউ তুলে নিয়ে যাবে না। শচী তার প্রতি রোমকূপে নিজের ব্যর্থতার স্বেদ অনুভব করতে পারছিল। জীবন এত শূন্য, অর্থহীন শচী আগে কখনও বোধ করেনি। তার দুটি বশীভূত পায়রা মরে যাবার পরও নয়। বেদনা শচীকে ক্রমশ পরিত্যক্ত শিশুর মতন অসহায় করে তুলছিল।

অচিন্ত্যর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শচী কান পেতে হৃদয়ে গ্রহণ করবার চেষ্টা করল। নিয়মিত বিরতির পর নিশ্বাস পড়ছে, প্রশ্বাস প্রবেশ করছে। শচীর মনে হচ্ছিল, অচিন্ত্যর হৃদয়ে কোথাও শূন্যতা নেই। তার প্রাণবায়ু পূর্ণ, গভীর। অচিন্ত্য একদিন তার জীবনকে অর্থময় করে তুলবে। সে বাঘের স্বপ্ন দেখে দেখে বেঁচে থাকবে এবং কোনো-দিন নিজের জীবনের বিনিময়ে এক আকাঙ্ক্ষিত আনন্দময় অভিজ্ঞতা তার করতলগত করে দেবতার মতন হাসবে। একদিন, শচী জানে না—কবে, কি ভাবে, তবে শচী আজ স্থির নিশ্চয়, অচিন্ত্য তার জীবনের আবেগে এবং ধ্রুব বিশ্বাসে তার মনোমত কীর্তি অর্জন করবে।

শচী কিছু করবে না। গাছের ছায়ার মতন সে বেঁচে থাকবে। নিয়তি নির্দিষ্ট সীমায় পরজীবী আলোয় কখনও হ্রস্ব কখনও বর্ধিত আকারে তাকে আমৃত্যু বেঁচে থাকতে হবে।

স্বামীর মুদিত নিদ্রিত চক্ষের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকল শচী। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আজ এই প্রথম স্বামীর হয়ে কামনা করল, একদিন এই অরণ্যের ধূর্ত শঙ্কিত পলাতক একটি ব্যাঘ্রকে সে যেন হত্যা করতে পারে।

অচিন্ত্য পাশ ফিরল। শচী পা টেনে নিল। শাড়ি টেনে পায়ের আলতা ঢেকে দিল।

নৈরাজ্যবাদ

অতীন্দ্রনাথ বসু

১৩। সমীক্ষণ

ই. ভি. জেংকার তাঁর "নৈরাজ্যবাদ" নামক ঐতিহাসিক সমালোচনা গ্রন্থের উপসংহারে রায় দিয়েছেন :

> মানুষের কল্পনায় যত রকমের বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে অন্যতম গুরুতর বিভ্রান্তি নৈরাজ্যবাদ। কারণ ইহা এমন সব প্রত্যয় লইয়া এমন সব মীমাংসার দিকে চলিয়াছে যাহা মানবপ্রকৃতির ও জীবনসত্যের পরিপন্থী।[১]

একাধিক মরমী ঐতিহাসিকের হাতে সমাজবাদের ইতিহাস রচিত হয়েছে। নৈরাজ্যবাদের ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা আজ পর্যন্ত হয়নি। এর সমঝদার নিরপেক্ষ আলোচনা একান্ত দুর্লভ। পল এল্‌ৎবাশের তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে সপ্তরথীর রচনাবলী থেকে বহুল উদ্ধৃতি দিয়ে একটা পক্ষপাতহীন বর্ণনা দিয়েছেন বটে কিন্তু এমন একটা ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে এঁদের ফেলেছেন যে মানুষগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয় না।[২] ভিজেটেলীর পুস্তক শতকান্তকালের গুপ্তহত্যার একটি ফিরিস্তি।[৩] ইনি বলতে চান নৈরাজ্যবাদীরা স্বভাবে ও চরিত্রে আততায়ী। নৈরাজ্যবাদের বিচার বিশ্লেষণ নানা জনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন—কারও নিন্দাবাদ শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, কেহ বা একে বিদ্রূপের অম্লরসে সিঞ্চিত করেছেন। প্রতিবাদীদের মধ্যে দুইজনের বিচার বিশেষ-ভাবে বিচার্য,—একজন মার্ক্‌স্‌বাদী জর্জ প্লেখানভ্‌, অপরজন ফেবিয়ানপন্থী জর্জ বার্নার্ড শ।

প্লেখানভের সমালোচনা দার্শনিক পদপাচ্য নয়।[৪] মার্ক্‌স্‌বাদের নিয়মে দর্শনের বিতর্ক শ্রেণীযুদ্ধের আওতায় পড়ে, সুতরাং মার্কসীয় শব্দকোষে যত প্রকারের কটুকাটাব্য আছে তার কোনটি ইনি বাদ দেননি। প্রুদঁ চরমপন্থা ও নরমপন্থার মধ্যে দোদুল্যমান একটি পাতি বুর্জোয়া, 'আঙুলের ডগা পর্যন্ত অবাস্তবমতি।'

> স্যাঁ সিমঁ, ফুরিয়ে ও রবার্ট ওয়েন হইতে যাহা তাঁহার স্বতন্ত্র তাহা হইল মনের চরম সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা, যাবতীয় বিপ্লবী ভাবনা ও আন্দোলনের প্রতি বিদ্বেষ। (৭৩)

প্রুদঁর অপরাধ তিনি বলেছিলেন যে ফেব্রুয়ারী মাসের (১৮৪৮) ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল কাল পূর্ণ হবার আগে, সুতরাং এর ব্যর্থতা অবধারিত। সরকার অথবা সংবিধানের

---

[১] ডের এনার্কিজমাস, জেনা, ১৮৯৫।

[২] ডের এনার্কিজমাস, ১৯০০। এতে আছে গডউইন, প্রুদঁ, স্টার্নার বাকুনিন, ক্রপটকিন, টাকার ও টলস্টয় থেকে বহুল উদ্ধৃতি। ক্রপটকিনের "নৈরাজ্যবাদী নীতিধর্ম" শীর্ষক পুস্তিকা এর আগে প্রকাশিত হয়েছে অথচ বইটিতে ক্রপটকিনের নৈতিক মতবাদের কোন উল্লেখ নেই।

[৩] ই. এ. ভিজেটেলী : দি এনার্কিস্টস্‌, দেয়ার ফেথ এণ্ড দেয়ার রেকর্ড, লণ্ডন, ১৯১১।

[৪] সোসিয়েলিজমাস্‌ আণ্ড এনার্কিজমাস, বার্লিন, ১৮৯৪। অনুবাদ, এলিয়ানর মার্ক্‌স্‌ এভেলিং, শিকাগো, ১৯০৭।

পরিবর্তনকে প্রূদ‍ঁ বিপ্লব বলে মনে করতেন না, আর সেইটেই ছিল ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবীদের লক্ষ্য। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্যে রাষ্ট্র অথবা শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি আপত্তি করেন নি। অথচ এই আপত্তিই তাঁর মুখে চাপিয়ে প্লেখানভ বলছেন,

> প্রত্যেকটি শ্রেণী-সংগ্রাম রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রাম। রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রামে বাধা দিলে তাহা দ্বারা শ্রেণী-সংগ্রামকেই সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া হয়। (৬২-৬৩)

প্রূদ‍ঁ, তথা নৈরাজ্যবাদীরা এর একটিতেও বাধা দেননি। পার্লামেণ্ট প্রথার যে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম তাতে তাঁরা বাধা দিয়েছেন কারণ তাঁরা মনে করেন পার্লামেণ্টের কায়দাকানুন বুর্জোয়াদের একটা ফাঁদ। মার্কসীয় প্রথার যে বৈপ্লবিক রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম তাতে তাঁরা বাধা দিয়েছেন কারণ তাঁরা মনে করেন গোটা শ্রমিকশ্রেণী কখনো একটা সরকারের কাজ চালাতে পারে না, সুতরাং এতে অল্প গুটিকতক লোক হাতে ক্ষমতা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নামে একটি স্বৈরতন্ত্র চালাবে। প্লেখানভ এই আশঙ্কা খণ্ডন করেন নি।

বাকুনিন ও তাঁর সমধর্মীরা পার্লামেণ্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন কারণ আইনসভার আবহাওয়ায় শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের শ্রেণীচেতনা হারিয়ে ফেলে, তারা বুর্জোয়া আদবকায়দায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পার্লামেণ্টের বুর্জোয়া পরিবেশ প্লেখানভের কাছেও খুব উপাদেয় নয়। তবে তাঁর বিশ্বাস এই পরিবেশ বদলাবে।

> নির্বাচকদের পরিবেশ, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় দলের পরিবেশ, যাহারা দৃঢ়ভাবে সংগঠিত এবং নিজ লক্ষ্যে সচেতন, তাহার কোন প্রভাব কি নিঃস্বদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর পড়িবে না? (৯৯)

এই সম্ভাবনা প্রাক্‌বিপ্লব না বিপ্লবোত্তর কালের তা ঠিক স্পষ্ট নয়। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর কি ঘটবে তার নিশানা মার্ক্‌স্‌ নিজেই পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন। বুর্জোয়াদের শক্তি নষ্ট করে, তাদের বিত্ত দখল করে শ্রমিকরাষ্ট্র শ্রেণীভেদ দূর করবে, তারপর ক্রমশ রাষ্ট্র অব্যবহারে ক্ষয় হয়ে যাবে। নৈরাজ্যবাদীদের রাষ্ট্রনাশা কার্যকলাপের প্রতিবাদে প্লেখানভ অন্যত্র এই মার্ক্‌সীয় পন্থার অবতারণা করেছেন। এই নূতন পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধির কোন জায়গা নেই। যখন রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা একটি মাত্র দল করায়ত্ত করেছে, যখন সংবিধানে দ্বিতীয় কোন দল মঞ্জুর নয়, যখন নির্বাচন হবে সরকারের তৈরী প্রার্থীতালিকার ভেতর থেকে, তখনকার সে বিধিব্যবস্থাকে প্রূদ‍ঁ ও বাকুনিন ঠিক গণতান্ত্রিক বিধান বলে বুঝতে পারেন নি।

তবে সম্ভবত প্লেখানভ বিপ্লবোত্তর কালের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য করেন নি। তিনি বিশ্বাস রাখেন যে বুর্জোয়া পরিবেশের মধ্যেও শ্রমিকরা নির্বাচন ও পার্লামেণ্টের মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। এ আশা হয়ত বা ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু যে জার্মান সমাজবাদী দলকে দৃষ্টান্ত খাড়া করে তিনি এই কর্মকৌশলের সুপারিশ করেছিলেন তারা বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নৈরাজ্যবাদীদের যুক্তিকেই প্রমাণ করে দিয়েছিল।[৫]

সম্পত্তিপ্রথা উচ্ছেদ করতে হলে রাষ্ট্রবল চাই,—বিপ্লব করে সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এর প্রত্যাবর্তন রুখতে হলে উদ্যত শাসনদণ্ডের প্রয়োজন। এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার্য। এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীদের একমাত্র রক্ষাকবচ সমাজের

[৫] প্লেখানভের পক্ষে অবশ্য এতটা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তিনি লিখেছিলেন ১৮৯৪ সালে, সমাজবাদী দলের ডিগবাজির বিশ বছর আগে।

সহযোগী বিবেকবুদ্ধি। তা বিপ্লব দিয়ে গড়া যায় না। মার্ক্সবাদীদের পন্থাও যে কতদূর কার্যকরী তাতে সন্দেহ আছে। তারা একতান্ত্রিক সরকারের হাত দিয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে চায়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক অনির্দিষ্ট কাল অপরিমিত রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করবে, তারা অপর্যাপ্ত বিত্ত রাষ্ট্রের নামে হরণ করে এক নতুন স্বার্থপর শ্রেণী হয়ে দাঁড়াবে না—তা কে বলবে? ক্ষমতা কারও হাতে কায়েম হয়ে বসলে নানাবিধ স্বার্থ ও সুবিধা সঙ্গে সঙ্গে কায়েম হয়ে বসবে—বাকুনিন ও ক্রপটকিনের এইটেই ছিল ভয়।

নৈরাজ্যবাদের ধ্যানধারণাগুলিকে যথাসাধ্য বিকৃত করে লেখক বিষোদগার করেছেন—এর অসারতা অবাস্তবতা প্রতিপন্ন করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

> ব্যক্তির অধিকার নিরঙ্কুশ এই কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নৈরাজ্যবাদী মানুষের কার্যকলাপের বিচার করে। অসীম ব্যক্তিঅধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের নীতিবোধ, সুতরাং চরম বর্বরোচিত দুষ্কর্ম অথবা বীভৎস স্বেচ্ছাচারের উপরেও তাহারা 'নিরপরাধ' রায় দিয়া থাকে। (১৪০)

ক্রপটকিন থেকে উদ্ধৃতির ঠিক পরেই এই মন্তব্য। তাঁর "নৈরাজ্যবাদী নীতিধর্ম" ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রুদঁর "চার্চ ও বিপ্লবের ন্যায়ধর্ম প্রসঙ্গে" নামক বিরাট তিন খণ্ডের গ্রন্থও প্লেখানভের চোখে না পড়ার কথা নয়। কিন্তু এই সকল প্রামাণ্য নীতি-গ্রন্থকে এড়িয়ে তিনি সাংবাদিক স্তম্ভের কিছু গরম গরম কথা বেছে নিয়ে নৈরাজ্যবাদীদের দেখিয়েছেন রক্তপিপাসু গুণ্ডা ও ডাকাতের মত করে যাদের কাছে 'কোন কাজ হিংসাত্মক না হলেই তা আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও সরকারের সঙ্গে আপসপন্থী।' হিংসাত্মক অপকর্মে উসকানি দিয়ে তারা বুর্জোয়াদের হাতে সমাজবাদী আন্দোলন দমন করবার সুযোগ তুলে দিচ্ছে। আসলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে এক সুরে নৈরাজ্যবাদীদের চোর ডাকাত বানিয়ে প্লেখানভ ও তাঁর দলই নৈরাজ্যবাদকে দমন করবার পথ পরিষ্কার করেছিলেন। চরিত্র হননের এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর মেলে না।

প্লেখানভ নৈরাজ্যবাদকে কতদূর বুঝেছেন তার আর একটি নমুনা—

> নৈরাজ্যবাদীরা গণতন্ত্রে বাধা দেয়, কারণ তাহাদের মতে গণতন্ত্র সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। (১৪০)

নৈরাজ্যবাদীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করে, তাদের খুনখারাবি বুর্জোয়াদের দমননীতির অজুহাত দেয় অথচ এই নৈরাজ্যবাদই নাকি একটি বুর্জোয়া মতবাদ!—বুর্জোয়াদের 'লেসে ফের' বা অবাধ উদ্যোগ নীতির রকমফের! শেষে উপসংহারটি হল এই—

> নৈরাজ্যবাদীরা বিপ্লবের নামে পথ প্রশস্ত করে প্রতিক্রিয়ার, নীতিধর্মের নামে সমর্থন করে চরম গর্হিত কর্ম, ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে পদদলিত করে অপরের যাকিছু অধিকার। (১৪১)

আশ্চর্যের কথা, এমন একটি অসার অবাস্তব মতবাদ এবং এমন কতকগুলো নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক নিয়ে সমালোচক এত সময় নষ্ট করলেন কেন? এর উত্তর—

> এই যে অতিভোগে অবসন্ন সমাজ যাহার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত পচিয়া গিয়াছে, যেখানে সকল বিশ্বাস বহুকাল হয় মরিয়া গিয়াছে, যেখানে সকল অকপট মত হাস্যকর বলিয়া পরিগণিত, এই যে ক্লান্ত পৃথিবী যাহাতে সকল প্রকার ভোগের উপচার ফুরাইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না কোন নূতন খেয়াল নূতন অমিতাচার

> অভিনব অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারিবে,—সেখানে কিছু লোক আসিয়া এনার্কিস্ট কিন্নরদের কুহক সঙ্গীতে স্বেচ্ছায় কান পাতিয়া দেয়।...ক্ষয়িষ্ণু লেখক ও শিল্পীরা নৈরাজ্যবাদে দীক্ষা লইয়া "ফ্রান্সবার্তা," "কলম" ইত্যাদি পত্রিকায় ইহার মন্ত্র প্রচার করে। ইহা জলের মত পরিষ্কার। সকল বুর্জোয়ার মধ্যে ভোগক্লান্ত যে ফরাসী বুর্জোয়া তাহাদের ভিতর হইতে খাঁটি বুর্জোয়া দর্শন নৈরাজ্যবাদের ধুরন্ধররা বাহির হইয়াছে। ইহা না হইলেই বরং বিস্ময়ের কথা ছিল। (১৪৪-৪৫)

যে বুর্জোয়া সমাজে মার্ক্স্-এর সময় থেকে পচন ধরেছিল, প্লেখানভের সময়ে যার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত বিগলিত হয়ে গেছে, আজ পয়ষট্টি বছর পরেও তা বহাল তবিয়তে বর্তমান। একঘেয়ে জীবনযাত্রার বাইরে নূতন উদ্দীপনা আবিষ্কার করতে হলে তার উত্তম ক্ষেত্র কমিউনিজ্ম্ ও তার আন্দোলন। নৈরাজ্যবাদের চেয়ে এতে উদ্দীপনার রসদ বেশি। বিপ্লবের প্লাবনে সমাজের বহু ময়লা ভেসে ওঠে। কমিউনিস্ট বিপ্লবেও তাই হয়। কমিউনিজ্ম্-এর বিশেষত্ব শুধু এই যে এতে নরমেধ যজ্ঞের আয়োজনটা একটু বেশী ব্যাপক এবং বিপ্লবের পরেও বলিদান বন্ধ হয় না।

এই হল প্লেখানভের পরিবেশিত তত্ত্ব যা ইংরাজী অনুবাদিকার মতে 'আমেরিকার প্রত্যেক সমাজবাদী ও শ্রমিক পত্রিকার গায় মোটা হরফে লাল কালিতে লেখা থাকা উচিত।' সত্যই সমালোচনাটি লাল কালিতে লেখা,—খোলাখুলি দলীয় প্রচার। প্রুদঁ ও মার্ক্স্-এর সময় থেকে শুরু হয়ে যে ঝগড়া পঞ্চাশ বছর গড়িয়েছিল, বইটি তারই একটি অধ্যায়। বইটির নাম হওয়া উচিত ছিল 'এনার্কিজ্ম্ ও কমিউনিজ্ম্'। কমিউনিজ্ম্-এর বদলে সোসিয়েলিজ্ম্ শব্দ বসিয়ে লেখক একটি চাল চেলেছেন। প্রথমত এর ইঙ্গিত—এনার্কিজ্ম্ সোস্যালিজ্ম্-এর বিপরীত, নৈরাজ্যবাদ সমাজবাদী হতে পারে না। দ্বিতীয় ইঙ্গিত যে মার্ক্সীয় সমাজবাদ বা কমিউনিজ্ম্ একমাত্র খাঁটি সমাজবাদ, আর যা কিছু সমাজবাদ সব মেকি। আসল লড়াই যে রাষ্ট্রহীন সমাজবাদ ও রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজবাদের মধ্যে তা তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন। নৈরাজ্যবাদী চায় রাষ্ট্রকে নাশ করতে, কমিউনিস্ট চায় রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করতে। উভয়েরই কর্মের বাহন নিঃস্বরা, লক্ষ্য সমাজতন্ত্র,—ভেদ কেবল কর্মে। বৈপ্লবিক উপায়ে ক্ষমতাকে নাশ করলে কিংবা দখল করলে পর কোন পথে যে মুক্ত সহযোগী সমাজের আবির্ভাব হবে তার নিশানা ইতিহাসে অথবা ন্যায়শাস্ত্রে নেই, আছে কেবল বিপ্লবের রহস্যালোকে। এনার্কিজ্ম্ ও কমিউনিজ্ম্ দুই-ই এক আকাশকুসুমের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু তাদের রাস্তা মাটি ছাড়িয়ে আকাশে ওঠেনি।

বার্নার্ড শ'র সমালোচনা গালাগালি নয়, তথ্য ও যুক্তির ওপর নির্ভরশীল।* নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে হিংসাত্মক অপরাধের সম্পর্ক তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন,—

> এই সকল পত্রিকা [যাহা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ধারক] পড়িলে মনে হয় সকল বিপ্লবীই সমাজবাদী, সকল সমাজবাদীই নৈরাজ্যবাদী এবং সকল নৈরাজ্যবাদীই ঘরজ্বালানি, খুনে এবং চোর। ইহার একটি ফল এই হইয়াছে যে

* ইম্পসিবিলিটিস অফ এনার্কিজ্ম্, ফেবিয়ান ট্র্যাক্ট্ নং ৪৫, লন্ডন, ১৮৯৩। এটি ১৮৮৮ সালে লেখা হয় এবং ১৮৯১ সালে একটি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়।

> যে-সকল কল্পনাপ্রবণ ফরাসী ও ইটালীয় দুর্বৃত্তেরা খবরের কাগজ পড়ে তাহারা খুন করিতে অথবা চুরি করিতে গিয়া হাতে হাতে ধরা পড়িলে কখনো কখনো বলিয়া বসে যে তাহারা নৈরাজ্যবাদী এবং নীতির তাগিদে কুকাজ করিয়াছে। ইহা ছাড়া সকল দেশেই বিক্ষুব্ধ জনসমাজে যে সব লোক একটু বেশী হিংস্র ও বেপরোয়া তাহারা সহজে এনার্কিস্ট নামে আকৃষ্ট হয় কারণ এনার্কিস্ট বলিতেই মনে হয় বর্তমান অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সর্বস্বপণ সংগ্রাম। (৪)

নৈরাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য মহৎ, তার সঙ্গে শ'র বিবাদ নেই। বিবাদ উপায় নিয়ে, উপায়গুলো কতদূর কার্যকরী তাই নিয়ে। উপায় সম্পর্কে সকল নৈরাজ্যবাদী একমত নয়। শ' টাকারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদ ও ক্রপটকিনের সমাজকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদকে ধরে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন।

'দামের পরিমাপক শ্রম'—এডাম স্মিথের এই সূত্র থেকে ওয়ারেন, প্রুদ' ও মার্ক্‌স্‌ সিদ্ধান্ত টেনেছেন, শ্রমের স্বাভাবিক মূল্য তার পয়দা করা মাল। হুইগ দল এর ওপরে তাদের অবাধ অর্থনৈতিক উদ্যোগের নীতিকে দাঁড় করিয়েছে। এই নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতায় টাকারের আপত্তি নেই। তাঁর বিশ্বাস যদি যাবতীয় মৌরুসী স্বত্ব তুলে দেওয়া হয়, যারা জমিতে বাস করে অথবা চাষ করে ভূমিস্বত্ব যদি শুধু তাদের ওপর বর্তায় তাহলে প্রত্যেক শ্রমিককে তার পরিশ্রমের ফলটুকু পুরোমাত্রায় দেবার যে সামাজিক সমস্যা তার সমাধান হবে একটি সোজা উপায়ে—সেটি হল সবাই যার যার নিজের চরকায় তেল দেওয়া। স্বাধীনভাবে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে যার পাওনা রোজগার করে নেবে।

এর মধ্যে একটি মস্ত বড় ফাঁক আছে। শ্রমিকের ঘাড়ের ওপর থেকে মালিকের মুনাফা, খাজনা ইত্যাদি বোঝা যদি তুলে নেওয়া হয় তা'হলেও সে অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তার পূর্ণ শ্রমমূল্য আদায় করতে পারবে না। শ্রম ছাড়া আরো কয়েকটি জিনিস আছে যা দ্বারা শ্রমের দাম ঠিক হয়—প্রাকৃতিক সুবিধা, ভৌগোলিক অবস্থান, ইত্যাদি। দুটি গমভাঙ্গা কল, একটির চাকা নদীর ধারায় ঘুরছে, আর একটির নিকটে নদী নেই। তার চাকা ঘুরছে হাতে কিংবা বিদ্যুতে। এ দুটির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সমান নয়।

> কোন পক্ষ কারও সাহায্য না পাইলে প্রতিযোগীর সহিত সমানে সমানে পাল্লা দেওয়া হয়ত বা সম্ভব। কিন্তু একজনের পক্ষে থাকিবে জল ও বায়ু (কারণ জলচালিত কলের মত বায়ুচালিত কলও আছে) আর একজন খালি হাতে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে ইহা খাঁটি নৈরাজ্যবাদ হইতে পারে বটে, তবে খাঁটি ন্যায়বিচার অবশ্যই নয়। (৭)

সব জমির গুণ সমান নয়। চাষী সমান মেহনত করলেও স্থানভেদে ফলন কমবেশি হয়। সবচেয়ে অধম জমির চেয়ে ভাল জমিতে যেটুকু বেশী ফলন হয় সেটুকু বর্তমানে জমিদারের খাজনা, চাষীর কাছ থেকে প্রাপ্য। যদি চাষীকে জমির মালিক করে দেওয়া যায় তা'হলে সেই উদ্বৃত্ত ফলন তার হাতে আসবে, মন্দ ও ভাল জমির চাষীর মধ্যে ফারাক থেকে যাবে।

সুতরাং প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রত্যেককে তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে দিলেও সাম্য ও ন্যায়বিচার স্থাপিত হবে না। এই অন্যায় বৈষম্য ব্যক্তিমালিকানা ও অবাধ প্রতিযোগিতায় ক্রমশ বাড়তে থাকবে।

প্রাকৃতিক সুবিধা থেকে যে ধনবৈষম্য আসবে তা টাকার অস্বীকার করেননি। আসলে

তাঁর ঝোঁক স্বাধীনতার দিকে যত সাম্যের দিকে তত নয়। তাঁর ধারণা প্রত্যেকে যদি পুরোপুরি তার শ্রমের দাম পায় তা হলে এই সামান্য অসমতা মেনে নেওয়া যেতে পারে—এ থেকে কোন মারাত্মক বৈষম্যের উদ্ভব হবে না। টাকার এখানে ভুল করেছেন। সম্পত্তি বেচাকেনা, উত্তরাধিকারসূত্রে ভাগবাটোয়ারা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি থেকে ধনবৈষম্য বাড়তে বাড়তে আবার ধনিক-নির্ধনের ব্যবধান সৃষ্টি হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

ক্রপটকিনের সমাজধর্মী নৈরাজ্যবাদকে ইংরেজদের বোধগম্য করবার জন্যে বার্নার্ড শ' এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—

> এমন এক ব্যবস্থা যাহাতে সকলের যা কিছু চাহিদা রাজস্ব হইতে মিটানো হয় এবং রাজস্ব দেওয়া হয় শ্রমে। (১৩)

সকলে স্বেচ্ছায় রাজস্ব দেয়, আদায় করবার জন্যে জোরজুলুম নেই। যদি কেউ রাজস্ব না দেয়? ক্রপটকিনের ভরসা জনমতের উপর। কিন্তু জনমত কি অপরাধী ও আদর্শ-বাদীদের ওপর সমান বিরূপ নয়? জনমত ত' অনেক স্বৈরাচারী রাজাকে পুজো দিয়েছে আর নৈরাজ্যবাদীদের শাপান্ত করেছে।

> বিনা মেহনতে রুটি রুজির ব্যবস্থা হইলেও খাটিয়া খাইতে হইবে এমন কোন অকপট জনমত নাই। বরং ঠিক তাহার বিপরীত। বরং জনমত ইহাই শিখিয়াছে যে দৈনন্দিন কায়িক শ্রম ছোটলোকদের কাজ। কিছু সম্পত্তি জুটাইয়া কাজ ছাড়িয়া বসিয়া খাওয়াই হইল সাধারণ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা (১৪)

মানুষের মধ্যে এই যে সমাজবিমুখী স্বার্থপরতা তার জন্যে ক্রপটকিন বর্তমান দূষিত ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এই সমাজব্যবস্থা দূর হলে লোকের স্বাভাবিক শ্রমবৃত্তি জেগে উঠবে, সে আর অন্যের ঘাড়ে চেপে অলসভাবে খেতে পরতে চাইবে না। তাই যদি হবে তা হলে আদিম যুগে যখন সবাই খেটে খেত তা থেকে সম্পত্তিপ্রথার উদ্ভব হল কেমন করে?

> মানুষকে একটি স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত মনে করিয়া কোন লাভ নাই। সর্তহীন চূড়ান্ত ভালমন্দর রায় যদি ভুল বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে মানুষ সম্বন্ধে বরং এই ধারণাই হইবে যে সে একটি একগুঁয়ে স্বার্থপর শয়তান যে প্রকৃতির কঠোর শাসনে ধীরে ধীরে বুঝিতে বাধ্য হইতেছে যে তাহার প্রতিবেশীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অবহেলা করিয়া সে নিজেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিবার পথ প্রশস্ত করিতেছে। (১৫)

বর্তমান ব্যবস্থায় যারা স্বার্থসিদ্ধিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা বিনা পরিশ্রমে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারলেও পরিশ্রম করবে এ সম্ভাবনা কম। নিরাজ সমাজেও তারা এ সুযোগ ছাড়বে না। সে অবস্থায় খয়রাতি ভাণ্ডারগুলি কয়দিনেই লালবাতি জ্বালাবে আর নিরাজ সমাজ সমাধিস্থ হবে। সুতরাং দুটির একটি জিনিস দরকার,—হয় বাইরের চাপ, বাধ্যতামূলক শ্রম, নয়ত'-বা গভীর সামাজিক ন্যায়বোধ। পরের বস্তুটি অকস্মাৎ লভ্য নয়, দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করলে পর আয়ত্ত হতে পারে। মোটামুটি এই হল ক্রপটকিন প্রসঙ্গে শ'র বিচার।

মানুষ প্রকৃতির শিকলে বাঁধা শয়তান না রক্তমাংসে কলঙ্কিত দেবদূত এ বিতর্কের শেষ নেই। তবে তার মনে যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি আছে সে কথা ক্রপটকিন ও নৈরাজ্যবাদীরা ছাড়া আরো অনেকে স্বীকার করেন। এই জৈব বৃত্তিগুলো

বর্তমান অসম ব্যবস্থায় চাপা পড়ে আছে। ক্রপটকিন বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবের ধাক্কায় এই অবশ বৃত্তিগুলো জেগে উঠবে। এটা কিছু অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার নয়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে এমন 'অলৌকিক' ব্যাপার ঘটতে দেখা গেছে—যখন অভিজাতদের মধ্যে জমিদারী স্বত্ব ত্যাগ করবার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। দরকার হল বিপ্লবের বান নেমে যাবার পরেও এই নৈতিক উচ্ছ্বাসকে জীইয়ে রাখা। সকল বিপ্লববাদীর মত ক্রপটকিনও একটু বেশী আশাবাদী ছিলেন, একটু বেশী স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তিনি ভোলেননি যে নূতন নৈতিক অভ্যাস আয়ত্ত না হলে নিরাজ সমাজ টিকবে না, ভোলেননি যে শ্রমিক সংগঠনের ভেতর দিয়ে যৌথ দায়িত্বের চেতনা বিপ্লবসাধনের আগেই জাগিয়ে তুলতে হবে। রুশ বিপ্লবের পরে তিনি এও বুঝেছিলেন যে এ তপস্যা দীর্ঘকালের, ধৈর্য ও নিষ্ঠায় তপস্কাল পূর্ণ হলে তবেই আসবে আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লব।

টাকারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে যে আয়বৈষম্য দেখা দেয় ক্রপটকিনের সমাজকেন্দ্রিক ব্যবস্থায়ও তা একেবারে দূর হয় না। শ' দেখাচ্ছেন যে-সকল বস্তুর চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি সেগুলি যাদের ভোগে লাগবে তারা বঞ্চিতদের চেয়ে ভাগ্যবান হবে। ঈস্ট এন্ডের বাড়ির চেয়ে রিজেন্ট পার্কের বাড়ি লোভনীয়, অথচ রিজেন্ট পার্কে সকলের জায়গা হবে না। পাড়াগাঁয়ের বাড়ি আর লন্ডনের বাড়ি সমান নয়। দেশসুদ্ধ লোক এসে লন্ডনে ভিড় করবে তাও সম্ভব নয়। কিছু লোকের কপালে জুটবে লন্ডনে এবং রিজেন্ট পার্কে বসবাসের সুবিধা। তার দরুণ কিছু বেশী কাজ তাদের কাছ থেকে আদায় করা খুবই ন্যায়সংগত।

এগুলি ছোটখাট ব্যাপার। এমন কোন মোক্ষম দাওয়াই নেই যাতে দেখতে দেখতে সব রোগ সেরে যাবে। তবে ক্রপটকিনের নৈরাজ্যবাদে এ ব্যাধিরও চিকিৎসা আছে। শ্রম ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বাধামুক্ত হলে ঘর-বাড়ির ও শ্রম পরিবেশের অনেক উন্নতি হবে—রিজেন্ট পার্ক ও ঈস্ট এন্ডের তারতম্য, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও মজুরের কারখানা এ দু-এর তফাত অনেক কমে যাবে।

শ'র সমাধান কমিউনিজ্‌ম্‌ ও এনার্কিজ্‌ম্‌-এর মধ্যপন্থা। আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল যে জবরদস্তি যৌথকরণ আমাদের সহ্য হবে না। আমাদের এমন সততা নেই যে নিঃশাসন স্বেচ্ছা-উদ্যোগে সমাজের উৎপাদন ও ভোগে সামঞ্জস্য ঘটতে পারে। দু-এর মাঝামাঝি রাস্তা সমাজবাদী গণতন্ত্র একমাত্র চলনীয় রাস্তা। নৈরাজ্যবাদীরা এ রাস্তার ধার ধারে না কারণ তাদের মতে গণতন্ত্র অল্পের উপরে বহুর শাসন। শ' তাঁর জবাবে ঠিকই বলেছেন যে এ শাসন অব্যর্থ, এ গণতন্ত্রের দেওয়া নয়, নৈরাজ্যবাদ একে কেড়ে নিতেও পারে না। অল্পের ওপর বহুর অধিকার সোজা অঙ্কের হিসেব—'দুজন ব্যক্তি একজনের অপেক্ষা বলবান, এই মাত্র।'

গণতন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত নালিশ টাকারের, ক্রপটকিনের নয়। ক্রপটকিন পার্লামেণ্টি গণতন্ত্র চান না কারণ তাতে লোকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আসলে নৈরাজ্যবাদীরা খাঁটি গণতন্ত্রই চায়। টাকারও বলেছেন—'তারা নির্ভীক জেফারসনীয় গণতান্ত্রিক মাত্র।' স্বেচ্ছায় গড়া জনসংহতি যখন নিজেদের খুশিমত নিজেদের কাজ চালাবে তার চেয়ে ভাল গণতন্ত্র আর কি হতে পারে? শ'র সমাজবাদী গণতন্ত্র যদি তাঁর বিকেন্দ্রণের পথে অগ্রসর হতে থাকে তা হলে পরিণামে তা নিরাজ ব্যবস্থায় এসে পেঁছিবে। গণতন্ত্র মানে যদি লোকরাজ হয় তা হলে তার সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের বিবাদ নেই।

ক্রপটকিনের মুক্ত সমাজের প্রতিরূপ বিম্বৎসমাজ, বণিকসঙ্ঘ, শিল্পিগোষ্ঠী, ইত্যাদি যাতে যে যার রুচি ও আগ্রহ অনুসারে স্বেচ্ছায় এসে মিলিত হয়। শ' মন্তব্য করছেন—

> এই সংস্থাগুলির প্রত্যেকটিতে অধিকাংশ সভ্যের ভোট অনুসারে বৎসরের মিয়াদে একটি কর্মপরিষদ নির্বাচিত হয়, এই কর্মপরিষদের হাতে সংস্থার শাসনভার ন্যস্ত হয়। সুতরাং ক্রপটকিন সংখ্যাধিকের ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক বিধানে আদৌ ভয় পান বলিয়া মনে হয় না। (২২)

শ' খেয়াল করেননি যে দুটোর মধ্যে একটু তফাত আছে। স্বাধীন সমিতিতে সভ্যদের ওপর কর্মপরিষদ কোন জোর খাটাতে পারে না। বনিবনা না হলে যে কেউ সমিতি ছেড়ে দিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশাসনে এ অধিকার নাগরিকের নেই। ব্যক্তি-অধিকার সুরক্ষিত করবার পক্ষে গণতান্ত্রিক নির্বাচন যথেষ্ট নয়।

সমাজে যদি পরস্পর সহনশীলতা না থাকে, যদি সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের পীড়ন করে তা'হলে রাজশাসন তুলে দিয়ে তার সুরাহা হবে এ ভরসা শ' রাখেন না।

> শীতকালের ঠাণ্ডা জলহাওয়ার মত অসহনীয়তা আমাদের বহু অনিষ্ট করে। আমরা ওভারকোট চাপাইয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, আগুন জ্বালাইয়া যতদূর পারি শীতকষ্ট নিবারণ করি, বাকিটুকু সহ্য করি। তেমন গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রণ ইত্যাদি দ্বারা শাসনকার্যকে যথাসাধ্য সংযত করিবার পরও আমাদের রাষ্ট্রকে সহ্য করিতে হইবে। (২৩)

প্রুদ*, বাকুনিন ও ক্রপটকিন বৈধানিক গণতন্ত্রের যে আসল গলদটি তুলে ধরেছিলেন সে সম্বন্ধে শ' উচ্চবাচ্য করেননি। তাঁরা দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র সংখ্যাধিকের রাজত্ব কেবল আনুষ্ঠানিক আকারে, বাস্তবে নয়, যে গণতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসে না, তাদের মধ্যে যে দু'চারজন ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে যায় বুর্জোয়া আবহাওয়ায় পড়ে তাদের মেজাজ বদলে যায়, মজুরদের সঙ্গে তাদের আর যোগাযোগ থাকে না এবং তারা হয়ে বসে কর্তা, মুরুব্বি। আর একটি দিকে শ' ও ফেবিয়ানদের নজর পড়েনি। পার্লামেন্টের বিধান জনস্বার্থে প্রযুক্ত হতে পারে না যদি না তার পিছনে* সক্রিয় জনশক্তির চাপ থাকে। যদি জনসাধারণের এই সামাজিক শক্তি না থাকে তা হলে শাসকশ্রেণী তাদের স্বার্থে ঘা লাগা মাত্র পার্লামেন্টের বিধিব্যবস্থাকে বরবাদ করতে কসুর করে না। ১৯৫৩ সালে তিনটি অনগ্রসর মহাদেশে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। আফ্রিকার ব্রিটিশ গায়নায় ডক্টর জগনের সরকার জনভোটে নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ প্ল্যাণ্টারদের কায়েমী স্বার্থে হাত দেওয়া মাত্রই জগন সরকার বিতাড়িত হলেন। দক্ষিণ আমেরিকার গুয়াতেমালায় জনপ্রিয় আরবেন্‌স্‌ মন্ত্রিসভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফলব্যবসায়ীদের স্বার্থহানিকর ভূমিবন্দোবস্ত চালু করতে গিয়ে বিদেশী ফৌজের তাড়নায় গদিচ্যুত হলেন। পূর্ব পাকিস্তানে ফজলুল হক ও যুক্ত ফ্রণ্ট সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী করে ক্ষমতা লাভ করলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে নতুন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুত্ব আর পাক-আমেরিকান সামরিক চুক্তি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে গেলেন অমনি তাঁদের আসন ছাড়তে হল, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর লাটসাহেবের শাসন চেপে বসল। এই তিন জায়গাতেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা গদি থেকে সোজা গিয়েছেন জেলখানায় কিংবা নির্বাসনে। সম্প্রতি নেপালেও তাই ঘটেছে।

ইংল্যাণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে ট্রেড ইউনিয়নগুলি জনশক্তি গড়ে তুলেছিল।

পার্লামেণ্ট বিধানের ওপর এদের সজাগ দৃষ্টি ও তৎপরতা এবং ইংরেজদের একটা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও অভ্যাস ছিল বলে সেখানে সমাজবাদী গণতন্ত্র কতকটা সফল হতে পেরেছে। কিন্তু বার্নার্ড শ'র রচনার পর শুধু এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশগুলিতে নয়, ইয়োরোপের ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, ইটালি প্রভৃতি দেশেও সচেতন জনশক্তির অভাবে সমাজবাদী গণতন্ত্রের পরাজয় হয়েছে। নৈরাজ্যবাদেরও গলদ ঐ জায়গায়। এর প্রচারকরা অতিদার্শনিক। বৈধানিক গণতন্ত্র অথবা স্বেচ্ছাসমিতি যে কোন কাঠামতে সমাজসাম্যকে বাঁধতে হলে তার পিছনে একটা লোকবল গড়ে তোলা দরকার। সিণ্ডিক্যালিস্টরা ছাড়া আর কেউ তা গড়বার মত কার্যক্রম দিতে পারেননি।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সমালোচনা সংযত ও দরদী।[৭] নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপের যে সম্বন্ধ তিনি দেখিয়েছেন তাতে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আছে।

> সাধারণ লোকে এনার্কিস্ট বলিতে বোঝে এমন ব্যক্তি যাহার মস্তিষ্ক অল্পবিস্তর বিকৃত বলিয়া অথবা যে তাহার অপরাধপ্রবণতাকে উগ্র রাষ্ট্রমতের আবরণে ঢাকিতে চায় বলিয়া বোমা ছোড়ে কিংবা অন্য কোন নৃশংস কাণ্ড করিয়া বসে। এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। কোন কোন নৈরাজ্যবাদী বোমা ছোড়ায় বিশ্বাস করে, অনেকে করে না। অন্যান্য মতাবলম্বীরাও অবস্থাবিশেষে বোমা ছোড়ায় বিশ্বাস করে,—যথা, যাহারা সেরাজিভোতে বোমা ছুড়িয়া বর্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল তাহারা ছিল জাতীয়তাবাদী,[৮] নৈরাজ্যবাদী নয়। যে সকল নৈরাজ্যবাদী বোমাছোড়ার সমর্থন করে এ বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে অন্যদের কোন মৌলিক নীতিগত পার্থক্য নাই—অবশ্য যে নগণ্য কয়েকজন টলস্টয়ের মত নির্বিরোধী শান্তির পথ বাছিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের কথা আলাদা। সমাজবাদীদের মত নৈরাজ্যবাদীরাও শ্রেণী-সংগ্রামের মত পোষণ করে। সরকার যেমন যুদ্ধ চালাইবার জন্য বোমা ব্যবহার করে তাহারাও তাই করে। তবে নৈরাজ্যবাদী যেখানে একটি বোমা তৈয়ার করে সেখানে সরকার করে লক্ষ লক্ষ, নৈরাজ্যবাদীর হিংসায় যেখানে একটি লোক নিহত হয় সেখানে সরকারী হিংসায় মরে লক্ষ লক্ষ। সুতরাং যে হিংসার প্রশ্নটি সাধারণের কল্পনা জুড়িয়া বসিয়া আছে তাহা আমরা আমাদের মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি কারণ নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে হিংসার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। (৪৯-৫০)

তবুও নৈরাজ্যবাদের গায় হিংসার অপবাদ লেগেছে তার একটা কারণ আছে।

> আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বভাবত সর্বস্বীকৃত নৈতিক বাঁধনগুলি শিথিল করিয়া দেয়। যাহারা গভীর মানবপ্রেমে অনুপ্রাণিত তাহারা এই ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পারে। অন্যদের মধ্যে ইহার ফলে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার বৃত্তি জাগিয়া ওঠে যাহা হইতে কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। (৬৬)

---

[৭] রোড্‌স্‌ টু ফ্রীডম, এলেন এণ্ড আনউইন, লণ্ডন, ১৯৫৪।

[৮] ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড ও যুবরাণী সেরাজিভোর পথে নিহত হন। আততায়ীরা ছিল বসনিয়ার স্বাধীনতাকামী সার্ব। সার্বিয়ার সরকার হত্যাকাণ্ডে প্রশ্রয় দিয়েছে এইরূপ অভিযোগ করে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে এক চরমপত্র দেয়। এ থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

আধপাগল ও অপরাধীদের মধ্যে বেশ কিছু লোক যে নৈরাজ্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হয় এইটেই তার কারণ,—যদিও এই দুঃসম্ভাবনা দিয়ে নৈরাজ্যবাদের বিচার করা অন্যায়।

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র যে এক নতুন ধরণের স্বৈরতন্ত্র খাড়া করবে নৈরাজ্যবাদীদের এ আশঙ্কার ভাগীদার রাসেলও। উপরতলার আমলাদের মত এতে এক সরকারী কুলীন জাত তৈরি হবে যারা নির্ভুল সবজান্তা, যারা ভাববে সমাজের ভালমন্দ তারা ছাড়া আর কেউ বোঝে না, তাদের পরিচালিত বিলিব্যবস্থা অভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয়।

কিন্তু রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থায় যে সব বিপদ আসতে পারে সেদিকে নৈরাজ্যবাদীদের খেয়াল নেই। ব্যক্তিসম্পত্তি উঠে গেলে চুরিচামারি কমবে বটে কিন্তু একেবারে যাবে না। জাদুঘর ও কলাভবন থেকে কিংবা দুষ্প্রাপ্য ব্যবহার্য বস্তুর সাধারণ ভাণ্ডার থেকে চুরির ভয় থাকবে। যৌন অপরাধ বন্ধ হবে না। বিদ্বেষ ও ঈর্ষাজনিত অপরাধ দূর হবে না। আইনের বিচার ও আদালতের শাস্তির পরিবর্তে অপরাধ শাসন করবে জনরোষ—সুস্থ মনে ধীরভাবে নয়, ঝোঁকের মাথায়। আইনের বিচারের চেয়ে সে বিচার উত্তম নয়। নানাভাবে স্বৈরাচারের আবির্ভাব হওয়াও খুব সম্ভব। কোন ক্ষমতালোভী ব্যক্তি যদি কিছু লোক জড় করে একটা স্বেচ্ছাবাহিনী তৈরি করে নিজের মৎলবে কাজে লাগায়, কোন দাম্ভিক লোক যদি নেপোলিয়নের মত নাগরিকদের ওপর প্রভু হয়ে বসে তা আটকাবার কোন উপায় নেই। মানুষের মন লোভী, স্বার্থসন্ধী, ঝগড়াটে। নৈরাজ্যবাদ মানবচরিত্র বদলাবে কেমন করে? কায়েমী স্বার্থ চলে গেলে শত্রুতা দূর হবে এমন আশা করা ভুল। অস্ট্রেলিয়ানরা তাদের দেশে এশিয়ানদের আগমন ও বসবাস বন্ধ করে দিয়েছে আর জাপান তার বাড়তি মানুষের উপনিবেশের জন্যে জায়গা খুঁজছে। দুই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব যাবে না।

> পিপীলিকাদের মত পুরাদস্তুর সমাজবাদী কোন জাতির হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি কোন পিপীলিকা ভুল করিয়া পার্শ্ববর্তী ঢিপি হইতে তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহাকে তাহারা মারিয়া ফেলে। মানুষে মানুষে যেখানে কৌমব্যবধান বিস্তর—যেমন শ্বেত ও পীত মানুষে, সেখানে এ ব্যাপারে মানুষ ও পিপীলিকার প্রবৃত্তিতে বেশী তফাত নাই। (১৫৭)

সুতরাং আইন নেই শাসন নেই এমন একটি নিরাজ সমাজ গড়ে উঠবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা এবং গড়ে উঠলেও তার টিকে থাকবার আশা নেই।

নৈরাজ্যবাদীর আশা আর রাসেলের সংশয় দুইই অতিশয়। কেউ ইচ্ছে হলে নিজের তাঁবে একদল ফৌজ গড়ে রাখবে এমন স্বাধীনতা নৈরাজ্যবাদে নেই। নিরাজ সমাজ বিধিব্যবস্থাহীন শূন্যগর্ভ নয়। প্রুদঁ তাঁর "স্বীকারোক্তি" গ্রন্থে যে নক্সা দিয়েছেন তাতে শান্তিরক্ষা ও দেশরক্ষার ভার নিয়েছে স্বেচ্ছায় ও সহযোগিতায় গড়া একটি জনবাহিনী। যার খুশি অস্ত্র রাখতে পারবে, খুশি না হলে কেউ গ্রামরক্ষাবাহিনীতে যোগ না দিতে পারে, তা বলে নিশ্চয় সে একটি পাল্টা ফৌজ গড়তে পারবে না। তাকে যদি সেই অপচেষ্টায় বাধা নাও দেওয়া হয় তবু শুধু শুধু লোকে তার সঙ্গে ভিড়বেই বা কেন? রাসেলের আশংকা সমাজতন্ত্রে কৌমবিদ্বেষ দূর হবে না। কিন্তু সমাজতন্ত্র ছাড়াই কি কৌমবিদ্বেষ ক্রমশ দূর হচ্ছে না? পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের পতন এবং এশিয়ায় স্বাধীন জাতির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ানদের প্রতি ইয়োরোপীয়দের ঘৃণার ভাব কি কমে নি? আফ্রিকায়ও আজ কালো জাতি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারের বর্বর অস্পৃশ্যতানীতি আজ শ্বেতমহলেও ধিক্কৃত।

জনমানসে নতুন ভাবনা নতুন চেতনা উদ্রিক্ত হলে তবেই নৈরাজ্যবাদী বিপ্লব সম্ভব, তখন সেই ভাবনা-চেতনা হবে আজকের উপসর্গগুলির প্রতিষেধক।

সমাজবাদ, রাষ্ট্রবাদ ও গণতন্ত্রবাদের মত নৈরাজ্যবাদেরও রকমফের আছে। সকল নৈরাজ্যবাদী এক ছাঁচে পড়েন না। স্টার্নার, বাকুনিন ও টলস্টয়ের মধ্যে ততখানি ব্যবধান যে ব্যবধান অহংকার, সন্ত্রাস ও শান্তির মধ্যে। তবুও মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নৈরাজ্যবাদী চায় সকল রকমের আধিপত্য থেকে ব্যক্তির সম্পূর্ণ মুক্তি, ধনতন্ত্র থেকে শ্রমিকের মুক্তি, চার্চের হাত থেকে বিশ্বাসীর মুক্তি, রাষ্ট্র থেকে নাগরিকের মুক্তি। আক্রমণ প্রধানত রাষ্ট্রের ওপর কারণ ধনতন্ত্র ও চার্চকে রাষ্ট্রই ধরে রেখেছে। রাষ্ট্র একটি পীড়নযন্ত্র। এই যন্ত্রটি যার আয়ত্ত হয় ক্ষমতার মোহ তাকে পেয়ে বসে। এ দিয়ে কারও কল্যাণ হয় না। মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করে একভাবে যন্ত্রের মত চালাতে এ অভ্যস্ত। এর জায়গায় নৈরাজ্যবাদ আনতে চায় ব্যক্তি ও সমাজ, তাদের বিচিত্র ভাবনা, চেতনা, সৃষ্টিসম্ভাবনা। মুক্ত সমাজের মৌল কেন্দ্র হবে গ্রাম ও কর্মশালা—পরস্পরের প্রয়োজনে এরা মিলবে, বৃহত্তর সার্বজনীন ক্ষেত্রে সমিতি ও সংহতি গড়ে তুলবে, লোককৃত্য পরিচালন করবে। যে কাজ এখন চলে শাসনে সে কাজ চলবে সহযোগিতায়, যে কাজ এখন চালায় সরকারী আমলা সে কাজ চালাবে নির্বাচিত অভিজ্ঞ লোক। এই হল নৈরাজ্যবাদের প্রধান সূত্র যদিও এর ওপরও সকলে একমত নয়।

চিত্রটি কল্পনার রঙে অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই। বিপ্লবে কিংবা কূটনীতিতে নৈরাজ্যবাদীরা কোথাও বাস্তবতাবোধের পরিচয় দেননি। বিপ্লবের আয়োজন কঠোর শৃংখলা ও শাসনসাপেক্ষ যা নৈরাজ্যবাদে বরদাস্ত হতে পারে না। উদ্দেশ্য ও উপায়ের এই অসঙ্গতির ফলে বিপ্লবপ্রচেষ্টা পঙ্গু হয়ে গেল। তবু এঁরা একটা মস্ত বড় কাজ করেছেন—এঁরা বহু বদ্ধমূল বিশ্বাসে নাড়া দিয়েছেন, বহু সনাতন সত্যের ওপর সন্দেহের বীজ ছড়িয়েছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস ও শাসন মানবচরিত্রকে শোধন করেছে না দূষিত করেছে বেশি, সম্পত্তি প্রথায় সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি হয়েছে না দারিদ্র্য বেড়েছে, মানবিক অধিকার রক্ষায় ও ন্যায়বিচারে আইনের অবদান কিছু আছে কি নেই, আইনে অপরাধ কমেছে না বেড়েছে, শান্তি না যুদ্ধ সরকার প্রজাকে কোনটা দিয়েছে বেশি, রাষ্ট্রযন্ত্রে কোথাও কোন মানবিক অনুভূতি আছে কিনা এবং সমাজবাদ ও জনকল্যাণের আদর্শে নিয়োজিত হলেও তার যান্ত্রিক প্রকৃতি যায় কিনা, আর বিপ্লবের দ্বারা একটা নতুন যন্ত্র বসালে তাতে সাম্য স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্র আসতে পারে কিনা—এসকল প্রশ্ন আগে ছিল না। নৈরাজ্যবাদীদের সমাজচিত্র অবাস্তব হতে পারে কিন্তু এ প্রশ্নগুলি উড়িয়ে দেবার নয়।

১৭৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় কনভেনশনের সভায় দাঁড়িয়ে রোব্‌স্‌পিয়ের বলেছিলেন—'স্বাধীনতার বীরপুরুষের হাতে যে তরবারি ঝলকিত হয় তাহা স্বৈরাচারীর হাতের অস্ত্রের মতই।......বিপ্লবের শাসন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার শাসন।' এই বৈপ্লবিক কূটাভাসেরই প্রতিধ্বনি লেনিনের সর্বহারার গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, দুই বিশ্বযুদ্ধের 'সমরান্তক সমর'—লড়াইর অবসান ঘটাবার জন্যে লড়াই। রুশো তাঁর "কঁন্ত্রা সোসিয়াল" পুস্তকে সমীচীন প্রশ্ন করেছেন—'মানুষকে অধীন করে মুক্ত করবার অচিন্ত্যনীয় কায়দাটি কি?'

স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি ভাল নয়, তার অপব্যবহার যাতে না হয় তার জন্যে শাসন চাই,—

এই হল রাষ্ট্রের যুক্তি। কিন্তু শাসনেরও অপব্যবহার হয় এবং সেটা আরো খারাপ, সুতরাং একে দূর কর;—এই হল নৈরাজ্যের যুক্তি।

দার্শনিক তত্ত্বকথা ছেড়ে যদি ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে বিচার করা যায় তাহলে কোন পক্ষে সরাসরি রায় দেওয়া সম্ভব নয়। উদার মুক্তিপরায়ণ সমাজে সকলের স্বাধীনতা স্বীকৃত, সেখানে স্বাধীনতা পরম সম্পদ। যে সমাজে এ উদারতা নেই সেখানে স্বাধীনতাকে শাসনের ওপর ভর করতে হয়। অনুদার সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রশাসন বিপরীত নয়। একতান্ত্রিক কিংবা গণতান্ত্রিক সরকার জাতির সংকীর্ণতা থেকে ব্যক্তির অধিকারকে মুক্ত করেছে, সামাজিক পীড়ন থেকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে উদ্ধার করেছে ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কামাল আতাতুর্ক ধর্মীয় শাসন থেকে তুর্কদের মুক্ত করেছিলেন, লালচীন চাষীদের ভূমিদাসত্ব মোচন করেছে, মেয়েদের সামাজিক স্বাধীনতা দিয়েছে। ফ্রান্সের পঞ্চম গণতন্ত্র আলজিরিয়ায় ফরাসী অধিবাসীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে ইচ্ছুক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার শ্বেতাঙ্গদের নিগ্রোবিদ্বেষকে আইনের জোরে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। অবশ্য সরকারী উদারতার পিছনে যুগশক্তির তাগিদ থাকে। তবু স্বাধীনতার পথের বাধা সরিয়ে দেবার জন্যে বার বার রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন হয়েছে এতে সন্দেহ নেই।

আর রাষ্ট্রশক্তির বিকল্প যে সকল প্রতিষ্ঠানকে নৈরাজ্যবাদীরা আদর্শ খাড়া করেছেন তাদের ওপর খুব ভরসা রাখা যায় না। এগুলি হল শ্রমিক ইউনিয়ন, পৌরসভা, বণিক-সঙ্ঘ এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনসেবার সমিতি। রাষ্ট্রে যে দুর্নীতি ও বিকার দেখা যায়, প্রথম তিনটিও সেই দোষে দুষ্ট কারণ এদের মধ্যেও শাসন ও শোষণের সুযোগ উপস্থিত। জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক সমিতিগুলিতে সে সুযোগ অনেক কম তাই তাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সহযোগিতার আবহাওয়া একেবারে নষ্ট হয় না।

নিরাজ সমাজ আনবার আগে যে একটা আমূল নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন আছে আদর্শের নেশায় বিভোর হয়ে নৈরাজ্যবাদীরা এই সত্যটির দিকে ফিরে তাকাননি। যে সমাজে কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকবে না, শুধু স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় সকল কাজ চলবে, সেখানে আগে একটা আধ্যাত্মিক বিবর্তন চাই। বর্তমান সমাজের সর্বাঙ্গ শাসনকর্তৃত্বের অভ্যাসদোষে দূষিত, তার কোথাও ভবিষ্যৎ সমাজের প্রতীক খুঁজবার চেষ্টা বৃথা। নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নেবার আগে ব্যক্তিকে নতুন অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে, নতুন ভাবনা ভাবতে হবে, নতুন রুচি জাগাতে হবে। গড্‌উইন ও প্রুদঁ প্রজ্ঞানের ধীরনিশ্চিত অগ্রগতিতে আস্থা রেখেছিলেন। তাঁরা মানুষের আত্মিক-নৈতিক পুনর্গঠনের দিকে মন দেন নি।

যে অবস্থায় শাসন ব্যতিরেকে সমাজের কাজ চলতে পারে সেই অবস্থা সৃষ্টি করবার কাজে নৈরাজ্যবাদীরা যেমন অবহেলা করেছেন, তেমন যে অবস্থায় শাসন অবশ্যম্ভাবী তার প্রতিও এঁরা যথেষ্ট সচেতন নন। তাই কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানের ওপর তাঁদের আক্রমণ অতিবিদ্বেষ ও পক্ষপাতে দুষ্ট। রাষ্ট্রের শতসহস্র ছিদ্র তাঁরা দেখিয়েছেন কিন্তু তারও যে একটা সাত্ত্বিক ভূমিকা আছে, তাকে সরিয়ে নিলে সমকালের অবস্থা কি হতে পারে তা তাঁরা ভেবে দেখেন নি। তাই তাঁরা অবাস্তব অত্যাশায় এক রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁরা বোঝেন নি যে ইতিহাসের ধারায় রাষ্ট্র, বিত্ত ও ধর্ম মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্যেই এসেছে, তাদের আনুষঙ্গিক কোন কোন প্রতিষ্ঠান এখনও এই সমাধানের কাজ চালিয়ে

যাচ্ছে, সকল মানবিক উদ্যমের মত এতেও আছে যথেষ্ট দোষত্রুটি, অপূর্ণতা এবং এজন্যেই এদের পরিবর্তন অত্যাবশ্যক—এদের সরিয়ে কালের উপযোগী বিকল্প ব্যবস্থা আনবার জন্যেই বিপ্লব। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা যখন রাষ্ট্র, বিত্ত ও ধর্মানুষ্ঠানকে সনাতন, পবিত্র ও অনিন্দ্য বলে পুজো করতে বসলেন তখন এ'দের ভুল হল আরো সাংঘাতিক, তখন ইতিহাস দাঁড়াল নৈরাজ্যবাদীর পক্ষে। কিন্তু অতীতকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে না দেখতে পারার ফলে তাঁদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি হল অস্পষ্ট, নতুন সমাজের চিত্র হল অবাস্তব, এবং তাঁদের পথ হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

নৈরাজ্যবাদ কতক মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দাবি করেছে, ভুলে যাওয়া মানবিক মূল্যবোধকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আদর্শের দিকে এগিয়ে যাবার রাস্তা দেখাতে পারে নি। প্রজ্ঞানের ধীর গতি আর বিপ্লবের দ্রুত গতি দুই-ই সমান ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রের শক্তি বাড়তে বাড়তে হয়েছে অতিকায় দৈত্যের মত যা ছিল চেঙ্গিজ খাঁ ও নেপোলিয়নের কল্পনার অগোচর।

পাশ্চাত্ত্য জগতে নৈরাজ্যবাদ যখন নিদ্রার আবেশে ম্রিয়মান অথবা বিভীষিকার উত্তেজনায় উন্মত্ত তখন এর পুনরাবির্ভাব হল প্রাচ্যে যেখানে আড়াই হাজার বছর আগে এর জন্ম হয়েছিল। নতুন বিশ্বপরিবেশে প্রাচ্যখণ্ডে উত্থিত হল এক আত্মিক বিদ্রোহের ঘোষণা, বিত্ত ও ক্ষমতার উন্মাদ কামনার বিরুদ্ধে মানবাত্মার সাবধানবাণী। এই নব নৈরাজ্যবাদের ঋত্বিক টলস্টয়, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী।

কনখল

মনীশ ঘটক

দিল্লী দরবারের রেশ সুদূর মফঃস্বল সহরগুলোকেও অল্পবিস্তর উৎসবমুখর করে। কুচ-কাওয়াজ, খানাপিনা, ক্ষুদে দরবার সিলেটেও হয়। স্কুলের ছেলেদের ধোপদস্ত জামা-কাপড় পরে রুল ব্রিটানিয়া গাইবার জন্য স্কুল প্রাঙ্গণে জমায়েৎ করা হয়। দু'টি কমলালেবু, একটি সন্দেশ মহোল্লাসে খায় ছেলেরা। প্রত্যেকেই একটি করে জর্জমেরির মুখ খোদাই করা তামার মেডেল পায়, সে আমলের ডবল পয়সা সাইজের। ওই মেডেল নিয়েই ছোট্ট একটি ঘটনা কনখলের মনে গভীর রেখাপাত করে।

গীতা সোসাইটির পাণ্ডাদের ওপর ফতোয়া ছিল মেডেল না নেবার। নিলেও বুকে ঝুলিয়ে কেউ না আসে, সেদিকে নজর দেবার নির্দেশ ছিল। এ সব কনখলের জানা নেই। তাই অমৃত, নিবারণ, অমূল্য, মেডেল নিল কি নিল না, নিলেও কি করল, খেয়াল করেনি। ঝক্‌ঝকে মেডেল লাল-নীল-সাদা ইউনিয়ন জ্যাকের রং-এর রিবন সমেত বুকে ঝুলিয়ে আর সবার সাথে সে বাড়ী ফেরার পথ ধরে। দলে অমৃত নিবারণ ব্যাঙা আর কনখল।

মায়াদিদের বাড়ীর পেছনের পুকুর কাছটায় এসে নিবারণ বলে,—তোকে বেশ মানিয়েছে রে কণা। চাপরাশীদের যেমন চাপরাশ, তোর বুকেও তেমনি গোলামের ছাপ। ব্যাঙা, তোরও।

এ সব কথা নিবারণের নয়, সোসাইটির পাণ্ডাদের। নিবারণ আউড়ে যায় খালি। একটু হতভম্ব হয়ে থেকে কনখল লক্ষ্য করে দেখে মেডেল অমৃত কি নিবারণ কারোও বুকে ঝুলছে না। থতমত খেয়ে বলে,—তা আগে বললি না কেন? তা'হলে—

—কি করতিস তা'হলে? পারতিস্ না ঝুলিয়ে? তোর বাবা যে সাহেবদের চাকর—

—এই ও নিবারণ—মুখ সামলে কথা বল্‌বি—গর্জে ওঠে অমৃত।

অমৃত কনখলের অকৃত্রিম বন্ধু, তার ওপর, বয়স আন্দাজে রীতিমত শক্তিমান। নিবারণ অপ্রতিভ হয়ে বলে,—বারে, স্বামীজিই'ত বলেন,—

—অমন করে স্বামীজি কখ্‌খনো বলেন না।

নিবারণ মুখ কাঁচুমাচু করে বিড়বিড় করে—বলেন না আবার। সেদিনই 'ত বলছিলেন আরো কত কি—

এইবার নিবারণের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অমৃত বলে,—বল্, আর কি বলছিলেন—

সভয়ে কাঁদো কাঁদো মুখ করে নিবারণ। বলে,—শুধু স্বামীজি কেন, প্রকাশদার মাও 'ত সেদিন বলছিলেন, ওরা সাহেবদের পা-চাটা, আর যতো ভাব সব মছুনমানদের সাথে।—মছুনমানের রান্না খায়, জাফর ডাক্তারের মেয়েটা ত—

অমৃতর একটি বিরাশী সিক্কায় বাক্‌রোধ হয় নিবারণের। ওর কান ধরে অমৃত বলে,—ফ্যাল, থুতু ফ্যাল এই জায়গায়—

আদেশ পালন করতে বিলম্ব হয় না নিবারণের। আবার হুঙ্কার দেয় অমৃত—চাট্,—চেটে তোল ওই থুতু—

অসহায় নিবারণ লগুড়াহতের মতো এ হুকুমও তামিল করে। অমৃত ওর কান ছেড়ে

দিয়ে বলে,—যা—বাড়ী যা। ফের যদি এমন কথা শুনি তোর মুখে, আস্ত রাখব না জানিস্। চল্ রে কণা—ওকি, তুই কাঁদ্‌ছিস্?

মুখে একটুও শব্দ নেই, চোখের জলে দু'গাল ভেসে যাচ্ছে। কনখল নিজের মেডেল ব্যাঙার মেডেল খুলে তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পুকুরে। চোখ মুছে ধরা গলায় বলে,—না, কাঁদ্‌ছি না। চল যাই।

ব্যাঙা অতশত কিছু বোঝে না, ওদের সাথ ধরে।

অমৃত বয়সে ওদের থেকে একটু বড়ো—আর বোঝেও বেশী। ও জানে সিলেটের গোঁড়া হিন্দুদের অন্দর-মহলে বাগচিদের চাল-চলন নিয়ে অনেক বিরূপ আলোচনা হয়। ওদের গীতা সোসাইটির মুরুব্বীরাও গোঁড়া হিন্দু। শুধু সেবার কাজে ধর্মাধর্মের বালাই নেই। আর সব তাতেই নিষ্ঠার সাথে দেব-দেবতা, পুজো, মন্তর মানা হয়। বিপিন কার্লাইলকে শাস্তি দেবার ভারও যে নিয়েছিল, মন্তর পড়ে কালীমূর্তির সাম্‌নে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে তাকে। এই সিলেটেরই কে একজন, বিপিন পাল না কে, কলকাতার ইংরেজি কাগজে লিখেছে 'ন্যাংটা কালী রক্ত চায়'। তাই নিয়ে স্বামীজি গোপন সভায় তার মানে বুঝিয়েছেন সোসাইটির বড় বড় সভ্যদের। সেখানে অমৃতের এখনো প্রবেশাধিকার হয়নি, তবে ও জানে। ও সব নাকি দেশের কাজ, গোপনে করতে হয়।

বাড়ী গিয়ে মনমরা হয়ে থাকে কনখল। যা হোক্ করে, কিছু খেয়ে, পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে। ব্যাঙাকে ডাকে না—বাইরে খেলার দলেও যোগ দেয় না। এড়িয়ে চলে নিভাননীকে, কাছে গেলেই মা ধরে ফেলবেন।

বিস্বাদ হয়ে যায় সমস্ত দিনটা। বিয়ের কথা হয়ে আয়েষা পর হয়ে যাচ্ছে। নিবারণের কথার খোঁচায় কনখলের ছোট্ট জীবনে প্রথম অপমানবোধ জাগে মনে। মুসলমান, সাহেব আর হিন্দুরা কি আলাদা জীব নাকি? সবাই ত মানুষ। কেউ আবার মানুষের চেয়েও বড়ো। যেমন হাজী সাহেব। আর দেশের রাজা ত সব রকম লোকই হয়। হিন্দু-মুসলমান সব রকম রাজা-বাদশার কথাই বইয়ে পড়া আছে ওর। এখন না হয় সাহেবরা রাজা, পরেও থাক্‌বে, তার কি কিছু ঠিক্ আছে? হয়ত মুসলমান, না হয় হিন্দু, আবার রাজা হবে। তখন যারা রাজার অধীনে কাজ করবে, তাদেরও পা-চাটা বলে ঘেন্না করবে সবাই? বুঝে ওঠে না কনখল। কেমন সব গুলিয়ে যায়।

বাবা সাহেবদের চাকর। নিবারণটা বলে কি? তা হলে হ্যাসেট কখনো মা বাবার সাথে একসাথে বসে চা খেত? ওকে নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে পোলো খেলতে দিত? ও শুনেছে, বাবা রাজকর্মচারী। রাজা থাকে বিলেতে। হ্যাসেটও রাজকর্মচারী। কেউ বড়, কেউ ছোট। বেণী দারোগাও রাজকর্মচারী। বেণী বাবাকে দেখলেও যেমন স্যালুট ঠোকে, হ্যাসেটকেও তাই। বাবা ত হ্যাসেটকে স্যালুট করেন না, বলেন—গুড্ মর্নিং সার। যারা বেশী জানে, নীচের লোকেরা তাদের সার্ বলে। স্কুলের সব সারকেই ত ওরা ছেলেরা সার্ বলে। শুধু জানা নয়, বয়েসে বড়ো হলেও তাদের সাথে সম্মান করে কথা বলতে হয়।

সাধ্যায়ত্ত নানা যুক্তির সান্ত্বনাতেও সুস্থির হয় না মন। কি যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে নিবারণের কথাগুলো, নিভ্‌তে চায় না। প্রকাশদার মায়ের মুখে কিছুদিন আগে শোনা গুটিকয় কথা আজ নতুন মানে নিয়ে মনে পড়ে যায়। বিপিন কার্লাইলকে বদরপুর ষ্টেশনের পরের ষ্টেশনে, কে বা কারা যখন ধাক্কা মেরে ট্রেণ থেকে ফেলে দিয়েছিল, সেই সময়কার কথা। আভাসে ইঙ্গিতে পরে জেনেছে তারা কারা। প্রকাশদার মায়ের সেই

কথাগুলো তারই পূর্বাভাস, আজ জানে কনখল।

সেদিন কথকতা শুনে ফিরছিল একটু রাত করেই। অমৃত ওর সাথে। প্রকাশদের বাড়ীর খিড়কি দিয়ে রাস্তা কম হয়—সেই দিক দিয়েই আস্‌ছে ওরা। অমৃত হন হন করে এগিয়ে গেছে। কনখল বেশ খানিকটা পেছনে। প্রকাশদার মায়ের চাপা আওয়াজ ওর কানে এল,—

—না, অমৃতকে দিয়ে হবে না। ও ছেলেমানুষ, তাছাড়া, মন্ত্রগুপ্তি হয়নি।

অম্‌নি চাপা গলায় পুরুষকণ্ঠের জবাব শোনা গেল,—দীক্ষা দিইয়ে নেয়া যাবে, তাতে আট্‌কাবে না। আর কাজটাও অল্পবয়সী ছেলেদের দিয়ে হওয়া ভালো।

—না, বিপিনবাবুর স্কুলের ছাত্র ও, চিনে ফেলবেন।

—চেনবার পর আর কিছু বলবার অবস্থা নাও থাকতে পারে বিপিনের।

—না, না। অমৃত ওই সাহেব ঘেঁষা বাড়ীর ছেলেটার পরম বন্ধু। কোথায় কখন পাঁচ কান হয়ে যাবে—সবসুদ্ধ হাতকড়ি পড়বে।

আর শুনতে পায়নি কনখল। অমৃতর হাঁকে তাড়াতাড়ি গিয়ে সাথ ধরেছিল। তখন আর কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিল যে হাতে হাতকড়ি পড়বার ভয় আছে এমন কোনো গোপন কাজের ভার দেওয়ার লোক বাছতে হচ্ছে। অমৃত ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই অপরাধে তাকে কাজ দিতে প্রকাশদার মায়ের আপত্তি।

পরের ঘটনায় কনখলের জানা হয়ে গেছে, সে কি কাজ। বিপিনবাবু ট্রেণ থেকে পড়ে শুধু আঘাতই পেয়েছেন, প্রাণে মরেননি। কিন্তু প্রাণে মারবার মতলবই ছিল প্রকাশের মায়ের। ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আর এই সব সর্বনেশে কাজের সর্দারনী কিনা ঐ মহিলা। প্রথম দিন দেখেই ওঁকে ভালো লাগেনি কনখলের। কদমফুল ছাঁট দেওয়া সুগৌর মুখমণ্ডলে কেবল খড়্গের মতো টিকোলো একটি নাক, চেরা চাপা ঠোঁটে সমস্ত অভিব্যক্তি অবরুদ্ধ অস্থির দামিনীর মতো চোখের তারায় মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণ, দাহ্য ও দাহিকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবশ্যম্ভাবী অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস, এই সবকটি লক্ষণই যেন জাজ্জ্বল্যমান তাঁর চঞ্চল চরণক্ষেপে, অস্থির হস্তসঞ্চালনে, উদ্ধত গ্রীবাউত্তোলনে। কিশোর কনখল ভয় পেয়েছে।

নিজেকে নগণ্য, অপদার্থ মনে হয়েছে সেদিন কনখলের। কী এমন কাজ, যা কনখলের বন্ধু বলেই করবার অযোগ্য হয়ে গেল অমৃত?

পরে, বিপিন কার্লাইলের ঘটনা সব জেনে, ওর মনে হয়েছে, যে কারণেই হোক, ওই ডাকাতনী যে অমৃতকে কাজের ভার দেয়নি, সে ভালোই হয়েছে। কাজটা ত ভারী! চলন্ত ট্রেণ থেকে একটা লোককে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া, তারপর সে বাঁচুক আর মরুক। নিন্দার, হিংসার, অপরাধের—ওই কাজের ভার থেকে তার বন্ধুত্ব অমৃতকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, এই আত্মপ্রসাদে তুষ্ট কনখল।

কিন্তু সেদিন? সেদিন আত্মাবমাননা আত্মধিক্কার এনেছিল, আত্মগোপনের চেতনাও ধীরে ধীরে জেগেছিল। মার কাছে কোনো দিন কিছু লুকোয়নি, সেদিন লুকিয়েছিল। আয়েষার কাছে কিছু লুকোতে পারে না, সেদিন পেরেছিল। বিয়ের কথা উঠে আয়েষা দূর হয়ে গেছে, মেলামেশা সহজ সাবলীল নয়। জীবন কাহিনীর প্রাথমিক কোনো এক অধ্যায়ে সেদিন যেন কে, বড়ো বড়ো দুটো দাঁড়ি টেনে দিয়েছিল। কিচ্ছু নিজের না রেখে নিজেকে উজাড় করে দেবার পরমানন্দ থেকে বঞ্চিত হবার প্রথম পাঠ নিয়েছিল সেদিন।

পার্টিশন রদ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে উঠে গেছে। বাগচির বদলি যিনি আসছেন, তাঁর নাম শুনে সাহেব বলে মনে হয়, কিন্তু বৈকালিক বৈঠকের রহস্যালাপ থেকে কনখল আবিষ্কার করেছে যে লোকটি কালা আদ্মী এবং উগ্র রকমের সাহেব। হ্যারিস্ হার্কার যে শ্রীহরি সরকার সে কথা নামধারী হয়ত ভুলতে চেয়েছেন, কিন্তু দেশবাসী ভোলেনি এবং খাস সাহেবরা ঘৃণ্য জীব বলে ভাবতে সুরু করেছে। ওরা মিশনারী পাঠিয়ে লোককে কেরেস্তান করে, স্ত্রী স্বাধীনতায় মেমের অনুকরণ করতে বলে, কোট-টাই-পাৎলুনে শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিত করার মতো অঙ্গভূষণ নামের ফেরিঙ্গীপনায় আমোদ অনুভব করে এবং সরকারী দয়াদাক্ষিণ্য কিঞ্চিৎ বর্ষণ করে থাকে। আদতে আমল দেয় না।

হার্কার সাহেবের দোষের মধ্যে তিনি বিলেত গিয়েছেন, এবং কৃষিবিদ্যার বৃত্তি পেয়ে নব্য বাঙালীর কাম্য পদ লাভ করেছেন। চলিত ঠাট্টার কালাপানিতে ডুব দিয়ে আসার অজুহাতে রংটা নিকষ না হোক কৃষ্ণ কালো হয়ে গেছে। পিতৃদত্ত নামের সার্থকতা বর্ণেই মালুম।

হার্কার সাহেব আজ এসেছেন, এবং ভ্রাম্যমান জেলা জজ লালওয়ানীর বাড়ীতে উঠেছেন। তিন চারটে জেলা নিয়ে একজন করে জজ, বছর ভাগ করে তিন-চার জেলায় ঘুরে বেড়ান। তবু প্রত্যেক জেলা সহরেই একটি করে জজের বাংলো আছে। লালওয়ানী প্রবীণ সিভিলিয়ান এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে লণ্ডন সফরের সময়ে হার্কারের সাথে পরিচিত ছিলেন। হার্কার অবিবাহিত এবং লালওয়ানী প্রোষিতভার্যা। তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুরাট নগরে আছেন। স্বামীর অবসর গ্রহণের বিলম্ব নেই তাই স্বদেশে ঘরকন্না গোছানোর ভার নিয়ে সাময়িক বিরহযাপন করছেন।

জজসাহেব সদালাপী লোক। অফিস অন্তে তাঁর ওখানে সরকারী বেসরকারী মজলিসি মানুষের সমাগম হয়। বাগচি ও হরেনবাবুও গিয়ে থাকেন। আজও গিয়েছিলেন। মস্ত বড়ো বাগানওয়ালা বাংলোবাড়ী, বাড়ীর পেছনে বেশ অনেকটা দূরে বাবুর্চিখানা এবং আনুসঙ্গিক আরো দুটো একটা ঘর। সেইদিকেই আস্তাবল এবং খিড়কি দরোয়াজা। বাংলোর সামনে ঘেরাও করা গোল বাগানের দুমুখে দুটো গেট। লাল সুরকির অর্ধচক্রাকার রাস্তাটির পাড়ের আঁচল ভুঁই চাঁপা ফুলের কেয়ারীখচিত।

মজলিসটি বসে একটি দশাসই শিরীষ গাছতলায়, ওটা বাগানের একটেরে। আটদশ-খানা বেতের কুর্শী পড়ে এবং প্রচুর নির্দোষ পানীয় ও ধূমের সদগতি হয়। গরমের দিনে সরবৎ এবং অন্যসময়ে চা কফি ইত্যাদি। কোনো বিশেষ উপলক্ষ না ঘট্লে খাদ্যের আয়োজন হয় না। লালওয়ানী সাহেব উগ্রপানীয়বিলাসী নন, কাজেই সাহেব সমাজেও কিছুটা অপাংক্তেয়।

আজ কথা উঠেছে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং প্রত্যেকেরই প্রতিমূর্তি থাকা সম্ভব, এই সম্ভাবনায় নবাগত হরি সরকার (Harris Harker) মারমুখী হয়ে বক্তৃতা করছেন। হরেনবাবু পাল্টা জবাব দিচ্ছেন। মোটামুটি আলোচনা এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ। হরেনবাবু বলেন, পৌত্তলিকতার আবশ্যক এই জন্য যে দেবতা তৈরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাজসরঞ্জাম মাটি ছাড়া আর কিছু সহজ প্রাপ্য নয়, এবং প্রতীকের মাধ্যমে দেবভাবের কল্পনা সাধারণের পক্ষে অনায়াস-সম্ভব। গৃহত্যাগী যোগী ধ্যানযোগে নিরীশ্বরের কল্পনা করতে পারেন, ক্ষেত্র, পরিবেশ এবং সাধনা অনুকূল হলে।

সংসারে সবাই যখন সারাক্ষণ শতকর্মে রত, এবং প্রতি কর্মের উপলক্ষই সাফল্য লাভ, তখন দেবপূজার জন্যে ফললাভের প্রতীক গড়তে দোষ কোথায়? পৃথিবী আমাদের কাছে মূর্ত, ঘরসংসার খুঁটিনাটি কেউ অরূপ নয়, রূপ গ্রহণ করবার জন্যে প্রকৃতি প্রাণপণে চলেছে, চারা থেকে মহীরূহ হচ্ছে, ক্ষীণ জলধারা মহাসাগর হচ্ছে, মানুষের কল্পনা তাকে মানবিক গুণ-সম্পন্ন দেবতার ধ্যানে সহজেই উদ্বুদ্ধ করেছে। এই ত আমার মনে হয়।

হার্কার অশিষ্ট ভাষণে বলে—ড্যাম বিগট্রি। আইডোলেটরস আর ষ্টোন এজ পিপ্‌ল।

লালওয়ানী শান্তসুরে বলেন,—যদি ষ্টোন এজ্ এখনও থেকে থাকে! এক ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও হিন্দু নেই, এবং পশ্চিমী আলোক সবে দেশে প্রবেশ করেছে। এদেশের হিন্দুদের প্রতীক ছাড়া আর কি অবলম্বন হতে পারে? মুসলমান বিশ্বজয় করেছিল সাহেবরাও করেছে। পার্থিব পরমপ্রাপ্তির আস্বাদ তারা পেয়েছে এবং চরমপ্রাপ্তি নিরীশ্বরে পেঁছেছে। হিন্দুদের বৈদিক যুগ মূলতঃ কৃষিযুগ ছিল। মাটি ফুড়ে সীতা ওঠার কল্পনার মতো মাটিতে গড়ে আরাধ্যের প্রতিমূর্তি গঠনও সহজ ভাবেই তাদের দ্বারা হয়েছে। পার্থিব পরম প্রাপ্তি হিন্দুদের এখনও বাকী আছে।

হার্কার এবারে চিপ্‌টেন কাটে,—হিণ্ডুজ্ আর বিগট্‌স্ অ্যান্ড বিণ্ট্‌স্। দে কম্‌পেল্‌ড্ দেয়ার উইমেন টু এণ্টার দি ফিউনেরাল পায়ারস্ অফ্ দেয়ার হাজ্‌ব্যান্ড্‌স্।

আলোচনা তিক্ত হয়ে আসে। আবার লালওয়ানী সাহেবই মোড় ঘুরিয়ে দেন। বলেন, —মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট এক অংশ সৌন্দর্যপূজারী। হয়ত হিন্দু সমাজের সেই অংশেরই কেউ পরমারাধ্যকে উপাসনার জন্য মানুষের মনের প্রতিটি ভাব অবলম্বন করে একটি করে মূর্তির কল্পনা করেছিল। নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির মাপকাটিতে বিচার করলেও লক্ষ্মীমূর্তির মতো সুন্দরী, সরস্বতীর মতো নিষ্পাপা বিদুষী, শ্রীদুর্গার মতো বিশ্বজননী, শ্রীকৃষ্ণের মতো ভালোবাসার আধার, কয়টি মেলে? শিশুকে স্নেহ করি, তাই বালগোপাল। বাড়ীর কর্তার মতো আত্মভোলা সুখ দুঃখে সমান সন্তুষ্ট কিঞ্চিৎ নেশাপরায়ণ শিবমূর্তি শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। দুর্গার মুখভাবের মতো স্নেহ-করুণা-কৃপা-ক্ষমা সমন্বিত মাতৃমূর্তি র‍্যাফেল আঁকেন নি। যাক্, এ প্রসঙ্গ আজ এখানেই শেষ হোক্।

ঠিক্ এই সময়টার দুটি উপদ্রব শান্তিভঙ্গ করে। বাবুর্চিখানার দরজায় একটা ঠিকে গাড়ী এসে দাঁড়ায়, এবং কাঞ্চনসওয়ারী কনখল দুপ্‌দাপ্ করে এসে পেঁছিয়। কনখলের কথা পরে। বাঞ্ছা মালী খবর নিয়ে আসে কে একজন বয়স্কা মহিলা, সঙ্গে একটি যুবক, এসে 'ছিওরি'র খোঁজ করছে। প্রবীণ লালওয়ানীকে শশব্যস্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর অভিনয় করে হার্কার ওঠে,—চলো, হাম্ দেখ্‌তা কৌন্ হ্যায়—

লালওয়ানী সাহেব ঘুণ জজ। বহুদিন বাংলা দেশে থেকে কথিত বাংলার অভিজ্ঞতাও কিছু হয়েছে। 'ছিওরি' শুনে একটু ভুরু কুঁচ্‌কে ভেবে বলেন,—বোসো হে তোমরা। একটু বাথরুম থেকে আসি।

কনখল বাবাকে বলে—মা হাজী সাহেবের কাছে এসেছেন। একসাথে ফিরবেন বলেছেন।—ধাতস্থ হয়ে বসা স্বভাব নয়। তাছাড়া ঘোড়াটাও আলগা ছাড়া আছে। ওধারে নিয়ে আস্তাবলে রাখলেও হয়। উঠে কাঞ্চনের লাগাম ধরে আস্তাবলের দিকেঁ যায় কনখল। কিন্তু অন্ধকারে বাইরের রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে পড়ে। হার্কারের গলায় ফিস্ ফিস্ তর্জন—কিন্তু পবিত্র মাতৃভাষায়।

—আমার পজিসন রইল না। কে ভিক্ষুকের মতো তোমাদের এখানে তাড়া করে

আস্‌তে বলেছে? আর এই পেঁচোটার যদি কোনো বুদ্ধি থাকে! একখানা চিঠি লিখে আস্‌তে কি হয়েছিল? তা'হলে আগে থেকে অন্য ব্যবস্থা করে রাখ্‌তুম। এখানে রয়েছি বিদেশীর বাসায়, তার ওপর মস্ত লোক,—জেলা জজ। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

মহিলাটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে যা বললেন, কনখল তার মর্মার্থ এই বুঝ্‌লে যে, গয়না বিক্রী করে হার্কার সাহেবকে তাঁর ঐ মা বিলেত পাঠিয়েছিলেন। আজ একবছর কোনো খবর রাখে না হার্কার এবং চাক্‌রী পাবার পর এখানে এসে কাজে যোগ দেবার খবর ঐ পেঁচোই সংগ্রহ করেছে। ছেলেকে দীর্ঘকাল না দেখে মা মর্মযন্ত্রণা ভোগ করছেন। জীবন-ব্যাপী দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে ছেলে যোগ্য হয়েছে তাই এখন তাকে দেখে স্বর্গসুখ অনুভব করবেন এবং জীবনের বাকী কটা দিন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাবেন। ওঁদের বাড়ী মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায়।

সগর্জনে হার্কার বল্‌ল, —এই নাও দশটা টাকা। গাড়োয়ানকে বলো বাজারে কোনো হিন্দু হোটেলে নিয়ে যাক। রাত কাট্‌লে কাল চাপরাশি পাঠিয়ে যা'হোক্‌ একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যতো সব—

সুগৌর লালওয়ানী টকটকে লাল হয়ে উঠেছেন কিনা, অন্ধকারে, কনখল ভালো বুঝতে পারছে না, তবে এটুকু অনুভব করেছে, যে জায়গাটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠ্‌ল। চাপা আগুনের গরম।

—ইউ স্কাউণ্ড্রেল। মার সাম্‌নে বক্‌ব না তোমাকে। বাঙ্গা, ওহি কেরায়া গাড়ীকো ঠায়্‌র্‌নে বোলো। আর, ইয়ে নয়া হাকিমকা সমান সব উস্‌মে উঠায় দো। গেট আউট অ্যাট ওয়ান্স ইউ রেচ্‌। তার পরই অনুতপ্ত সুরে মহিলাকে বললেন,—মা, অপরাধ নেবেন না। আপনার ছেলেকে আমি বাড়ীর বার করে দিচ্ছি, সে তারই ভালোর জন্যে। আর আপনার বুড়োছেলের বাড়ীতে আপনি থাকবেন, যতদিন আপনার ছেলে বাড়ী ভাড়া করে আপনাকে নিয়ে না যায়। আপনার বৌমা এখানে নেই—তাতে অসুবিধে হবে না। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি। আমার সেরেস্তাদার নবীনবাবু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সগৃহিণী তাঁকে আনিয়ে নিচ্ছি। আমি দরকার হলে আণ্টাঘরে গিয়ে শোব।

চিত্রার্পিতের মতো অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকে কনখল। ঘোড়া আস্তাবলে ওঠাবার কথা ভুলে যায়। খিড়কির দরজা দিয়ে অপমানিত হার্কারের পলায়ন স্বচক্ষে দেখে। তারপর ফিরে এসে বাগানে বসে। লালওয়ানীও ফিরেছেন, যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে সাধারণ আলোচনায় যোগ দেন। হার্কার কোথায় গেল, সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই করেন না। তাঁর কৃতকর্মের যে একজন জলজ্যান্ত সাক্ষী থেকে গেছে, গোটাকয়েক জেলার দন্তমুণ্ডের কর্তার সে খবর অজানাই থেকে যায়।

আপন মনে দাঁত কিড়মিড় করে কনখল। পারলে হার্কারটাকে, অথবা মায়ের ছিওরি, আসলে শ্রীহরিটাকে, গুলি করে মারত। যুক্তিতর্কের বয়স কনখলের নয়। অনুমান, উপমাও মাথায় আসে না। নিজের মা। গয়না বেচে ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছেন। সেই ছেলে চাক্‌রি পেয়ে ফিরে এসে দোরগোড়া থেকে বিদেশাগতা মায়ের গাড়ী হাঁকিয়ে দেয়। বলে হিন্দু হোটেলে গিয়ে ওঠো। এই অমানুষিক ব্যবহার অন্যায় ও অসঙ্গত, এ বোধ আছে কনখলের। কি এর প্রকৃষ্ট শাস্তি, ঠিক্‌মতো আঁচ করে উঠ্‌তে পারে না।

রাত্তিরে মার কাছে কেঁদেকেটে সব বলে কনখল। হৃষিকেশও শোনেন। তিনি বলেন,—আশ্চর্য ভদ্র এই লালওয়ানী। অতবড় কাণ্ডটা করে এল, আর একটুও জানতে দিল

না? নিভ্‌, তুমি কাল গিয়ে ছিওরির মায়ের সাথে দেখা করে এস।

নিভা বলেন,—এক একটা পশুপ্রকৃতির মানুষ যে কি করে জন্মায়।

বাগচি বলেন,—হয়ত জন্মেছিল মানুষ হয়েই, বিলিতী চাক্‌চিক্যের বদহজম রূপান্তর ঘটিয়ে ছেড়েছে।

কনখল শুতে গিয়ে হার্কারের অপরাধে নিজে কেঁদে বালিস ভাসিয়ে দেয়।

২৬

ওদের সিলেট ছাড়তে আর দিন দু-তিন বাকী আছে। ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করা, ইত্যাদি কারণে বয়সের অতিরিক্ত সম্মান ছেলেমহলে পেয়ে থাকে কনখল। প্যারীবাবুর ছেলে জীবন একদিন বলে,—ওরে, আমাদের একটা গাদাবন্দুক আছে, সেটা ঢেরদিন খাটের তলায় থেকে জং পড়ে প্রায় নষ্ট হয়ে আছে। একটু সাফ্‌সুফ্‌ করে দিবি?

গাদা বন্দুকের রহস্য কনখলের জানা নেই, ভাঁজ করে কার্তুজ পোরার হদিস্‌ ও জানে। তবে রহমৎ সাবেককেলে লোক, ওর নিশ্চয় এ সব জানা আছে। যাবার আগের দিন দুপুরে রহমৎকে নিয়ে হাজির হয় জীবনদের বাড়ীতে। জীবনদের বাড়ীটা অদ্ভুত গঠনের। বাইরের ঘর দু-রাস্তার মোড়ে, এবং একতলার ভিত্‌ বাইরের পাঁচিলের থেকে উঁচু। ঘরের সামনে বেশ চওড়া বারান্দা, উঠোনে সাবু গাছ, বিলিতী পাম ও ছোট ঝাউয়ের ঝাড় দিয়ে রাস্তার দিকের নজর প্রায় বন্ধ।

বাড়ীতে বাইসাইকেলের সরঞ্জামের মধ্যে একটা তেলের টেপা ডাব্বা ছিল সেইটি, এবং বন্দুকের নল পরিষ্কার করবার প্যাঁচকষা রড নিয়ে ওরা হাজির। জীবন বন্দুকটা বার করেই রেখেছে। বন্দুকের বাক্সে বারুদ, তুলো, ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রো, ছিটে ও ক্যাপ সবই মজুত। মূল দ্রব্যটিই অশক্ত, উপকরণের অভাব নেই। রাস্তামুখী কাঠের বেঞ্চিতে বসে তিনজনে তোড়জোড় করে বন্দুক পরিষ্কার করায় মন দেয়।

নলের ভেতরের মরচে তুলতে হিমসিম খেয়ে যায়। বাঁকানো তারের তুলি সমেত রড দিয়ে অতি কষ্টে ইস্পাতের ঔজ্জ্বল্য আংশিক ফেরে। তুলো দিয়ে তেল পরিষ্কার করে বারুদ গাদতে থাকে। তারপর কিছু ছররা ও ছেঁড়া কাগজের পুঁটলী দিয়ে ইঞ্চি তিনেক মশলা তৈয়েরী হয়। কিন্তু রহমৎ আবার খুঁচিয়ে সব বার করে ছররাগুলো সরিয়ে রাখে। বলে,—পুরোনো যন্তর, ফেটেফুটে যেতে পারে। ফাঁকা আওয়াজের ব্যবস্থা হলেই হোলো।

ক্যাপ পিনের ওপর বসিয়ে নল আকাশমুখী করে খুট্‌-খাট্‌ শব্দে ঘোড়া টিপে যায়, কিন্তু আওয়াজ নেই। রহমৎ বলে, হয় বারুদ নষ্ট হয়ে গেছে, না হয় ক্যাপে পিন টিপ্‌ছে না। বন্দুক একবার এর হাত থেকে ওর হাত তিনজনের হাত ফিরি করছে, কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। নির্জীব বোঝার মতো বন্দুকটা নিষ্প্রাণ হয়েই আছে।

এত কাণ্ডকারখানার মধ্যে কখন যে শীতের বেলা গড়িয়ে এসেছে কেউ খেয়াল করেনি। আজ বিকেলে আয়েষাদের আসার কথা। রাতে খেয়ে যাবেন সবাই। রহমৎ উস্‌খুস্‌ করে উঠে যায়। কিন্তু জীবন ও কনখলের জেদ চেপে যায়। আবার বন্দুক খালি করে আবার বারুদ পুরে বিনা ছররায় ভালো করে গেদে আবার ক্যাপ চাপায়।

কখন যে আকাশমুখী নল ক্লান্ত কিশোর হাতসুদ্ধ রাস্তামুখী নেমে এসেছে, এবং কখন যে দড়াম্‌ করে একটা বিকট গর্জনধ্বনি শোনা গেছে, সে চৈতন্য ওদের আদৌ হয়নি।

ওদের সমস্ত চৈতন্য ছাপিয়ে একটা তীব্র আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে—ওরে বাবারে—

এ কণ্ঠস্বর কনখলের জীবনবীণার মূল সুর। এ আয়েষার গলা। ভাগ্যিস রাস্তার ও-দিকটা নির্জন, একটি লোকও নেই রাস্তায়। একলাফে কনখল রাস্তায় নেমে আয়েষার দু-হাত ধরে বারান্দায় উঠিয়ে আনে। ডান হাতের কনুইয়ের ওপর দিয়ে ঝির-ঝির করে রক্ত পড়ছে। আয়েষা প্রায় বেহুঁস্। অন্দর থেকে পাগলিনীর মতো ঊষা ছুটে বেরিয়ে আসে। ওকে ডাকতেই নিভা আয়েষাকে পাঠিয়েছিলেন। ঊষার হাহাকার একটা আতঙ্কগ্রস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ধ্বনিত হয়—ওরে কনখল, তুই কি করলিরে, আয়েষাটাকে মেরে ফেললি—

জীবন ভয়গ্রস্ত হয়েও সম্বিত হারায় না। বলে—আমি কিন্তু ছুঁড়িনি বন্দুক। ছুঁড়েছে কনখল।

দেখতে দেখতে পাশের বাড়ী থেকে বাগচি, জাফর, নিভা, কুলসম, ব্যাঙা, রহমৎ—সবাই এসে হাজির হয়। আয়েষার আহত হাতটা বুকে নিয়ে কনখল বসে আছে, তার এই নিদারুণ অপরাধের জন্য দৈহিক দন্ড দিতে হলে আয়েষারও লাগবে। বাগচি ক্রুদ্ধ এবং বিপন্ন, নিভাননী ভাবলেশহীন, কুলসম ক্রন্দনশীলা, শুধু জাফর ডাক্তার কিছুমাত্র বিচলিত নন। বন্দুকের আওয়াজ শুনেই রহমৎ ওঁকে বলতে বলতে এসেছি, নলে আদৌ ছিটে পোরা হয়নি, শুধু দু-চার টুক্‌রো ছেঁড়া কাগজ। ধীর ভাবে আয়েষার আহত স্থান পরীক্ষা করে জাফর বলেন—সুপারফিসিয়াল উন্ড্। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে আছে। ঘা দু-দিনে সেরে যাবে। তবে কনখল, তুমি বড় হচ্ছ—অস্তর-শস্তর নিয়ে যখন-তখন ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, যেগুলো হঠাৎ ঘটে, তাই দুর্ঘটনা। ফল খারাপ হলে আফ্‌শোষের সীমা থাক্‌বে না। আজকে আয়েষার আঘাত কিছু নয়, কিন্তু ওর বিয়ের কথা হচ্ছে, যদি দৈবাৎ নাকে-মুখে চোট লাগত কি বিপদে পড়তাম বলো তো?

কনখল দাঁতে নীচের ঠোঁট চেপে তিন-চারটে বেগুনী দাগ তোলে। চোখের মণিদুটো পাঁকে পড়া অসহায় জন্তুর মতো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌তে চায়। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপে।

জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথেই আয়েষার দুষ্টুমি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কনখলের পেটে চিম্‌টি কেটে বলে—খুব আস্তে আস্তে বলে,—দিলি ত? জখম করে তবে ছাড়লি।

হলুদ রঙের দুর্গন্ধ আয়োডোফর্মের পট্টি লাগানোর ব্যবস্থা করে, জীবাণু বিনাশক পেয় একটি অষুধের ব্যবস্থা করে, জাফর ডাক্তার বললেন,—আজ রাতে ত ওকে অতটা রাস্তা ঝাঁকিতে নেয়া ঠিক হবে না।

নিভাননী বললেন,—ও আমার কাছে থেকেছে। ও আমার কাছেই থাকবে। কাল যাবার আগে আপনাদের কন্যা সমর্পণ করে যাব।

কনখল বোকা বনে গেছে। রাত্তিরে নিভাননীর সাথে শুয়ে আয়েষা যখন প্রায় ঘুমন্ত, কনখল উঠে এসে চুপিসারে তাকে দেখে যায়। নিভাননী ঘুমিয়ে পড়েছেন, আয়েষা অর্ধ-মুদ্রিত চোখে একপলক চেয়ে বলে—চিহ্ন না রেখে দিয়ে গেলে তোকে কি মনে রাখতুম না?

দুষ্মন্তের দুরবস্থা বর্ণনায় 'এক অস্ত্রে হত হোলো মৃগী ও নিষাদ', তারই পুনরাভাস যেন কনখলের শিরায় শিরায় পুলকে শিহরণ জাগিয়ে দেয়।

॥ শেষ ॥

আধুনিক সাহিত্য

অভিমতটা উচ্চারণ করলে গলাধাক্কা খাওয়ার ভয়, কিন্তু বিবেকবোধের তাড়নায় বলতেই হয় : গেলো পনেরো বছরে বাংলা সাহিত্য যে-অধঃপাতে নেমে এসেছে তা যেমনই শোকের তেমনই বিস্ময়বহ। প্রশ্ন করা হবে : এই প্রতি-তুলনার মান কী, কোন্ সংজ্ঞার মারফতে আমি বিবেচনা করছি। যেহেতু বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বাঙালির যোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায় অথবা বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্যে কী ঘটছে-না ঘটছে তার নজির টানবো না। কূপমণ্ডুককে একমাত্র মনে করিয়ে দেওয়া চলে এই কুয়োরই জল কিছুকাল আগে কতটা স্বাদু ছিল।

সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে, অনেক নতুন প্রকাশক, কুড়ি-বছর আগেকার সঙ্গে মিলিয়ে হিশেব করলে দেখা যাবে বোধহয় দশগুণ বেশি বই প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত-র বদ্যিনাথ এখন আর একক নয়, সহস্র এবং তারা লেখা মক্সো করেই নিরস্ত নয়। সে-সব রচনা ছাপা হচ্ছে, বই হয়ে বেরোচ্ছে, সংস্করণ থেকে সংস্করণান্তরে সমৃদ্ধি কুড়োচ্ছে। লোকের কেনবার সংগতি বেড়েছে বলেই-যে বইয়ের এবং পত্রিকার বিক্রি বেড়েছে স্রেফ তা নয়, লোকরুচি অনেকটাই নেমে এসেছে, ভালো বাঁধাই ও ছাপার ছলনায় অপকর্ষের চূড়ান্ত পর্যন্ত বিকিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা-চিন্তা-অনুভাবনা-আত্মজিজ্ঞাসা সব-কিছুর মান আপাতত নিম্নগহ্বরগামী : নরকে পৌঁছবার, এমন অবস্থা চলতে থাকলে, খুব বেশি বাকি নেই। সুতরাং হয়তো আলাদা করে সাহিত্যচর্চার হতদ্দশাকে ধিক্কার দেওয়া সমীচীন নয়, লাভও নেই তাতে।

কিন্তু তাই বা বলি কী করি? একশো বছর আগে বাঙালি রেনেশাঁসের সূচনা হয়েছিল ভাষা ও সাহিত্যসাধনার উজ্জ্বল অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। ভাষার গভীরে ডুবে গিয়ে উচ্ছল জল-কেলির মতো আনন্দ আর নেই : কল্পনার সব-ক'টি প্রত্যঙ্গ তাতে শিহরিত হয়ে ওঠে, নতুন বিভঙ্গ শেখে, দুঃসাহসের নতুন স্তরে পৌঁছবার প্রান্তে দ্বিধাতে আর দোলায়িত হয় না। আত্মপ্রসারের সহায়ক হিসেবে আত্মবিশ্বাসের চেয়ে বড়ো জিনিশ নেই। তন্নিষ্ঠ সাহিত্যসেবা বাঙালিকে গর্ব করতে শিখিয়েছিল, কান্নাসর্বস্ব অবরুদ্ধ প্রলাপের মতো গর্ব নয় : জিজ্ঞাসার স্পর্ধিত গর্ব, বিশ্লেষণে আনন্দ খুঁজে বেড়াবার মতো অহংকার, প্রজ্ঞাকে বিভাসিত স্বর্গে উত্তীর্ণ করবার মতো প্রবল দার্ঢ্য। রামমোহন-মাইকেলের সময় থেকে হিশেব করলে অঙ্ক না-মিলে পারেই না : বাঙালিমানস ভাষাসঞ্জাত, অসহ্যরকম ভাষানির্ভর, সাহিত্যের প্রেরণা না থাকলে বাঙালি আবেগ মরুপথে বহু আগেই ধারা হারাতো, বাঙালি চিন্তায় শ্রান্তির ঢল নামতো হয়তো সেই প্রায় ষাট-বছর আগে প্রথম বঙ্গভঙ্গের মুহূর্তে।

বাঙালি টিঁকে ছিল কারণ সাহিত্য ছিল উজ্জয়িনী। সে-সাহিত্য জাতিকে সংহতি শিখিয়েছিল, বিচার-বিশ্লেষণ-বুদ্ধিবিস্তারের স্বাদে জনসাধারণকে আপ্লুত করে রেখে-ছিল। গত দেড়-দশকের অধোগতি তাই খুব নিরুত্তাপ হয়ে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। চিন্তা-শিক্ষা-ভাবনার মান নেমে আসছে, বাঙালি উচ্ছন্নে যাচ্ছে, এই সংক্রান্তিক অবস্থায়

সাহিত্যসাধনার দায় বরঞ্চ তাই অত্যন্ত বেশি। কার্যকারণ সম্পর্কের এ রকম ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসহ : সাহিত্য তার ধ্রুবতারা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে বলেই চারিদিকে এত অপকর্ষের বিক্রম।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা বাংলা গদ্যের উপর উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়সওয়ারগিরি। উপরে যা উল্লেখ করেছি, যেহেতু প্রকাশের সুযোগ-সুবিধে অনেক বেড়েছে, প্রায় যে-কেউই গল্প উপন্যাস লিখছেন। কিন্তু যিনি প্রথমত কোনোদিন ভাষা নিয়ে সাধনা করেননি তাঁর পক্ষে সে-ভাষার মধ্যবর্তিতায় কাহিনী ব্যক্ত করতে যাওয়া অন্যায় বাড়াবাড়ি। আপাতবিচারে মনে হতে পারে, আমিই অন্যায় কথাবার্তা বলছি, হালে যাঁরা লিখছেন, তাঁদের অনেকেই বেশ-লিখে-যেতে-পারেন-গোষ্ঠীভুক্ত, সাচ্ছন্দ্য তাঁদের অন্যতম মহৎ ধর্ম। এই নাগরিক গুণের উপস্থিতি মেনে নিয়েও আমি বলবো, দাও ফিরে সে-অরণ্য, লও এ-নগরী। যা সচ্ছলতা বলে মনে হয়, আসলে সেটা অপকৃষ্ট চটুলতা। এই চটুলতা না-থাকলে চলনসই সাংবাদিক হওয়া সম্ভব নয়, খবরের কাগজে অল্প সময়ের মধ্যে কোলাম ভরাতে হ'লে যে-ক'রেই-হোক দ্রুত স্থানপূরণের কায়দা আয়ত্তে আনা প্রয়োজন। কিন্তু মোহনবাগান ক'-গোল কাদের ঠুকে দিল যে-ভাষায় লেখা চলে, তা দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। গভীর অবসাদের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, গদ্যপটিয়সী বলে সম্প্রতি যাঁরা নাম কিনেছেন বস্তায়-বস্তায় গল্প-উপন্যাস লিখছেন, তাঁদের বাক্যগঠন কত দুর্বল, তাঁদের শব্দজ্ঞান কত সীমিত, কোনো গম্ভীর-আশ্চর্য বিন্যাসের দোলা সঞ্চার করা তাঁদের ক্ষমতার কত যোজন দূরে। এক-নজর তাকিয়েই অভিজ্ঞানবসন্তে পৌঁছুতে হয় : একদা যাঁরা সাংবাদিক ছিলেন, এখন তাঁরা সবাই সাহিত্যিক।

আরো-একটা জিনিশ সহজেই ধরা পড়ে। যাঁরা লিখতে জানেন তাঁরা সবাই-যে চিন্তা করতে জানেন, জিজ্ঞাসায় দীর্ণ হ'তে পারেন তা নয়, কিন্তু যাঁরা আদৌ লিখতেই জানেন না তাঁদের অপসৃষ্টি থেকে চিন্তাপ্রতিভা বা বিশ্লেষণ বিদ্যুৎচ্ছুরিত হবে, এমন আশা করা অর্থহীন।

কোনো শ্রুতি নির্ধারণের চেষ্টা করছি না, আমার এই উক্তির প্রমাণ মেলে সম্প্রতি কী-ধরনের কাহিনী বেশি বা কম লেখা হচ্ছে, তা থেকে। ১৯৪০ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দেশ সমস্যা ও সংকটে ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে, কিন্তু উপন্যাস-হিশেবে যা-যা প্রকাশ করা হচ্ছে, তালিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, অধিকাংশই একশো-দুশো-তিনশো বছরের পুরোনো নিরাপদ ইতিহাসের পাতা-ছেঁড়া খণ্ড ঘটনার সঙ্গে গোঁজামিল দেওয়া, পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে বলা হয় রম্যকাহিনী। চিন্তায় ধৃতি না থাকলে, কল্পনা সংকীর্ণ হলে উপস্থিত সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়া সাহসে কুলোয় না, অতএব ইতিহাসে পলায়ন. অথচ ইতিহাসেই যে-বর্তমানের অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেরকম কোনো আলোকিত সমন্বয়ও এ সমস্ত লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

কবিতা-সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ উক্তি করতে হয় : এর চেয়ে মুহ্যমান স্তব্ধতা বুঝি ভালো। কারণে মনে হয় না গত দশবছরের বাংলা কবিতা সামান্যতমও এগিয়েছে। অবশ্য প্রভেদ আছে। বিশুদ্ধ কবিতা-রচনার সংখ্যা বেড়েছে, প্রাকরণিক দক্ষতা অন্তত কমেনি। যদি গড়পড়তা কথা হয়, হয়তো দেখা যাবে উত্তম কবির সংখ্যা উত্তম গল্পলেখকের অনুপাতে বেড়েই গিয়েছে। কিন্তু মুস্কিল হলো উত্তম কবি হলেই কবিতা উত্তম হয় না। যা অতিরিক্ত প্রয়োজন তা চরিত্রতীক্ষ্ণতার, আবেগস্বাতন্ত্র্যের। তরুণতম কবিদের

মধ্যে অন্তত দশ-পনেরোজনের রচনা আমি একাকার মিলিয়ে নেওয়ার পর আর ফের আলাদা করে খুঁজে বের করতে পারি না : সকলেরই এক আবেগ, এক পদ্ধতি, সমরীতিনিষ্ঠা, সমশব্দসম্ভোগ। এই সার্বজনীন অবৈকল্য গোষ্ঠীপ্রেমের পরিচয় বহন করে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু না। কবিরা ক্ষুব্ধ হবেন, কিন্তু যে-তুলনাটি মনে আসে তা টেবিলের উপরে দাঁড়ানো ব্যায়াম-শিক্ষকের নির্দেশে কতিপয় সুবোধ বালকের শরীর সঞ্চালনের।

সাহিত্যসাধনায় যখন শ্রান্তির লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে আসে, তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রূঢ়, কর্তব্যঅপরাঙ্মুখ সমালোচকের। জীবনানন্দ যে-কোরিকেচর এঁকেছিলেন তার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও বলতেই হয় সমালোচনায় অনেক ক্ষেত্রে রূঢ়তা মমতারই রূপান্তর। যাকে ভালোবাসি তার মহৎ রূপ দেখতে চাই, মহৎ করে পেতে চাই তাকে, মহত্ত্বের স্বর্গে সমাসীন রাখতে চাই। শ্রেষ্ঠ সমালোচকের মন তাই সর্বদা ভয়ে-ছাওয়া, প্রেয় যাতে স্বর্গস্খলিত না হতে পারে সেজন্য তাঁর অনুশাসন আবিষ্কার ও প্রয়োগ। কোথায় ফাঁক থেকে গেছে, কোথায় আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে, কোন্‌টা মেকি, কোন্‌টা সাচ্চা, কল্পনার স্পর্ধা কোথায় সার্থকতার জাদু ছুঁয়েছে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়েছে : ক্রমানুক্রমিক পর্যায়ে সে-কাহিনী লিপিবদ্ধ করাই সমালোচনা। মহৎ সমালোচনা বাদ দিয়ে মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব। সমালোচনা সাহিত্যের বিবেক, সাহিত্যের কষ্ঠিপাথর।

এখানেও কথা ঢাকবার কোনো মানে হয় না : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র পর বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা স্তব্ধ হয়ে আছে। কেউ কেউ সমালোচনার নামে গীতিকবিতা লিখেছেন, একেবারে হালে তুলনামূলক বিচারের প্রহসনে নানা সাহিত্য থেকে অনূদিত উদ্ধৃতির ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পরিশ্রমী, নিয়মনিষ্ঠ সমালোচনা প্রায় অন্তর্হিত। বিশ্লেষণ, বিবেচনা, এমনকি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের যেখানে অভাব, সেক্ষেত্রে সমালোচনা সম্ভব নয়। অতএব মুড়িমুড়কি একাকার হয়ে যাচ্ছে, ভুঁইফোড় রাজার সম্মান পাচ্ছে।

এতগুলি কথা অবতারণা করতে হলো "বাঙলা সনেট" নামে একটি সংকলন হাতে পেয়ে, যা 'বাঙলা সনেটের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সশ্রদ্ধ নিবেদন'। বইটির সৌষ্ঠব ভালো, বাঁধাই মনোরম। কুড়ি-বছর আগে বাংলা বইয়ের এমন দেহসম্ভার কল্পনা করা যেত না। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ঘুরিয়ে এটাও বলতে পারি, কুড়ি-বছর আগে গ্রন্থপ্রকাশে এমন অপচয় কল্পনা করা যেত না।

এতটা রূঢ়ভাষণ কেন করছি? সংকলন সমালোচনারই একটি প্রকরণ। বাছাই করা মানে বিচার করা, অপকৃষ্ট অথবা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টদের পাশে ফেলে উৎকৃষ্টদের জড়ো করা। এরকম সংগ্রহের মধ্যে তাই এক নিহিত মন্তব্য থাকে, মুখবন্ধ লিখে বিস্তার করে না-বললেও যা হৃদয়ঙ্গমে করতে বেগ পেতে হয় না। আলোচ্য সংকলনের পিছনে এমন-কোনো উদ্দেশ্য ছিল বা আছে তা মনে করলে ভুল হবে। প্রধান সম্পাদক মস্ত-এক মুখবন্ধ ফেঁদেছেন, যেটা পড়ে সহসা প্রমাণ আরো-একবার পেলাম যে আজকাল যে-কোনো রচনাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলে। এমন নয়-যে মুখবন্ধটি পরিশ্রমের সঙ্গে লেখা নয়। লেখক যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সঙ্গে সনেটের লক্ষণ ও গুণবর্ণনা করেছেন, সনেট ক'প্রকার তা বিশদ করবার চেষ্টা করেছেন, সনেটে কোন্ মিল সাধু কোন্‌টা অশ্রেয় সে-সম্পর্কে মত ব্যক্ত করেছেন, ব্যাকরণানুগ মিল্টন-শেক্স্‌পীয়ার-ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সবশেষে বাংলা ভাষায় কারা-কারা কী ধরনের সনেট লিখেছেন তার উপর বিস্তারিত টীকা। 'বাঙলা সনেটের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে' যে-গ্রন্থের প্রকাশ, তার ভূমিকা হিশেবে এরকম

সাদামাঠা প্রবন্ধ, যাতে কোনো আলোকপাত নেই, এমনকি সাধারণ রচনাসৌকর্য পর্যন্ত নেই, নিশ্চয়ই খুব শোকান্তিক ব্যাপার। মুখবন্ধটির উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন এই জন্য যে তাতে উত্তেজনার কিছু নেই, নতুন প্রজ্ঞা নেই, দুঃসাহসী কোনো উক্তি নেই যে ভুল শোধরাবার ছলেও ইচ্ছা হয় কিছু মন্তব্য যোগ করে দিই। এটা না লেখা হলে কোনো ক্ষতি ছিল না। লেখা হয়েছে তার কারণ বাংলা সাহিত্যের মান ঠিক এতটাই নেমে এসেছে।

তাহলেও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়। 'সনেটের নামে অজস্র চোদ্দ চরণের কবিতা বাঙলা কাব্যের অঙ্গন ভরিয়ে তুলেছে', এই উক্তি করার অব্যবহিত পরেই সম্পাদক বলছেন যে-কবিতাগুলিকে 'মোটামুটিভাবে' তাঁর কাছে সনেট বলে মনে হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে সংকলন করেছেন। কিন্তু, যেহেতু সনেট একটি সুবিশেষ নিয়মবন্ধ ব্যাপার, তাতে 'মোটামুটি'-র একেবারেই স্থান নেই : হয় সমস্ত ব্যাকরণ ও প্রকৃতিলক্ষণ সংযুক্ত নিটোল ব্যাপার হবে, তাহলে তা সনেট; নয়তো নিয়মস্খলন হবে, তখন তা সনেট হবে না। মধ্যবর্তী কোন পর্যায় নেই। সম্পাদকদ্বয় যে একশোএকুশটি কবিতা সংগ্রহ করেছেন, তার প্রত্যেকটিই চতুর্দশপদী সন্দেহ নেই, তবে সত্তর-আশিটির বেশি আদপেই সনেট নয়। সুতরাং তাঁদের মুখ্য, এবং সহজতম, কর্তব্যপালনেই সম্পাদকদ্বয় অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

অথচ এমন নয় যে বাংলা কাব্যে সনেটের সমৃদ্ধি নেই। মাইকেল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রচুর সার্থক সনেট রচিত হয়েছে, এবং তাদের অনেকের সঙ্গেই বাঙালি পাঠকের আশৈশব পরিচয়। এক গ্রন্থে এই রচনাগুলি সংগ্রহিত হলে একটি মূল্যবান কাজ সম্পন্ন হতো। কিন্তু, ঐ যা মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'সংকলনের কাজ চলে সংকলনকর্তার রুচি ও বিচার অনুযায়ী'। গ্রন্থটির প্রায় অর্ধেক কবিতা বাংলার নিকৃষ্টতর চতুর্দশপদীদের কোনো সংকলন হ'লে তাতে সম্মানের সঙ্গে স্থান পেতে পারে এমন আমার সন্দেহ। বিশেষ করে সম্পাদকদ্বয় অবিচার করেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার, অজিত দত্ত এবং বিষ্ণু দে-র রচনা নির্বাচনে। অথচ এটা নিঃসন্দেহ এই চারজনই বাংলা সনেটের প্রধানতম পুরুষ।*

অশোক মিত্র

* বাঙলা সনেট—জীবেন্দ্র সিংহ রায় ও শক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত। কথাশিল্প। ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

সমালোচনা

প্রাণগঙ্গা— অবিনাশ সাহা। ভারতী লাইব্রেরী। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

শরৎচন্দ্রের পরে আমাদের সাহিত্যে গল্প-উপন্যাসের যে ধারা চলেছে সে সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর সম্প্রতি আমাকে নিতে হয়েছিল। সেই সম্পর্কে যে সব অপেক্ষাকৃত সার্থক গল্প উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলাম তার একটি হচ্ছে অবিনাশ সাহার "প্রাণ গঙ্গা" উপন্যাস। এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

এর পাত্র-পাত্রীরা হচ্ছে প্রধানত চাষী শ্রেণীর লোক। তবে চাষী হলেও তাদের নিম্নমধ্যবিত্ত বলাই সংগত, কেননা, বাড়ীঘর ও কিছু জমিজমা তাদের আছে—না থাকলে তারা অসহায় বোধ করে—আর আমাদের দেশের যে প্রাচীন সংস্কৃতিধারা তার মনোহারিত্ব ও অদ্ভুতত্ব সব কিছু নিয়ে দেশের সর্বসাধারণের ভিতরে বয়ে চলেছে সেটি আজো প্রাণবন্ত তাদের মধ্যে। চাষীদের ভিন্ন এই উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে ব্যবসায়ী বা মহাজনশ্রেণী, তারাও নিম্নমধ্যবিত্ত, কেননা, চাষীদের তুলনায় কিছু সংগতিসম্পন্ন হলেও সংস্কৃতিতে তারা এই চাষীদেরই সমগোত্রীয়। আর এতে আছে একজন সপারিষদ জমিদার; এই অঞ্চলের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার যোগ এক হিসাবে যৎসামান্য, কেননা, মোটের উপরে সে যে জীবনযাপন করে তা নিঃসঙ্গ। তবে লোকটিকে দাঁড় করানো হয়েছে খেয়ালী ও নির্দয় শোষক রূপে—তার সঙ্গে জমিদারী প্রতাপ যোগ হওয়াতে সে এই পরিবেশের জন্য হয়েছে একটি মূর্তিমান অনর্থ।

ঢাকা জেলার সাভার অঞ্চলের একটি চর কেমন করে আবাদ হলো তার বিস্তারিত বর্ণনা এই বইখানির অনেকটা জায়গা দখল করেছে। আবাদকারীদের মধ্যে খুব উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে দীনু বৈরাগী আর করিম ফকির। তারা এই অঞ্চলের লোক নয়—ফরিদপুর জেলায় পদ্মার ধারে ছিল তাদের বাড়ী। সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল তারা; কিন্তু পদ্মার দারুণ ভাঙনে ও ঝড়ের প্রকোপে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে তারা অকূলে ভাসলো, আর শেষে বহুকষ্টে ঘর বাঁধলো এসে এই নতুন চরে। বিচক্ষণ কৃষক তারা। এই নাবাল জমিতে পলি ধরে বালুর চরকে তারা করলে উর্বরা—আর অল্পদিনেই আবার অনেকটা সুদিনের মুখ দেখতে পেলে। তাদের পূর্বে আর একটি চরে বসতি জমে উঠেছিল। তাতে খুব নামকরা গৃহস্থ হচ্ছে পলান ব্যাপারী। পাঁচটি লায়েক ছেলে তার। বহু জমিজমা চাকরবাকর গরুবাছুর এসব নিয়ে এ তল্লাটে খুব মশহুর লোক এই পলান ব্যাপারী। দীনু-করিমদের চরের নাম চরফুটনগর। আর পলান ব্যাপারীর চরের নাম চরধল্লা। লেখক বিস্তারিতভাবে যথেষ্ট যত্ন নিয়ে বর্ণনা করেছেন এই দুই চরের লোকদের সুদিনের নানা আনন্দ-উৎসব, লোক-লৌকিকতা, আর দুর্দিনের হায়-আফশোষ আর দুর্ভোগ। এসব তাঁর বইতে যতটা জায়গা নিয়েছে সহজেই মনে হতে পারে তা অনেকটা কমালেও খুব ক্ষতি হতো না, কেননা, যে জীবন তিনি এঁকেছেন তাতে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য তেমন নেই। কিন্তু

লেখকের চোখ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় তিনি কোনো চটকদার ছবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাননি, তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন একটি গ্রাম্য পরিবেশের নির্ভেজাল ছবি—যে ছবি একদিন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁর আশা, পাঠকদেরও মুগ্ধ করবে। কিছু যে মুগ্ধ করবে তাতে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে যখন এ জীবন দ্রুত বদলে যাচ্ছে তখন সাহিত্যে এর যে একটি ছবি থাকলো তাকে মূল্যবান বলতে হবে। তবু মনে হয় লেখক জায়গা কিছু বেশিই নিয়েছেন; আরো কম জায়গা নিয়ে এই ছবিটিকে সার্থকভাবে যে আঁকা না যেত তা নয়।

কিন্তু বইখানি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে শুধু পল্লী-চিত্রের জন্যই নয়। এই অনেকখানি সুখশান্তিভরা সুন্দর পল্লীজীবন কেমন করে নির্মমভাবে ধ্বংস হলো—অজন্মা, মহাজনের লোভ আর জমিদারের অত্যাচার এই তিনের মিলিত আঘাতে—সেই ছবিটিই এতে সব চাইতে লক্ষণীয় হয়েছে। যে তিনটি আঘাত এই সুন্দর লোকালয়কে অনেকটা শ্মশান-ক্ষেত্র করে তুললো তার মধ্যে অজন্মা আর জমিদারের অত্যাচার নির্মম হলেও খুব অপ্রত্যাশিত বলা যায় না, কিন্তু মহাজনদের তরফ থেকে যে ধরনের অত্যাচার এই প্রাণময় লোক-বসতির উপরে নেমে এলো তা যেমন নির্মম তেমনি বিস্ময়কর। অবশ্য মহাজনের অত্যাচারও বাংলার পল্লীজীবনে অজানা ব্যাপার নয়; কিন্তু তার রূপ যে এমন অমানুষিক ও নির্বোধ তা আমাদের অনেকেরই অনেকটা অজানা। লেখক নিজে হয়তো এই মহাজন-শ্রেণীরই লোক; যাদের ছবি তিনি এঁকেছেন তারা হয়তো তাঁরই আপনার জন। সেই জন্যই খুব বিস্ময়কর হয়েছে লেখকের সত্যনিষ্ঠা। ছবি যা আঁকা হয়েছে তা যে অতিরঞ্জন নয় তা বোঝা যায় সহজেই।

এই সত্যনিষ্ঠাই এই বইখানির খুব লক্ষণীয় সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছে। বই-খানিতে একটি মেলার বর্ণনা আছে। তাতে একটি দুর্নীতিপূর্ণ ব্যাপারের যে-বর্ণনা লেখক দিয়েছেন কেউ কেউ বলতে পারেন তা বীভৎস হয়েছে। কিন্তু এও যথার্থ যে লেখকের সত্যনিষ্ঠা এই বীভৎস ব্যাপারটিকেও কিছু কম দুঃসহ করেছে।

বইখানির নাম দেওয়া হয়েছে "প্রাণগঙ্গা"। গঙ্গার অবশ্য দুই রূপ—সে প্রাণ বিস্তার করে আর কীর্তি নাশ করে চলে। এই বইখানিতে লেখক পল্লীর অখ্যাত অশিক্ষিত মানুষগুলোর প্রাণোচ্ছলতার পরিচয় দিতে কম চেষ্টা করেননি, কিন্তু তাঁর কলমে খুব বেশি করে ফুটেছে সেই প্রাণোচ্ছলতাকে দুর্দৈব আর মানুষের দুর্মতি কেমন করে নষ্ট করে চললো সেই দিকটা। গ্রন্থের শেষে দেখা যাচ্ছে নববিবাহিত কিশোর নিশি তার নববিবাহিতা কিশোরী বধূকে ত্যাগ করে দূর কলকাতায় গেছে আপিসের সামান্য চাপরাশি হতে; কষ্ট করে এক বৎসরে সে ষাটটি টাকা জমিয়েছে, আশা করছে তার বধূ ও অন্যান্য স্বজনের জন্য কলকাতা থেকে কিছু উপহার কিনে নিয়ে বাড়ী যাবে; কিন্তু বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এলো—পঞ্চাশ টাকা পাঠাও, চিঠি যাচ্ছে। পঞ্চাশ টাকা সে পাঠিয়ে দিলে—পাঠাতেও খরচ গেল টাকা পাঁচেক, আর বাড়ীর চিঠি পেয়ে দেখলো সেখানে এক শো টাকা ঋণ হয়েছে। সে বুঝলো ঋণ শোধ দিতেই দীর্ঘকাল তার ব্যয় হবে, কাজেই বাড়ী যাওয়া যে তার কবে হবে তার ঠিকঠিকানা নেই। তার কিশোরী বধূ দিন দিন ডাগর হয়ে উঠছে—তাকে মাঝে মাঝে যেন সে চোখে দেখে, আর অবসর পেলে গ্রাম থেকে আনা তার বাঁশিটা বাজায়। এতে কয়েকটি সরল ও বলিষ্ঠ চরিত্র ভাল ফুটেছে।

আমাদের একালের আরো কয়েকখানি উপন্যাসে বেজেছে এই ভাঙার সুর। একালের

বাংলায় ভাঙার দিকটা নানাভাবে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেইটিই হয়তো অজ্ঞাতসারে এমন ভাঙার করুণ গান হয়ে উঠেছে আমাদের একালের কতকগুলো উল্লেখযোগ্য লেখায়।

এই লেখাগুলো যে এমন বাস্তবধর্মী ও করুণ হয়েছে তাতে আমাদের মনকে সহজেই স্পর্শ করবার শক্তি এরা অর্জন করেছে। কিন্তু বাস্তবানুগতা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের এক মাত্র লক্ষণ নয়—যদিও একটি প্রধান লক্ষণ। আমাদের সাহিত্য যে বাস্তবানুগ হয়েছে এটি একটি বড় আশার কথা নিঃসন্দেহ; কিন্তু মহৎ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় মহৎ আত্মাও—সেটি বাস্তাবানুগতার অতিরিক্ত কিছু। ভাঙার সুর আজ আমাদের সাহিত্যে বাজছে; আমাদের ভবিষ্যতের মহত্তর সাহিত্যেও ভাঙার দিকটা যে কম রূপ পাবে তা নয়, কেননা, কম রূপ পেলে তা সত্য জীবনের পরিচায়ক হবে না। কিন্তু মহৎ সাহিত্যে ধ্বংসের রূপক ছাপিয়ে বাজে মানব-মহিমার সুর—যেমন শেক্স্‌পীয়রের কিং লীয়ারে ভয়াবহ ভাঙার তাণ্ডব ডিঙিয়ে উঠলো এই অভয় বাণী : Men must endure their going hence, even as their coming hither, ripeness is all.

কাজী আবদুল ওদুদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য—ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা-৯। মূল্য আট টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কাব্য-শাখা বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা কাব্যের ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। কাব্য-শাখার প্রতি এই উপেক্ষার কারণ কি জানি না। বাংলা উপন্যাস ও নাটকের ইতিহাস লেখার একাধিক চেষ্টা হয়েছে। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ডি-ফিল ডিগ্রির জন্য বাংলা কাব্যের একটি যুগের আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার জন্য তিনি অন্য কারো স্বারস্থ না হয়ে নিজেই পঁচাত্তরজন কবির পাঁচশত কবিতা নির্বাচন করে একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। গবেষণা-প্রবন্ধটি এই সংকলনকে ভিত্তি করেই রচিত। সুতরাং আলোচ্য বিষয়টি সম্যক উপলব্ধির জন্য দু'টি বই এক সঙ্গে পড়া দরকার।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক। অরুণবাবু বলেছেন, সংকলনটি তিনিই করেছেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে তাঁর নামের সঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যুক্ত আছে দেখা যায়। সুতরাং সংকলনটির কৃতিত্ব উভয়ের কিনা সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না।

আলোচ্য বইটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম দুটি অধ্যায় যথাক্রমে : প্রাগাধুনিক বাংলা গীতিকবিতা ও রেনেসাঁস ও গীতিকবিতার বিলম্বিত আবির্ভাব। এর পর ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতার প্রকৃতি অনুসারে প্রেমকবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গার্হস্থ-জীবনের কবিতা, প্রকৃতি কবিতা, বিষাদ কবিতা ও তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা শ্রেণীবিভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ।

অরুণবাবুর মতে, আধুনিক গীতিকাব্যের আবির্ভাব যে আসন্ন হয়ে উঠেছে তার

ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়; মধুসূদনের কাব্যে আধুনিক লিরিকের সূত্রপাত হয়েছে; এবং আধুনিক গীতিকবিতার মৌলিক সুরটি সুস্পষ্ট হল বিহারী-লালের কাব্যে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "বঙ্গসুন্দরী" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সাহিত্যে লিরিক কবিতার আবির্ভাবের সুনির্দিষ্ট সন তারিখ উল্লেখ করা যে সম্ভব নয় একথা অরুণবাবুরও অজানা নয়। তাই তিনি প্রথম অধ্যায়ে বাংলা লিরিক কবিতার উৎস সন্ধান করেছেন। এই উৎস তিনি খুঁজে পেয়েছেন চর্যাপদের মধ্যে। তারপর বৈষ্ণব কবিতা, লৌকিক কাব্য, কবিগান ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের মঙ্গল কাব্যগুলি গান করবার জন্যই রচিত। ফুল্লরার বারমাস্যা প্রভৃতি অংশগুলিতে লিরিকের ধর্ম সুস্পষ্ট। ময়মনসিংহ গীতিকার কথা একেবারেই উল্লেখ করা হয়নি। মধ্যযুগের লোকপ্রিয় কাব্যগুলি নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করলে ভালো হত। চর্যাপদ অপেক্ষা এরা আমাদের অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ।

পনেরো পৃষ্ঠায় লেখক কবিগান সম্বন্ধে বলছেন, 'তাঁহারা (কবিওয়ালারা) জীবিকা-নির্বাহের তাগিদে ও হঠাৎ-বাবু কলিকাতার চাহিদা মিটাইবার জন্য চপল, চটুল, নিন্দা-কটাক্ষ-সমন্বিত ইতর রুচিপূর্ণ এক ধরনের গান রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।' এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই দেখা যায় কবি-গান হঠাৎ-বাবু কলকাতার চাহিদা মেটাবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল। সমসাময়িক সমাজের কথা না থাকলে কবিগান সেদিন জনপ্রিয় হতে পারত না। কিন্তু আটাশ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন, কবিগান ও টপ্পায় সেদিনের বাঙালির আসল পরিচয় ধরা পড়েনি। 'বৈষ্ণব কবিতার উঁচু সুরে বাঁধা প্রণয়কাহিনী লোকায়ত স্তরে রুচিবিকৃত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে কবিগানে (১৫ পৃঃ)।' অনেক বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেও রুচিবিকৃতির লক্ষণ পাওয়া যায়। কবিগানে যে কত উঁচু ভাবধারারও পরিচয় আছে তার দৃষ্টান্ত লেখক নিজেই উদ্ধৃত করেছেন। শ্রীধর কথকের 'ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে' গানটি নিঃস্বার্থ প্রেমানুভূতির একটি বিরল দৃষ্টান্ত; সুতরাং কবিগান সম্বন্ধে এরূপ একটি সাধারণ মন্তব্য বোধ হয় করা যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের 'ক্যাভেলিয়ার' গোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে কবিওয়ালাদের তুলনা করা যেতে পারে বলে অরুণবাবু বলেছেন (পৃঃ ১৬)। এ মন্তব্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের নিকট প্রভেদটাই বড় বলে মনে হয়।

এগারো পৃষ্ঠায় লোকসঙ্গীতের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে কটি বাউল গান উদ্ধৃত করা হয়েছে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার সর্বশেষ অনুচ্ছেদের বক্তব্য অনুসারে মনে হয় এগুলি মঙ্গল-কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির সমসাময়িক। আসলে এগুলি অনেক পরবর্তী কালের। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত "বাংলা-কাব্য পরিচয়ে" এদের স্থান পরেই নির্দেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের পটভূমিকায় গীতি-কবিতার আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে যখন রোমাণ্টিক গীতিকবিতার অপ্রতিহত প্রভাব তখন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী কবিরা ক্লাসিকধর্মী কাব্যের সাধনা করে গীতিকবিতার আবির্ভাব বিলম্বিত করেছেন। অরুণবাবুর মতে বাঙ্গালী কবিরাই এজন্য দায়ী। কিন্তু অব্যবহিত পরেই আবার গীতিকবিতার বিলম্বিত আবির্ভাবের জন্য দায়ী করা হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে। হিন্দুমেলা, ন্যাশনাল থিয়েটার, নীলবিদ্রোহ, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে সমগ্র দেশে আবেগ ও উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল। 'সেই আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন খুব

স্বাভাবিক কারণেই গীতিকবিতা হইতে পারে না; গুরুবস্তু ভার-বহনক্ষম আখ্যায়িকা-কাব্যই সে আবেগ ও উন্মাদনার যথার্থ ও যোগ্য আধার হইতে পারে। গীতিকবিতার জন্য যে ধ্যানাবিষ্ট অনুভূতি, emotions recollected in tranquility প্রয়োজন, তাহা সেই দায়িত্বভারাবনত পরিবেশে লাভ করা সম্ভব ছিল না। ...জাতীয় জীবনে শান্তি ও স্থিতি না আসিলে গীতিকবিতা সর্বহৃদয়সংবাদী হইয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই এই পর্বে গীতিকবিতার আবির্ভাব বিলম্বিত হইয়াছিল...। (পৃঃ ৩৬)'

এই ব্যাখ্যা যে যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয় তা অরুণবাবু বিংশ শতকের প্রথম ত্রিশ বৎসরের বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ এবং অসহযোগের ঢেউ বাংলার জনচিত্ত যেরূপ প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ করেছিল, হিন্দুমেলা বা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটনার প্রভাব সেই তুলনায় খুবই সামান্য বলা যায়। তথাপি এই বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা লেখা হয়েছে এবং তাঁর অনুবর্তী কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতাও এই পটভূমিকাতেই রচিত। আবেগ ও উন্মাদনা গীতিকবিতার প্রতিবন্ধক না হয়ে সহায় হয়েছে।

সাহিত্যের ধারা আপনার নিয়মে আপনি চলে। ধারার পরিবর্তন বা বিবর্তনের জন্য কাউকে 'দায়ী' করা চলে না। ক্লাসিকধর্মিতার প্রাধান্য এক সময় হয়; তার পরে আসে গীতিকবিতার যুগ। কিন্তু একটি সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিয়ে গেলে তবেই আর একটি আসবে এমন কোনো কথা নেই। প্রকৃত পক্ষে দু'টি ধারাই অধিকাংশ সময় পাশাপাশি চলে। তবে কখনো কখনো একটি প্রধান হয়ে ওঠে। মধুসূদনের সময়ে কয়েক বছরের জন্য ক্লাসিক রীতির প্রাধান্যের কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সংঘাত নয়। দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ রেনেসাঁসের একটি প্রধান লক্ষণ।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল পতনের পর সেখানকার গ্রীক পণ্ডিতরা ইতালীতে চলে আসেন। তাঁরা ক্লাসিক্স্‌ চর্চা নতুন করে প্রবর্তন করবার ফলে ইতালীতে রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয় বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন। ক্লাসিকসের প্রতি আগ্রহ যে রেনেসাঁসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই জন্যই বাংলার নবজাগরণের প্রারম্ভে দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদের নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। সাহিত্যে তার চিহ্ন দেখতে পাই ক্লাসিকধর্মী বাংলা কাব্যের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনের জন্য এই জাতীয় কাব্যের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু ক্লাসিকধর্মী কাব্যের প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারেনি। কারণ সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিসিজম বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র প্লাবিত করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক এমন কয়েকটি মন্তব্য করেছেন যা বিচার করা প্রয়োজন। তাঁর মতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যে" বাংলা সাহিত্যের 'ভূগোলে সমগ্র ভারতবর্ষ আসিয়া ধরা দিল।' 'মঙ্গলকাব্যে ও বৈষ্ণবকাব্যে ঘরের আঙিনা ও তুলসী-তলাই একমাত্র সত্য ছিল (পৃঃ ২৭)।' কিন্তু মঙ্গলকাব্য কি বাঙ্গালী পাঠককে সিংহল নিয়ে যায়নি? গোবিন্দদাসের কড়চায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যত বিস্তৃত বিবরণ আছে রঙ্গলালের কাব্যে কি তেমন পাওয়া যায়? 'বৈষ্ণব কাব্যে তুলসীতলাই একমাত্র সত্য ছিল'—একথাও ভেবে দেখবার মতো। তুলসীতলার সংকীর্ণতার মধ্যেই যে কাব্য আবদ্ধ সে

কাব্যের আধ্যাত্মিক ও অন্যাবিধ উৎকর্ষ নিয়ে এত আলোচনা হয় কেন?

ঊনত্রিশ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'রেনেসাঁস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—বাধা-বন্ধহীন রোমান্টিকতার পূর্ণ বিকাশ।' রোমান্টিকতার পূর্ণবিকাশ যদি রেনেসাঁসের সময়ই হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী কালে আর একটি পর্বকে পৃথকভাবে রোমান্টিক যুগ বলে চিহ্নিত করবার কারণ কি? ইতালিয়ান রেনেসাঁসের সময় বর্তমান অর্থে রোমান্টি-সিজম শব্দটির ব্যবহার পর্যন্ত ছিল। অতীতের প্রতি আকর্ষণের মধ্যে কিছু রোমান্টি-সিজমে জড়িত থাকে। প্রধানতঃ সেটুকুই রোমান্টিসিজমের সঙ্গে রেনেসাঁসের সম্পর্ক।

প্রাচীন কবিদের সঙ্গে তুলনা করে লেখক বলছেন, 'আধুনিক কবির মন মুক্ত মন। কোনো ধর্মানুশাসন বা সংস্কার কবিমনকে নিয়ন্ত্রণ করে না (পৃঃ ৪৬)।' ধর্মের বন্ধন না থাক, এখন কি আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধন নেই? বন্ধনের যুগে যুগে রূপান্তর ঘটে; কিন্তু কোনো না কোনো বন্ধন থাকেই। বন্ধনমুক্ত জীবন আমাদের আদর্শ; সে জীবন পাওয়া যায় না। 'নদী ও ঝড় লইয়া যে কবিতা রচিত হয়, তাহাতে একটি উত্তাল বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি-চিত্র থাকে।' (পৃঃ ৪৭) এ জাতীয় সাধারণ মন্তব্য না করাই উচিত বলে মনে হয়। কারণ বাঙ্গালী পাঠকের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ 'নদী' কবিতাটির কথা। সেখানে 'উত্তাল বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি-চিত্র' নেই।

কীট্‌সের রোমান্টিক লিরিক কবিতা 'ওড্‌ টু এ নাইটিঙ্গেল'-এর সঙ্গে কালিদাসের মহাকাব্যের কয়েকটি লাইনের তুলনামূলক বিচার সমীচীন কিনা এই প্রশ্ন জাগে। দুটি যুগের দুই জাতের এবং দুই উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা। চিত্রময়তাই কালিদাসের উদ্ধৃত লাইন ক'টির বৈশিষ্ট্য।

সর্বশেষ অধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা নিয়ে অনেক বিষয়েই মতভেদ হবার আশঙ্কা আছে। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনা-বলীর হিসাব দিয়ে লেখক বলছেন যে 'নাটক গীতিকবিতার সহজ স্ফূর্তিতে বাধা দিতেছে।' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে গীতিকবিতার একক আধিপত্য হয়নি। তিনি একই সঙ্গে নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাই বলে কি তাঁর লিরিক কবিতার সহজ স্ফূর্তিতে বাধা পড়েছে বলা যায়?

অরুণবাবুর মতে "রাজা ও রানী" এবং "বিসর্জন" রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডি রচনার নিখুঁত পরিপূর্ণ পরীক্ষোত্তীর্ণ ফল। "রাজা ও রানী" সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অন্য ধারণা ছিল। তাই তিনি "তপতী" নাটক লিখে "রাজা ও রানীর" ত্রুটি সংশোধন করতে চেয়েছেন। ত্রুটি কোথায় তার ব্যাখ্যাও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, এবং রসজ্ঞ পাঠক তাঁর যুক্তি স্বীকার করবেন বলেই আশা করি।

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের অনেক জায়গায়ই মিল নেই। উপরে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এই ক'টি দৃষ্টান্ত আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য ক্ষুণ্ণ করবে না। অনেক পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর প্রবন্ধের জন্য পাঁচশত কবিতা সংগ্রহ করেছেন। এবং তাঁর এই সংগ্রহের মূল্য থিসিসের সাময়িক প্রয়োজনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকও কাব্য-সঙ্কলনটি ব্যবহার করে উপকৃত হবেন।

বাংলা সাহিত্যের অনেক বইয়ের এখন পর্যন্ত আলোচনা হয়নি এবং সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের যথার্থ স্থান নির্ণয়ের চেষ্টাও দেখা যায় না। আমাদের দৃষ্টি প্রথমশ্রেণীর এবং খ্যাতিমান লেখকদের উপরেই নিবন্ধ। অথচ দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর স্বল্পখ্যাত

লেখকদের রচনার মূল্যায়ন সাহিত্যের সামগ্রিক বিচারের জন্য অত্যাবশ্যক। ছোটকে না জানলে বড়র মূল্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া যায় না।

অরুণবাবু অনেক বিস্মৃতপ্রায় কবির সাহিত্য-সাধনার কথা আমাদের নিকট নতুন করে উপস্থিত করেছেন; যাঁদের আমরা একেবারেই ভুলতে বসেছিলাম এই নতুন আলোচনার ফলে ইতিহাসে তাঁদের আয়ুর মেয়াদ বৃদ্ধি পেল। এর জন্য অরুণবাবু কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। বইয়ের শেষে সংযোজিত কালানুক্রমিক কাব্যতালিকাটি পাঠকদের কাজে লাগবে।

গ্রন্থপঞ্জীতে ডঃ সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস", ডঃ হুমায়ুন কবিরের "বাংলার কাব্য" এবং ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের "বাংলা কাব্যে প্রাক-রবীন্দ্র" বই ক'টির উল্লেখ দেখতে পাব আশা করেছিলাম।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

The Golden Buttons. *By* Violette Leduc. Translated by Dorothy Williams. Peter Owen Limited. London. 16*s*.

ভায়োলেট লোডুক সেই জাতের লেখিকা যাঁরা সহজ জনপ্রিয়তার পথে না গিয়ে সাহিত্য সাধনায় নিজের ধ্যান-ধারণার প্রতি অবিচলিত থাকেন। যাঁরা প্রতিভাবান, কিন্তু যাঁদের নাম বিশেষ সাহিত্যামোদীদের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর বাইরে সহজে ছড়ায় না। মনে হয় তাঁর নাম এখনো ফরাসী সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী পাঠকদের গণ্ডী ছাড়ায়নি।

সত্যি বলতে কি আলোচ্য বইখানার মলাটে কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা পড়ে বেশ নিরাশ বোধ করেছিলাম, কিন্তু বইখানা পড়া হয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম আমার পূর্ব-অনুমানগুলো ভুল। কোমল-স্বভাবা অনুভূতিপ্রবণ চাষার মেয়ে ক্লথিল্ডের বাপ একটু চাষাড়ে স্বভাবের। বাপের শাসনের নিরানন্দ থেকে সে মাঝে মাঝে পালিয়ে যায় এক প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার কাছে। নিঃসন্তান বৃদ্ধাটি ক্লথিল্ডের এই বালিকা-সুলভ পক্ষপাতকে প্রশ্রয়ের চোখে দেখে, তার মনে সন্তান স্নেহ জেগে ওঠে। দৈবক্রমে একদিন ক্লথিল্ডের ছোট ভাই জলে ডুবে মারা গেল; এই দুর্ঘটনার জন্য ক্লথিল্ডকে দায়ী করা হয়। সে যদি আর একটু সাবধানী ও মনোযোগী হত তবে হয়তো এ দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত। ফলে পিতার রোষ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে যে প্রতিবেশিনীর বাড়িতে আশ্রয় নিল এবং প্রতিবেশিনীর চেষ্টায় সে কিছু দূরে এক চাষীর বাড়িতে ঝি হিসাবে স্থান লাভ করল। এখানে দু বছর কাজ করার পর কর্তব্য কর্মে কোন অবহেলা না ঘটলেও তার চাকরি গেল। তার সবচেয়ে বড় অপরাধ সে এখন পনেরতে পা দিয়েছে, এবং বাড়ির মালিক ম্যারিও তাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। কাজেই এই দুটি ঘটনার যোগাযোগের মধ্যে বাড়ির কর্ত্রী যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা দেখলেন। বিদায় নেওয়ার সময় ক্লথিল্ড ম্যারিওর সঙ্গে শেষ-দেখা করবারও অনুমতি পেল না। এরপর ক্লথিল্ড সহরের এক গৃহস্থের বাড়িতে বহাল হল। কিন্তু সেখানে একটিমাত্র রাত্রি বাস করেই তাকে সরে পড়তে হল। এখানেও দোষ অবশ্য তারই : কারণ বাড়ির ছোট ছেলে জর্জেস্ তাকে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল; মা তাকে অমর্যাদাকর কাজে নিয়োগ

করবেন এতে সে আপত্তি জানালো। এইটুকু জানতে পেরেই মা তাকে বিদায় দিলেন; কিন্তু তিনি যদি জানতে পারতেন যে জীবনের প্রথম এক অভূতপূর্ব উপলব্ধির দরুণ সারারাত এই দুটি তরুণ তরুণী ঘুমোতে পারেনি, জর্জেস্ মাঝরাতে এসে ঘুমের-ভান-করা ক্লথিল্ডকে স্পর্শ করেছে, ক্লথিল্ড তার একমাত্র মূল্যবান সম্পত্তি জামার সোনার বোতাম জর্জেসের জন্য উপহার হিসাবে রেখেছে, তবে হয়ত তিনি তাদের মাথা দাবী করতেন। একদিন আগে ক্লথিল্ড ছিল বালিকা, আজ সে যুবতী। এই মৃতজাত প্রেমকে ফেলে রেখে এরপর সে আশ্রয় পেল পায়রা-পাগল এক ক্ষ্যাপাটে ভদ্রলোকের বাড়িতে। সেখানে পাখীর ক্লান্তিকর একঘেয়ে সংসর্গে সহজেই সে হাঁপিয়ে উঠল, তার মন পালাই পালাই করতে লাগল। একদিন মরীয়া হয়ে সে তার অবোধ পলাতক প্রেমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কাহিনী এখানে শেষ। বলা বাহুল্য পাঠকের মন এখানে থামতে চায় না।

একশো ত্রিশ পৃষ্ঠার বইতে অনেকগুলি দৃশ্যান্তরের বিবরণ আছে। লেখিকা অনায়াসেই প্রতিটি দৃশ্যকেই টেনে লম্বা করতে পারতেন। নাটকীয় সংঘাতের ঘটনাগুলিকে অনেক বেশী রোমাঞ্চকর করে তুলতে পারতেন। কিন্তু ইচ্ছে করেই তিনি নাটকীয়তাকে বর্জন করে চলেছেন; সামান্য দু'চার কথায়, অনেক সময় বা নিছক আভাসে ইঙ্গিতে তিনি সংঘাতের সামান্য পরিচয় মাত্র দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ের দিকে চলে গিয়েছেন। এই সংযম এবং ব্যঞ্জনাধর্মিতা অবশ্য ফরাসী সাহিত্যেরই বিশেষত্ব; এবং সাম্প্রতিক কালে এটা প্রায় রোগ হিসাবেই দেখা দিয়েছে। আমার তো অনেক সময় মনে হয় সাহিত্য-কর্মে শুধু ব্যঞ্জনা নয়, বিস্তারেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে নায়িকা নাটকীয়তাকে বর্জন করেছেন কাহিনীর গূঢ় প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য।

কাহিনীটি মূলতঃ কাব্যধর্মী; সংঘাতের উপর অধিক গুরুত্ব দিলে এই কাব্যধর্মিতায় বাধা জন্মাত। এই কাব্য অবশ্য পরিণত বয়সের বৈচিত্র্যপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান-সম্মত কাব্য নয়। এ বালিকা হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য। বালিকা-হৃদয়ের সহস্র মুদ্রিত কোরক-গুলি রৌদ্রের স্পর্শে একদিন আকস্মিকভাবে খুলে যাচ্ছে—এইটি হল কাহিনীর উপজীব্য বিষয়। জন্মাবধিই যেন বালিকার মন নিজের অজ্ঞাতসারে এক পরম আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। তার সমস্ত স্পর্শকাতরতা, অনুভব ক্ষমতা, প্রকৃতির বর্ণ ও গন্ধের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, এই রুক্ষ পৃথিবীতে একটুখানি স্নেহের জন্য তার কাঙালপনা। সর্বোপরি তার অপারিসীম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা,—এই সমস্ত গুণগুলিরই তার প্রয়োজন ছিল সেই পরম লগ্নকে সে যাতে অনায়াসে চিনতে পারে, বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। অবশেষে একদিন দীর্ঘ-অচেতন প্রতীক্ষার পর ক্লথিল্ডের জীবনে সেই পরম লগ্নটি এল; কিন্তু লগ্নের প্রান্তে লেগেছিল গ্রহণের স্পর্শ। তাই লগ্ন গেল ভেঙ্গে; নির্বাক প্রেম বাক্ খুঁজে পাওয়ার আগেই দেখা দিল বিচ্ছেদ। ক্লথিল্ড অবশ্য হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল না; যে ঐশ্বর্য তার নিজের অন্তরে তারই সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে।

কাব্যের এই একটানা সুরকে লেখিকা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করতে চাননি বলে ক্লথিল্ডের বিড়ম্বিত জীবনের বিড়ম্বনার দৃশ্যগুলি তিনি শুধু আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। এই কাব্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে লেখিকার ভাষা আশ্চর্যভাবে সাহায্য করেছে। এ ভাষা যেন নিছক কাব্যের বাহন নয়, এ ভাষা নিজেই যেন কাব্য। 'Twilight was hovering like an eagle with open eyes', 'childlike might turned trees into flowers', 'immortal childhood show in his eyes'.— প্রভৃতি বাক্যাংশ

অজস্র আপন-ফোটা ফুলের মত ছড়িয়ে রয়েছে সারা বইতে। অনেকে বলতে পারেন এ বইয়ের সার্থকতার কারণ বোধ করি লেখিকার ভাষা আর প্রকাশনৈপুণ্য। আমি তা মনে করি না। বালিকাহৃদয়ের অনুভূতি মালার প্রতিটি ভাঁজ যদি লেখিকার পর্যবেক্ষণ আর অনুভূতিতে ধরা না পড়ত তবে নিছক ভঙ্গিমার আঙ্গিক তাঁকে খুব বেশী দূর নিয়ে যেতে পারত কিনা সন্দেহ।

কথাটা আর একটু বিশদভাবে বলা দরকার। বইখানা প্রেমধর্মী বটে; কিন্তু এর প্রেমধর্মিতা সম্পূর্ণভাবে বাস্তব-নির্ভর। বইখানা ফরাসী রোমান্টিক ঐতিহ্যপুষ্ট এ-কথা অস্বীকার করব না। কিন্তু আগের যুগের সে প্রেম আবেগের বাস্তবে জন্ম নিলেও তাকে টবে বর্ধিত ফুলের মত সযত্নে লালন পালন করে আতিশয্যে পরিণত করা হত। আলোচ্য বইয়ের রোমান্টিক মানস বালিকা হৃদয়ের একান্ত স্বাভাবিক একান্ত বাস্তব রোমান্টিকতা। ক্লথিল্ডকে কোন সময়েই মনে হয় না যে সে নিরক্ষর চাষীর মেয়ে নয়। আবার সে চাষীর মেয়ে বলে কখনোই আমাদের চেয়ে দূরের মানুষ বলে মনে হয় না। তার অনুভূতির ঐশ্বর্যে সে আমাদের সমান।

ক্লথিল্ডের বালিকা-সুলভ রোমান্টিসিজমের পিছনে স্বভাবতঃই কোন তত্ত্ব নেই। এ রোমান্টিসিজমের জন্ম অকরুণ বাস্তব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন। জীবন বড় নিষ্ঠুর, তবু বালিকা বিনা দ্বিধায় বিনা প্রতিবাদে জীবনকে অসীম মমতা ও আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করে নিচ্ছে। সে সমালোচক বটে; পিতাকে, প্রভুপত্নীদের সে সমালোচনা করে। তার সমালোচনা শুধু ব্যক্তির বিরুদ্ধে; জীবনকে সমাজকে সে সমালোচনা করে না, অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করে নেয়। সামান্য প্রাপ্তিকে সে আপন মনের রঙে রাঙিয়ে অসামান্য করে তুলতে পারে। বালিকা মনের এই বিশেষত্বকে লেখিকা অসীম দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

এই বাস্তবাশ্রিত রোমান্টিসিজমই লেখিকার আধুনিকত্বের প্রমাণ। আধুনিক মানুষ রোমান্টিক হতে চায়; কিন্তু পারে না। বিজ্ঞানশিক্ষিত মন বাস্তবকে অস্বীকার করার যুক্তি খুঁজে পায় না বলে বার বার বাস্তবের কাছে ফিরে আসে। এ-যুগের রোমান্টিসিজ্‌ম তাই বাস্তব-সম্ভাব্যতাকে পরিহার করে চলতে পারে না। লেখিকাও তাই বাস্তবের মধ্যে যে স্বাভাবিক রোমান্টিসিজম্‌ আছে তাকেই তাঁর কাহিনীর উপজীব্য করে নিয়েছেন।

অচ্যুত গোস্বামী

ঝর্নার পাশে শুয়ে আছি—সমীর রায়চৌধুরী। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি—ওমর আলী। কোহিনূর লাইব্রেরি, ঢাকা। মূল্য আড়াই টাকা।

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য—শক্তি চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ। মূল্য আড়াই টাকা।

অন্য এক সমুদ্র—শান্তিকুমার ঘোষ। এসোসিয়েটেড্‌ পাবলিশার্স। মূল্য দু'টাকা।

প্রসিদ্ধ অভিনয়শিল্পী সারা বার্নার্ডের কথা কে না জানেন! একবার কোনো এক নাট্যশালার অংশীদার তাঁকে এক দফা শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন

অধ্যাপক। সারার অভিনয় দেখে, তাঁকে ডেকে তিনি নাকি বলেছিলেন—'দেখুন, রঙ্গমঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে দর্শকদের দিকে আপনি পিঠ ফিরিয়ে সরে যান যে,—সেটা মোটেই ভালো নয়। ওতে দর্শকদের অসম্মান হয়।'

সারা তাতে বলেছিলেন—'কিন্তু দেখুন, এক প্রবীণা মহিলাকে পথ দেখিয়ে বাইরে এগিয়ে দেবার ভূমিকাতেই আমাকে যে সে-সময়ে নিযুক্ত থাকতে হয়! সমস্যাটা একবার ভেবে দেখুন দয়া করে।'

অধ্যাপক সে-জবাবে সন্তুষ্ট হননি। সারা বার্নার্ডের আগে দেশে কি আর কোনো অভিনেত্রী ছিলেন না? মঞ্চের ওপর দাঁড়াতে হলে শ্রোতাদের দিকে, দর্শকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ানোটা যে মোটেই সুরুচি নয়, সে-কথা কি সারাকে তিনি আরো বেশি করে বুঝিয়ে বলতে বাধ্য? তিনি রাগ করে সেখান থেকে সরে যেতে উদ্যত হলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সারা তাঁকে জিগেস করলেন—'আচ্ছা, অধ্যাপকমশাই আপনি তো এখনি ঐ সামনের দরজা দিয়েই বেরিয়ে যাবেন?—আমার দিকে আপনার পিঠ না-ফিরিয়ে যান তো দেখি?'

অতঃপর কী যে হয়েছিল, সে-কথা সহজেই অনুমেয়। সারা বার্নার্ড বলে গেছেন—'তিনি একবার চেষ্টা করলেন সেভাবে বেরিয়ে যেতে,—কিন্তু পারলেন না। রাগে জ্বলে উঠে, গট্‌মট্ করে, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে,—ঝনাৎ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন।'

আধুনিক,—অর্থাৎ, অতিশয়—সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিষয়ে দু'চার কথা বলবার জন্যেই সারা বার্নার্ডের এই গল্পটি মনে পড়লো। পরামর্শ দেওয়া সহজ, কিন্তু আসল কাজটা করে দেখানো দুরূহ ব্যাপার। মঞ্চের বাইরে যেতে হ'লে, যেখানে দর্শকদের দিকে পেছন-ফিরে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, সেখানে সেইভাবেই তো যেতে হবে। কিন্তু সেই অধ্যাপক সে-কথা বোঝেন নি!

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই রকম ব্যাপার। পাঠক বুঝলেন—কি-বুঝলেন-না,—রসিকের হৃদয়ে পৌঁছুলো-কি-পৌঁছুলো-না—হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে, সে-বিষয়ে লেখকরা মোটেই যেন চিন্তিত নন। একটু উগ্রভাবে বললে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা পাঠকের দিকে মুখ না ফিরিয়েই নিজের নিজের পথে চলেছেন বলে মনে হয়। যদি কোনো স্বল্পাবিবেচক বা সম্পূর্ণ অবিবেচক ব্যক্তি হঠাৎ তাঁদের কাউকে ধরে জিগেস করে বসেন যে, মশাই আপনারা যা বলছেন, সে-সবের মানে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে,—এবং সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা যেন কেবলই ধ্বনি-সমাবেশ, কেবলই বহিরঙ্গ কথা,—এ যেন কেবলই এক ধরনের মিহি উক্তি,—'সংক্রামক সহযাত্রী',—'মন্থিত স্পন্দন',—'এক ঝাঁক চড়ুইয়ের নিঃশ্বাসের হাওয়া',—'আমি একা সঙ্গীহীন ম্লান পাখি নির্জন শাখায়',—'অলস অলস ভালোবাসা তুমি নদীপথ আঁকো নখে নখে' গোছের অদ্ভুত ভাষা,—তাহলে কবিরা কী-ই বা বলতে পারেন? বলবার সত্যিই কিছু নেই। এক যুগের পরে আর এক যুগ আসে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে উনিশ শ চল্লিশের দশকের শেষ প্রান্ত থেকে আজ এই উনিশ শ' একষট্টি পর্যন্ত অন্য বিশেষত্বহীন একটা পর্বই শুধু চলেছে। এ কোনো যুগ নয়,—একে বরং সুদীর্ঘ, অতিপ্রলম্বিত এক যুগাবসান বলাই সংগত। সারা বার্নার্ডের সঙ্গে তর্ক করে অধ্যাপক যেমন বলেছিলেন যে, মঞ্চ থেকে মঞ্চের বাইরে যেতে হলে, কৃত্রিম হলেও দর্শকের দিকে পিঠ না ফিরিয়েই যাওয়া উচিত,—বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আজও সেই

রকম কিছু কিছু অনুষ্ঠানেই নিষ্ঠা দেখা যাচ্ছে। যে বাস্তব দৃষ্টির গুণে সারা বার্নার্ড সে-পরামর্শের বিরোধিতা করেছিলেন, সে-রকম সত্য-বোধ কোথায়? কবিতার উদ্দেশ্য কী? তার স্বরূপ কী? শান্তভাবে স্রষ্টাদের মনে এসব প্রশ্ন সত্যিই কি একালে দেখা দেয়? তা-ই যদি দিয়ে থাকে, তাহলে সমীর রায়চৌধুরীর এই রচনার মানে কি?

স্বচ্ছ নির্ভরতা

পৃথিবীর সব কিছু হেলে আছে কাছাকাছি কাঁধে
স্বাবলম্বী স্তুতিস্তোত্র, অপহৃত সাম্রাজ্যের গভ-আস্ফালন;
পিঁপীলিকা পাখি-সাধ আকাশের ক্রূর অভিশাপ
মৃত শালিখের শব হাতে তুলে বিস্মিত বালিকা—
অযুত যুগের এক চলমান নির্ঝরিণী খোঁজে
অথচ সে কিশোরীর রক্তে আসে ধূসর স্রোতের চূর্ণ জল
একদা বিলীন হতে, পুরাতন শালিখের বেশে।

দুদিনের জীবনের অশোক কাননতলে, নিরবধি চতুর্দিকে জাগে,
সন্ধান নিরন্ত ভঙ্গি; ব্যাপ্ত নীলে, স্বচ্ছ সন্নিধানে।
সমুদ্র পাহাড় সূর্য, বৃষ্টি মেঘ তুষারের দেহে
পরস্পরে বৃত্তলীন, অকপট, অবিচ্ছিন্ন গানে
পৃথিবীও মেরুদণ্ডে হেলে আছে, আকাশের ধূসর বাগানে।

এ রচনার মানে কি? 'পিপীলিকা পাখি-সাধ' মানে না-হয় পিঁপড়ের পাখি হবার সাধ;—এখানে এই রকম টুকরো-টুকরো আরো দু'একটি কথার মানে বোঝা যাচ্ছে বটে,—কিন্তু শালিখের শব হাতে-তুলে-নেওয়া বিস্মিত বালিকাটি কে?—শালিখই বা কেন? কেন এ-সব কথা? জগতে অণুপরমাণু সকলের মধ্যে, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অন্বয় উপলব্ধির কবিতা কি এটি? না, তাও নয়। তাতে যে বিস্ময় থাকা স্বাভাবিক, এতে তা নেই। এ একটা ভঙ্গির আবৃত্তি। এখানে প্রাণ নাহি জাগে! কবিরা সে-কথাটা বুঝুন।

শালিখ সম্বন্ধে শ্রীসমীর রায়চৌধুরীর আসক্তি চোখে পড়বার মতন। তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় কবিতাতেও শালিখ আছে,—আর অন্যান্য কবিতাগুলির প্রায় সর্বত্রই শকুন, মোরগ, পিপীলিকা, ভ্রমর, ফড়িং, মাছরাঙা ইত্যাদি তো আছেই,—তা ছাড়া এরকম বিচিত্র উক্তিও ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে যেমন—

১ 'বৃষকে বলদ জেনে, দ্যাখো, কৃষকেরা গাভিনী হয়েছে'। (অন্তঃশীলা)

২ 'ফনিমনসার কাঁটা ভুক্তভোগী ত্যক্ত শশিকলা,
অবলা সবাই নহে, আত্মরক্ষা চন্দ্রপাঠ বোধ—
রোধ করি রাখিয়াছে; বসুধার সারাটা জমাট।'
(শুক্লা রজনীর আলোয়)

৩ 'বিড়ালীর ছেলেপুলে হলে, নধর ইঁদুর দুটো এনে দিও, তাকে'।
(মন্থিত স্পন্দন)

কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই বইখানি সম্বন্ধে এতো কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, এ-প্রকাশভবনের সঙ্গে যুক্ত যে কবিদল, তাঁদের মধ্যে সম্ভাবনার লক্ষণ দেখা গেছে একাধিকবার। উদ্ভট কিছু-একটা করে তোলবার চেষ্টা পরিত্যাগ করাই ভালো। অন্ততঃ বাংলা কবিতার ধারা রবীন্দ্রনাথ যেখানে পেঁীছিয়ে দিয়ে গেছেন,—তারপর, যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি-ব্যতিরেকে বিনা-গভীরতায়,—কেবলমাত্র তাক-লাগানো গোছের নতুন কিছু একটা দেখিয়ে দেবার জন্যেই সত্যি কিছু করে তোলা সম্ভব নয়!

ওমর আলীকেও সেই অনুরোধ। তিনি অবিশ্যি শারীরিক কোনো কোনো সুখের কথা বলতে ভালোবাসেন। চামেলি, মালতী, রজনীগন্ধা ইত্যাদি ফুলের গন্ধস্পর্শের সুখেই তিনি সমাচ্ছন্ন। সেই সব, এবং সেই ধরনের অন্যান্য কথাসূত্রেই তিনি 'প্রেয়সী', 'নীবী',—'রসনায় কী ভীষণ কৃষ্ণচূড়া দাবানল জ্বালে',—'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' ইত্যাদি কথা উচ্চারণ করেছেন,—এবং এ-ছাড়া আরো যা বলেছেন, তা কোনো সুস্থ সাহিত্যিকের উচ্চারণযোগ্য নয়। হয়তো রমণীদেহ সম্বন্ধে প্রগল্‌ভতা প্রকাশের খেয়াল তাঁকে পেয়ে বসেছে! কিন্তু, বাংলা সাহিত্যে সে-সব ফ্যাশানও সত্যিই সেকেলে হয়ে গেছে। এই নির্ভরযোগ্য বন্ধুবচনে তিনি বিশ্বাস করুন, এইটেই আন্তরিক অনুরোধ। 'একটা ভালো মেয়েলোক'—এ-যে ভালো বাংলাও নয়। তাঁর 'বাঞ্ছিতা' কবিতায় তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এ-উক্তি পর পর তিনবার করেছেন। ভেবেছিলুম যে তাঁর 'আমার দেশকে' কবিতাটিতে গভীর কোনো উৎসর্গের কথা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানেও কবিতার চিরাভ্যস্ত এক ধরনের উদাত্ত ভঙ্গিরই শূন্যতা!

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বইখানির প্রথম কবিতা 'খেলনা'তেই 'সখ্যতা' শব্দটি চোখে পড়লো। ওটা ভুল। আর, 'এ-জীবনী পরাণভ্রমর' উক্তিটিরই বা কাব্যোচিত কোনো মানে আছে কি? এ-জীবন ভ্রমর—বললেও অচল হয় না, কিন্তু 'জীবনী' মানে তো biography,—সে আবার পরাণভ্রমর? তিনি তাই-কি বলতে চেয়েছেন? মানে কি? তিনিও অনেক ফুলের নাম করেছেন,—আর, একালের কবিতায় ব্যবহৃত 'মেছো বক', 'মায়াবী সকাল', 'ঈশ্বরের মুখ' ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে।

'জন্ম এবং পুরুষ' ব্যাকরণ-অভিধান-রুচি-লঙ্ঘন-করা একালের বীভৎসতম মধ্যেই গণ্য। এধরনের বই প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। নিজের সন্তানের হাতে সুস্থ অবস্থায় কোনো-দিনই নিজের যে-লেখা তুলে দেওয়া যাবে না, কবিরা সে-রকম লেখা কখনোই যদি না প্রকাশ করেন, তাহলে ভালো হয়!

শান্তিকুমার ঘোষের "অন্য এক সমুদ্র" তাঁর গতানুগতিক 'আধুনিক কবিতা'রই সংকলন বটে,—কিন্তু তিনি যে রুচিবিকার থেকে মুক্ত, তাতে সন্দেহ নেই। অমিয় চক্রবর্তী যেমন দূর দূর অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেই তাঁর কতকগুলি কবিতার বিষয় নির্ধারণ করেছেন, ইনিও যেন কতকটা সেই ভাবেই 'কানারীয় গীত', 'ওয়াই ভ্যালি'—'কাচের আধারে মদ, সিম্ফনিক ঢেউ, প্রভৃতি উক্তি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন,—কিন্তু শান্তিকুমারের স্বভাব অন্য রকম। তিনি গভীর অর্থে আধ্যাত্মিক নন—অমিয় চক্রবর্তীর মতন স্বভাব-বিশ্বচর নন তিনি। তিনি বরং বলতে ভালোবাসেন—'বুকের বর্তুল ওঠে সুমেরু সমান' (প্রাচীন পৃথিবী আজো)! তবে অমিয় চক্রবর্তীই এ-পর্বে তাঁকে অধিকার করে আছেন, যেমন তাঁর প্রবাস-ভ্রমণের আগে তাঁর লক্ষ্য ছিল অন্য কোনো কোনো বাঙালী কবির দিকে!

কিন্তু এইসব নমুনা হাতড়ে হাতড়ে ভালো-মন্দ-মাঝারি কবিতা বাছাই করবার

কথাটা বাহ্য! জীবনকে শৌখীন কোনো-রকম ভঙ্গির অধীন মনে করাই তো বাতুলতা। সত্যিকার আধুনিক জীবনবোধ এবং সত্যিকার ভাষাজ্ঞান—এই দুটি প্রান্ত যিনি মিলিয়ে দেখাতে পারেন, আমাদের বর্তমানকালের জটিল জীবনরঙ্গক্ষেত্রে সেই সার্থক আধুনিক কবির আবির্ভাবের সম্ভাবনা এইসব প্রয়াসের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে।

হরপ্রসাদ মিত্র

Poems. *By* Dom Moraes. Eyre & Spottiswoode. London. 10*s* 6*d*.

সবে বাইশ পেরিয়ে তেইশের ঘরে এসেছেন। মুখে তারুণ্যের দীপ্তি, চোখে নবীন বাঙ্ময়তা। মনে হয় সে বাঙ্ময়তা একান্তভাবে কবিতার জগৎ থেকেই আহৃত। জন্মসূত্রে ভারতীয় একদা-অক্স্‌ফোর্ডের ছাত্র ডম মোরেস, শুনতে পাই, পশ্চিমী দেশে ইংরেজি কবিতা লিখে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এবং তা করেছেন আশাতীত-ভাবে প্রথম বইয়েই—*A Beginning*-এ। হথর্নডেন পুরস্কার-বিজয়ী সেই প্রথমার মধ্যে বিদেশী কবিতাপাঠক-ও-সমালোচক সম্প্রদায় ভাবীকালের একজন বড় কবির সম্ভাবনা আবিষ্কার করে আনন্দিত বোধ করেছিলেন। আমাদের আনন্দ বাইশ বছরের ভারতীয় কবি ইংরেজ কবি-মহলে স্থান পেতে চলেছেন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের চার বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে *A Poems*—মোরেসের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, কবি-মানসের ক্রম-পরিণতির নিদর্শন-স্তর। এই বইয়ে মোরেস আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন, কণ্ঠস্বরে বিশিষ্টতর হয়ে উঠেছেন। প্রথম কবিতা 'অটোবায়োগ্রাফি' থেকে শেষ কবিতা 'শেষ কথা' অবধি কবিতাগুলি পড়ে গেলে যে কবি-সত্তা আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে তার স্বভাব; সরল, শান্ত, সুধীর।

বিশেষণ তিনটি ব্যবহার করে থামতে হল। কারণ বিশেষণ তিনটির সমবায় বর্তমান পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবে নেতিয়ে-পড়া নিশ্চরিত্র মানুষতার ছবি জাগিয়ে তোলে। বিপরীতভাবে আমাদের কবি প্রত্যয়ে ঋজু, উচ্চারণে বলিষ্ঠ, ঋজু বা বলিষ্ঠ কথার অর্থ অবশ্যই নয় উচ্চ স্বরগ্রামে বাঁধা প্রায়-সাহিত্য-বিরহিত ভাষণধর্মিতা। বরং মোরেসের কবিতায় স্পর্শসহ শিরদাঁড়ার উপস্থিতি প্রশংসনীয়ভাবে লক্ষণীয়, তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় একটা ক্যারেক্টর,—রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে—সুনিশ্চিত আত্মতা।

এই আত্মতা একজন তরুণের—তরুণ কবির। সাধারণভাবে তিনি প্রেমিক, তাঁর উপলব্ধি অগভীর নয়; মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তিনি সচেতন, জগৎ সংসারের প্রতি অপ্রসন্ন নন; এখনও মনে সবুজ পত্রালির মর্মরিত সুপবন প্রবাহিত হয়; যা বিশ্বাস করেন তা গাঢ়ভাবেই করেন। এবং এই কারণে নিজস্ব ভঙ্গীতে সহজ উচ্চারণে ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তাকে তিনি সরাসরি পাঠকের মনে পৌঁছে দিতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কবিতার শুরুতেই বক্তব্যের অনচ্ছতা ও প্রকাশভঙ্গীর সহজ ঋজুতা চোখে পড়ে :

Since I was ten I have not been unkind
To anyone save those who were most close.
Of my close friends one of the best is blind

One deaf, and one a priest who can't write prose.
None has a quite mind. (*The Final Word*)

Grey goose and gander
Go with cranberry sauce.
I can understand the
World without remorse. (*Voices*)

I wake and find myself in love:
And this one time I do not doubt.
I only fear, and wonder out
To hold long parley with a dove. (*The Garden*)

প্রকাশভঙ্গী ঋজুতাসম্পন্ন হলেও কাব্যগত অলঙ্কারের দ্যুতিও দুর্লক্ষ্য নয়। উপমাবয়নের দ্যুতিময় অভিনবত্বের দু-একটি নিদর্শন :

Rain drones on outside like a businessman's stories.
(*French Lesson*)

I roll my mind at your feet like the painting
Of some idler who died, unremarked, in an attic
(ঐ)

কিন্তু সামগ্রিকভাবে মোরেস বচনপ্রধান কবি। এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গীর সহজ ঋজুতার কারণও বোধ হয় তাঁর কবিচরিত্রে নিহিত। তাঁর মন এখনও নানা অভিজ্ঞতার ঘূর্ণিপাকে জটিল হয়ে ওঠেনি, তিনি যেটা বলেন স্পষ্টভাবেই বলেন, অন্তত বলার চেষ্টা করেন, যদিও দু' চারটি কবিতা যে পর্দায় সুরু হয়েছিল, সে পর্দা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকেনি। এর কারণ বোধ করি কবিতাকে রমনীয় করে তোলার দিকে তাঁর তারুণ্যধর্মী প্রবণতায়। অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য বা মসৃণ মাধুর্য—যাকে বলে melliflousness—তাতে কখনো কখনো কবি হারিয়ে গেছেন। তবে এ দোষের দৃষ্টান্ত খুব বেশি নয় এবং মোরেসের ক্ষেত্রে এ দোষেও মৃত্যু অদূরবর্তী নয় বলে মনে হয়। বর্তমান কাব্যসংগ্রহে মোরেসের কবিসত্তা প্রধানত প্রেমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই প্রেমে দুঃখ বেদনা আশা-নিরাশা আছে, কিন্তু প্রেম সুন্দর, সুন্দরভাবে সত্য। প্রেম নিত্য নিঃসংশয়, অক্ষয় গৌরবের অধিকারী সে। এই প্রেম কতটা দৈব কতটা জৈব সে বিচার করুন পণ্ডিতসমাজ, মনস্তাত্ত্বিকবর্গ, কিন্তু তরুণ মোরেস জানেন তাঁর জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া যে মাধুরী তাঁকে দিয়েছেন তাঁর প্রেয়সী, তার মূল্য অপরিমেয়, সংসারের কোন কিছুই তার তুলনা হতে পারে না। তাই তিনি প্রেম সম্পর্কে প্রেমের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় :

I wake and find myself in love:
And this one time *I do not doubt.*

প্রেমের মৃত্যু নেই। সে অনাদি অনন্ত। তার স্পর্শে মরণশীলও মৃত্যুঞ্জয় হয়ে ওঠে।

. . . her love at last expressed,
Into my arms: and then *I cannot die.*

সমাপ্তি বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা প্রেমেই। তবে আপাতদৃষ্টিতে যা সমাপ্তি তা তো পথ-চলতির বিশ্রাম। এবং সেই সার্থক বিশ্রাম পাখির নীড়ের মতো প্রিয়তমের হৃদয়ে :

I have furnished my heart to be here nest
For even if at dusk she choose to fly
Afterwards she must rest.

কিংবা কিঞ্চিৎ ভিন্নতর ভাষায় ও ভঙ্গীতে :

Except in you I have no rest,
For always with you I am safe.

মোরেস যথার্থ প্রেমিক বলেই তাঁর জীবনে অগাধ আস্থা, অপার আনন্দ। সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রতি তীব্র অভীপ্সা। এবং এই কারণেই জীবনকে ধ্বংস করবার জন্য যারা সচেষ্ট, তাদের প্রতি তীক্ষ্ণবাণী তিনি, কারণ তারা সর্ববিধ ক্ষমার অযোগ্য। একটি কবিতায় (কবিতাটির গাঢ়বন্ধতা, মিতভাষণ, ব্যঞ্জনাগর্ভতা বিশেষ প্রশংসনীয়) তার প্রমাণ :

Where you lived, when the fighting planes came over,
The houses shrank into their bricks, and then
Suddenly fell down, and then the river
Went red and pulpy, and the limbs of men
Tumbled around you where you stood, a child,
Wondering upward at what fell from heaven
To break your toys.
Years later, when you smiled,
All was explained, though nothing was forgiven.

(*For Dorothy*)

সমসাময়িক ঘটনাবলীও যে তাঁর কলমকে স্পর্শ করে তার প্রমাণ The Frontier বা From Tibet.

পুনরুক্তির সুরে বলা যায় ডম মোরেস জীবনপ্রেমী এবং তিনি আদ্যন্ত কবি, কবিতা তাঁর রক্তে নিয়ত নৃত্যপরা (তাঁর কথাতে : Poems dancing in my blood)। কিন্তু এ মন্তব্যের যাথার্থ্য অনুভূতিসাপেক্ষ, তাই এইখানেই আলোচনার ছেদ টানছি।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

রক্তগোলাপ—সন্তোষকুমার দে। কথাকলি। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা দেশে সাম্প্রতিক কালে যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই গল্পের ভাববস্তুর চেয়ে টেকনিকের বৈচিত্র্যের দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। অতিরিক্ত 'টেকনিক' প্রবণতা ঘটলে গল্পের প্রাণ চাপা পড়ে যায়। তেমনি আধুনিক গল্পে অনিবার্য কারণেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসেছে বুদ্ধিধর্মিতা বা

সাংকেতিকতা। গল্পকে সুন্দরভাবে বলাই গল্পকথকের প্রধান কাজ। যুগভেদে তার অনিবার্য রূপভেদ ঘটা সত্ত্বেও গল্পরস আজও ছোট গল্পের মুখ্য আকর্ষণ। একটি মুহূর্ত, একটি আবেগের ঢেউয়ের রূপায়ণ ছোট গল্পকে গীতিকবিতার সমধর্মী করে তুলল। আবার একটি ঘটনার আকস্মিকতা ছোট গল্পে নিয়ে এল নাট্যরীতিকে। তবু গল্প প্রধানত গল্পই—সন্তোষকুমার দে-র "রক্তগোলাপ" পড়ে তাই মনে হয়। এই গল্পসংকলনে টেকনিকের মার-প্যাঁচ নেই, সংকেতধর্মিতা নেই, গল্পরসই এগুলির প্রধান সম্পদ। তাঁর 'উন্মেষ', 'সঙ্গিনী' গল্পগুলি পড়তে পড়তে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে হয়। সেই গ্রামীণ জীবনের ছন্দ, স্বপ্নের মত মধুর, 'উন্মেষ' গল্পটিতে গীতিকবিতার স্বাদ লেগেছে। 'সঙ্গিনী' করুণ-সুন্দর গল্প।

গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় যেমন সন্তোষকুমার লিখেছেন পূর্বোক্ত গল্প দুটি, তেমনি নাগরিক জীবনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। তাঁর দৃষ্টি প্রগতিশীল অথচ কোথাও প্রচারধর্মী নয়। 'একালের কাহিনী' 'সৈনিক' তার দৃষ্টান্ত।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

বাঙলার কাব্য

হুমায়ুন কবির

বাঙালীর গৌরব বাঙলার কাব্য। হাজার বছরের গৌরবময় ঐতিহ্যের উপর বাঙলার কাব্যের প্রতিষ্ঠা। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ সেই কাব্যধারার গতি প্রকৃতি মনোজ্ঞ নৈপুণ্যে বিশ্লেষণ করেছেন হুমায়ুন কবির। সর্বপ্রথম সমাজ-মানসের বিস্তৃত পটভূমিকায় বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যে প্রথম সাহসী সাহিত্যকৃতি। বাঙলার কাব্য সাহিত্যের সামগ্রিক রূপের পরিচয় লাভের পক্ষে এ গ্রন্থ অপরিহার্য। মূল্য তিন টাকা

মার্ক্সবাদ

হুমায়ুন কবির

আধুনিক চিন্তা-জগতে যাঁরা দিগন্তপ্রসারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন, কার্ল মার্ক্স তাঁদের অন্যতম। এই মনীষীর যুগান্তকারী দর্শন ও মতবাদ বুঝতে হলে বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। মূল্য দু টাকা পঞ্চাশ ন.প.

পটলডাঙার পাঁচালী

যুবনাশ্ব

"কল্লোল" পত্রিকার অগ্রণী মশালচী যুবনাশ্ব একদিন সাহিত্য-পাঠক-সমাজে আলোচনার বিষয় ছিলেন। গভীর জীবনবোধ, কঠোর সত্যনিষ্ঠ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে যুবনাশ্বের রচনা শাশ্বত সাহিত্য-মূল্যে বিশিষ্ট। এবং তারই স্মরণীয় দৃষ্টান্ত "পটলডাঙার পাঁচালী"। লেখকের একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য দু টাকা পঁচিশ ন.প.

প্রাপ্তিস্থান :

চতুরঙ্গ। ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা ১৩ ॥ মিত্রালয়। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ॥ বাক সাহিত্য, কলেজ রো, কলিকাতা ১২